অবসর

৩য় বর্ষ

ভাদ্র ১৩১৩ - শ্রাবণ ১৩১৪

অবসর

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

পঞ্চম খণ্ড।

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা;

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রচার কার্য্যালয়" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচিপত্র।

অবসর

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

শ্রীশ্রী ভগবানের মঙ্গলময় নাম এবং ভগবতীর সর্ব্বমঙ্গলময়ী নাম স্মরণ করিয়া, অবসর পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। যাঁহারা বন্ধুভাবে প্রতিপালক-রূপে এতাবৎকাল অবসরকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এই শুভ অবসরে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহাদের সেবায় অবসর নিয়োজিত হইল।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তুরস্কে ভীষণ অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছিল। তুরস্কের নব্য সম্প্রদায় সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু বহুদর্শী সুলতান মহোদয় প্রজার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং রাজ্য হইতে গুপ্ত পুলিশ তুলিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য আজ তুরস্কে নরকের কোলাহল উত্থিত না হইয়া দেশব্যাপী জয়ধ্বনি উঠিয়াছে। সুলতানের স্বার্থত্যাগ অনেক সভ্যতাভিমানী নৃপতির আদর্শ সন্দেহ নাই।

ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লার্ক তত্রত্য বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কাছারীবাটী অবৈধভাবে খানাতল্লাসী করা অপরাধে অভিযুক্ত ও পাঁচশত টাকা হিসাবে দুইটী ক্ষতিপূরণ প্রদানে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মিঃ ক্লার্ক হাইকোর্টের এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন।

বরদার জনপ্রিয় মহারাজ গায়কবাড় সম্প্রতি সিমলা-শৈলে বড়লাট মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। জনরবে প্রকাশ, মহারাজ গায়কবাড় সিমলায় বর্ত্তমান অশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

চীন এবার তিব্বতের উপর একাধিপত্য স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তিব্বতে চীনের একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং রণকুশল সেনানায়কগণের নেতৃত্বে নূতন নূতন সৈন্যদল তিব্বতে নীত হইতেছে। সুপ্ত চীন যে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে ইহা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

নববর্ষ।

পুলকে মাতিয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া
আইলরে নবীন বরষ।
নবীনা নবীনে নবীন মিলনে
হেরি সবে নবীন হরষ॥
নবীন জীবনে কুসুম কাননে
ফুটিয়াছে কুসুম-নিকর।
নব প্রেমভরে গুণ্ গুণ্ স্বরে
কিবা ভ্রমিতেছে মধুকর॥
নব শশধর উদি' নভপর
নব কর করে বরিষণ।
ধরণী ভাতিছে প্রকৃতি হাসিছে
করে অঙ্গ করি আবরণ।
নব অনুরাগে বসি' তরু-শাখে
গাহিছে কোকিল কুহুতানে।
প্রেমের চাতুরী শ্যামের বাঁশরী
বাজে যেন রাধাগুণ গানে॥
নদ, নদীকুল ভাসায়ে দু'কূল
খেলিতেছে অকূল পাঁথারে।
নব প্রেমোচ্ছ্বাসে ক্রমে চলি ভেসে
মিশিতেছে অনন্ত সাগরে॥
চতুর্দ্দিকে ফিরি নবীন মাধুরী
আঁখি ভ'রি করি নিরীক্ষণ।
আজি অবসর নব কলেবর
নবভাব করিল ধারণ॥

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাদুরে দৃশ্য।

প্রখর দাবদাহী গ্রীষ্মের অন্ত হইয়াছে। অবিশ্রান্ত ধারাবাহি বর্ষাও শেষ; পথ ঘাট কর্দ্দম শূন্য হইতেছে। ম্যালেরিয়াগ্রস্থ ও অন্নহীন কৃষকগণের অধরে আজ মৃদু হাসি খেলিতেছে। আজ দু'বৎসর পরে জরাজীর্ণ কৃষকগণ, মা লক্ষ্মীর দর্শন পাইয়াছে; তাই আজ বালক বালিকার, যুবক যুবতীর, বৃদ্ধ বৃদ্ধার মুখে হাসির রেখা ফুটিতেছে। পাঠক, মাঠের দৃশ্য দেখ, মা লক্ষ্মী ধান্যক্ষেত্রে অধিষ্ঠান হইয়াছেন—মা চঞ্চলা আজ দুই বৎসর তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত মৃতপ্রায় কৃষকগণ মায়ের দর্শন পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। প্রতি ক্ষেতে ধান্য বৃক্ষ আসন্ন পক্কাবস্থায় ফলভারে অবনত। ধান্য ক্ষেতে কৃষকগণ মৃদু মধুর কলরবে ধান্য কাটিতে তৎপর;—কেহ বা গো-গাড়ীতে ধান্য বোঝাই দিতেছে,—কেহ বা তাহা উৎসাহ সহকারে তুলিয়া দিতেছে,—আর কেহ বা নবীন আনন্দে ধান্যাধার "গোলা" বাঁধিতেছে। কৃষককুল আজ নবীন আনন্দে উন্মত্ত। কৃষক পত্নীগণও জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দেহে নূতন উৎসাহে কার্য্যে যোগ দান করিতেছে; কেহবা এবার এক জোড়া মল পাইবার আশায় আশান্বিতা হইতেছে। দেখ পাঠক! কোথাও কৃষকগণ "ধানের ক্ষেতে" বসিয়া মনের আনন্দে জলবৎ-তরল দধি সহ নূতন ধানের চিড়া অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে—বাস্তবিক তাহার কি অমৃত স্বাদ! সহরবাসী পাঠক! তোমরা এ রসাস্বাদে অক্ষম। আর দেখ, বালক বালিকাগণও অনাহুতভাবে তাহদের নিকট আসিয়া কত প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ করিতেছে। আরও দেখ কত বালক মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ধানের শীষ তুলিয়া 'নোচ' বাঁধিতেছে,—দেখ সহরবাসী পাঠক! জীর্ণ শীর্ণ কুটীরবাসীর মনের আনন্দ দেখ, তোমরা সৌধশিরে বসিয়া এহেন আনন্দ কল্পনাতেও আনিতে পার না। আরও দেখ, হরিৎ বর্ণের টিয়া পাখীগণ ঝাঁকে ঝাঁকে মাথার উপর দিয়া মিষ্ট মধুর কলরব করিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেত্রে বসিয়া 'ক্যাঁ কোঁ' শব্দে ঠোঁট দ্বারা শীষ তুলিয়া মনের আনন্দে ভক্ষণ করিতেছে। আর কোথাও নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত অশ্বত্থ বৃক্ষে বসিয়া শ্যামা শিস দিতেছে। আর দেখ পশ্চিমে দিনমণি ডুবু ডুবু; পশ্চিম গগণ লোহিত বরণে উদ্ভাসিত, কে

যেন দিকে দিকে তরল সোনা ছড়াইয়া দিয়াছে; বৃক্ষশির সে আভায় আলোকিত, ধান্য শীষ আলোকিত; আর বালকগণ সে আভায় পুলকিত হইয়া মনের আনন্দে গান আরম্ভ করিয়াছে। কে বলে পল্লীবাসীর আনন্দ নাই সদাই নিরানন্দ; কে বলে পল্লীবাসীর সুখ নাই সদাই অসুখ। সহরবাসী! দেখ, তোমরা সুখের জন্য, সুবিধার জন্য, আনন্দের জন্য দলে দলে সহরে বাস করিতেছ,—কিন্তু বল এক দণ্ডের জন্যও এ সুখ-চিত্র তোমাদের হৃদয়ে উদয় হয় কি?

জনৈক পল্লীবাসী।

প্রেম-স্বপ্ন।

নীরব নিথর-সুপ্ত
অবস পরাণ,
জেগে উঠে সুধা স্পর্শে
নব বলিয়ান।
পুলকে খসিয়া যায়
লাজের বন্ধন
বিহ্বল মদিরা পানে
মত্ত প্রাণ মন।
ভাষার অতীত কথা
অস্ফুট সে রব
ছড়াইয়া দেয় প্রাণে
পবিত্র সৌরভ—
সে শুধু ক্ষণিক স্পর্শে
চকিত মিলন
অজানা কি স্বর্গ রাজ্যে
করে বিচরণ।

নগেন্দ্রবালা।

ক্রমোন্নতি।

কর্ম্মক্ষেত্র এই জগতে জীবমাত্রেই কর্ম্মের বাধ্য। এবং সেই কর্ম্ম আবার ক্রমের বাধ্য, ক্রম পুরুষকারের, পুরুষকার আবার একতার বাধ্য। যাক্; এক্ষণে বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার সৃষ্ট জগতে কোন একটী কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা সম্পন্নের জন্য ক্রমানুসরণ করিতে হয়। ক্রমানুসরণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য যে সুসম্পন্ন হয় না, তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপে লিখিবার ক্ষমতা আমার না থাকিলেও জন সাধারণের সচরাচর ব্যবহৃত চলিত কথা অবলম্বন করিয়া লিখিতে মনস্থ করিয়াছি, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, যেন অজ্ঞের কথাগুলি অবজ্ঞা করিয়া পাঠের অযোগ্য বিবেচনায় অন্তর হইতে অন্তর্হিত না করিয়া, লিখিত বিষয়ের প্রকৃত সার মর্ম্ম গ্রহণ করতঃ লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

সংসারাশ্রমে, লঘুতর হইতে গুরুতর পর্য্যন্ত যে কোন একটী কার্য্য করিতে হইলে যে ক্রমের অনুসরণ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে নিম্নে একটী শ্লোক প্রদত্ত হইল। যথা;—

"শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কান্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ কর্ম্মশ্চ ধর্ম্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥"

বোধ হয় এই শ্লোকটী সকলেই অবগত আছেন। তথাপি পুনরায় সাধারণের নিকট জ্ঞাত করাইবার জন্য, বিশেষ রূপে আদরের সহিত উদ্ধৃত করা হইল। শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, "এক স্থান হইতে অন্য কোন এক-স্থানে যাইবার মানসে রাজ-পথে গমন করিতে হইলে, একপদ একপদ করিয়া ক্রমে সেই স্থানে পৌঁছিতে হয়, ইচ্ছামাত্রেই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায় না। (২) পরিণয় কালেই প্রণয়িণীর সহিত প্রণয়ীর প্রণয় জন্মে না, তাহাও ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। (৩) অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ আরোহণ কিম্বা অতিক্রম করিতে হইলে, প্রথম পাদ দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিতম্বদেশে উপস্থিত হইতে হয়, পরে নিতম্ব দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে শিখর দেশে আরো-হণ করিতে হয়, কিন্তু ইচ্ছামাত্রেই তাহা হয় না। (৪) সংসারে লঘু ও গুরু যে কোন একটী কার্য্য করিতে হইলেই ক্রমের অনুসরণ করিতে হয়, ক্রম

ভিন্ন তাহা সম্পন্ন হয় না। (৫) ধর্ম্ম করিতে হইলেও ক্রমের আবশ্যক। ফলতঃ এই পঞ্চ প্রকার নিষ্পন্ন করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে ক্রমের আবশ্যক হইয়া থাকে।

" যেমন ভূমিখণ্ডে বৃক্ষবীজ বপন করিবামাত্রেই তাহা সুবৃহৎ বৃক্ষে পরিণত না হইয়া; আপন দেহ পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত ক্রমের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে; তদ্রূপ এই কর্ম্মক্ষেত্র জগতে ক্ষুদ্রতর হইতে বৃহত্তর পর্য্যন্ত যে কোন একটী কর্ম্মের সূচনা হইবামাত্রেই যে, তাহা নিষ্পন্ন না হইয়া সুসম্পন্নের জন্য ক্রমানুসরণ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"প্রকাণ্ড কাণ্ড বিশিষ্ট কোনও একটী বৃক্ষের ছেদন মানসে, কাঠুরিয়া যদি সেই কঠিন কাষ্ঠের উপর একবার কুঠারাঘাত করে, তাহা হইলে কি বৃক্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়, না—ক্রমান্বয়ে কুঠারাঘাত করিলে পর ক্রমে তরু ছিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া থাকে? (২) পুষ্প চয়ন করিতে হইলে, কুসুম উদ্যানের সমস্ত ফুল কি একেবরে চয়ন হইয়া থাকে, না—এক একটী করিয়া ক্রমে চয়ন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে? (৩) তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করিলেই কি বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, না—এক একটী করিয়া তন্তু বয়ন করিলে পর, ক্রমে একখানি বস্ত্রের আকার ধারণ করিয়া থাকে? (৪) কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণের ইচ্ছা করিলেই কি ঘট নির্ম্মিত হইয়া থাকে, না—দণ্ড, সলিল ও চক্র একত্রিত করিয়া, দণ্ডের দ্বারা ঘূর্ণিত চক্রের উপরিস্থিত মৃত্তিকায় কুম্ভকারের নানারূপ হস্ত কৌশল সংযোজিত হইলে পর ক্রমে ঘট কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে? (৫) নব যৌবন সম্পন্নায়ত লোচনা গৃহলক্ষ্মী পাক কার্য্যের নিমিত্ত পাকশালায় গমন করিবামাত্রেই কি পাক কার্য্য সম্পন হইয়া থাকে, না—সমস্ত আয়োজন করতঃ এক একটী করিয়া রন্ধন করিলে পর, ক্রমে পাক কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে? (৬) ভোজনকারী ব্যক্তিদিগের অন্নপাত্রে কি, পরেবেশনকারী একেবারে সমস্ত রকম ব্যঞ্জনাদি অর্পণ করিয়া থাকেন, না—শাকাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করিয়া থাকেন? (৭) ভোজন করিতে হইলে কি লোকে একেবারে সমস্তগুলিই ভোজন করিয়া থাকেন, না—শাকাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে আহার করিয়া থাকেন? (৮) নিম্নতল হইতে দ্বিতলে উঠিতে হইলে কি একেবারে উঠিতে হয়, না—একধা "একধাপ" করিয়া ক্রমে উঠিতে হয়? (৯)

শতকিয়া গণনা করিতে হইলে কি একেবারে একশত গণিতে হয়, না—এক হইতে আরম্ভ করিয়া দুই তিন করিয়া ক্রমে এক শত গণনা করিতে হয়? (১০) একেবারেই কি লোকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, না—নিম্ন শ্রেণীর প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উচ্চ শিক্ষালভ করিয়া থাকে? (১১) গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই কি সন্তান প্রাচীন হইয়া থাকে, না—এক দুই বৎসর করিয়া অতীত হইতে হইতে ক্রমে লোকে প্রাচীন হইয়া থাকে? (১২) বক্তৃতা দাতা বক্তাগণ কি একেবারেই বক্তৃতোপ-যোগী সমস্ত কথা শিক্ষালাভ করিয়া বক্তা হন, না—বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, নানা বিষয় পরিদর্শন করতঃ দুই একটী সভায় বক্তৃতা দান করিবার পর, ক্রমে ক্রমে জন-সমাজে সুবক্তা বলিয়া পরিচিত হন? (১৩) লোকে কি প্রথমেই সমস্ত কথা শিখিয়া থাকে, না—শিশুকাল হইতে কা-বা-মা বুলি অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে বয়সের সঙ্গে সমস্ত কথা শিখিয়া থাকে? (৪) হাতে খড়ি দিলেই কি বালকের হস্তাক্ষর পাকিয়া থাকে, না—লিখিতে লিখিতে ক্রমে হস্তাক্ষর পাকিয়া থাকে? (১৫) রোগাক্রান্ত হইলেই কি লোকে মরিয়া থাকে, না—রোগে ভুগিতে ভুগিতে জরাজীর্ণ হইয়া ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে? ইত্যাদি—”

তবে শেষোক্ত কথার প্রত্যুত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ক্রমের ব্যতিরেকে হঠাৎ মৃত্যুও ত দেখিতে পাওয়া যায়, অশনি পতন প্রভৃতি বৈদ্যুক্তিক শক্তি-প্রভাবে মানবের মৃত্যু হঠাৎ হইয়া থাকে, কৈ তাহাতে ত ক্রমের আবশ্যক হয় না? এ কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, একবার জ্ঞানের প্রদীপ অন্তরে জ্বালিয়া দেখুন দেখি ঐ হঠাৎ মৃত্যু ক্রমের বাধ্য কি না? ইউক্লেড় প্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থে প্রথমেই লিখিত আছে যে, “যাহার অংশ নাই অথবা, পরিমাণ নাই তাহার নাম বিন্দু।” এখন বলুন দেখি, অংশ ও পরিমাণ হীন বিন্দু কি প্রকার! অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর ন্যায় একটী বিন্দুরও ত পরিমাণ ও অংশ আছে! “বিস্তার বিহীন দৈর্ঘের নাম রেখা।” যত সূক্ষ্মই হউক না কেন, একটী রেখা অঙ্কিত করিলেই ত তাহার বিস্তার থাকিবে? তবে বিন্দুর অংশ ও পরিমাণ এবং রেখার বিস্তার, ইহা চাক্ষষ-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে, উহা অনুমান সিদ্ধ। সেই প্রকার উপরিউক্ত হঠাৎ মৃত্যুর ক্রম-অনুমেয়, তাহা সাধারণের চাক্ষষ-প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চক্ষষ-প্রত্যক্ষীভূতই হউক, আর অনুমেয়ই হউক

জগতের কর্ম্ম মাত্রেই ক্রমের বাধ্য। ইহা যে সকলে বিশ্বাস করেন না, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল। যথা;—

সুফলা শস্য শ্যামলা রত্ন প্রসূতা ভারত-মাতার অনেক সুসন্তান, বর্ত্তমান যে সময়ে স্বদেশজাত পণ্য-দ্রব্যের উন্নতি সাধনরূপ নির্ব্বাপিত বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার মানসে, প্রাণান্ত পরিশ্রম ও একান্ত অধ্যবসায় রূপ মলয়-পবন সংযোগে ধূমায়িত করিতেছেন, অমনি বিদেশী বণিকদিগের ভীষণ অত্যাচার ও তীব্র উৎপীড়ন রূপ মুষলধারে বৃষ্টির স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহা নির্ব্বাণ করতঃ দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। মাতৃ দুঃখ-প্রপীড়িত ভারতের আদরনীয় ভারত সুসন্তানগণ, পুনরায় ভারতের উন্নতি বহ্নি স্থাপন করতঃ তাহা উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তদ্দর্শনে মায়ের কুসন্তান অনেকে বলিতেছেন যে, যাহা হইবার নয়, তাহা কখনই হইবে না। ভারতের উন্নতি যদি হইবার হইত, তাহা হইলে এত দিন নিশ্চয়ই হইত। যখন তাহা হইল না, তখন আর চেষ্টা করা বৃথা।

অবশ্য তাঁহাদের কথা জ্যামিতির স্বীকার্য্য বিষয়ের ন্যায় স্বীকার করিয়া লইতেছি, কিন্তু তাঁহারা কি একবার ভুলেও ভাবেন না, যে চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই? চেষ্টা করিলে ক্রমে হইতে পারে না, জগতে এমন কি কোন কর্ম্ম আছে? জগতের সমস্তই ক্রমেতে উৎপত্তি, আবার ক্রমেতেই লয় হইবে। তবে সামান্য কার্য্যের ক্রম সামান্য সময়াপেক্ষী, আর গুরুতর কার্য্যের ক্রম বহু সময়াপেক্ষী! একবার সকলে মুক্তকণ্ঠে বলুন দেখি, একেবারেই কি এই ভারত, বৈদেশিক দ্রব্যে ছাইয়া পড়িয়াছিল? ভারত-পণ্যারি বিদেশী দ্রব্য কি একেবারেই ভীষণ কবল বিস্তৃত করিয়া, সমগ্র ভারতভূমিকে গ্রাস করিয়াছিল? বিদেশী দ্রব্য কি একেবারেই ভারতবাসীর প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছিল? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য কাল হইতে প্রায় তিন শত বৎসরের ফলে, এই দারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। যাহা এত দিনে দেশ ব্যপ্ত হইয়াছে, তাহা তিন চারি বৎসরে দুরিভূত হইতে পারে না। কারণ বায়ু অল্প সময়েই উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; শীতল হইতেও তাহার কালবিলম্ব হয় না, কিন্তু লৌহ যেমন অধিক-ক্ষণে উত্তপ্ত হইয়া থাকে, শীতল হইতেও তাহার সেইরূপ কাল বিলম্ব হইয়া থাকে। কি ছার মানবের কার্য্য দেবতাদিগের কার্য্যেও ক্রমের অবশ্যক হইয়া থাকে, যথা;—

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে
ইতি বিধির্ব্বিদধে রমণী মুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ ॥"

৩পঃ ৩৩ শ্লোক উদ্ভট।

ব্রহ্মা নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিবার পর মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, "নয়নানন্দকর মনোহর এক সুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এই চিন্তা করিয়া পদ্ম ফুল সৃষ্টি করিলেন। দিবসাপগমে পদ্মের শোভা নষ্ট হয় দেখিয়া, পূর্ণচন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পর চন্দ্রের শোভা বিলুপ্ত হয় দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ক্রমে দিবারাত্রি উভয় সময়েরই শোভা বিশিষ্ট রমণী মুখ নির্ম্মাণ করিলেন।" এই শ্লোকটীর ভাবার্থে বুঝিতে পারা যায় যে, অধ্যবসায়ে জন ক্রমে পণ্ডিত হইয়া থাকে এবং বাঞ্ছিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন,—"সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে যখন অত্যাচার প্রবেশ করিয়াছে, কলঙ্ক-কালিমায় যখন হিন্দু-ধর্ম্ম কলঙ্কিত হইয়াছে, যখন ধর্ম্মের ঘরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তখন হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের উন্নতির আশা আর নাই। যা হবার তা হইয়া গিয়াছে, হিন্দুদিগের উন্নতির তরি অবনতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে; হিন্দুদিগের যশঃসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে। শত সহস্র চেষ্টা করিলেও 'ভারত-বক্ষে যশোরবি আর উদিত হইবে না, অধর্ম্মই হিন্দুদিগের অধোগতির কারণ।"

এবম্ভূত ভগ্নোৎসাহী নিশ্চেষ্ট ভারতবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট সানুনয় বক্তব্য এই যে, "তাঁহারা যেন ভারতের উন্নতির সূচনা মাত্রেই, পূতিকাময় নিরাশার অতল জলে ঝম্প প্রদান না করেন, যেন অশান্তির ভীষণ-উত্তাল-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালি দিয়া হাবু-ডুবু না খান, যেন হতাশের প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে, হুতাশে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া দগ্ধীভূত না হন।" ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় অর্থাৎ ধর্ম্মের উন্নতি, অধর্ম্মের অবনতি ইহা চিরনিশ্চিত হইলেও, অধর্ম্মের যে একেবারেই উন্নতি হইতে পারে না, তাহা নহে। অনেক স্থানে ধর্ম্মের অধোগতি, অধর্ম্মের ঊর্দ্ধগতিও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"যাতঃ ক্ষামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতাল মূলং বলিঃ
শক্রু প্রস্থ বিসর্জ্জনাৎ সচমুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।

আবাল্যা দসতী সতী সুরপুরং কুন্তী সমারোহয়ং
হা সীতা পতিদেবতা গমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ ॥"

৩পঃ ৬ শ্লোক উদ্ভট।

দানধর্ম্মে ব্রতী হইয়া দৈত্যরাজ বলি, ভক্তিসহকারে সমস্ত পৃথিবী ভগবান বিষ্ণুকে দান করিয়া পাতালপুরী গমন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, কোন একজন মুনি শক্তু শরাব (এক শরা ছাতু) দান করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালাবধি কুন্তী অসতী (কর্ণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ) হইলেও সতী বলিয়া সুরপুর অধিকার করিয়াছিলেন। আর পতিপরায়ণা সতী সাধ্বী হইয়াও সীতা দেবীর পাতালপুরী গমন, অর্থাৎ তাঁহার অধোগতি হইয়াছিল! অতএব ধর্ম্মের যে কি সূক্ষ্মগতি তাহা বলিতে পারা যায় না।

উপরিউক্ত শ্লোকটীর ভাবার্থে বুঝিতে পারা যায়, অধর্ম্মের একেবারেই যে উন্নতি হইতে পারে না, তাহা নহে। অতএব হে নিশ্চেষ্ট-নিস্তেজ-দুর্ব্বল-ভীরু ভারত-সন্তানগণ! আপনারা আর ভারতের উন্নতি হইবে না এই দুশ্চিন্তা, অন্তরে স্থান দিয়া নিরাশা-বিষে মস্তিষ্ক বিকৃত না করিয়া সচেষ্ট হউন, দেখিবেন ক্রমে আবার সব হইবে।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরষ মাত্ম শক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥"

ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে এই ভাবিয়া জড় পদার্থের ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলে কিছুই হয় না। সকলে একতা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া উন্নতি বিষয়ে প্রাণপণে সচেষ্ট হউন, তাহাতে যদি অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে আর আমাদের উন্নতির আশা নাই, ভারতের উন্নতি, ভারত-বক্ষ হইতে চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রমণী-রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

বালিকা।।

রামঅক্ষয় বাবুর কথা শুনিয়া ভৃত্য বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "যা বল্‌চি, তাই কর,—শীঘ্র মাথায় তুলে নিয়ে চল,—ধর, মাথায় তুলে দি। ভাগ্‌গি রাস্তায় লোকজন নেই,— না হলে কানা বুড়ো বামনকে এই সব কর্ত্তে দেখ্‌লে কি বল্‌তো! ধর—ধর"—

ভৃত্য বাক্স ধরিয়াই ছুড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাপ্‌,—এর ভেতর কে আছে?"

"বেটা,—তুই কি আমায় পাগল করিবি?"

এই বলিয়া একরূপ বলে রামঅক্ষয় বাবু বাক্সটী ভৃত্যের মস্তকে তুলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "যা ছুটে বাসায় নিয়ে যা,—আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চি।"

ভৃত্য বাক্স লইয়া ছুটিল,—রামঅক্ষয় বাবুও তাহার সঙ্গে চলিলেন,—বাধ্য হইয়া তাঁহার ছদ্মবেশ ভুলিয়া দ্রুতপদে যাইতে হইল। একটা অন্ধকার ক্ষুদ্র গলির সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কে যে বিদ্রূপস্বরে হাসিয়া উঠিল,—পথের কোন লোক ভাবিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন,—এই সময়ে কে বলিল, "কি অক্ষয় কানা বুড়ো!"

রামঅক্ষয় বাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—তবে এখনও তাঁহাকে কেহ অনুসরণ করিতেছে,—কেবল অনুসরণ করিয়া নিশ্চিন্ত নহে;—তাঁহাকে উপহাস বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেছে না। তিনি বস্ত্র মধ্য হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন,—কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন অনর্থক সময় নষ্ট করা উচিত নহে ভাবিয়া তিনি বাসার দিকে চলিলেন।

দেখিলেন, ভৃত্য বাক্স আনিয়া উপরের ঘরে নামাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া কেবলই "রাম রাম" বলিতেছে! রামঅক্ষয় বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি—অমন কচ্চিস কেন?"

সে উত্তর করিল, "বাবু,—এ বাক্সে ভূত আছে।"

"তা জানি—সুশীল কোথায়?"

"তাঁকে ফিরে আর দেখ্‌তে পাচ্চি নে।"

"সেও উড়ল নাকি—কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমায় না বলে মেয়ে মানুষ সেজে এখান থেকে পলাবে,—না, এতে পাগল হবার কথাই বটে,—আবার তাকে খুঁজে বেড়াতে না হয়,—কি যন্ত্রণাতেই পড়িলাম! যাক—পরে তাহার কথা ভাবা যাইবে,—এখন এই বাক্সের মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি আছে,—তাহাই দেখা যাক।"

রামঅক্ষয় বাবু এইরূপ আপনা আপনি এই সকল কথা বলিতেছিলেন,—তৎপরে ভৃত্যকে বলিলেন, "একখানা সাবল নিয়ে আয়, বাক্স ভাঙ্গতে হবে।"

ভৃত্যের বাক্স ভাঙ্গিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না,—সে প্রভুর ভয়ে অগত্যা সাবল আনিয়া দিল। রামঅক্ষয় বাবুও বাক্স ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে, ভিতর হইতে শব্দ হইল, "এই চাবি লও।"

"বাবু!—ভূত, করেন কি?" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল,—রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "কই চাবি?"

তখন বাক্সের ছিদ্র দিয়া ভিতর হইতে একটা চাবি বাহিরে পড়িল। রামঅক্ষয় বাবু চাবি কুড়াইয়া লইয়া বাক্স খুলিলেন।

বাক্সের ভিতর একটী জীবন্ত মনুষ্য আছে, তাহা রামঅক্ষয় বাবু পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাক্স খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা আশা করেন নাই।

বাক্স খুলিবামাত্র একটী পরমাসুন্দরী বালিকা বাক্সের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল,—তাহার উন্মুক্ত কৃষ্ণ-কেশ তাহার মুখে, পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—পরিধানে একখানি লাল চেলি,—অলঙ্কারের মধ্যে হাতে দুই গাছি চুড়ীমাত্র আছে,—বয়স একাদশ বৎসরের অধিক নহে। বাক্স খুলিবামাত্র বালিকা খিল খিল করিয়া মধুর হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার ভাব দেখিয়া রামঅক্ষয় বাবু বুঝিলেন যে বালিকা তাঁহার এই বাক্স-যাত্রাকে এক অভূতপূর্ব্ব মজা ভাবিয়া লইয়াছে। সুতরাং রামঅক্ষয় বাবু বুঝিলেন, কেহ তাহাকে তাহার অনিচ্ছায় বাক্সে বন্ধ করে নাই,—সে ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ ব্যাপারে সম্মত হইয়াছে। তিনি মধুপুরের ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া প্রতিপদেই বিস্মিত হইতেছিলেন,—এই বালিকার ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলেন।

এ বালিকা কে? কে তাহাকে বাক্সে বন্ধ করিয়া এরূপ অত্যাশ্চর্য্যভাবে তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া পলাইল? তাহার নিকট পাঠাইবার জন্যই যে কেহ এরূপ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার বিশ্বাস হইল না, তবে রহস্যের অর্থ কি তাহা তিনি স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি মজা! মজা নয় কি? তুমি কি কখনও বাক্সে চড়িয়াছ?"

দশম পরিচ্ছেদ।

রঙ্গিনী।

রামঅক্ষয় বাবু বালিকার কথায় মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মজা নিশ্চয়ই"

বালিকা বলিল, "তুমি কি কখনও এমন করে বাক্সে চড়েছ?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "না—এ সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি।" এখন জিজ্ঞাসা করি "তুমি কে?"

বালিকা বলিল, "কেন আমি রঙ্গিনী!"

"বুঝিলাম—কোথাকার রঙ্গিনী,—তোমার বাড়ী কোথায়,—মা বাপ কোথায়?"

"তুমি কি পুলিশের লোক?"

"যদি তাহাই হই।"

"তবে ভাল,—পুলিশের বাবু ভিন্ন আর কাকেও কিছু বল্‌তে বারণ করে দিয়েছে।"

"কাহারা?"

"যারা আমাকে এত যত্নে রেখেছিল। তা বুঝি তুমি জান না,—তারা আমায় এক গা গহনা দেবে!"

"বটে! তাহারা কে?"

"তাহারা কে—তা জান না,—হা আমার পোড়া কপাল!"

"কেমন করিয়া জানিব বল?"

"তারা খুব বড় লোক,—তাদের কত লোকজন।"

"তাহারা কে কোথায় থাকে?"

"তাহারা কে?"

এই বলিয়া বালিকা উঠিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিস্মিত-ভাবে রামঅক্ষয় বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাহারা কে—তারা বড় লোক।"

রামঅক্ষয় বাবু এই বালিকাকে লইয়া বিপদে পড়িলেন,—বুঝিলেন বালিকা যথার্থই নিতান্ত বালিকা। ইহার নিকট কোন কথা অবগত হওয়া সহজ হইবে না,—অথচ ইহার কথায় বেশ বুঝিলেন যে যাহারা ইহাকে পাঠাইয়াছে, তাহারা আপনাদের প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এই বালিকার দ্বারা তাহাকে কোন কথা জানাইতে চাহে,—নতুবা তাঁহার নিকট বাক্সে বদ্ধ করিয়া মেয়ে-টাকে পাঠাইত না,—অথচ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার ছদ্মবেশ কেহ চিনিতে পারিবে না। তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে তাঁহার সকল সন্ধানই তাহারা রাখিয়াছে,—ইহারা কে?

তিনি আদর করিয়া বালিকাকে পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "তোমার ক্ষিধে পেয়েছে—কিছু খাবে,—আনাইয়া দিব?"

বালিকা বলিল, "খানিকটা আগে তারা আমাকে কত ভাল ভাল খাবার খাইয়েছে—তুমি বুড়ো?"

রামঅক্ষয় বাবু তখনও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে ছিলেন;—হাসিয়া বলিলেন, দেখিতেছ না,—তবে কিছু খাবে না?"

"না—তাদের ওখানে গিয়ে খাব।"

"তাদের বাড়ী চিনিতে পারিবে?"

"তা কেমন করে পার্ব্বো। বাক্সের মধ্যে কি পথ দেখা যায়?"

"কতক্ষণ বাক্সের ভিতর ছিলে?"

"প্রায় আদঘন্টা।"

"এই এতক্ষণ ধরে তোমায় মাথায় করিয়া আনিতেছিল?"

"হাঁ—তারা আবার আমায় নিয়ে যাবে বলেছে।"

রামঅক্ষয় মনে মনে বলিলেন, "যাহারা গোপনে এত কাণ্ড করিয়া আমার কাছে ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে,—তাহারা নিশ্চয়ই প্রকাশ্যভাবে ইহাকে লইতে আসিবে না। তবে যাহারা এত করিতে পারে, তাহারা সব করিতে পারে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় আছ জান?"

"কেন জানব না,—কলকাতায়।"

"বরাবরই কি এখানে আছ ?"

"না মোটে তিন দিন এখানে এসেছি !"

"আগে কোথায় ছিলে ?"

"মধুপুর বলে একটা যায়গার। রাণীর সঙ্গে রেলগাড়ী চড়ে সেখানে গিয়েছিলেম।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ—তাইতো বলি,—মধুপুর হতে তোমায় এখানে আনিল কে ?"

"সেই বাবুরা।"

"তাদের নাম জান ?"

"না—তারা খুব বড় লোক।"

"তাদের বাড়ী কোথায় ?"

"তা জানি না।"

"তবে তাদের কাছে গেলে কেমন করে ?"

"এক ডাইনী আমায় নিয়ে গিয়েছিল।"

"কেন,—সে তোমায় কোথা থেকে নিয়ে গিয়েছিল ?"

"সেই কথাই তো বলতে পাঠিয়েছে,—তুমি তো পুলিশের বাবু ?"

"হাঁ,—আমার কাছেই তোমায় তারা পাঠিয়েছে—বল সব শুনি।

"তা হলে কথা কহিও না,—যা বলি শোন।"

"শুনচি বল।"

"তবে বলি শোন—আমার নাম রঙ্গিনী।"

"সে তো শুনিয়াছি।"

"ফের্ কথা কওতো কিছুই বলিব না।"

রামঅক্ষয় বাবু এই ক্ষুদ্র বালিকার নিকট পরাজিত হইয়া হাসিয়া বলিলেন। "না,—এই মুখে আঙ্গুল দিলাম, আর কথা কহিব না।"

বালিকা বলিল, "এ ভাল কথা,—চুপ—বলে যাই।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "মুখস্থ নয়তো ?"

রঙ্গিনী চক্ষু রাঙ্গাইয়া তাহার দিকে চাহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রঙ্গিনীর কথা।

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন, রঙ্গিনী বলিল, "আমার নাম রঙ্গিনী, আমার মা বাপ নেই,—কখনও তাদের দেখি নি। রাণী বিন্ধেশ্বরীর বাড়ীতে আমি মানুষ হয়েছি, তাঁরা আমাকে কোথায় পেয়েছিলেন, তা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর', আমি জানি না,—তিনি আমাকে তার লক্ষ্মীর মত ভাল বাসিতেন।"

রামঅক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "লক্ষ্মী কে?"

রঙ্গিনী আবার চোক রাঙ্গাইয়া বলিল, "সে আমার সই—তার মেয়ে,—রাজকুমারী,—শুনেছ, তার বে হয় নি,—আমারও হয় নি। শুনেছি কোন বদমাইশ নাকি লক্ষ্মীকে বে কর্ত্তে চায়, যাক সে কথা, রাণী আমাদের সকলকে মধুপুর ব'লে একটা জায়গায় লয়ে যান। সেখানে আমরা আছি,—এক দিন আমি ঘুমাইয়া আছি, এমন সময় কারা আমার মুখ বেঁধে ফেল্লে, আমি চেঁচাতে পাল্লুম না। অন্ধকারে তারা ধরাধরি করে আমায় নিয়ে চল্ল, একজন কে সেই ঘরে শুয়ে ছিল,—সে, পাশে একখান দা ছিল, তাই দিয়ে তাদের কোপ মাল্লে, তারা তাকেও বেঁধে নিয়ে চল্ল।"

"তাদের দেখ্‌তে পেয়েছিলে?"

"আবার কথা কয়, ভুলে যাব না? অন্ধকার ঘর, কেমন করে দেখব—তারা আমায় কোথায় নিয়ে গেল, একটা জঙ্গলের কাছে গাছতলায় নিয়ে এল। সেখানে একটা গোরা আলো নিয়ে ছিল,—সেখানে তারা আলোতে আমায় দেখিয়া বলিল, "ভুল হয়েছে—এ নয়।" তখন তারা ইজিড় বিজিড় করে গোরাটার সঙ্গে কি বকাবকি কর্ত্তে লাগল,—তারপর তারা গোরাটার কাছে আমায় রেখে সরে দাঁড়াল। বোধ হয় অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল,—গোরাটা আর একটা লোক আসিল, গোরাটা গাছের ডালে একখানা কাপড় বেঁধে আমার গলায় সে কাপড় দিলে। সেই লোকটা বলিল, "তুমি কচ্চো আমার দোষ নেই।" গোরাটা হিন্দি কথায় বল্লে, "এই ছুঁড়ি আমাদের দেখেছে,—ছেড়ে দিলে সব কথা ব'লে দেবে,—মারা যেতে পারিনে।"

সে আমার গলার কাপড় ধ'রে গাছের ডালে টেনে তুলছিল, এই সময়ে দুম দাম ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল, সাহেব চীৎকার করে ছুটল, অন্য

লোকটা পড়ে গেল। তখন দুই তিন জন তাকে নিয়ে ছুটে পলাল,—তারা পালিয়ে গেলে এক ডাইনী এসে আমার বাঁধন খুলে দিয়ে বল্লে আমার সঙ্গে—ভয়ে আমি অশাড় হয়ে গিয়েছিলেম, তার সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম।

সমস্ত রাত্রি বোধ হয় চলেছিলাম, কোন কথা বলতে গেলেই সে কেমন গোঁ গোঁ করে উঠে, আমার ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়,—সে যে ডাইনি।

সে আমকে একটা বাড়ীতে আনল, সেখানে কেউ ছিল না,—একজনমাত্র লোক ছিল,—সেইখানে ডাইনী আমায় রাখ্‌লে, লোকটা আমায় খুব যত্ন করেছিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় তারা দুজন এল—

রামঅক্ষয় বাবু আবার বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তারা?"

"ফের কথা কয়,—ভুলে যাব।"

"বল, আর কথা কহিব না।"

"সেই তারা বড় লোক, তারা আমায় সেই রাত্রে আর এক জায়গায় নিয়ে গেল—খুব বড় বাড়ী, অনেক লোকজন,—তারা আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বোধ হয় ডাইনী মাগী তাদের সব বলে ছিল। তারা আমায় খুব যত্ন কর্ত্তে লাগিল, বল্লে, তোমার কোন ভয় নেই—আমরা রাণীর লোক। বদমাইশেরা রাণীর সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় আছে, তুমি না হলে তারা জব্দ হবে না। প্রথমে তোমায় কলকাতায় গিয়ে সব কথা এক পুলিশ বাবুকে বলতে হবে।" আমি রাজী হলাম,—আমি বদমাইশের কথা আগে শুনেছিলাম,—তারা যাতে রাণীর কিছু কর্ত্তে না পারে আমি তাই কর্ত্তে চাই। রাণী মা যে আমায় বড় ভাল বাসে, তাকি তুমি জান না?"

"জানি বলি।"

"চুপ্‌—তারা বল্লে,—তার পর তোমায় রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিব। তারপর তারা আমায় এখানে এনে এক খুব বড় বাড়ীতে রাখ্‌লে, কত লোকজন,—কত ভাল ভাল জিনিষ—তারা যে বড় লোক!"

"তার পর কি হলো?"

"তার পর তারা আমায় বল্লে, "পুলিশ বাবুর কাছে আমরা কোন কারণে নিজেরা নিয়ে যেতে পারি নি, সেই জন্যে একটা উপায় স্থির করেছি,—এই বাক্সটার মধ্যে তোমায় পাঠাব,—কোন কষ্ট হবে না, আমরা যা বলি যদি কর, তো তোমায় গা ভরা গয়না দিব। আমি রাজী হলেম, তারা আমায়

বাক্সবন্দি করে একজনের মাথায় দিয়ে পাঠালে, আমার কোন কষ্ট হয় নি, কি মজা! মানবের মাথায়,—বাক্সের মধ্যে—এখন শুন্‌লে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপার কি?

রঙ্গিনীর সরল বালিকা সুলভ কথা শুনিয়া রামঅক্ষয় বাবুর চক্ষু অনেক উন্মীলিত হইল, মধুপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি এক্ষণে অনেক অনুমান করিতে সক্ষম হইলেন। পূর্ব্বে অনুসন্ধানে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, আর এক্ষণে এই বালিকার নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার নিকট মধুপুরের রহস্য অনেক ভেদ হইল।

প্রথমতঃ বুঝিলেন, "এই ব্যাপারে তিনটী কি চারিটী দল জড়িত আছে।

প্রথম, রাণী বিন্ধেশ্বরী, তাহার কন্যা লক্ষ্মী, তাহার ভ্রাতা বিনোদ, এই রঙ্গিনী, তাহার দাস দাসী প্রভৃতি।

দ্বিতীয়, বনমালী রায়, তাহার প্রধান মন্ত্রী পশ্চিমের গুণধর গোঁসাই বাবু, তাহার জাল পুত্র সুখচাঁদ, তাহার স্ত্রী রূপী সখিনী, তাহার বন্ধু বা চেলা অখিল প্রভৃতি।

তৃতীয়, রাজা নিমাই নারায়ণ, তাহার পুত্র কুমার গুণেন্দ্র নারায়ণ, বনমালী রায়ের পুত্র বরেন্দ্র নাথ, তাহাদের দুই স্ত্রী নিশা ও উষা তাহাদের ভৃত্য হরিচরণ প্রভৃতি।

চতুর্থ, এই তিন দল ব্যতীত আরও কয়েকজনকে এই ব্যাপারে জড়িত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে মধুপুরের দারোগা বাবু প্রধান, তাহার পর গার্ড স্মিথ,—তাহার পর এই ডাইনী শাঁওতালনী।

এখন জিজ্ঞাস্য ব্যাপারটা কি? যতদূর অনুসন্ধানে জানা যায়, তাহাতে বনমালী রায় চিরকালই খারাপ লোক, অত্যাচারী জমীদার, কিন্তু পুত্র বড় ভাল। পিতা পুত্রে কখনও বনিত না,—বিশেষতঃ বরেন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হওয়া পর্য্যন্ত পিতা পুত্রে আরও পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই সময়ে সস্ত্রীক গোঁসাই বাবু উপস্থিত হওয়ায় বনমালী রায় তাহার চক্রান্তে পড়িয়া পুত্রকে তেজ্যপুত্র করিয়াছে, গোঁসাই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছে। তাহার জাল-পুত্র বনমালী রায়ের পোষ্য-পুত্র হইয়াছে, বরেন্দ্র সস্ত্রীক বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়াছেন।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, গোঁসাই পশ্চিমের এক বদমাইশ দলের সর্দ্দার। সে বনমালী রায়ের হত্যা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়াও সন্তুষ্ট নহে। রাণী বিন্ধেশ্বরী কন্যার সহিত তাহার পুত্ররূপী সুখচাঁদের বিবাহ দিয়া রাণীর বৃহৎ সম্পত্তি হস্তগত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে। রাণী, তাহার পুত্র সুখচাঁদের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃতা হওয়ায়, সে ছলে বলে কৌশলে রাণীর কন্যার সহিত সুখচাঁদের বিবাহ দিতে চেষ্টা পাইতেছে।

কেবল ইহাই নহে। যতদূর জানা গিয়াছে, সে রাজা নিমাই নারায়ণেরও সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে। কুমার গুণেন্দ্র নারায়ণ ও বরেন্দ্রই ইহাদের উভয়েরই স্ত্রীর সমূহ অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছে। অনুমান যতদূর করা যায় তাহাতে বোধ হয় যে, তাহাদের কাহারও জীবন নিরাপদ নহে।

তাহার পর মধুপুরে একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের সহিত যে ইহারা জড়িত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণ হইয়াছে, গার্ড স্মিথ ও গোঁসাইয়ের লোক অখিল খুন হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য ইহাদের খুন করিল কে? গোঁসাইয়ের লোককে গোঁসাই বা তাহার দলের লোকে কি খুন করিবে? তাহা যদি না হয়, তবে কে তাহাদের হত্যা করিল? তাহারা কি গুণেন্দ্র বা বরেন্দ্র বা তাহাদের কোন লোক কর্ত্তৃক হত হইয়াছে! অথবা রাণীর কোন লোক এ কাজ করিয়াছে! ইহা স্থির নিশ্চিত বলা কঠিন। গুনেন্দ্র ও বরেন্দ্র যেরূপ ভাবে গুপ্ত রহস্যপূর্ণ কাজ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের উপর বিশেষ সন্দেহ হয়। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ ভিন্ন বিন্দুমাত্র প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মধুপুরের দারোগার উপর এই খুনের জন্য বিশেষ সন্দেহ হয়। তাহার অযাচিত ভাবে সপ্নের কথা বলা, তাহার পর তাহার প্রত্যেক কার্য্যই সন্দেহ জনক। খুব সম্ভব সে হয় পয়সার লোভে গোঁসাইয়ের দলে, অথবা গুণেন্দ্র, বরেন্দ্রের দলে মিশিয়াছিল,—রাণী বা তাহার ভাই বিনোদের দলে যে মিশে নাই তাহাইবা কি প্রকারে বিশ্বাস করাযায়। অর্থ এমনই দ্রব্য যে বিনোদ ভগ্নির সম্পত্তি হস্তগত করিতে গিয়া ভগ্নির কন্যাটীকে সরাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এমন কাণ্ড অনেক হইয়াছে। সুতরাং এ রহস্যের মূল ব্যাপার এখনও কিছুই জানিতে পারা যাইতেছে না।

মধুপুরের ব্যাপারটা কি তাহা এখন বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে! বালিকা যাহা বলিল তাহাতে বুঝা যায় যে, অখিল প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিয়া

রাণীর কন্যাকে সরাইতে চাহে, খুব সম্ভব এ কথা রাণীর বিশ্বস্থ দাসী কোন গতিকে জানিতে পারিয়া তাহাকে আততায়ীগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে রাত্রে মেয়েটীকে লইয়া অন্য কোন স্থানে লুকাইয়া রাখে। অখিলের দল রাণীর কন্যা ভাবিয়া ভুলক্রমে রঙ্গিনীকে লইয়া পলায়,—দাসী প্রতিবন্ধক দিতে চেষ্টা পাওয়ায়,—তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, সে—যে দা চালাইয়াছিল,—তাহাতে আততায়ীর কেহ না কেহ আঘাতিত হইয়াছিল। রাণীর বাড়ী যে রক্ত দেখা গিয়াছিল, সে তাহারই রক্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মধুপুরের ব্যাপার।

ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অখিলের দল হউক বা গোঁসাইয়ের দলই হউক, ইহারা টাকা দিয়া কাজের সুবিধা হইবে বলিয়া ইংরেজ স্মিথকে হস্তগত করিয়াছিল। খুব সম্ভব বন্দোবস্ত ছিল যে, স্মিথ লুকাইয়া তাহার গাড়ীতে রাণীর কন্যাকে তুলিয়া কোন স্থানে তাহাকে পৌঁছিয়া দিবে। কোন মালগাড়ীতে সে অনায়াসে এ কার্য্য করিতে পারিত। নিশ্চয়ই রাণীর কন্যার ভার লইবার জন্য কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু রাণীর কন্যা না আসিয়া ভুলক্রমে রঙ্গিনীকে আনায় সমস্তই গোল হইয়া গিয়াছিল। রঙ্গিনীর কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অখিলের দলের লোকেরা তাহাকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, স্মিথ ইহা নিরাপদ না ভাবিয়া তাহার গলায় দড়ি দিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই সময়ে কে বৃক্ষান্তরাল হইতে গুলি করিয়া স্মিথকে ও অখিলকে আহত করায় সমস্তই গোল হইয়া গেল। স্মিথ ইংরেজ, গুলি খাইয়াও কোন গতিকে নিজ আবাস স্থলে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু অখিলের মৃত্যু হয়। তাহার দলের লোক সহসা তাহাকে আহত ও ভূপতিত হইতে দেখিয়া তাহাকে লইয়া পলাতেছিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহাকে বড় বট গাছ তলে রাখিয়া পলাইয়াছিল। এই ব্যাপার নিশ্চয়ই—বট গাছ তলায় হয় নাই,—অন্য কোন স্থানে ঘটিয়াছিল। বটগাছ তলায় ঘটিলে সেখানে নিশ্চয়ই রক্তের চিহ্ন থাকিত। দারোগা উপযুক্ত অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই রক্তের দাগ ধরিয়া সে স্থান বাহির করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ায় অথবা তিনি স্বইচ্ছায় নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে অনুসন্ধান হয় নাই। যখন

কলিকাতায় ডিটেক্‌টিভগণ আসিয়াছিলেন, তখন রক্তের দাগ ধরা সম্পূর্ণই অসম্ভব হইয়াছিল! ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, যাহারা অখিলকে লইয়া-পলাইয়াছিল,—তাহারা তাহার মৃতদেহ বট গাছ তলায় ফেলিয়া গিয়াছিল।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল,—তাহাও বালিকার কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঘটনা ক্রমে ডাইনী শাঁওতালনী এই সময় এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়,—দারোগা যাহা বলিয়াছিল,—তাহাও সত্য। সে নিশ্চয়ই এই ব্যাপার দেখিয়া, যে বন্দুক ছুড়িয়াছিল, তাহাকে তীর মারিয়াছিল। সে তীর নিশ্চয়ই তাহার গায় লাগে নাই। লোকটী পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল। যখন এটা নিশ্চিত যে বট গাছ তলায় এ কাণ্ড হয় নাই, তখন এই বট গাছে যে তীর লাগিয়াছিল, সে তীর খুনীকে বিদ্ধ করিবার জন্য ডাইনী নিক্ষিপ্ত করে নাই। তবে সে তীর কে মারিল! আর কেই বা দারোগাকে বলিয়াছিল যে সে "ডাইনীর তীর।" এ দুই বিষয়ই অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা রঙ্গিনী বলিয়াছে। ডাইনী তাহাকে সমস্ত রাত্রি প্রায় হাটাইয়া একটা বাড়ীতে লইয়া আইসে, সে বাড়ীতে একটী মাত্র লোক ছিল,—তাহার পর তথায় দুই জন বড় লোক আইসে,—তাহারা তাহাকে রেলে অন্যত্র লইয়া যায়,—তাহার পর তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আইসে। রামঅক্ষয় বাবু ইহাতে অনুমান করিলেন যে, ডাইনী রঙ্গিনীকে কারমাটরের বাড়ীতে লইয়া আইসে, তাহার আগমন বার্ত্তা নিশ্চয়ই হরিচরণ, গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্রকে বৈদ্যনাথে টেলিগ্রাফ করিয়া জানায়, তাহার টেলিগ্রাফ পাইয়াই তাহারা দুই জনে কারমাটরে আসিয়া রঙ্গিনীকে বৈদ্যনাথে লইয়া যান। তাহার পর তাঁহারাই তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে রামঅক্ষয় বাবুর নিকট রঙ্গিনীকে আনিলেন না কেন? কেনই বা তাহাকে এই অদ্ভুতভাবে পাঠান হইল। কেনই বা তাঁহারা উষা হইতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গিনী পর্য্যন্ত এরূপ লুকোচুরি খেলিতেছেন? এ সকল করিবার উদ্দেশ্য কি?

তাঁহারা দোষী হইলে কি রঙ্গিনীকে রামঅক্ষয় বাবুর নিকট পাঠাইতে সাহসী হইতেন? দোষী না হইলেই বা এমন করিবার অর্থ কি?

দারোগাই বা কোথায়? সে কোন্ দলের সহিত মিলিয়া এরূপভাবে নিরুদ্দেশ হইয়াছে?

রামঅক্ষয় বাবু মনে মনে বলিলেন, "অনেক জানা গিয়াছে, কিন্তু অনেক এখনও জানিবার বাঁকি। যখন এত দূর জানিতে পারিয়াছি, তখন বোধ হয় বাঁকিটুকুও জানিতে পারিব। এখন উপস্থিত এই বালিকাকে লইয়া, কি করা যায়? মহা বিপদ সন্দেহ নাই। তবে আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্রের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না,—এ আবার কে!

দ্বার সম্মুখে একটী হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোক। (ক্রমশঃ)

শ্রাবণের সূর্য্য।

(১)
কেন আজি প্রভাকর বিষাদিত চিত;—
প্রবল-প্রদীপ্ত-বহ্নি-নিন্দিত বদন,
নিবিড়-নীরদ-জালে করি' আবরিত,
অবিরত করিতেছ অশ্রু বরিষণ!
চির বৈরিভাব ভুলি আঁধারের সনে,
ক'রেছ সখ্যতা আজি কহ কি কারণে।

(২)
কোথা তব মহাশুভ্র রত্ন সিংহাসন;
প্রখর সহস্র কর, ওহে দিবাকর!
যার ভয়ে কম্পবান সদা ত্রিভুবন;—
দুঃসহ যাতনানল-দগ্ধ-কলেবর।
প্রচণ্ড প্রতাপে যা'র ক্ষিতি টলমল,
বাঙ্গালীর মত তা'র রোদন সম্বল?

(৩)
অসংখ্য আগ্নেয়-অস্ত্র,—পোড়াইতে যাহে
চরাচর, হে ভাস্কর! কোথা সে সকল,
অগ্নিময় মহাসিন্ধু,—বহিল কি তাহে,
পর্ব্বত-নির্ঝর-বারি-স্রোত সুশীতল?
সিক্ত পূর্ণশশী হ'লো অসিত বরণ,
অমল শীতল, স্নিগ্ধ, সলিল যেমন?

(৪)
তব আগমন বার্ত্তা হইলে জ্ঞাপিত,
বিষাদে ব্যাকুল চিত্তে নিশা সহচর—
তমঃ,ত্রাণ হেতু ত্রাসে হতো তিরোহিত;
বন্দি-বিহঙ্গের গীতে ভাসিত অম্বর।
ব্যজন লইয়া করে মলয় পবন,
ব্যজন করিতে ত্বরা করিত গমন।

(৫)
রোষ-রক্তোৎপল-রাগ-রঞ্জিত-নয়নে,
আগত পূরব প্রান্তে করি দরশন;
বিশ্ব বিমোহিনী উষা বিক্লব-বদনে,
দাঁড়াত দুয়ারে আসি। তিতিত বসন,
নীহার নয়ন জল হইয়া নির্গত;
কাঁদিত তাহার দুঃখে মধুকর যত।

(৬)
রাজবেশে রাজাসনে মধ্যাহ্ন গগণে;
রাজদণ্ড-কর করে করিয়া ধারণ,
হ'লে সমাসীন—বিশ্ব কাঁপিত সঘনে;

প্রশ্বাসে প্রবল বেগে বহিত পবন।
অনল-কিরণ-বৃষ্টি সহিতে না পারি;
দিগম্বরী সাজিতেন প্রকৃতি সুন্দরী।

(৭)

কোথা সে অমিত তেজ পূর্ণ কলেবর,
প্রভাকর! নিষ্প্রভিত কেনহে এমন;
কি হেতু কাহার সনে করিয়া সমর,
হারায়েছ রাজ্য সহ ঐশ্বর্য্য আপন?
সবুট শ্বেতাঙ্গপদ-ভীত বঙ্গবাসী
সম অশ্রুপাত সার অন্তঃপুরে পশি?

(৮)

থাকিত শঙ্কিত সদা যা'রা তব ভয়ে,
তা'রাও তোমার দুঃখে করিছে রোদন
চির অরি ধান্ত তব দ্বেষ বিদ্বেষিয়ে,
ধান্তারি! হ'য়েছে তব অঙ্গ আবরণ।
ছেদকে হেরিয়া শ্রান্ত শত্রু ভাবি মনে,
বিরত না হয় বৃক্ষ ছায়া বিতরণে।

(৯)

লভিয়া অসীম শক্তি না করি বিচার,
করিয়াছ নিষ্পীড়ন সমভাবে সবে;
যাতনা ক্লিশিত মুখ হেরি বসুধার
করনি' করুণা কভু; প্রচণ্ড প্রভাবে
শুকায়েছ নদ, নদী, কত জলাশয়,
গ্রাসিয়াছে কত প্রাণী তোমার তনয়।

(১০)

জীবন বিহনে জীব আকুল জীবনে,
লভিবারে কৃপা তব ক'রেছে রোদন;
অহঙ্কারে মত্ত তুমি, আশ্রিতের পানে,
করনি' কটাক্ষপাত নলিনী রঞ্জন!
তোমার আশ্রিত এই সসাগরা ধরা;
আশ্রয় বিহনে তব ঝরে অশ্রুধারা।

(১১)

ভীষণ বিক্রমী তুমি, বিহীন-বিক্রম-
ভীরু সম অবিরত কাঁদিছ কেবল;
হেসেছ হেরিয়া যা'র যাতনা বিষম,
সেও তব দুঃখে আজ ফেলে অশ্রুজল।
বল যা'র দুর্ব্বলের নিগ্রহের তরে,
দুর্ব্বল তাহার মত কে আছে সংসারে?

(১২)

স্থলজ, জলজ যত জীব অগণন,
কত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম, সৃজন যাঁহার;
ওই ক্ষুদ্র পিপীলিকা,—উহারি কারণ,
জগৎ পালক পিতা সৃজেছে তোমায়।
কিরণে বিদগ্ধ করি কাঁদায়েছ যা'রে,
তোমারে কাঁদায়ে বিধি দেখাইছে
তা'রে।

(১৩)

কণামাত্র কৃপা যাঁর লভিয়া, ভাস্কর,
হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান, মত্ত অহঙ্কারে;
তোমারে দণ্ডিয়া সেই জগতী-ঈশ্বর,
দেখা'লে;—"অনন্ত কৃপা সর্ব্ব-
জীবোপরে।"
মহাপাপী সর্ব্ব জীব নিগ্রহে যে জন;
"সর্ব্বজীবে দয়া" সেই ধর্ম্ম সনাতন।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

মহাত্মা জেমস্ শেঠজী নাশারেনজী তাতা।

এদেশের অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে পারিলেই, দেশের যথেষ্ট উপকার করা হইল। কিন্তু সে কথাটি কি ঠিক?

অনেকে দাড়ি নাড়িয়া চোগা দোলাইয়া, মেদিনী কাঁপাইয়া ঘোর রবে বক্তৃতা করিয়া, বলিলেন,— ভাইসকল! তোমরা শিল্পোন্নতি কর, তোমাদের সকল কষ্ট দূর হইবে। সকল বক্তারই এক কথা—"শিল্পোন্নতি কর।" কিন্তু করে কে—বা করায় কে? বক্তা, তিনি বাক্যবীর—কর্ম্মবীর নহেন। কাজেকাজেই তিনি শারীরিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কারণ তাঁহার কাজ করা অভ্যাস নাই। তাঁর কাজের মধ্যে টেরি কাটা এবং বৈকালে বিডন বাগানে বক্তৃতা করা। তিনি কথায় যাহা বলিবেন কিন্তু তাহা কাজে করিবেন না। বক্তৃতা করা কেবল নাম জাহির করিবার জন্য। এই সকল বাক্যবীরের দ্বারায় যে কত উন্নতি হইবে, তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন।

কিন্তু ভারতে এমন লোক ছিলেন ও আছেন, যে রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়াও নীরবে দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বোম্বাইবাসী জেমস্ শেঠজী নাশারেনজী তাতা মহাশয় অগ্রগণ্য। তিনি নীরবে দেশের যে মহদুন্নতি করিয়া গিয়াছেন, অনেক হোমড়া চোমড়া নেতা গলাবাজী করিয়া তাহা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

ইনি বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নাওসারি নামক নগরে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে কয়েক বৎসর বাটীতে অধ্যয়ন করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়সে বোম্বাই আসিয়া কিছুকাল লেখাপড়া শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতে বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তজ্জন্য তাঁহার পড়া শুনা ভাল লাগিল না, তিনি বাণিজ্যবৃত্তি শিক্ষার জন্য পিতার নিকট স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার পিতা একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিক ছিলেন,—তিনি প্রিয়তম পুত্রের কথায় অনুমোদন করিলেন। ১৯ বৎসর বয়সের সময় পিতার বোম্বাইস্থিত বাণিজ্যাগারে প্রবেশ করেন। তথায় কিছুদিন ব্যবসাদারী কাজ শিখিয়া, স্থির করিলেন যে, বাণিজ্য ব্যতীত

দেশের উন্নতি নাই, ইহা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। দেশের টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, সেই পরিমাণ টাকা এদেশে আসিতেছে না দেখিয়া তিনি বিদেশ হইতে অর্থাগমের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন দেশে গমন করেন। তথায় ৪ বৎসর কাল থাকিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডে আমাদের দেশীয় লোকের ব্যাঙ্ক না থাকায়, ভারতীয় বাণিজ্যের নানাপ্রকার অসুবিধা ও সমূহ ক্ষতি হয়। তিনি তন্নিবারণোদ্দেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কস্থাপন করিবার জন্য ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বৎসর তুলার ব্যবসায় বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বিখ্যাত সওদাগরগণ সর্ব্বস্বান্ত হন। তাঁহার পিতারও ঐ দশা হয়। যখন এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাঁহার শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। তিনি ভগ্ন-মনে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তাতা সাহেবের পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, তিনি উৎসাহহীন হইলেন না। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে পুনঃপুনঃ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এবং ভাগ্য পরীক্ষার জন্য পুনরায় পিতাপুত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ঠিক এই সময় ইংরাজদের সঙ্গে আবিসিনিয়াবাসীদের যুদ্ধ ঘটে—পিতাপুত্রে রসদাদি সংগ্রহের ভার লইলেন। ইহাতে তাঁহাদের কিছু টাকা লাভ হইল।

তিনি পিতাকে পুনরায় সওদাগরী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। তিনি দেখিলেন যে, এক তুলার কারবার করিলে হইবে না। তৎসঙ্গে অন্যান্য কারবারও করিতে হইবে। তজ্জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান। তথায় গিয়া জানিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে দেশে কল কারখানা না করিতে পারিলে দেশের উন্নতি নাই। তিনি আরও দেখিলেন যে, আমাদের নিকট হইতে তুলা লইয়া যাইয়া এখানকার কলওয়ালারা ধনকুবের হইয়া গিয়াছে। এই সময় তাঁহার মনে ভারতে উৎকৃষ্ট কাপড়ের কল স্থাপনের বাসনা বড়ই বলবতী হইল। তিনি আরও দেখিলেন—ভারতে তুলা জন্মায়, সেখানে কাপড়ের কল স্থাপন করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিব এবং দেশেরও যথেষ্ট উপকার সাধন হইবে। বিশেষ একটা কল স্থাপন করিতে পারিলে বোম্বাইয়ের অনেক দীন-দুঃখীর অন্ন সংস্থান হইবে। তিনি কল স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন।

১৮৭২ সালে বিলাতের কাপড়ের কল সমূহের পরিচালন-প্রণালী অবগত হইবার জন্য পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে কাপড়ের কলের বিশেষরূপ শিক্ষালাভ করিয়া দেশে ফিরিলেন। এবং ১৮৭৭ সালে

নাগপুরে একটি কলস্থাপন করিলেন। এই কল আজিও আছে নাম এম্প্রেস মিল (Empress mill)।

ইহার পর তিনি আরও অনেকগুলি কল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখানে আমাদের বলা আবশ্যক যে, তিনি স্বীয় স্বার্থের জন্য কল কারখানা স্থাপন করেন নাই। স্বদেশের এবং স্বদেশবাসীর উপকার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। নিজের উন্নতির প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। কলের অংশীদারদের ও শ্রমজীবীগণের যাহাতে লাভ ও উপকার হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এমন কি নিজের ক্ষতি করিয়াও অন্যের সুবিধা করিয়া দিতেন।

তিনি জানিতে পারিলেন—অক্ষম-বৃদ্ধ-শ্রমজীবীরা কার্য্য করিতে পারে না তজ্জন্য তাহাদের আহার জুটে না। অর্দ্ধাহারে দিন অতিবাহিত করে। তিনি সেই দিনই নিজের কলে প্রচার করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার কলে ত্রিশ বৎসর কাজ করিবে, সে বৃদ্ধ বয়সে ৫৲ টাকা করিয়া ভাতা পাইবে। তিনি কার্য্যেও তাহা করিয়া গিয়াছেন।

তাতা সাহেব কল আনিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। এই কলজাত বস্ত্র যাহাতে দেশ দেশান্তরে বিক্রয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান নগরে এক এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন এবং চীন, জাপান, শ্যাম, বোর্ণিও ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মাল রপ্তানী করিতে লাগিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত 'পি এণ্ড ও' জাহাজ কোম্পানীর সহিত ঘোরতর বাণিজ্য-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা বহুটাকার সূতা এবং কাপড় চীন জাপানে রপ্তানী করিতেন। এই সমস্ত মাল-পত্র উক্ত জাহাজ কোম্পানী বোম্বাই হইতে চীন জাপানে লইয়া যাইত। কিন্তু ভাড়া প্রতি ২৮/০ মণে ১৭৲ টাকা করিয়া লইত।

ভাড়া অত্যন্ত গুরুতর বোধে তাতা সাহেব এবং অন্যান্য কলওয়ালারা ভাড়ার হার কমাইবার জন্য উক্ত কোম্পানীর নিকট আবেদন করেন। বোম্বাই হইতে লণ্ডন যতখানি দুর, বোম্বাই হইতে হংকংও ততখানি দুর; কিন্তু বিলাতের মাল ভারতে আসে, তাহার ভাড়া অতি অল্প। আর ভারতীয় মাল হংকংয়ে যায়, তাহার ভাড়া অত্যন্ত বেশী, এই সমস্ত কারণ আবেদন পত্রে লিখিত হইল। কিন্তু উক্ত কোম্পানী আবেদন পত্র গ্রাহ্য করিলেন না। ইহাতে তাতা সাহেব নিরস্ত হইলেন না।

তিনি 'লয়েড' ও 'রুবাটিনো' কোম্পানীর সহিত হার কমাইয়া, তাহাদের জাহাজে মাল রপ্তানী করিতে লাগিলেন। 'পি এণ্ড ও' কোম্পানী উক্ত কোম্পানীদ্বয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভাড়া বৃদ্ধি করিলেন। বিলাতের লোকেরা স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের স্বার্থের দিকে প্রখর-দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। সেই জন্য উক্ত কোম্পানীদ্বয় 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর মতে মত দিলেন।

তাতা সাহেব বড়ই বিপদে পড়িলেন। তাঁহার একটা মহদ্‌গুণ ছিল, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেও নিরাশ হইতেন না। তিনি যে কাজে একবার ঠকিতেন, সে কাজে লাভ না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। তাঁহার জিগীষা প্রবৃত্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। তিনি এক জাপানী জাহাজ কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের জাহাজে বিদেশে মাল পাঠাইতে লাগিলেন। তাহারা ২৮/০ মণে ১৩৲ টাকা করিয়া লইবে, এইরূপ চুক্তি করিয়া লইল। তদ্দর্শনে ইংরাজ কোম্পানীত্রয় প্রতি ২৮/০ মণে ১৲ টাকা করিয়া ভাড়া নির্দ্দিষ্ট করিল। কিন্তু কেহই তাহাদের জাহাজে এক সের মালও পাঠাইল না। তাতা লোভে ভুলিবার ছেলে নয়, তবে তাঁহার দুই একটি সঙ্গী উক্ত কোম্পানীদের মাল দিতে ইচ্ছা করিলেন। তাতা বলিলেন, তোমরা জাপানী জাহাজে মাল উঠাও, আমি অতিরিক্ত ভাড়া নিজে বহন করিব। তাঁহার সঙ্গীরা তাহাই করিতে লাগিল। তাতা এবং অন্যান্য কলওয়ালারা অনুনয় বিনয় করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, 'পি এণ্ড ও' কোম্পানী এখন বিপদে পড়িয়া, সেই মাশুল কমাইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না।

তাঁহারা অন্য উপায়ে স্বার্থ সিদ্ধির পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর প্রতিপত্তি অসাধারণ। তাঁহারা তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড রোজবেরীর শরণাপন্ন হইলেন। স্বজাতিবৎসল, স্বার্থান্ধ মন্ত্রী, লণ্ডনস্থিত জাপানী দূতকে ডাকাইয়া বলিলেন,—ভারতবর্ষে জাপানী জাহাজ-কোম্পানি ইংরাজ জাহাজ-কোম্পানির সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। তজ্জন্য জাপান বন্ধু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। জাপানী দূত এই কথা জাপানী গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন। ফলে উভয় তরফ হইতে অনুসন্ধান চলিতে থাকে।

ঠিক সেই সময় কর্ম্মবীর তাতা একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া "পি, এণ্ড ও" কোম্পানির কীর্ত্তিকলাপ এবং অমানুষিক অত্যাচারের কথা, ভারতে

জাপানে ও ইংলণ্ডের জন-সাধারণের গোচর করিলেন। বিলাতের পার্লিয়া-মেণ্টের উদারনীতিক সদস্যগণ উক্ত কোম্পানীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট চুপ চাপ। কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। শেষে উভয় গভর্ণমেণ্টের সন্ধি হইল। তাহাতে স্থির হয়, উভয় দেশের কোম্পানী ১২৲ টাকাতে ২৮/০ মণ মাল চীন জাপানে লইয়া যাইবেন। অদ্যাবধি সেইরূপ মাল যাতায়াত করিতেছে।

এই মহাদ্বন্দ্বে মহাত্মা তাতার ২॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। তিনি স্বীয় টাকা দিয়া নিস্বার্থভাবে যে, অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোম্বাইবাসী চিরকাল স্মরণ করিবেন। তিনি অনেক সৎকাজ করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত লিপিবদ্ধ করা কঠিন। আমরা তন্মধ্যে কয়েকটি কথা বলিব মাত্র।

তিনি টাকাকে টাকা জ্ঞান করিতেন না, কেহ তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হইলে, তিনি ১০৲।১৫৲ টাকার কম দান করিতেন না। তিনি দরিদ্রের মা, বাপ ছিলেন।

ভারতে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলে, কখনো আশি হাজার, কখনো নব্বই হাজার, সময়ে সময়ে লক্ষাধিক টাকা দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে দান করিতেন। তবুও তাঁহার আশা মিটিত না। তিনি বলিতেন,—আমি সুখে আহার করি, আর আমার দেশীয় ভাই ভগ্নীগণ অনাহারে মরিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখ আছে!

তিনি দেশীয় জাহাজ কোম্পানী খুলিবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বাসনা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি স্বব্যয়ে যুবকগণকে কাপড়ের কলে এবং কার্য্যকরী শিল্প বিদ্যা (Technical Education) শিখাইতেন। সেই সকল যুবক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার, কলের ম্যানেজার এবং উইভিং মাষ্টার প্রভৃতির কার্য্য করিতেছেন। ইহা ব্যতীত তিনি একটি ধন ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তাহার সুদ হইতে শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবৃন্দকে নানা প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য বিদেশে পাঠাইতেন। এই সমস্ত ভিন্ন, তিনি উক্ত উদ্দেশে গভর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি দান করেন।

তিনি মহীশূরে একটি প্রকাণ্ড রেশমের কল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখনও এই কল এক জন দক্ষ জাপানী কর্ম্মচারীর অধীনে সুন্দর রূপ চলিতেছে।

সর্ব্বদাই দীন-দুঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তজ্জন্য তিনি বোম্বাই নগরে দুঃখীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য নিবাস প্রস্তত করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। উক্ত বাটীতে যে কেহ অবাধে থাকিতে পারেন। তিনি মধ্য প্রদেশে একটি লৌহ-খনি ক্রয় করিয়াছিলেন,—তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালাদেশে একটি বৃহদ্ লৌহ কারখানা স্থাপন করিবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা জীবনে কুলায় নাই।

ইহা ব্যতিরেকে আরও অনেক কার্য্যে হাত দিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। তিনি জলস্রোতের সাহায্যে তাড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। (এখন এই কার্য্য তাঁহার পুত্রেরা সম্পাদনের চেষ্টায় আছেন)।

তিনি শেষ বয়সে আরও একটা প্রকাণ্ড কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন—সেটা মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান। এই নিমিত্ত তিনি মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান বিদ্যালয়—(Institution for original researches) স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে প্রথমে বিশ লক্ষ টাকা দান করিতে স্বীকার করেন। পরে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করেন। এই কার্য্যে তিনি অক্ষয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

গত ১৯০৪ সালে ১৯শে জুন জর্ম্মনীর অন্তঃপাতী নৌহিম নগরে ভারতের অদ্বিতীয় দানশীল, কর্ম্মবীর জেমস্ শেঠজী নাসারেন্জী তাতা মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ডাক্তারগণ তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন—সেই জন্য বিদেশে মহাত্মার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তিলার্দ্ধ অলসভাবে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না। এত বৃদ্ধ হইয়াও যুবকের মত উৎসাহী ও কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। ভারতের বাণিজ্যোন্নতির জন্য চিরজীবন দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার অমূল্য জীবন ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। সেই জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ব্যবসা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বড়ই বিনয়ী ও অমায়িক ছিলেন।

তিনি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহারা যে দেশের উপকার করেন, তাহা তিনি বিশেষ জানিতেন। কেহ তাঁহার নিকট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে পারিত না। তিনি তাহা ভালবাসিতেন না।

তিনি নীরবে কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন। তাই এত সৎকাজ করিয়াও তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার যশো গৌরব আপনা আপনিই চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

তিনি বিপুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়াও ধন গর্ব্ব করিতেন না। তিনি

বলিতেন এ ধন রত্ন যাঁর তাঁরই থাকিবে। আমি রক্ষক মাত্র। কার্য্য শেষ হইলে চলিয়া যাইব। এই জাতীয় উন্নতির দিনে ভারত গৌরব, ভারত মাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তান, অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, নিঃস্বার্থ হৃদয়, জেমস্ শেঠ্ জী নাশারেনজী তাতা জগৎ হইতে অবসর লইয়াছেন। আবার কত দিনে তাঁহার স্থান পূরণ হইবে। তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।

তিনি স্বদেশ প্রেমিক, স্বজাতি বৎসল, নিঃস্বার্থ ভাবে স্বদেশের ও স্বজাতির উপকার করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য সকলের নিকট পূজার্হ।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

অভিসার।

কখন বাজিল বাঁশী!—
(সুর) দিগন্ত মাতিয়া পরাণ লুটিয়া
সমীরে গিয়াছে ভাসি'।
প্রতিধ্বনিগুলি তার ঘুরে ফিরে,
পড়েছি লুটিয়া জীবনের তীরে,
সকল পরাণ ধীরে অতি ধীরে,
নীরবে গোপনে হাসি,
চলেছে আজিকে পুলকে ছুটিয়া,
লাজ-মান-ভয় সকলি টুটিয়া,
প্রাণেশের পদে পড়িতে লুটিয়া,
বিরহ-তিমির নাশি!—
কখন বাজিল বাঁশী!

কখন বেজেছে বাঁশী!
(করি) উদাস আহ্বানে সারা মন প্রাণে
লইয়া অর্ঘ্যরাশি
আসিয়াছে আজি করিতে সম্মান,
দলিয়া সকল ঘৃণা অভিমান,
দেবতার পদে করিবারে দান—
আপন হৃদয়বাসি।

কোথায় আজিকে দেবতা আমার,
কোথায় বাদক সন্ধান তা'র,
কোথা হ'তে আজো আবাহন তার,
উছসে পরাণে আসি?—
কখন বেজেছে বাঁশী!

কবে জীবনের তীরে
(শত) লহর তুলিয়া পড়েছে লুটিয়া
প্রীতির উর্ম্মিধীরে,
হৃদয় যেন গো গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
পরাণ যেন গো গিয়াছে গলিয়া;
উঠিতেছে আজি মরম ভেদিয়া
হাহাকার ভীম সুরে;
কখন আমার, বিশাল-ভুবন
দাঁড়াল সমুখে, লইয়া কুজন
কখন বিহগ করে উপবন
দাঁড়াল আমায় ঘিরে,
আমার জীবন-তীরে?

ছুটিয়াছি উদাসীন!
(প্রভু) সেইদিন হ'তে ল'য়ে সাথে সাথে
হৃদয় আমার ক্ষীণ।
কত দরী-গিরি-বন উপবনে,
ফিরিয়াছি আমি তোমারি সন্ধানে
কত নদী-কূলে ভীষণ শ্মশানে
ভ্রমেছি চেতনা-হীন;
কত বিহগের মধুর-কূজন,
কত তটিনীর মৃদুল-নর্ত্তন,
কত মলয়ের স্নিগ্ধ-চুম্বন
কুড়াইয়া এতদিন,
ছুটিয়াছি উদাসীন!

সকলি কি, দেব, বৃথা?—
(ল'য়ে) অনুদিন-যামি, ভ্রমিয়াছি আমি
প্রাণের গভীর-ব্যথা!
শুধু কি, প্রাণেশ, এত আয়োজন,
মোর কি, স্বামিন্, বিফল রোদন,
বৃথা কি আমার জীপন-যাপন?
প্রাণের কাননে লতা
ফুটা'য়েছে কি গো বৃথা ফুলরাশি,
বৃথা কি আমার মৃদু-মধু-হাসি,
বৃথা কি ফুকারি' উঠেছিল বাঁশী,
জানাতে প্রাণের কথা?
সকলি কি প্রভু বৃথা?।

সিদ্ধ কর ঐ সাধন।
(কভু) অপূর্ণ কামনা রেখনা রেখনা;—
কর আজি আবাহন!
শৈশব আগার তোমারি ইঙ্গিতে
ত্যজিয়া কেবলি, লুটিয়া লইতে
আসিয়াছি, দেব, শঙ্কাহীন চিতে;—
এই মোর নিবেদন—
চরণে তোমার দাও, নাথ, স্থান—
যাক হ'য়ে সুখে মোর অবসান—
হউক ধরণী, বিপুল-বিগান
প্রেমপূর্ণ প্রাণ মন!—
সিদ্ধ কর ঐ সাধন!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ব্যাকুলতা।

আপনি বুঝিনা আপনার ভাব
কেমনে বুঝাব অন্যে
তবু যেন প্রাণে আকুল আবেগ
জানিনা কিসের জন্যে
আপনার কথা পরকে বোঝান
এ বড় বিষম দায়
পরের পরাণে আত্ম অনুভূতি
কে করিতে পারে হায়!
কি আছে আমার হৃদয় মাঝারে
চাহেনা জানিতে কেঁউ
সাগরের তীরে বসিয়া নিয়ত
গনিব কি শুধু ঢেউ?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মন্দাকিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কমলা।

"গিয়াছে সর্ব্বস্ব এবে—
নিশ্চয় মরিব সবে—
অনশনে—জঠর জ্বালায়"—

এই কয়েকটী অসম্বন্ধ—অথচ মর্ম্মস্পর্শী-কথা জনৈক গৌরবর্ণ, প্রৌঢ়ব্যক্তি চঞ্চলচিত্তে একটী প্রকোষ্ঠে পাদচারণা করিতে করিতে উচ্চারণ করিলেন। গৃহটী একটী ক্ষীণ দীপালোকে বিভাসিত—দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহৎ। যে অংশে ক্ষীণালোক প্রবেশ করিতে পারে নাই—বক্তা গৃহের সেই অংশে, অন্ধকারের সহিত হৃদয়-কালিমা মিশ্রিত করিয়া আপন মনে বিচরণ করিতেছিলেন। বক্তার দীর্ঘ শুভ্র ললাট যেন সরস্বতীর আসন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইন্দ্রধনু-তুল্য ভ্রূযুগল, দীর্ঘায়ত লোচন—খগেন্দ্রশোভিত নাসিকা—কৃষ্ণভ্রমর গুম্ফ, রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয় সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল। প্রৌঢ়ব্যক্তির বয়স ৪২।৪৩ বৎসর হইবে। আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, দীর্ঘ-বপু—বিশাল বক্ষঃ, বলবীর্য্যের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

এত যে সৌন্দর্য্যাবয়ব, এত যে বলিষ্ঠ-গঠন, দেখিলেই কিন্তু মনে হইত উহা বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন। চিন্তার রেখাগুলি বদনমণ্ডলে প্রকটিত ছিল। সেই যে দেবোপম দেহ, তাহা যেন সততই গুরুচিন্তাভারাক্রান্ত ছিল। ইহাঁকে দেখিলেই মনে হইত ইনি উচ্চবংশসম্ভূত, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা সংসর্গ কিছুতে হীন নহেন, কিন্তু দীনতায় আচ্ছন্ন। পরিধানে বহুমূল্য একখানি বস্ত্র—কিন্তু তাহা অতি পুরাতন—ছিন্ন ও মলিন।

কথিত প্রৌঢ়ব্যক্তি যেন শীতল বায়ু সেবনে উষ্ণদেহ শীতল করণাভিপ্রায়ে পার্শ্ববর্ত্তী উন্মুক্ত-বাতায়ন সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিধাতা বাধ সাধিলেন। দুঃখের সময় সুখ লাভ অসম্ভব। তিনি বাতায়ন-পথ দিয়া দেখিতে পাইলেন—যে তাহার সর্ব্বনাশের মূলাধার—সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার অট্টালিকার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিতে চাহিতে অশ্বারোহণে গমন করিতেছে। দেখিয়াই শোণিত উষ্ণতর হইল—চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত

হইতে লাগিল—রোষে, ক্ষোভে তিনি অধীর হইয়া বলিলেন—"পাপিষ্ঠের দেহ হইতে এখনও মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলাম না—ধিক্ আমার জীবনে—"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে এক অপরূপ-রূপলাবণ্যময়ী রমণী প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রৌঢ় ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"প্রাণাধিক! এখনও শয়ন কর নাই? তোমার শরীর অসুস্থ, গা দিয়া যেন আগুণ ছুটিতেছে—তুমি এখনও বিশ্রাম কর নাই?—চল—বিশ্রাম করিবে চল।"

বলা বাহুল্য কামিনী অতি কোমলস্বরে—প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে—এই কয়েকটী কথা বলিলেন। ইনি আর কেহ নহেন—প্রৌঢ় ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী। ইঁহার বয়ক্রম ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রমণী অনুপমা সুন্দরী—সুতরাং তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিশদ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা বৃথা। এই সৌন্দর্য্য-রাশির মধ্যেও দরিদ্রতাজনিত বিষাদ-ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল।

ভামিনীর নাম কমলা। কমলাও সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা। কমলা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কমলার কথায়—প্রৌঢ় ব্যক্তির সেই রুদ্রভাব তিরোহিত হইল, মমতাস্রোত উথলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—দক্ষিণ হস্তে ভার্য্যাকে বক্ষোপরি আকর্ষণ করিয়া বামহস্তে নিজের চক্ষুঃ চাপিয়া ধরিলেন। সেই সাহসী বীরপুরুষের বজ্র-কঠিন হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন বিগলিত হইল—শত চেষ্টা করিয়া দুঃখাশ্রু তিনি নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া অধীর হইলেন। যে বেগে ঐরাবত পরাজিত হইয়াছিল—সে বেগ রোধ করিবার সাধ্য কি কাহারও আছে? তাঁহার সেই সময়ের দুঃখ-বেগ নিবারণ করা তখন সাধ্যাতীত হইল—তিনি পরক্ষণেই উন্মত্তের ন্যায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্জ্রান্ত হইলেন।

আর কমলা? যিনি ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতাপালিতা হইয়াছিলেন, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার নিদ্রা হইত না—যিনি রাজার দুহিতা—রাজার মহিষী ছিলেন—তিনি কালের আবর্ত্তনে—দুঃখদারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, সন্তান সন্ততির ক্লেশাবলোকনে—এবং সর্ব্বোপরি স্বামীর ঐরূপ অবস্থাদর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ভূলুণ্ঠিত হইয়া নয়নাসারে ধরাতল আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কমলার দুই কন্যা—লীলাবতী ও মাধবী—তথায় উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতী যৌবনে পদার্পণ মাত্র করিয়াছে, কনিষ্ঠা মাধবী

কৌমার্য্যের সীমা এখনও অতিক্রম করে নাই—উভয়েই নিসর্গসুন্দরী—দেবকন্যাসদৃশা। জননীকে ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া লীলাবতী মাতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল—মাধবীকে সত্বর জল আনিতে বলিল। কমলা রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। মাধবী জল আনিলে লীলাবতী সলিল সিঞ্চনে মাতার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইল। কমলা কিঞ্চিৎ বারি পান করিয়া যেন পুনর্জ্জীবিতা হইলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন। কন্যাদ্বয়ের উৎকণ্ঠা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন—"কিছুই নয় মা—আমি সুস্থ হইয়াছি—তবে শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইতেছে।"

লীলা। "দাদা ও বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ খাঁ সাহেবের নিকট গিয়াছেন, এখনই বোধ হয় তাঁহারা সুসংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা সুসংবাদ আনিবেন। আপনি একটু দুগ্ধ পান করুন।"

মাধবী অতি সত্বরতাসহকারে দুগ্ধ আনিল, কিন্তু কমলা কিছুতেই তাহা পান করিতে সম্মতা হইলেন না। গৃহে সেই দুগ্ধটুকু ব্যতীত আর কোন আহার্য্যের সংস্থান ছিল না। স্বামীকে যে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য কমলা ব্যস্ত হইয়াছিলেন—কমলা স্বয়ং কি তাহা প্রাণ থাকিতে পান করিতে পারেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের এক অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রৌঢ় ব্যক্তির নাম দুর্গাদাস রায়। দেবীপুরে তাঁহার বাস। কিছুদিবস পূর্ব্বে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। ধনে মানে, জ্ঞানে গুণে তিনি ইংরেজ ও মুশলমান উভয়েরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তখন কলিকাতায়—ইংরেজ ব্যবসাসূত্রে রাজ্যস্থাপনের ভিত্তি প্রস্তুত করিতেছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁকে ইংরেজ যমের ন্যায় ভয় করিতেন। আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইয়াছে—সিরাজুদ্দৌলা * সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। সিরাজুদ্দৌলার উপর ইংরেজের পূর্ব্বাপর ক্রোধ ছিল। ইংরেজের বিশ্বাস, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, আলিবর্দ্দি খাঁ কেবল সিরাজুদ্দৌলার কুপরামর্শে ইংরেজকে পীড়ন করিতেন। কিন্তু প্রকৃত

---

* সিরাজুদ্দৌলার প্রকৃত নাম সিরাজ-উদ্-দৌলা।

কথা তাহা নহে। ইংরেজকে সিরাজুদ্দৌলা বিলক্ষণরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্যশক্তি সুবিধা করিতে পারিলেই ভারতে যে প্রলয়োৎপত্তি করিতে পারিবে, দূরদর্শী সিরাজুদ্দৌলা তাহা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি তাই ইংরেজের উপর সততই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। ইংরেজ বণিকের কার্য্যকলাপের সামান্য সংবাদ পর্য্যন্ত যাহাতে তাঁহার অগোচর না থাকে, তজ্জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রখরবুদ্ধি ইংরেজও ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন।

উভয় শক্তির এবংবিধ সংঘর্ষ সময়ে এই আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজ এই সুযোগে যেন ফরাসীর ভয়ে কলিকাতায় দুর্গের সংস্কারে ব্যাপৃত হন। ফরাসীর হস্ত হইতে কুঠীরক্ষা করিবার ধুয়া ধরিয়া দুর্গের সংস্কারাদি করিতে লাগিলেন। সিরাজ ইংরেজকে সতত সন্দেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। তিনি ইংরেজকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বারংবার নিষেধ করেন। ইংরেজ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই চতুরঙ্গ সেনা-সহ সিরাজ ইংরেজের কলিকাতাস্থ দুর্গ আক্রমণার্থ অগ্রসর হন।

দুর্গাদাস বাবু রাজা উমিচাঁদের অধীনে কার্য্য করিতেন। ইংরেজ সে সময়ে এদেশ হইতে যে পণ্যসম্ভার ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিতেন, তাহার অধিকাংশ উমিচাঁদের সাহায্যে ক্রীত হইত। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী লোক হইয়া শুদ্ধ উমিচাঁদ যে ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, দুর্গাদাস বাবুও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা দুর্গাদাস বাবুর কথা জানিতেন। উমিচাঁদ যে দুর্গাদাস বাবুর গুণে বিশেষ বশীভূত, দুর্গাদাসবাবুকে হস্তগত করিতে পারিলে যে বিশেষ উপকার হইবে, সিরাজুদ্দৌলা তাহা জানিতেন। কাজেই তিনি যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে উমিচাঁদের ন্যায় দুর্গাদাস বাবুকেও হস্তগত করিতে অল্পপ্রয়াসী হন নাই।

দুর্গাদাস বাবু ইহাতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। একদিকে অন্নদাতা, অপরদিকে রাজা। ধর্ম্মতঃ তিনি কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া তিনি এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে প্রয়াসী হন। মুসলমানেরা তাহা বুঝিলেন না—তাঁহারা দুর্গাদাস বাবুকে তাঁহাদিগের শত্রু বলিয়া মনে করিলেন। শুদ্ধ যে দুর্গাদাস বাবুর অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নহে—উমিচাঁদও নবাবের ক্রোধাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

এই আখ্যায়িকায়, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উমিচাঁদের ভাগ্যের সহিত দুর্গাদাস বাবুর ভাগ্য কিয়ৎপরিমাণে বিজড়িত ছিল বলিয়া আমরা উমিচাঁদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সামান্য অবতারণা এ স্থানে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উমিচাঁদকে ইংরেজ ইতিহাসবেত্তারা খল, কপটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা ইতিহাস অনবগত, তাঁহারা উমিচাঁদকে বাঙ্গালী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু উমিচাঁদ প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী ছিলেন না, কাশ্মীরবাসী ছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর—উমিচাঁদ ও দীপচাঁদ—বঙ্গে ধনোপার্জ্জন ও বসবাস করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে উমিচাঁদ নবাবকে অসময়ে ঋণদান করিতেন এবং অন্যান্যরূপে সাহায্য করিতেন। উমিচাঁদ আলিবর্দ্দি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর সময়েও ইংরেজ বণিকবেশে বঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহীত্র সিরাজুদ্দৌলার এই বণিক ইংরেজদলের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। ইংরেজ ইতিহাসবেত্তারা যাহাই বলুন, সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাস ছিল, তিনি ইংরেজকে চিনিয়াছেন, ইংরেজ "ছুচ" হইয়া প্রবেশ করিয়া "ফাল" হইয়া বাহির হইবে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মধ্যে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, ব্যবসায়ের পসার যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, সিরাজুদ্দৌলার তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁকেও এসম্বন্ধে সদাসর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেন। চতুর ইংরেজের ইহা বুঝিতে বাকী ছিল না। কাজেই প্রথমাবধি সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাদিগের বিষ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন।

উমিচাঁদের প্রতি নবাবের বিশেষ অনুগ্রহ সন্দর্শন করিয়া ইংরেজ অনেক সময়ে উমিচাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হইতেন। উমিচাঁদের চেষ্টাতেও ইংরেজ অনেক অনেক কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতেন।

আমাদিগের বর্ণিত আখ্যায়িকার কালে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে ধনরাশিসহ কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা ঢাকা লুণ্ঠনের জন্য উদ্‌যোগ করিতেছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া রাজবল্লভ তাঁহার প্রিয়পুত্র কৃষ্ণদাসকে বিপুল ধনাদিসহ কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয়ে প্রেরণ করেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হন। কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি অনুজ্ঞা প্রদান করেন। সুচতুর ইংরেজ বণিকেরা কৃষ্ণদাসের অর্থে বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আতিথ্য ব্রতে জলাঞ্জলী প্রদান

করত কি করিয়া কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবেন, ইহা সিরাজুদ্দৌলাকে লিখিয়া পাঠান। কৃষ্ণদাস উমিচাঁদের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইংরেজের এই স্পর্দ্ধায় সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ইংরেজকে বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। পূর্ব্বের এই ইতিহাসটুকু অবগত হইতে না পারিলে আমাদিগের আখ্যায়িকার ঘটনাবলী সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নদীতটে।

দেবীপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, মুশলমান অপেক্ষা হিন্দুর বাস এখানে অধিক। রেশমের ব্যবসায় দেবীপুরের অনেক লোকে করিয়া থাকে। সুতরাং অধিবাসীদিগকে আর্থিক অসচ্ছলতার মুখ প্রায়শঃ দেখিতে হয় না। ইংরেজ বণিক এদেশ হইতে রেশমী বস্ত্রাদি বিলাতে প্রেরণ করিয়া থাকে। দুর্গাদাস রায় গ্রামের জমীদার। তিনি দয়াদাক্ষিণ্যমণ্ডিত, সদগুণাবলীতে ভূষিত। কাজেই প্রজারা তাঁহার একান্ত বশীভূত ও অনুরক্ত। উমিচাঁদের মধ্যস্থতায় ইংরেজেরা দেবীপুর হইতে অনেক টাকার পট্টবস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। উমিচাঁদ আবার দুর্গাদাসের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে, যেমন দেবতা, তেমনই বাহন হইয়া থাকে। সিরাজুদ্দৌলার প্রবল ইংরেজ বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিবার উপযুক্ত পাত্রের অভাব ছিল না। তাঁহার পাত্র, মিত্র, সভাসদগণ প্রায় সকলেই ইংরেজের নিন্দা করিত। করিম খাঁ নামক জনৈক যুবক ইঁহাদিগের অন্যতম। করিম খাঁ দেখিতে রূপবান পুরুষ, বুদ্ধিমান, বিদ্বান। করিম সিরাজের পরমাত্মীয়। করিমের বলবীর্য্যের পরিচয় সিরাজুদ্দৌলা কয়েকবার পাইয়াছিলেন। এই করিমই দুর্গাদাসের সর্ব্বনাশের মূল।

দুর্গাদাস রায় উন্মত্তের ন্যায় বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জাহ্নবী তীরে গমন করিলেন। দেবীপুরের পাদদেশ বিধৌত করত ভাগিরথী প্রধাবিতা। অনন্ত বীচিশালিনী, দুকুলপ্লাবিনী জহ্নুনন্দিনী—সেই নৈশ ঘনান্ধকারে অসংখ্য তারকামালার প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিতে-

ছেন। তীরে ঘন বিটপীরাজি উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, বায়ু নিঃস্বনে পত্রের আলোড়নে যেন পৈশাচিক ভাষায় তাহারা পরস্পরে কথোপকথন করিতেছে। আবার নদীর কুলুকুলুস্বর সেই শব্দে মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শব্দের সমাবেশ করিতেছে। গভীরা যামিনীতে, সেই মনুষ্য-সমাগম-বিরহিত স্থানে, সেই স্বর যে ভীতি উৎপাদক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দুর্গাদাস রায়ের তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি বাহ্যজ্ঞানহীনের ন্যায় নদী সৈকতাভিমুখে ছুটিলেন।

আকাশে চন্দ্রের উদয় হয় নাই। নীল নভোমণ্ডলে অনন্ত তারকাশ্রেণী বিরাজিত। একের পর একটী, আবার একটী, আবার একটী এইরূপে অগণ্য তারকা সেই নৈশান্ধকার বিনাশের জন্য যেন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এক চন্দ্রে যে তমঃ নাশ করে, লক্ষ লক্ষ তারাতে তাহা করিতে পারে না। তারকামণ্ডলীর এই অনর্থক চেষ্টা দেখিয়া ধরিত্রী সুন্দরী যেন বিদ্রূপছলে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। যে নক্ষত্রের অভিমান বেশী—সে পৃথিবীর বিদ্রূপ-বাণ সহ্য করিতে পারিল না, স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর পায়ে পড়িবার জন্য বিমান হইতে খসিয়া পড়িল। হায়! আশা কি কখন পূর্ণ হয়? অনন্ত কোটী গ্রহাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ ছিন্ন করিয়া নক্ষত্র মহাশয় অভীপ্সিত ফললাভ করিতে পারিল না—ভূতলে পতিত হইবার বাসনা তিরোহিত হইল। স্বধর্ম্মত্যাগী, স্বজাতিদ্রোহীর পরিণাম এইরূপই হয়।

দুর্গাদাস রায় যখন জাহ্নবী তীরে উপনীত হইলেন, তখন তাহার বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নদীজলস্পৃষ্ট শীতল সমীরণ তাঁহার উষ্ণ কপোল স্পর্শ করিল। বিশুদ্ধ, অনবরুদ্ধ সলিলসেবিত পবন হিল্লোলে দুর্গাদাস রায়ের উষ্ণ মস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ শীতল হইল। তিনি ধীরে ধীরে বেলাভূমিতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্শ্ব দিয়া শৃগাল কুকুর চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছে, দুর্গাদাস স্বগত বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কেন এই শৃগাল কুকুর হইলাম না? ইহারাও সুখী। কত পাপ করিয়াছি তাই ভগবান আমাকে এইরূপ শাস্তি প্রদান করিলেন। ধন জন, মান সম্ভ্রম কিছুরই আমার অভাব ছিল না। আমার ভার্য্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমার পুত্র কন্যারা রূপে গুণে অতুলনীয়। আমার সব ছিল—কিন্তু সবই গেল! কেন গেল—কোথায় গেল—তাহা যেন স্বপ্নবৎ মনে পড়িতেছে। একদিন যে পুরী আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী প্রভৃতির কোলাহলে

মুখরিত হইত—এখন তাহা জনশূণ্যপ্রায় হইয়াছে। আমার কিসের অভাব ছিল? কিন্তু পাপিষ্ঠ করিম আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। আমি উপায়হীন অক্ষম—তাই প্রতিশোধ লইতে পারিলাম না। পাষণ্ড আমার সর্ব্বনাশ-সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে। আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে—তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় নাই। আবার—আবার—বলিতে বলিতে দুর্গাদাসের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, দৃঢ় মুষ্টিতে তিনি নিজের কপালে আঘাত করিলেন।

এই সময়ে এক ছায়ামূর্ত্তি তাহার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। এ কি ভূত, প্রেত, পিশাচ না দানব? নতুবা গভীর নিশীথে—সেই জনশূন্য সেই ভয়াবহ স্থানে উন্মত্তবৎ দুর্গাদাসের পশ্চাদনুবর্ত্তী কে হইবে? এ কি করিমের গুপ্তচর? নরাধম কি দুর্গাদাসের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াও নিবৃত্ত হয় নাই—তাহার প্রাণ নাশার্থ গুপ্ত হত্যাকারীকে পাঠাইয়াছে?

দুর্গাদাস রায় আপন মনে চিন্তা করিতেছিলেন; কেহ যে তাহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইয়াছেন, তিনি তাহা জানিতেন না। দুর্গাদাস আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলেন। এক একবার মনে করিতেছিলেন, সর্ব্বপাতক-বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গার গর্ভে দেহ বিসর্জ্জন দয়া সকল দুঃখের অবসান করেন। দুর্গাদাস ইহাই করিবেন স্থির করিলেন—তিনি 'মাগো' বলিয়া যেমন জাহ্নবী গর্ভে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে যাইবেন, অমনি বজ্রমুষ্টিতে পশ্চাতদিক্ হইতে কে তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। দুর্গাদাস দেখিলেন, জটাজুটধারী, গৈরিক বসনপরিহিত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকশোভিত এক দীর্ঘাকার মহাপুরুষ। দেখিয়া দুর্গাদাস ভাবিলেন—স্বয়ং ভূতভাবন ভগবান কি তাহার সমক্ষে দণ্ডায়মান! দুর্গাদাস সবিস্ময়ে; সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন "বৎস! আত্মহত্যা মহাপাপ। যদি এমন বুঝিতে পার যে, মৃত্যু হইলে আর জন্মিতে হইবে না—বর্ত্তমান দুঃখের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ হইবে না—তাহা হইলে মৃত্যু সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা যদি না হয়—যদি এমন হয় যে, মানুষ যেরূপ মনের অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করে, পরজন্মে তদ্রূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ফলভোগী হয়, তাহা হইলে তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় আত্ম-হত্যায় লাভ কি? কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, কর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ম্মফলপ্রত্যাশী হইও না। ভগবানের চরণে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া

কর্ম্মবীরের ন্যায় কার্য্য করাই মনুষ্যের উচিত। যাও বৎস, গৃহে প্রত্যাগমন কর—আবার সময়মতে দেখা করিব।"

মহাপুরুষ এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন—যেন অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন। দুর্গাদাস রায় চকিতনেত্রে দীর্ঘাকার মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা।

আজি প্রকৃতি কেন কাঁদিছে,
কিসের তরে?
কেন অঙ্গ তার আবরিছে—
ঘন অম্বরে?
মধুর মোহন সে মূরতি—
কোথায় আজ,
বিষাদিনী, উন্মাদিনী বেশ
একি রে সাজ?
জোছনায় মাখা মুখখানি
কোথায় তার,
কোথা বা কণ্ঠে শোভিছে আজ
তারকা হার?
মাঝে মাঝে কেন শিহরিছে—
(ভীরু) বালিকা হেন?
গুমরি গুমরি বেদনা ভরে—
কাঁদিছে কেন?
কেনবা অশ্রু ঝরিছে আজ
নয়ন হ'তে,
ধরার গাত্র হ'তেছে সিক্ত
তাহার স্রোতে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ব্রজে ।

কে গো ঐ কাল বরণ, বংশী বদন
ব্রজের পথে দিলে দেখা,
চ'লেছে নূপুর পায়ে, চূড়ায় দিয়ে,
ময়ূর-পাখা বামে বাঁকা !
পরণে পীতবসন, অঙ্গে ভূষণ,
প্রস্ফুটিত ফুলের মালা ;
অধরে মধুর হাসি, সুধার রাশি,
দেখ্‌ছি বাঁকা চ'খে ঢালা,
নয়নে দেখেছে যে, মজেছে সে,
বাহ্য জগত গেছে ভুলে ;
ব্রজে কে কাল বরণ, বংশীবদন,
প্রেমের আলো দিলে জ্বেলে !

২

কে গো ঐ যায়গো চলে, চরণতলে,
সঙ্কেতেরে ধূলায় এঁকে ;
যেন সে স্বপন দিয়ে, মন বাঁধিয়ে,
প্রতিপদে যায় গো ডেকে ।
নয়নে চায় যে দিকে, সে দিকটিকে,
সাজায় যেন উল্লাসেতে,
নিরখি' হয় গো মনে, উহার সনে,
ঘুরে বেড়াই পথে পথে ।
ও শশী মুখের হাসি, কুসুম রাশি,
বুকে বুকে ফুট্‌য়ে দিলে ;
ব্রজে কে কাল বরণ, বংশীবদন,
প্রেমের আলো দিলে জ্বেলে ।

৩

দূরে ঐ নীল আকাশে, শশী হাসে,
অমল আলো বিশ্বে ঢালি,
কাননে কোকিল ডাকে, রসাল শাখে,
মধু লোভে ছুট্‌ছে অলি।
কে গো ঐ বাঁশীর স্বরে, হৃদয় হরে,
জাগায় আশা মনোমাঝে,
যেন সে নে যায় টেনে, উষার সনে,
কুসুম ঘেরা রাজ্য মাঝে।
সুষমা কেমন যে সে, বুঝা'বে কে
শুধুই দেখি চক্ষু মেজে,
ব্রজে কে কাল বরণ, বংশীবদন,
প্রেমের আলো দিলে জ্বেলে!

৪

যমুনা উজান চলে, কদম তলে,
কালার বাঁশী শুনে কাণে,
ফুলেরা উঠ্‌ছে ফুটে, আস্‌ছে ছুটে,
মত্ত ভ্রমর মধুপানে।
বহিছে পবন ধীরে, আস্‌ছে ফিরে,
গত কথা আবার মনে,
ভুলায়ে বর্ত্তমানে, লয় গো টেনে,
কালার বাঁশী গোপী জনে।
রহিতে কুলের ফাঁদে, পরাণ কাঁদে;
ইচ্ছা করে যাই গো চ'লে,
ব্রজে কে কাল বরণ, বংশীবদন,
প্রেমের আলো দিলে জ্বেলে!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নৃসিংহ মন্দিরে।

(১)

সে আজ কতদিনের কথা, আমরা ভগবান নৃসিংহ দেবের পুণ্য পাদমূলে সমবেত হইয়াছিলাম। অতীতের স্মৃতি সুধাময় সেই শুভ বাসরটী বহুদিন হইল কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, কিন্তু সেই শুভদিনের মহিয়সী স্মৃতিটুকু আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। দিব্য বনপ্রান্তে সেই কোমলে কঠোরে মিশ্রিত পাষাণময় দেবমূর্ত্তি তৎসঙ্গে স্নেহময়ী প্রকৃতি মাতার স্নেহাঞ্চলে ঢাকা সেই সুমনস সুষমাময় পল্লী চিত্রখানি আজিও উজ্জ্বল বরণে মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই পুণ্য প্রভাতে নব বধূর প্রথম মিলন-রাতের সুন্দর হাস্য-টুকুরই মত প্রকৃতি দেবীর সুচারু অধরে মধুর হাস্যের বিকাশ—নীরব মধ্যাহ্নে রুদ্রমূর্ত্তি তপনের লালসিত অগ্নি কিরণের মাঝে ছায়া, বটতলে সন্তপ্ত সন্তানের জন্য মাতার শীতল স্নেহাশ্রয় সৃজন—সেই শ্যাম সন্ধ্যায় মন্দানিল মুখর শান্ত পল্লীর সৌরভ-সুষমা এসব বুঝি জীবনে ভুলিবার নয়।

নৃসিংহ মন্দির—নদীয়া কৃষ্ণনগরের দুই ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে—বৃক্ষ-বনস্পতিচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন—সুন্দর গন্ধামোদিত-আকুল বকুল-বীথিকা বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রান্তে অবস্থিত, গ্রামখানির নাম নৃসিংহ দেবপাড়া। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাকে সংক্ষেপে দেপাড়া বলিয়া থাকে। একটি উচ্চ বনভূমে মন্দিরটি বিরাজিত। স্থানটি মনোরম। চতুর্দ্দিক বেল, বকুল, তিন্তিড়ী ও বন্য-বৃক্ষশ্রেণী—উচ্ছৃঙ্খল-সমীর হিল্লোলে নিয়ত হিল্লোলিত। তাহাদের শাখাশ্রয়ে কলকণ্ঠ বিহগকুল তাহাদের অব্যক্ত গীতি কাকলীতে নির্জ্জন বনভূমি নিয়ত মুখরিত করিতেছে। অদূরে কুমুদ-কহ্লার পরিশোভিত একটি দীর্ঘিকা। তাহাতে নানা জাতীয় জলচর পক্ষী দিবা-রাত্রি তাহাদের চীৎকারে তীরবর্ত্তী বনানীতে প্রতিধ্বনি সৃজন করিতেছে। পল্লীগ্রামের সেই অভিনব শোভারাশি দেখিয়া আমার মনে হইল—ত্রিদিবের নন্দনকানন বুঝি এমনি সুন্দর, দেব-বালাগণের অমর সঙ্গীত বুঝি এই বিহগ কাকলীর মতই মধুর। এ কল কাকলী যেন নীরব প্রকৃতি মাতার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের স্নেহ প্রণোদিত আকুল আহ্বান।

কতদিন এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা তাহার স্থিরতা নাই। কত পূর্ণিমা নিশি

তাহার রজত কিরণে এই সুন্দর বনভূমি প্লাবিত করিয়াছে—কতদিন কত না সমীর-উচ্ছাস বকুল গন্ধে বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে—কত না অক্লান্ত বাসর-তিয়াস-সন্তপ্তা-বিরহিণীর মত তাহার সুষমা সম্ভার লইয়া কাহার প্রতীক্ষায় থাকিয়া অতীতের কক্ষ রেখায় গড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতি মাতার এ সজ্জিত বিপণি বুঝি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান এবং ইহা চিরসুন্দর।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান নৃসিংহ দেবের উত্থান মহোৎসব হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে জাত বলে। আমরা অতি প্রত্যূষে একখানি গো-যান সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণনগর হইতে যাত্রা করিলাম। গো-যান তাহার স্বভাবোচিত শ্রুতিকঠোর শব্দ তুলিয়া ক্রমে সহর ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। তখন নবারুণ-কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। বিশ্বনাথের আশীর্ব্বাদ যেন কর্ম্ম ও পরিশ্রম, উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত স্বর্ণ কিরণে গলিত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আমরা প্রকৃতির প্রভাতী সুষুমায় আত্মহারা হইয়া গো-যানে নিষ্পেষিত হইতে হইতে অগ্রসর হইলাম। পথের দুই ধারে ক্ষেত্রগুলি নবীন শস্য-সম্পদে প্রভাত সমীরে হেলিতেছে-দুলিতেছে। পথ জন বিরল। তরঙ্গায়িত বিশাল প্রান্তর দিগন্ত বিস্তৃত—সূর্য্যের প্রথমালোকে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। অযত্ন-সেবিত বন-ফুল-গন্ধে পবন তখন সৌরভ ভার কাতর। জলার্থিনী গ্রাম্য বধূগণ কলসী কক্ষে দূর গ্রামান্তর হইতে দিবসের জল সঞ্চয়ের জন্য পথিপার্শ্বস্থ-বুনা দীঘিতে নামিতেছিল। তাহাদের ঋজু দেহ, শান্ত চাহনি ও স্বভাব সরল মাধুর্য্য দেখিয়া ভাবিলাম, সহরবাসিনী নবসভ্যতা-লোকোদ্ভাসিতা বিদুষী ললনাগণের সহিত তুলনায় ইহাদের কত প্রভেদ! সংসারের কার্য্যগুলি পরের হাতে সঁপিয়া শুধু বিলাস ব্যসনে ও কার্পেটে ফুল তুলিয়া যাঁহারা দিবসের অখণ্ড অবসর যাপন করেন, তাঁহাদের চিররুগ্না হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। হায়, মা সরলা গ্রাম্য-বধূগণ! আজিও তোমাদের কল্যাণে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শেষ ছায়াটুকু দগ্ধ-ভারত হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজিও তোমাদের গৃহে ক্ষুধার্ত্ত আহার্য্য পায়—পথবাহী পথিক রজনীর অন্ধকার ও পথের বিভীষিকা হইতে আশ্রয় পাইয়া থাকে। গার্হস্থের পুণ্য প্রভাটুকু ধর্ম্মহীন ভারত-শ্মশানে তোমরাই জাগাইয়া রাখিয়াছ। তোমরা চির কল্যাণময়ী হইয়া ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে পতিত ভারতকে আবার তেমনি আলোকময় কর—তোমাদের বক্ষে ধরিয়া ভারত মাতা আবার

তেমনি পুরাণ-বর্ণিতা গৌরব আখ্যার উপযুক্তা হউন। তোমাদের ভাণ্ডারে আহারীয় অক্ষয় হউক—শস্য সম্পদে তোমাদের গৃহ ভরিয়া উঠুক।

আমরা যখন মন্দিরে পৌঁছিলাম তখন নিকটস্থ গ্রাম হইতে জন সমূহ আসিয়া জমিতেছিল। দোকানীরা তখন যে যাহার দোকান সাজাইতে ব্যস্ত। আমাদের গাড়ী একটি ছায়া-নিবিড় বট-বৃক্ষ তলে থামিল। কয়েকটি শান্ত সবল দেহে কৃষক-বালক পাঁচন বাড়ী হস্তে আমাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। মন্দিরটি ক্ষুদ্র এবং পশ্চিমাস্য। ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ পাষাণময় নৃসিংহ মূর্ত্তি, মৃত্তিকা হইতে উত্থিত। ক্রোড়ে হিরণ্যকশিপু—পদতলে নত জানু প্রহ্লাদ। দেখিলে ভয় ও ভক্তিতে মস্তক আপনি অবনত হইয়া আসে। আমরা ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

তখনও পূজার্থী কেহ আসেন নাই—মাত্র মন্দির পরিষ্কৃত হইতেছিল, আমরা অদূরস্থিত তিন্তিড়ী বৃক্ষচ্ছায়া বেষ্টিত উচ্চ ভূমে যাইয়া বিশ্রামার্থ সতরঞ্চ বিছাইলাম। কতকগুলি 'হনুমান' সন্ত্রস্তভাবে বৃক্ষ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহাদের অধিকৃত রাজ্যে নিরালয়ে, সহসা আজ এতগুলি মনুষ্যের অভিযানে তাহারা বিশেষ চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা আকাশ পানে চাহিয়া শুইয়া পড়িলাম। গো-যানের 'ঝাঁকানি'তে কোথাও অস্থি সরিয়াছে কিনা ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে ভীম কর্ম্মা বন্ধুবর আশুতোষ ইটের উনানে বন্যকাষ্ঠ সাহায্যে চায়ের কাৎলিট চাপাইয়া দিয়াছে! বাস্তবিক সে দিন সেই বনের মধ্যে কষ্ট-সংগৃহীত চায়ের গন্ধে আমরা আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবসাদ দূর হইলে আমরা সেই স্বল্প সলিলা সরোবরে স্নান করিয়া লইলাম। জলযোগের জন্য খাদ্য, যথেষ্ট ফল মূল ও মিষ্টান্ন ছিল কাজেই কোন বিষয়ে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না।

নির্জ্জন বনভূমি ক্রমে জন সঙ্কুল হইয়া উঠিল। দোকানদারেরা বেশ জাঁকাইয়া বসিয়া ঘৃতাভাবে তৈলপক্ক মিষ্টান্নগুলি সরল কৃষকগণকে বিক্রয় করিয়া বাক্সে পয়সা ফেলিতে লাগিল। তালশাঁসের দোকানে তাল 'ছোবা' স্তূপাকার হইয়া উঠিল। মনিহারীর দোকানে ক্রেতা এবং তদভাবে দর্শকের ভীড়ে বিক্রেতাকে সচেষ্ট করিয়া তুলিল। দু'চার দল জুয়ারী বৃক্ষতলে আপনাপন অধিকার বিস্তার করিল। আমরা মন্দিরে ফিরি আসিলাম, তখন চতুর্দ্দিক হইতে ভারে ভারে দুগ্ধ ও পূজার দ্রব্য আসি

জমিতে লাগিল। যাঁহারা নৃসিংহের কৃপায় সন্তান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা নবকুমারের অন্নপ্রাশন দিতে দেব-মন্দিরে সমাগত হইলেন। সবলকায় গোপ যুবকগণ দুগ্ধের ভার স্কন্ধে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পবিত্র জলহীন দুগ্ধে পায়সান্ন রন্ধন করিয়া ভগবানের ভোগ দেওয়া হইলে অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। শুনিলাম যে দেবতার ভোগের জন্য আনীত দুগ্ধ সম্পূর্ণ রূপে বারিহীন হওয়া আবশ্যক। ইহার জন্য গোপগণ যথেষ্ট মূল্য গ্রহণ করে। যদি কোন দুষ্ট গোপ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুগ্ধে একটুও জল মিশ্রিত করে, তাহা হইলে পথিমধ্যে দুগ্ধভাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তবে স্বরূপগঞ্জ ও নদী তীরবর্ত্তীগ্রামের গোপগণ নাকি দুগ্ধে গঙ্গার জল মিশাইয়া আনে। 'দুগ্ধে গঙ্গাজল মিশাইলে সে দুগ্ধ-ভাণ্ডের উপর নৃসিংহ দেবের 'জুরিস্ ডিক্‌সন নাই।'

যাহা হউক ভোগের পর অনাহুত আমরাও দেবতার প্রসাদ লাভ করিলাম। সেরূপ পরমান্ন সকলের জীবনে আহার করা ঘটিয়া উঠেনা। ক্রমে মন্দির জন সঙ্ঘে পরিপূর্ণ হইল। আমরা বনমধ্যে সেই তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলাম। ক্ষণকাল পরে একজন সেবাইৎ আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ভদ্র এবং মিষ্টভাষী। কথায় কথায় তিনি আমাদের নিকট নৃসিংহ দেবের আবির্ভাব ও মন্দির স্থাপনের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

তবে এস।

তবে এস, তবে এস, এস সখা আজিকার মত ;
ভুলে যেও, ওগো সখা, যেও ভুলে অপরাধ যত !
প্রফুল্ল স্বপন সম,
রূপরাশি অনুপম,
সংজ্ঞের কোলেতে যবে যাবে মিশায়ে ;
যেন কল্পনার স্মৃতি,
মানসে উদিবে নিতি—
নিশার আঁধারে তারে রেখো লুকায়ে!

আঁধারের আবরণে,
আঁধার পরাণ সনে,
বাহিরিব অভিসারে অলক্ষ্যে সবার;
এই বিদায়ের বাণী
অর্থহীন অনুমানি,
নিমেষে দরশ তব যাচিব আবার!
বুঝি সে করুণ কথা,
সুচঞ্চল ব্যাকুলতা,
পথের মাঝেতে সখা যাবে হারায়ে;—
অথবা পশিলে কাণে,
বাতুল প্রলাপ জ্ঞানে,
যাবে চ'লে ঘৃণাভরে বদন ফিরায়ে!
সারাটী যৌবন ধরি,
যে চারু মূরতি গড়ি,
রেখেছিনু হিয়া মাঝে অতীব গোপনে;—
আপন অস্তিত্ব ভুলি,
কাঁটা বেছে ফুল তুলি,
প্রেমহার গাঁথি যার দে'ছিনু চরণে!
আজি সে মূরতিখানি,
বাহিরে আনিছ টানি,
ভেঙ্গে ফেলে দিতে শুধু কর অনুরোধ;
ভুলে যেতে বার বার,
কেন সখা সাধ' আর,
আমি ত সাধিনি তোমা দানিতে প্রবোধ!
চ'লে যাবে সেই ভাল,
নিভাও আশার আলো,
স্মৃতিটুকু মুছে দিতে কেনগো প্রয়াস?—
মরমে যাতনা ল'য়ে,
শতেক লাঞ্ছনা স'য়ে,
নিরাশা প্রান্তর মাঝে নিরমিব বাস;

তোমা হ'তে বহু দূরে,
নীরব শ্মশানপুরে,
একেলা রহিব সখা, একেলা কাঁদিব;
স্মৃতি চিতা সাজাইয়ে,
বাসনা আহুতি দিয়ে,
অশান্ত পরাণ ল'য়ে অনন্তে মিশিব!
তবে এস, ওগো সখা, এস তবে আজিকার মত;
ভুলে যেও, ওগো প্রিয়, ক্ষমা ক'রো অপরাধ যত!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার নাগ।

মাসিক-সংবাদ।

গত ২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার প্রভাতে ছয়টার সময় মজঃফরপুরের জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

অরবিন্দ বাবুর মামলার সাহায্য-ভাণ্ডারে কিঞ্চিদধিক পঁচিশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। মামলার দিন সন্নিহিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গবাসী যথাসাধ্য দান করুন।

মহারাষ্ট্রের পুরুষসিংহ শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ডের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী পীড়িতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মা তাঁহাকে দেবতুল্য স্বামীর বিরহ সহ্য করিবার শক্তি দিন।

বড়বাজারে একটা বাড়ীর ভিত্তি খননের সময় একটা পুরাতন কামান বাহির হইয়াছে। উহা প্রায় তিন ফিট দীর্ঘ হইবে। লোকে অনুমান করিতেছে, ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে এই কামান প্রোথিত হইয়াছিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বিজয়ার দিবস এবার কলিকাতার সওদাগরদিগের আফিসে বিলাতী-বস্ত্রের বিক্রয়-চুক্তি যৎসামান্ন হইয়াছিল। বিলাতী-বস্ত্রের বিক্রয়ের অল্পতা যে স্বদেশী-প্রচলনাধিক্যজনিত ঘটে নাই—সাহেব বণিকদিগের অনেকের মুখেই এই কথাই শুনা যাইতেছে। তাহারা বলিতেছে—দুর্ভিক্ষাদি বিক্রয়-হ্রাসের অন্যতম কারণ। আমরা কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি না। এ বৎসরে সারদীয় পূজার সময়ে "দেশী-বস্ত্রের" বিক্রয়াধিক্যই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে।

রাখীস্নানাদি এ বৎসর নানাস্থানে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ প্রভুরা গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল প্রযত্ন হন। পুলিশ সভা করিতে না দিলেও কেহ শান্তিভঙ্গ করে নাই।

মেদিনীপুরের বোমা মোকদ্দমায় অভিযুক্ত সম্ভ্রান্ত আসামীদিগকে কিছুতেই জামিনে মুক্তি না দেওয়ায়, পূজাবকাশে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র ও কক্স সাহেবের নিকট পুনরায় আবেদন হইয়াছিল। জামিনের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কক্স সাহেব জামিন দিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু মিত্র মহাশয় জামিনে মুক্তি দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলেন। কক্স সাহেব সারদা বাবুর সহিত ঐক্যমত না হওয়ায় সারদা বাবু সিনিয়ার জজ বলিয়া, আসামীদিগকে জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ প্রদান করেন। কক্স সাহেবের "থোঁতা মুখ ভোঁতা হইয়া যায়।"

দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতবাসীর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহাই বোধ হয় বিলাতের রাজপুরুষদিগের বিশ্বাস। নতুবা বিলাতের গবর্ণমেণ্ট বিলাতের সৈনিক ব্যয়ের জন্য ভারতবাসীর স্কন্ধে আবার প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ভার চাপাইবেন কেন? বিলাতী গবর্ণমেণ্ট ভাবেন "ভারত গৌরীসেন যখন আছে, তখন টাকার ভাবনা কি?"

দুর্গোৎসব।

মানবের কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ জীবন-গতি, সময়ের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনন্তের কোন অজানা পথে অগ্রসর হইতেছে। মোহান্ধ মানব তৎপ্রতি দৃষ্টি প্রদানের ক্ষণেকের অবসরও অন্বেষণ করিয়া পায় না, কেবল কর্ম্মভারাবনত শ্রান্ত-ক্লান্ত নশ্বর শরীর লইয়া বিশাল বিশ্বের এক কোণে পড়িয়া আছে এবং "আমিত্ব"টাকে ক্রমেই সঙ্কুচিত করিয়া নিজের চতুর্দ্দিকে একটা স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছে। কিন্তু মানবের এই স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঘূর্ণায়মান কাল-চক্রের আবর্ত্তন মুহূর্ত্তের জন্যও মন্দীভূত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষের উপর দিয়া কাল-চক্রের আবার একটি আবর্ত্তন শেষ হইয়া গেল! চন্দ্র সূর্য্য কতবার উঠিল ডুবিল—বঙ্গের বক্ষে কত ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইল—অন্নকষ্ট জলকষ্টের দারুণ দাবানলে সোণার বঙ্গ ছারখার হইয়া গেল! গত শরতের পর শীতাতপ বসন্ত বর্ষা অতিক্রম করিয়া আবার জ্যোৎস্নামাখা শরৎ আসিয়া বঙ্গের শালিলতাসমাচ্ছন্ন শ্যামল প্রান্তর-পথে পদার্পণ করিল। শরতের আগমনে জলে স্থলে নানাবিধ কুসুম-রাশি হাসিয়া উঠিল—ভ্রমর ছুটিল--পাখী ডাকিল! বর্ষাবারিবিধৌত মেঘমুক্ত নীলাকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! জলে, স্থলে, ব্যোমে—সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে এক অভিনব সুষুমার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল!

শরদাগমনের এই শুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গের বিশাল বক্ষে মহামহোৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিল—ভ্রমর ছুটিল! বিশ্বমাঝে প্রচারিত হইল—বঙ্গে দুর্গোৎসব! নৈশাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ উজ্জ্বল বক্ষ বিস্তৃত করিয়া প্রচার করিতে লাগিল—বঙ্গে দুর্গোৎসব! ঊষার পীতাঞ্চল-পতাকা সঞ্চালিত হইয়া ঘোষণা করিতে লাগিল—বঙ্গে দুর্গোৎসব! মুক্তবক্ষ প্রভাত আসিয়া সুপ্তোত্থিতের কর্ণরন্ধ্রে কহিতে লাগিল—বঙ্গে দুর্গোৎসব! শান্ত সৌম্য সান্ধ্য-সমীরণে মর্ম্মরায়মান কাননকুঞ্জে ধ্বনিত হইল—বঙ্গে দুর্গোৎসব! বঙ্গবাসী আজ এক বৎসর পরে আবার বুঝিল—বঙ্গে দুর্গোৎসব! তাই কর্ম্ম-পিষ্ট,চিন্তাক্লিষ্ট মানসমন্দিরে আবার উৎসাহের নবীন-সিংহাসন সংস্থাপন করিল;—আশা, সেই সিংহাসনে সিংহ-বাহিনী জগজ্জননী—দুঃখ-দৈন্য-সন্তাপ-পাপহারিণী-মাতৃ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রাণ ভরিয়া মনের সাধে একবার "মা" বলিয়া ডাকিবে!—মহামহিমাময়ী রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইয়া একবার মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া

"মা" বলিয়া ডাকিবে!—অন্নপূর্ণার আদরের পুত্রগণ আপনাদিগের অপূর্ণ দগ্ধোদর দেখাইয়া আব্দার করিয়া একবার উচ্চকণ্ঠে—"মা" বলিয়া ডাকিবে!

আশাই মানবের আয়ু। আশার সূক্ষ্মসূত্র ছিন্ন হইলেই মানবের আয়ুর অবসান হয়। আজ এই শারদীয়-শুভ্রোজ্জ্বল-প্রভাতের সঙ্গে এক নবীন আশা বাঙ্গালীর নির্জ্জীব প্রাণে চেতনার স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। তাই বাঙ্গালার কোটি কোটি অবসন্ন হৃদয় আজ জাগিয়াছে—তাই বাঙ্গালীর হৃদয়ে হৃদয়ে আজ বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইয়াছে! এই চেতনাপূর্ণ নবীন আশার কুহক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী আজ জাতীয় উৎসবে উন্মত্ত হইয়াছে।

এ উৎসব আজ নূতন নহে। সুদূর অতীতের কোলে এই উৎসবের বিকাশ—যুগযুগান্তের কোন পুণ্য প্রভাতে মাতৃপূজার এই বিরাট আয়োজন! বাঙ্গালী পৌরাণিক-স্মৃতি বুকে করিয়া অদ্যাপি এই মাতৃপূজার মহোৎসবে উন্মত্ত! একদিন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেরই রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ—আত্মীয়রূপী শত্রু-বিতাড়িত-সুরথ, মহর্ষি মেধসের কৃপায় মাতৃপূজায় লুপ্তগৌরবের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! তা'রপর আর একদিন, সাগর বেষ্টিত স্বর্ণলঙ্কার বেলাভূমিতে শক্তিহারা রামচন্দ্র এই মাতৃপূজারূপ মহাযজ্ঞের আয়ো-জন করিয়া শক্তিরূপিণী সীতাদেবীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন! তা'রপর ব্রজধামে আর একদিন, গোপীগণ মাতৃপূজার অনুষ্ঠান করিয়া চিরবাঞ্ছিত জনের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন! তাই বলি, এ উৎসব আজ নূতন নহে, পুরা-তন। বুঝি পুরাতনেরও পুরাতন! সেই পুরাতন স্মৃতির মাঝে উজ্জ্বল-অক্ষরে মহাকাল যেন লিখিয়া রাখিয়াছেন, এই মাতৃপূজায় তন্ময়-সাধক শত্রু বিজয়ী হইতে পারেন, নষ্ট সম্পদ পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, অপহৃত আত্ম-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন; সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। বঙ্গবাসী সাধকবৃন্দ! তোমরা আজ মাতৃপূজায় কোন্ কামনা পূর্ণ করিতে চাও?

হউক পুরাতন! তথাপি যেন এ মাতৃপূজার মহামহোৎসব "নিতুই নব।" নবীন না হ'লে এত মত্ততা কি পুরাতনের থাকে? এসো ভাই, আমরাও পুরাতনকে পশ্চাতে রাখিয়া—তা'র স্মৃতিমাত্র বুকে করিয়া নূতনের দিকে অগ্রসর হই। নূতনের আশাপূর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহারই শান্ত সৌম্য কর্ম্ম-কুশল আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া মাতৃপূজার মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করি, সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় নবজীবন প্রাপ্ত হইব! ঐ দেখ দশদিক আলোকিত করিয়া নানা শস্ত্রাস্ত্রধারিণী দৈত্যদলনী দশভুজা মাতৃমূর্ত্তি!

ক্ষুদ্র আমরা, উপেক্ষিত আমরা, নিপীড়িত আমরা ঐ সিংহবাহিনী মহাশক্তিরই প্রিয়-সন্তান। আমরা আজ মাতৃমহিমা বিস্মৃত হইয়াছি, মাতৃসেবায় অনাদর করিয়াছি, মাতৃনামে শ্রদ্ধা হরাইয়াছি, তাই এখন আমাদের এই দুর্দশা! তাই আজ আমরা অন্নের কাঙ্গাল—বস্ত্রের কাঙ্গাল—ধনের কাঙ্গাল—মানের কাঙ্গাল! চল ভাই মাতৃমন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আবার আমরা সকল ভ্রাতা সম্মিলিত হই। আমাদের সম্মিলিত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে মাতৃমহিমার বিজয়গাথা উচ্চারিত হউক—আমাদের কোটি কোটি হস্ত মাতৃসেবার পুণ্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হউক, শিবানী শুভদৃষ্টি করিবেন, আমাদের দুঃখ, দৈন্য অন্তর্হিত হইবে। মায়ের কৃপা হইলে, আমরা ঐ মহাশক্তির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার পাইব। এসো ভাই, বিদেশের বিলাস-দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া মাতৃ-সম্মুখে এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হই, একপন্থা অবলম্বন করি। এসো ভাই, আবার আমরা মায়ের ছেলে হইয়া, মাতৃচরণেই আশ্রয় গ্রহণ করি। একদিন সৌভাগ্যভ্রষ্ট, স্বর্গচ্যুত দেবগণ দৈত্যভয়ে ঐ মহামহিমাময়ী মাতৃচরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন দেবগণ মিলনের মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাশক্তির প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। যতদিন দেবগণের একতার অভাব ছিল, ততদিন মাতা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েন নাই। যখন দেবগণ এক উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সমবেত শক্তি হইতে মহাশক্তিরূপিণী মাতৃমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। তা'রপর দেবগণের হিতার্থে, দুষ্ট মহিষাসুরের বধার্থে ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে মাতা রণাঙ্গণে অবতীর্ণা হইলেন। মাতৃমহিমায় মহিষাসুরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। একদিন দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া এই মহাশক্তিই কহিয়াছিলেন,—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তাই বলি, মায়ের সকল সন্তান একত্রে যদি মাকে "মা" বলিয়া ডাকি, তাহা হইলে মায়ের ঐ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতেই চিন্ময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইবে!

ঐ দেখ ভাই, পুরোহিত তন্ময়চিত্তে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন,—

"আয়ু রক্ষতু বারাহী ধর্ম্মংরক্ষতু পার্ব্বতী।
যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদারক্ষত বৈষ্ণবী॥"

এই পৌরাণিক প্রার্থনা-মন্ত্র কি কেবল ব্যক্তিবিশেষের জন্য রচিত?

এই প্রার্থনা-মন্ত্র কি কেবল এক জনের কল্যাণ কামনাতেই পঠিত? বোধ হয় তাহা নহে। এ মন্ত্র সমস্ত দেশের জন্য—সমস্ত জাতির জন্য! এ প্রার্থনা সমস্ত মাতৃভক্ত সন্তানের মঙ্গলের জন্য! আয়ু, ধর্ম্ম, যশঃ, কীর্ত্তি, ধনরক্ষার্থে মাতৃচরণে শরণ লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? তবে এসো ভাই, শান্তোজ্জ্বল আকাশ-তলে, শ্যামল শালিলতা সমাকীর্ণ প্রান্তর বক্ষে, কাশ-পুষ্প-পরিচ্ছদাবৃত তটবেষ্টিত কল্লোলনাদিনী নদীকূলে, মাতৃমন্দিরের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া, আ'জ আমরা মায়ের সকল সন্তান সমস্বরে যুক্তকরে মাতৃসমীপে দেশের দুঃখের কথা, দশের দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করি। দয়াময়ী, করুণাময়ী, স্নেহময়ী মা, আমাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিবেন। তাঁহার করুণা-দৃষ্টিতে মেঘনির্ম্মুক্ত নীলাকাশে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয় হইবে। নবোদিত সুখ-সূর্য্যের কিরণমালায় দুঃখান্ধকার দূরে পলায়ন করিবে।

আজ এই মহাশক্তির মহামহোৎসবের সন্ধিক্ষণে মাতৃসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, এসো ভাই কেবল ডাকি—"বন্দেমাতরম্!" রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, অত্যাচার, উৎপীড়ন সব ভুলিয়া কোটি কণ্ঠে; কণ্ঠমিলাইয়া কেবল ডাকি—"বন্দে মাতরম্!" শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসের পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চবটী।

"পঞ্চবটী" "দণ্ডকারণ্যে" একটী অংশবিশেষ। যিনি একবার অনন্য অন্তঃকরণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চির-লীলাভূমি পুণ্যময়ী "পঞ্চবটী" দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, রঘুকুলমণি "রামচন্দ্র" প্রাণ-প্রিয়তমা বনিতা "সীতা" দেবীর বনবাস-ক্লেশ নিরাকরণ জন্য, কেন ঐ স্থান মনোনীত করিয়া বনবাস-কাল অতিবাহিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। "পঞ্চবটীতে" প্রকৃতিদেবী আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শন করিয়া যে রাজ্যসুখ বিস্মরণ হইতে হইবে; তাহা আশ্চর্য্য নহে। "পঞ্চবটীর" পাদপকুটীরের পর্ণশয্যা, মর্ম্মর নির্ম্মিত শ্বেতো-জ্জ্বল সৌধের সুরঞ্জিত কক্ষস্থিত সুকোমল শয্যা অপেক্ষা সুখপ্রদ; এবং বন্য-কুসুম-সুরভি-সিক্ত সমীরণ, গোলাপজল মাখা "ইলেকট্রী ফ্যান"-প্রহত সমীরণ

অপেক্ষা স্নিগ্ধ ও সুশীতল। বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের পূর্ণচন্দ্র "মাইকেল মধুসূদন" "পঞ্চবটীর" অতল সৌন্দর্য্য-সাগরের উত্তাল-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া একছত্রে বর্ণনা শেষ করিয়াই পলায়ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। "পঞ্চবটী বনচর মধু নিরবধি" তাঁহার সেই সংক্ষেপোক্তি সম্পূর্ণ সত্য ও সার্থক। রামায়ণ হইতে "পঞ্চবটী" বাদ দিলে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ বিকল হইবে সন্দেহ নাই।

"নাসিকা" ষ্টেশনে নামিয়া একজন পাণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই পাণ্ডার সাহায্যেই সমস্ত দেখিতে হইল। ঐ সকল স্থানের হরিৎ শোভা সমন্বিত প্রান্তর দেখিলে বাঙ্গালাদেশ বলিয়া ভ্রম হয়। "গোদাবরী" নদীর অপর তীরে "দণ্ডকারণ্য"। ষ্টেশন হইতে সহর পাঁচ মাইল ব্যবধান। আরও কিছুদূরে তীর্থ স্থান, "গোদাবরী" নদী ও "গঙ্গাপুরের" মন্দির সমূহ। কুড়ি মাইল দূরে "গোদাবরীর" উৎপত্তি স্থান, "লেক্সা" গুহা ইত্যাদি। গোদাবরী পার হইয়া "দণ্ডকারণ্যে" প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, "দণ্ডক" অরণ্য নহে—রীতিমত 'সহর।' নদীগর্ভ কেবল প্রস্তর দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ সকল প্রস্তর কাটিয়া স্থানে স্থানে কূপ প্রস্তুত করা রহিয়াছে। কূপগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এক কূপ হইতে অন্য কূপে জল যাতায়াত করিবার উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী আছে। মৃদু-কুলুকুলু-স্বনে কূপ হইতে কূপান্তরে জল প্রবেশ করিতেছে;—বোধ হইতেছে যেন, 'পাতালবাসিনী নাগবালাগণের সুমধুর সঙ্গীত-লহরী নদীর তলদেশ ভেদ করিয়া উঠিতেছে।' প্রথমে আমরা একটী মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পাণ্ডা বলিল, "এই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ সীতা অবস্থান করিয়াছিলেন।" অদূরেই আর একটী মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখে একজন বিভূতিভূষণ সন্ন্যাসী নিমীলিত নেত্রে যাত্রীসমাগম ধ্যান করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার ইষ্টদেবের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিলাম। তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর বলিলেন, "এই বিগ্রহের নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই পূর্ণ হইবে।" আমি প্রার্থনা করিলাম—"এই পুণ্যময় ক্ষেত্রে আমার পাপ-জীবনের অবসান হউক।" তৎপরে প্রায় এক মাস গত হইল এ পর্য্যন্ত আমার সেই সকাতর প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। আমার প্রার্থনা পূর্ণ না হইলেও সন্ন্যাসীর প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমরা তিন জনে তাহাকে ছয় পয়সার কম দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই।

একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে "সীতা" দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরটী

একে অন্ধকার, তাহাতে আবার এতই ক্ষুদ্র যে, দুইটী লোক একযোগে প্রবেশ করিতে, অথবা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। সীতাদেবীকে নাকি এই অন্ধকূপে লুকাইয়া রাখা হইত। পাণ্ডার এই প্রকার বিজ্ঞতা দর্শনে রাধারমণ বাবু নানারূপ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে বলিলেন, "রামচন্দ্রের ন্যায় বহুদর্শী ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য সীতাদেবীকে এই প্রকার নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখা কর্ত্তব্যই হইয়াছিল।" আবার পাণ্ডাকে বলিলেন, "তোমার যদি ত্রেতাযুগে জন্ম হইত তাহা হইলে, বেচারা বাল্মীকির অনেক সাহায্য হইত, এবং রামায়ণও নির্ভুল হইত।"

এই স্থান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে আর একটী বন দেখিতে যাই। পাণ্ডা বলিল, "এই স্থানে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত বিনাশের জন্য তপস্যা করিয়াছিল।" স্থানটি যেন বনদেবীর গুপ্ত ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার। এক স্থানে পাঁচটি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষে প্রকৃতির কারুকার্য্য খচিত মনোমোহন অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বট বৃক্ষ পাঁচটি অতি পুরাতন। চতুর্দ্দিকে শ্যামল পল্লবাবৃত নানাজাতীয় বৃক্ষে অসংখ্য অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণে হেলিতেছে—দুলিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া অনিল প্রবাহ সাঁ সাঁ শব্দে সুবাস বিতরণ করিবার জন্য দিগ্‌দিগন্তে গমন করিতেছে। লাবণ্যময়ী লতিকাদল হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। পাদপশ্রেণীর মধ্য দিয়া ময়ূর ময়ূরী, মৃগশাবকগণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। এক পার্শ্ব দিয়া খরস্রোতা গোদাবরী আনন্দে কুল্ কুল্ করিয়া রামায়ণের হৃদয় স্পর্শী সঙ্গীত গাইতে গাইতে—কে জানে কোন্ অনন্তরাজ্যের উদ্দেশে চলিয়াছে? মধুপগণের সুমধুর গুন্ গুন্ স্বর, পিকগণের ললিত তান, তটিনীর তর্ তর্ শব্দ মিলিয়া কি অনির্ব্বচনীয় অমিয় সঙ্গীতলহরী চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিতেছে; শ্রবণ করিয়া প্রাণ মন মোহিত হইল। আমার বিশ্বাস এই বনই প্রকৃত পঞ্চবটী। স্বভাবের মনোমোহিনী শোভা দর্শন করিতে করিতে অন্তর-নয়ন বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোন সৌন্দর্য্যময় জগতে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মীস্বরূপা সীতাদেবীর পুষ্পচয়ন, গোদাবরী স্নান, ময়ূর ময়ূরী মৃগশিশুগণ সহ ক্রীড়া;—স্বামীর সহিত পর্ব্বতারোহণ ইত্যাদি, রামায়ণের কত চারুচিত্র দর্শন করিতে করিতে অতীত সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িলাম। আবার সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দ্রের শোকপূর্ণ চিত্র হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল। যে স্থান এক দিন রামসীতার পদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছে, সেই পুণ্যভূমির পবিত্র মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া নরজন্ম সার্থক বোধ করিলাম। শেষে

একার মর্ম্মস্পর্শী ঝাঁকিতে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; একা আমাদিগকে স্কন্ধে করিয়া দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছে।

পরদিন "ত্রিম্বকে" গিয়াছিলাম। ঐ স্থান হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়াছে। 'শিবের জটা হইতে গোদাবরীর উৎপত্তি' ইহাই প্রবাদ আছে। বাস্তবিক "ত্রিম্বকে" পর্ব্বতের সম্মুখভাগ একটী প্রকাণ্ড হস্তীশুণ্ড অথবা জটার মতই দেখা যায়। ঐ স্থানের পর্ব্বতগাত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণাগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। নদীর গভীরতা সেখানে নিতান্ত অল্প, কিন্তু স্রোত অতি প্রখর। পর্ব্বতগাত্রে খোদিত দুইটি গুহা ব্যতীত দর্শনযোগ্য আর বিশেষ কিছু নাই। ওখান হইতে "আরাবলী"—পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। "পঞ্চবটীর" মোহিনী মাধুরী দেখিয়া শৈলরাজ নির্ব্বাক, নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বহু সন্ন্যাসী সাগ্নিক-গঞ্জিকাধার সম্মুখে করিয়া চতুর্ব্বর্গের ফললাভের আয়োজন করিতেছে। একজন সন্ন্যাসী আমাদের সহিত ইংরেজিতে আলাপ আরম্ভ করিল। রাধারমণ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা জানি, শ্বেতাঙ্গ-উপাসনায় ইংরেজি বিশেষ প্রয়োজন; ঈশ্বর-উপাসনায়ও কি সেইরূপ?"

একায় চড়িয়া যাতায়াত করা যে কত সুখ, তাহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম; তবে আর এত দর্শনের সখ হইত না। "ত্রিম্বক" হইতে আসিবার সময় একার ঝাঁকিতে 'প্রাণ যায় যায়' হইয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া আমি তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িলাম। রাধারমণ বাবু জিনিষ-পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। পরদিন প্রাতে বম্বে রওনা হইতে হইবে বলিয়া তিনি সমস্ত শেষ করিয়া পাণ্ডা বিদায়ের পালা আরম্ভ করিলেন। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; উভয়ের বীররস অভিনয়ের সময় তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। পাণ্ডা যে করুণরসের ফোয়ারা ছুটাইয়া ষ্টেশন হইতে আনিয়াছিল; দেখিলাম তাহা রুদ্ররসে পরিণত হইয়াছে। রাধারমণ বাবুকে থামাইয়া আমি বহুকষ্টে তাহার সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিলাম। দক্ষিণা যেরূপ দিবার কথা ছিল; তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী দিতে হইল। যাহা হউক আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছি। পাণ্ডা মহাশয় 'ইহকালের অতুল-ঐশ্বর্য্য, এবং পরকালের অক্ষয়-স্বর্গ' অতি শীঘ্র আমাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর বাহাদুরের নিকট Urgent Telegram করিয়াছেন। তাহাতে ইহাও উল্লেখ আছে, 'রাধারমণ বাবুকে সঙ্গে করিয়া তীর্থস্থান ভ্রমণ করিলে ঐ আদেশের প্রত্যাহার করা হইবে।' ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মন্দাকিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদাবাদ।

পাঠক! বঙ্গবিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদে একবার যাইতে হইবে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজুদ্দৌলার সময়ে ত্রিদিব-লাঞ্ছিত মুর্শিদাবাদের শোভা বর্ণনা করা আমাদিগের সাধ্যাতীত। সিরাজুদ্দৌলা স্বনামের সার্থকতা সম্পাদনার্থ মুর্শিদাবাদকে বোধ হয় ঐশ্বর্য্য-প্রদীপ করিয়াছেন। যৌবনের বিলাস-বিভ্রম, ঐশ্বর্য্য-গরিমা, কামিনীকাঞ্চনানুরাগ, মুশলমান নবাবসুলভ সুখলিপ্সা ও নিজের ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনেচ্ছা সিরাজুদ্দৌলা-চরিত্রে অভাব ছিল না। সুতরাং তাঁহার শাসন-সময়ে মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্য্য যে অলৌকিক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

যে মুর্শিদাবাদে অহোরাত্র আমোদলহরী প্রবাহিত হইত, সেই মুর্শিদাবাদ আজি নীরব কেন? "ররাব, বীণা, মুরজী মুরলীর" মধুর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে না কেন? বাঁশী, সেতার, এসরাজ, সারেঙ্গ, তবলা প্রভৃতির মনঃপ্রাণহারী এবং মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছেনা কেন? নর্ত্তকীদিগের হাবভাবময় নৃত্যসমুদ্ভূত নূপুর নিক্বণ ও মধুরকণ্ঠ নিঃসৃত সুরলহরী আর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না কেন? রজনী সমাগমে যে মুর্শিদাবাদ বিলাসের নিকেতন হইত, যেখানে আমোদ-প্রমোদের স্রোত ছুটিত, সেখানে আজি উৎকণ্ঠা, চিন্তা বিদ্যমান কেন? সে বাদ্যধ্বনিমুখরিত নগরী আজি নীরব-নিস্পন্দ কেন?

সিরাজুদ্দৌলা আজি নৃত্যগীতে মত্ত নহেন—কতিপয় বিশ্বস্ত ওমরাও লইয়া পরামর্শে ব্যস্ত। করিম ইঁহাদিগের অন্যতম। সভায় এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

সিরাজ। ফিরিঙ্গীদের বড়ই স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। আমার অজ্ঞাতে কলিকাতায় দুর্গ-সংস্কার করিয়াছে—আমার অমতে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়াছে। ফিরিঙ্গীদের এদেশ হইতে না তাড়াইলে নহে।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনার সকল কথাই সত্য। ফিরিঙ্গীচরিত্র হুজুর পূর্ব্বাবধি অবগত আছেন।

করিম। উমিচাঁদ ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিতেছে। সাহামসা যেরূপ দুর্গাদাস রায়ের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ উমিচাঁদকে দণ্ডিত করা আবশ্যক।

সি। না-না, তাহা হইবে না। উমিচাঁদ কৃষ্ণদাসকে অতিথিস্বরূপ আশ্রয় দিলেও তাঁহাকে আমি শত্রু বিবেচনা করি না। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি খাঁর সময় হইতে আমি তাহাকে জানি। সে ন্যায়পরায়ণ, নির্ভীক, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। ঐরূপ ব্যক্তিকে সহসা শত্রু পর্য্যায়ভুক্ত করা কোনমতেই উচিত নহে।

ক। খোদাবন্দ! গুস্তাকী মাফ করিবেন। আমি উমিচাঁদকে পথের ভিখারী করিতে বলি না। তবে লোকটাকে হাতে রাখা উচিত। আমার নিবেদন, আমরা কলিকাতা আক্রমণ করিতে যাইলে পাছে উমিচাঁদ ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করে, এই নিমিত্ত তাহার ভ্রাতা দীপচাঁদকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

সি। এ পরামর্শ মন্দ নহে। অদ্যই উমিচাঁদের নিকট সংবাদ পাঠান হউক, সে যেন দীপচাঁদকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেয়।

২য় ওমরাও। জাহাঁপনার আদেশ মত এখনই সংবাদ প্রেরিত হইবে।

ক। আমার প্রার্থনা, ঢাকা আক্রমণের পূর্ব্বেই কলিকাতা আক্রমণ-পূর্ব্বক ফিরিঙ্গীর প্রতি যথাবিহিত দণ্ড-বিধান করা হউক। নতুবা কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদের চেষ্টায় ফিরিঙ্গী ঢাকাতেও শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিতে পারে।

সি। করিমের পরামর্শই গ্রহণীয়। ফিরিঙ্গীর দমন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ঢাকাবাহিনী কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইবে।

মির্জাফর। অধীনের এক আরজ আছে। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের বিরুদ্ধাচরণ অথবা অনভিমতে কার্য্য করিলে ফিরিঙ্গীকে অবশ্যই দণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য। কিন্তু হুজুর! এসম্বন্ধে একটু বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে বোধ হয় ভাল হয়। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসীর সহিত প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। বাঙ্গালায় ফরাসীর বল এখনও ইংরেজের নিকট হতবল হয় নাই। ইংরেজকে যদি একান্তই দমন করিতে হয়, তাহা হইলে কণ্টক-দ্বারা কণ্টকোদ্ধার করাই শ্রেয়ঃ। নবাবের যাঁহারা বিশ্বস্ত প্রজা, তাঁহাদিগকে অকারণে দণ্ডিত করিয়া শত্রুবৃদ্ধি করা উচিত কি?

সি। সেনাপতি! কাহার কথা বলিতেছ?

মি। জাহাঁপনা! দুর্গাদাস রায়ের কথাই বলিতেছি। দুর্গাদাস ধনী

মানী, জ্ঞানী ও গুণী। তাহার ধনাগার পূর্ণ ছিল—তাহার লোকবলও কম ছিল না। যাহার বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ আছে—যে সর্ব্বজনপ্রিয়, এবং ঐশ্বর্য্যশালী, হিন্দু-সমাজে যাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, তাহাকে অকারণে পথের ভিখারী করিয়া প্রজাবর্গের বিরাগভাজন হওয়া কি উচিত ছিল?

ক। (ত্রস্তে) সেনাপতি মহাশয়ের কথায় প্রতিবাদ করি, এরূপ ক্ষমতা ও সাহস আমার নাই। তবে অনুমতি করিলে, এ দাস এসম্বন্ধে কিছু বলিতে সাহস করে।

সি। তোমার বক্তব্য কি?

ক। খোদাবন্দ! ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত সেনাপতি মহোদয় সম্ভবতঃ ইংরেজকে ভয় করিতেছেন। নতুবা তিনি মুষ্টিমেয় ইংরেজ দমনের নিমিত্ত সুবে বাঙ্গালার নবাবকে হীন-কৌশল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিবেন কেন? ফরাসীর সাহায্যে আমরা ইংরেজকে দমন করিব কেন? আমাদিগের বাহুবীর্য্য কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? প্রভু যদি আদেশ করেনত এ দাস চারি সহস্র সৈন্য লইয়া ইংরেজকে বঙ্গবিহার উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিতে পারে। তাহার পর দুর্গাদাস রায়ের কথা। সেনাপতি মহাশয় বোধ হয় দুর্গাদাস রায়ের সহিত পরিচিত নহেন। নতুবা তাহার চতুরতা, কৌশল ও ষড়যন্ত্রাদির কথা পরিজ্ঞাত হইতেন। অধম দুর্গাদাসকে চিনে ও জানে। ইংরেজের সহিত কার্য্যসূত্রে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। আবশ্যক হইলে সে নবাবের শত্রুতা করিতে পশ্চাৎপদ্ হইবে না।

সি। এসম্বন্ধে আপাততঃ বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। যাহা হইবার হইয়াছে। ইংরেজ দমনের পর দুর্গাদাসকে যদি নির্দ্দোষ বুঝা যায়, তাহা হইলে তখন তৎসম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য বিহিত করা যাইবে। ভরসা করি, সেনাপতি মহাশয় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হইবেন।

সিরাজুদ্দৌলার বাক্যাবসানে সকলেই নবাবকে নতশিরে অভিবাদন করিলেন। সে দিবসের জন্য সভা ভঙ্গ হইল। ইংরেজ অভিযানের জন্য সকলেই ত্বরান্বিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রে।

মহাপুরুষ চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্গাদাস রায়ের সংজ্ঞালাভ হইল। মহাপুরুষের কথা তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীতি হইল। দুর্গাদাস নানারূপ

চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে তাঁহার দুই পুত্র ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা মুর্শিদাবাদে মীরজাফর খাঁর নিকট গমন করিয়াছিল। মিরজাফর খাঁ দুর্গাদাসকে চিনিতেন ও ভালবাসিতেন। তিনি দুর্গাদাসের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। যাহাতে নবাবের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তজ্জন্য দুর্গাদাস রায় তাঁহার পুত্রদ্বয়কে মিরজাফর খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্গাদাস স্বয়ং মুর্শিদাবাদে কিছুতেই যাইতে পারিলেন না। করিমের উপর তথা সিরাজুদ্দৌলার উপর তাঁহার ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইয়াছিল। তাই তিনি পুত্রদ্বয়কে পাঠাইয়াছিলেন।

পথে পিতা পুত্রে কোন কথা হইল না। বাটীতে আসিয়া স্ত্রী ও কন্যার সম্মুখে দুর্গাদাস জ্যেষ্ঠপুত্র ধীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব তোমাদের যত্ন করিয়াছিলেন কি?"

ধী। "যত্নের ত্রুটী হয় নাই। তিনি আমাদের বিপদের কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। নবাবকে বুঝাইয়া যাহাতে আমরা পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হই, তৎসাধনে তিনি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। অবশেষে অদ্যও নবাব সমীপে আমাদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না"—বীরেন্দ্রের মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না—সে অজস্র ধারে কাঁদিতে লাগিল; পরে বহুকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল—"করিম খাঁয়ই আমাদিগের শত্রুতাচরণ করিতেছে।"

করিম খাঁর নাম হইবামাত্রই কমলা, লীলাবতী ও মাধবী শিহরিয়া উঠিল, দুর্গাদাস দন্তদ্বারা ওষ্ঠ নিপীড়ন করিতে করিতে বজ্রমুষ্টিতে কোষস্থিত অসি ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই ভাব সন্দর্শন করিয়া সকলেই ভীত হইল—কমলা তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। হায়! দুর্গাদাস! বৈরনির্য্যাতনে এত ব্যাঘাত!

প্রথম ভাবাবেগ তিরোহিত হইবার পর দুর্গাদাস প্রকৃতস্থ হইলেন। পুত্র কলত্রাদির গ্রাসাচ্ছাদনের যে আর কোন উপায় নাই, তাহা চিন্তা করিয়াই তিনি আকুল হইলেন। দেবীপুরে কে না তাঁহার নিকট উপকৃত? কিন্তু তিনি কি কাহার নিকট প্রত্যুপকারপ্রার্থী হইতে পারেন? তিনি কি কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে পারেন? যিনি একদিন দেবীপুরের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন—যাঁহাকে দেবীপুরের লোক দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে, তিনি

কি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া লোকের দ্বারে দণ্ডায়মান হইতে পারেন? হিন্দুর এই আত্মসম্মান-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থা-বিশেষে রাজমুকুটধারী পর্ণকুটীরবাসী হইতে পারেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোকের ন্যায় হিন্দু মান-সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিতে পারে না। হিন্দু বলে "যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।"

দুর্গাদাস রায় পুত্র কন্যাকে গৃহান্তরে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন। তাহারা প্রস্থান করিলে কমলা, প্রেমপূর্ণ অথচ ভক্তি গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "কণ্ঠরত্ন! সমস্ত রাত্রি কি অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় যাইবে? গৃহে একটু দুগ্ধ আছে, পান করিয়া শয়ন কর।"

দুর্গাদাস প্রথমে কিছুতেই দুগ্ধ পান করিতে সম্মত হইলেন না, অবশেষে ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দুগ্ধপান করিয়া শয়ন করিলেন, কমলা তাঁহার পদ সেবা করিতে লাগিলেন। দুর্গাদাস বলিলেন "কমলে! তুমি চিন্তা দূর করিতে বলিতেছ, কিন্তু এ চিন্তা কি দুর্ণিবার নহে? যাহার ঘরে অন্ন নাই, মানসম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হইয়াছে, নিদ্রাদেবী কি তাহার উপর দয়া প্রকাশ করিতে পারেন? কাল তোমরা কি খাইবে, তাহার সংস্থান নাই। ইহার উপর পাপিষ্ঠ করিম নানারূপে আমার শত্রুতাসাধন করিয়া এখনও জীবিত আছে। আমি কি এ সকল কারণে জীবন্মৃত হই নাই?

কমলা। সকলই জানি। কিন্তু এইরূপে চিন্তা করিলে কয়দিন শরীর থাকিবে? তুমি অসুস্থ হইলে সংসার কি একেবারে অন্ধকার হইবে না? তুমি জ্ঞানী, আমি সহজেই অবলা অজ্ঞান, তোমাকে কি বুঝাইব? বিপদে ধৈর্য্য-ধারণ করিতে, প্রভো! তুমিই ত উপদেশ দিয়া থাক? তুমিই ত আমাকে চিন্তাকুল দেখিলে বলিয়া থাক, ভগবানে অটল বিশ্বাস ও ভক্তিই বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়। তুমি স্বামী—দেবতা। হিন্দু-রমণী অন্য দেবতা জানে না—স্বামীকেই প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করে। সুতরাং তোমার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, আমি সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। প্রভো! নিজে জ্ঞানী হইয়া তবে বিপদে বিচলিত হও কেন?

দুর্গাদাস। সত্য কমলে! বিপদে মধুসূদন ব্যতীত আর উদ্ধার করিবার কেহই নাই। সকলই জানি, সকলই বুঝি, কিন্তু সময়ে সময়ে মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। আমরা অল্পবুদ্ধি, ক্ষীণমতি মানব, ভগবৎচরণে অটল অচল বিশ্বাস রাখিতে পারি না। যখন তোমাদিগের মুখের দিকে চাহি, যখন দরিদ্রতার ভীষণ

নিষ্পেষণে তোমরা পীড়িত হইতেছ দেখি, তখন আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হয়—পৃথিবী শূন্যময় দেখিতে থাকি। জান কি কমলা! অদ্য উন্মত্ত হইয়া জাহ্নবী সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলাম? কিন্তু পারিলাম না। এক মহাপুরুষ আসিয়া বাধা দিলেন। তদবধি আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছে—সংসারের অনেক কাজ এখনও বাকী আছে, মরা এখন হইবে না। করিম—পাপিষ্ঠ করিম—এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহাকে নিধন না করিয়া মরিলে আমার মৃত্যুতেও সুখ হইবে না।

কমলা। পাপিষ্ঠের স্পর্দ্ধা কম নহে। সে যবন হইয়া আমার স্বর্ণলতিকা লীলাবতীকে গ্রহণ করিতে চাহে। উহার জিহ্বা খসিয়া যাউক। ভগবান উহার পাপের শাস্তি দান করিবেন।

দুর্গাদাস। "আমি যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি উহাকে ইহার প্রতিশোধ দিবই দিব" বলিতে বলিতে দুর্গাদাস রায়ের বদনমণ্ডল আবার আরক্তিম হইল, ক্রোধে নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। দুর্গাদাস রায় অস্থির হইয়া গৃহে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল মৌনভাবে অতিবাহিত করিয়া বলিলেন,—"আমার বড় সাধের অঙ্গুরীয়—পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল—অদ্য বিক্রয়ার্থ জগৎ সেঠের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। এত দিবস এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, অনেক সময়ে তাহা বিক্রয় করিব মনে করিয়াছি, কিন্তু তোমার অনুরোধে বিক্রয় করিতে পারি নাই—সেই অঙ্গুরীয় বিক্রয় না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। কমলে! আর যে কোন উপায় নাই! আহারাভাবে পুত্র-কন্যাদি ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিবে, তাহা কি আমি দেখিতে পারিব? ঋণ যথেষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া—অনশনে পুত্র-কলত্রাদির মৃত্যু চক্ষের সম্মুখে হইবে দেখিতে পারিব না বলিয়া—তোমার নিষেধ সত্ত্বেও—পূর্ব্বপুরুষদিগের একমাত্র স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ সেই অঙ্গুরী বিক্রয়ার্থ প্রেরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমলে ইহার জন্য ক্ষমা করিও।"

কমলা জানিতেন, দুর্গাদাস সেই অঙ্গুরীটীকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করিতেন। তিনি হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যে উহা বিক্রয় করিতে দিয়াছেন, কমলা তাহা বুঝিলেন। পাছে স্বামী মর্ম্মে ব্যথা পান, এই জন্যই কমলা অঙ্গুরীটী বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি আর কিছু বলিতে পারিলেন না—এই সংবাদে মাত্র নীরবে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অজাগর দ্রাক্ষালতা।

আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালিফোর্ণিয়ার সন্নিকটে সান্তা-বারবারা (Santa Barbara) নামক পল্লীতে অনেক খৃষ্টিয় সন্ন্যাসীদিগের বাস। এই স্থান নানাবিধ কুসুমরাজিতে নিরন্তর সজ্জিত ও সুবাসিত। সান্তা-বারবারা পুরাতন দ্রাক্ষালতার জন্যও বিখ্যাত। এই স্থানে একটী অতি প্রাচীন দ্রাক্ষালতা ছিল।

যুক্ত-রাজ্যের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই অজাগর দ্রাক্ষালতা কর্ত্তিত হইয়া ফিলাডেল্‌ফিয়ার মহা মেলায় প্রেরিত হয়। সান্তা-বারবারায় উক্ত প্রাচীন চিহ্ন বিনষ্ট করাতে স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়—অনেকে ক্ষুব্ধ হয়। পরে যখন প্রচারিত হইল যে, উক্ত লতা বার্দ্ধক্য হেতু মরণোন্মুখ হইয়াই ছিল, মানুষে তাহার মৃত্যু সাধিত করিয়াছে মাত্র, তখন লোকের মনে অনেকটা শান্তি আইসে—লোকগণ সান্ত্বনা লাভ করে।

উক্ত প্রাচীন উদ্ভিদ যে কত কালের তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে অনেকের বিশ্বাস যে, উহার বয়ঃক্রম শতাধিক বৎসরের অধিক হইবে। উহার মূল কাণ্ডের বেড়,—চারিফুট এবং লতার বিস্তৃতি,—প্রায় ৭৫ বর্গফুট। স্বাভাবিক কারণে—অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধি হেতু যে উহার স্বাস্থ্যভগ্ন হইয়াছিল; তাহা নহে। উহার সান্নিধ্যে এক নির্ঝরিণী ছিল। এবং তাহারই গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্রাক্ষার গোড়া হইতে ক্রমে মাটি খসিয়া যাইতে থাকে, তন্নিবন্ধন শিকড় সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় দিন দিন উহার হীনাবস্থার সূত্রপাত হয়। অতঃপর সান্তা-বারবারার প্রাচীন দ্রাক্ষা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার আর একটী দ্রাক্ষালতা ছিল—উহা অজাগর দ্রাক্ষার কলম, কিন্তু প্রাচীন দশা প্রাপ্ত হওয়ায়—উহার মূল কীটাক্রান্ত হয়, তন্নিবন্ধন উহার মৃত্যু হয়।

শেষোক্ত দ্রাক্ষার মৃত অবয়ব সান্তা-বারবারার চেম্বার-অব-কমার্সের গৃহে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহার কাণ্ডের—ভূমি হইতে এক হাত উপরের মাপ চারি ফুট পরিধি। পৃথিবীর মধ্যে এই জাতীয় অজাগর দ্রাক্ষালতার ফলন, বিস্ময়জনক—চারি টন অর্থাৎ একশত আটমণ, ছত্রিশ সের! ইহার বয়ঃক্রম পঁচাত্তর বৎসর বলিয়া অনেকের অনুমান।

কালিফোর্ণির অদ্ভুত দেশ, সেখানে তৃতীয় প্রাচীন দ্রাক্ষালতার নিকট উল্লিখিত দুইটী দ্রাক্ষাও পরাজিত। ইহা কার্পেণ্টারিয়া উপত্যকাতে (Carpentaria valley) আজও বিরাজ করিতেছে। বিগত শতাব্দীর ১৮৪২ সালে জোয়াকিনা লুগো-ডি—আয়ালা (Joaquina Lugo de Ayala) কর্ত্তৃক উক্ত উপত্যকায় রোপিত হয়। মার্কিণ শাসনাধীনে সান্তা-বারবারার সাধারণতন্ত্রের প্রথম সদস্য নির্ব্বাচন—এই মহা দ্রাক্ষার বিস্তীর্ণ ছায়ায় সমাহিত হইয়াছিল। এই কারণে সান্তাবারবারার তৃতীয় দ্রাক্ষালতা—প্রজাতান্ত্রিক দ্রাক্ষালতা (Republican Vine) নামে পরিচিত হইয়াছে। যে গাছের নিম্নে নির্ব্বাচন কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, সে গাছ কত বিস্তীর্ণ, তাহা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারা যায়। পৃথিবীর মধ্যে এক্ষণে এই দ্রাক্ষাই সর্ব্ব পুরাতন। ভূমি হইতে উহা দুই কাণ্ডে বিভক্ত বটে কিন্তু উভয়ে ঘনভাবে বিজড়িত হইয়া ঊর্দ্ধে পাঁচ ফুট, সাত ইঞ্চ পর্য্যন্ত উঠিয়া দুই বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়াছে। ভূমি হইতে অত উচ্চে গিয়া বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইলেও উভয়ের কাণ্ডের সেই স্থানের পরিধি—দুই হাত! ভূমি হইতে ছয়ইঞ্চ উপরে মূল কাণ্ডের পরিধি পাঁচফুট আধ ইঞ্চ এবং ইহার বিস্তৃতি একশত পনর বর্গ ফুট। এই সুবিস্তীর্ণ মহা দ্রাক্ষাকে রক্ষা করিবার জন্য ষাটের অধিক মজবুদ খুঁটি চারিদিকে প্রোথিত আছে। উহাকে প্রতিবৎসর ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা উহা আরও অধিক দূর বিস্তারিত হইত। এই অজাগর দ্রাক্ষালতার ফলন সম্বন্ধে প্রতি বৎসর অদ্ভুত সংবাদ প্রচারিত হয়। সম্প্রতি এক বৎসর উহাতে যে দ্রাক্ষা ফলিয়াছিল তাহার পরিমাণ শুনিবেন?

দশ টন

অর্থাৎ

দুইশত বায়াত্তর মণ দশ সের!!!

সম্প্রতি সান্‌ফান্সিস্‌কো (San Fanscisco)র এক মেলাতে (Mid winter fair) পাঠাইবার জন্য কোন ব্যক্তি এক সহস্র—ডলার (প্রায় চারি হাজার টাকা) দাম দিয়া উহা ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু উদ্যান-স্বামী তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। গাছের প্রাচীনত্বই মূল্য—বিশেষতঃ দ্রাক্ষালতার প্রাচীনত্ব। দ্রাক্ষালতাকে এতকাল জীবিত রাখাই বিস্ময়ের বিষয়। সুতরাং টাকার লোভে কে এরূপ অমূল্য গাছ হইতে বঞ্চিত হইতে চায়?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

সুলতান টিপুর শোচনীয় পরিণাম।

টিপু সুলতানের নাম ভারতে সর্ব্বজন-বিখ্যাত। তাঁহার অতুল বাহুবলে এবং দুর্দ্দান্ত সামরিক প্রতাপে একদিন সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ উদ্বেলিত এবং আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতানের বীর্য্যবহ্নিতে যে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত করিতে ব্রিটিশসিংহকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

আমরা টিপুর শেষ জীবনের কথা পাঠকগণকে উপহার দিব। তাঁহার জীবননাটিকায় যেদিন কালের করাল যবনিকা পতিত হয়, সেই দিনের ঘটনাই আমাদের প্রথম আলোচ্য। সুরাংপটাম বিপুল ব্রিটিশ-বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছে। নগরের বহির্ভাগে যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই তরঙ্গায়িত বিপক্ষ-সৈন্য-সাগর চক্ষুগোচর হয়। নগরের ভিতর হইতে, জনপ্রাণীর বাহিরে গমন করিবার উপায় নাই। ইংরেজদিগের প্রবল অগ্নিবর্ষী কামানের বজ্রনির্ঘোষ মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জিত হইয়া, শ্রবণ বধিরপ্রায় করিয়া দিতেছে। অবশেষে অনবরত অনলবর্ষণের ফলে সুরাংপটাম দুর্গের প্রাচীরের একাংশ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। ইংরেজ-সৈন্যগণ দলে দলে রন্ধ্রপথাবলম্বনে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সুলতানের দুর্গরক্ষক সৈনিকগণ যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়াও বিপক্ষের সেই প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। ব্রিটিশবাহিনীর অতুল পরাক্রমের সম্মুখে দুর্গরক্ষকগণ অবিলম্বেই পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

সুলতান এই সময়ে আহারে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার সেই শেষ আহার সমাপ্ত হইল না। সমর-কোলাহল শ্রবণ করিয়া, সুলতান আহারে বিমুখ হইয়া বাহিরে আগমন করিলেন। অদূরে যুদ্ধ বাধিয়াছে দেখিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তাদি প্রক্ষালন করিলেন এবং উন্মুক্ত অসি গ্রহণ করিয়া ঘটনাস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুলতানের নির্ব্বাচিত দেহরক্ষীগণ এবং কতিপয় বিশিষ্ট সেনাপতি তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিলেন। টিপু যখন ঘটনাস্থল হইতে ২০০ শত গজ দূরে উপস্থিত হইলেন, তখন ভীতিচকিতনেত্রে দেখিলেন, দুর্গরক্ষকগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে, বহুসংখ্যক ইংরেজসৈন্য

সেই হিতাহিতজ্ঞানপরিশূন্য পলয়মান সৈনিকদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাহাদিগকে দলে দলে বিনাশ করিতেছে। দুর্গ-প্রাচীর ইংরেজসৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। সুলতান তখন উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যদ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন. এবং স্বয়ং বন্দুক উদ্যত করিয়া, বিপক্ষগণের কয়েকজনকে সংহার করিলেন। কিন্তু ভাগ্য তখন বিমুখ হইয়াছিল। কেহই সুলতানের আদেশ, অনুরোধ বা বাক্যে কর্ণপাত করিল না, সকলে ব্যাধবিতাড়িত মৃগযুথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে অসংখ্য ইংরেজসৈন্য আসিয়া, সুলতানের সেই মুষ্টিমেয়, অঙ্গুল্যাগ্রে গণনীয় দেহরক্ষী-দলকে আক্রমণ করিল। নিরুপায় হইয়া, টিপুও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া একটী ক্ষুদ্র সেতুর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ সেতু পলায়নপর সৈন্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত হওয়াতে, তাহা অতিক্রম করা দুরূহব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-সুলতান সেতুর প্রবেশ-পথের সম্মুখে নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময়ে পশ্চাদ্ধাবমান ইংরেজ-সৈন্যগণের নিক্ষিপ্ত গুলির অব্যর্থসন্ধানে সুলতানের বামবক্ষ বিদ্ধ হইল। সুলতান আহত স্থানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সেতুর প্রবেশ-পথাভিমুখে স্বীয় অশ্বকে পরিচালিত করিলেন। ইত্যবসরে দ্বাবিংশসংখ্যক Light Infanfry সৈন্যদল ভিন্ন পথাবলম্বনে দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া, সেতুর নিস্ক্রমণ-পথে দণ্ডায়মান হইল এবং সম্মুখাগত পলাতকগণের উপরে প্রবলবেগে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

সেই অগ্নিবৃষ্টিতে সুলতানের দক্ষিণ অঙ্গও আহত হইল। টিপু বিচ্ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পতনোন্মুখ হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সুলতানের বিশ্বস্ত অনুচরগণ টিপুর অবশদেহ ধারণ করিয়া নিকটস্থিত পাল্‌কী অভ্যন্তরে স্থাপন করিল।

এদিকে উভয়পার্শ্ব হইতে বিপক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত সুলতানের ভীরু সৈন্যগণ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। আহত টিপু সেই সঙ্কটময় স্থানে, পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এই সময়ে একজন ইংরেজ-সৈনিক সুলতানের নিকটে অসিয়া, তাঁহার অসিবন্ধ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। সুপ্তসিংহ যেন জাগরিত হইল। টিপু তৎক্ষণাৎ স্বীয় তরবারি উদ্যত করিয়া, সেই বেয়াদব ও ধৃষ্ট ইংরেজসৈনিককে আঘাত করিলেন। আহতসৈনিকও প্রতিদানস্বরূপ সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া

বন্দুক ছুড়িল। গুলি সুলতানের ললাট-পার্শ্ব ভেদ করিল। এই আঘাতই অবিলম্বে সুলতানের মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। *

দুর্গ সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ব হইলে, ইংরেজগণ সুলতানের দেহ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বহু অন্বেষণের পরে সম্পূর্ণ পরিত্যক্তাবস্থায়, রাশিকৃত মৃতদেহের মধ্য হইতে, হতভাগ্য টিপুর অচেতন কলেবর পাওয়া গেল। প্রথমে সকলে বিবেচনা করিয়াছিল, সুলতান মৃত—কিন্তু কর্ণেল ওয়েলেশলি (পরে ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন) সুলতানের সেই মৃতকল্প দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, গতপ্রায় জীবনপ্রক্রীয়া তখনও অল্প অল্প চলিতেছে—কিন্তু জীবনাশা দূরগত। সকলে সেই মুমূর্ষু সুলতানকে পাল্‌কী দ্বারা বহন করাইয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে লইয়া চলিলেন, এবং রাজপ্রাসাদের একটী কক্ষে সুলতানকে শায়িত করিলেন। অত্যল্পকালমধ্যে বিলাপমগ্ন পরিবারবর্গের ক্রন্দনজনিত অশ্রুবারিতে অভিষিক্ত হইয়া, ভারতের উজ্জ্বলনক্ষত্র, পরাক্রান্ত সুলতানটিপু অন্তিমনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুলতানের দ্বাদশতনয়, বিধবা মাতৃগণের সহিত ব্রিটিশকরে বন্দি হইলেন।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ৫ই্ মে তারিখে টিপু সুলতানের সমাধি কার্য্যের উদ্যোগ হইল। পাল্‌কীর মধ্যে সুলতানের কফিণ সংস্থাপিত হইল। শববাহী-গণের সমভিব্যাহারে সুলতানের দ্বিতীয় তনয় যুবরাজ আব্‌দুল খালিখ, কাজিগণ এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত ওমরাওগণ অগ্রসর হইলেন। ক্রমে সকলে যখন লালবাগের প্রবেশপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রেষ্ঠ সেনানীগণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। রাজপথের উভয়-পার্শ্বে রোরুদ্যমান নাগরিকগণ দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের কেহ কেহ অতি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল, কেহ কেহ মৃত সুলতানের পাল্‌কীর নিকটে আসিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা আজ যেন পিতৃ-হারা হইয়াছে।

---

* After a short interval some European soldiers entered the gate way, and one of them attempting to take off the Sultans sword belt, the wounded Prince, who still held his sword in his right hand, made a cut at the soldier, and wounded him about the knee, when the latter instantaneously fired his musket and shot him through the temple, which caused immediate death' Vide the History of Hyder Shah and Tipoo Sultan By M. M. D. L. T. P. P. 309.

সুলতানের জীবনহীন, নশ্বর কলেবর হায়দর আলির সমাধিভবনে নীত হইল। কাজিগণ সময়োচিত ধর্ম্মস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সকলে বিনতজানু হইয়া সুলতানের পারলৌকিক মঙ্গলকামনা করিলেন। অনন্তর সুলতানের দেহাবশিষ্ট সমাহিত হইল। কামান গম্ভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, রাজ্যস্থ সকলকে এই বিষাদবার্ত্তা জ্ঞাত করিল। দীন-দুঃখীগণের মধ্যে দ্বাদশসহস্র মুদ্রা বিতরিত হইল।

দিবাবসান কালে সমস্ত প্রকৃতি অতি ভীষণরূপ ধারণ করিল। ঝটিকার সহিত বজ্রধ্বনি মিশ্রিত হইয়া কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। অবিশ্রাম ধারাপতনে বসুধা-বক্ষ সিঞ্চিত হইল। যেন স্নেহশীলা প্রকৃতি জননী তাঁহার প্রাণতম তনয়-বিরহবেদনায় অধীরা হইয়া, উচ্চক্রন্দনরব তুলিয়া আঁখিনিঝরের পবিত্র উৎস খুলিয়া দিয়াছেন।

মৃত্যুকালে টিপু সুলতানের বয়ঃক্রম প্রায় ষষ্ঠি বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণ দাক্ষিণাত্য-সুলভ গাঢ় কৃষ্ণবরণ ছিল না—তিনি দিব্য নবজলধর কান্তিমান ছিলেন। টিপুর দৈহিক উচ্চতার পরিমাণ পাঁচফিট নয় ইঞ্চি ছিল। তাঁহার বদনমণ্ডল গোলাকার ছিল। সুলতানের লোচনদ্বয় আয়ত এবং নাসা সুগঠিত ছিল। ফলতঃ সুলতান টিপু একজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি সাতিশয় শ্রমপরায়ণ ছিলেন। অশ্বারোহণ, সিংহ-ব্যাঘ্রশীকার, পদব্রজে গমন,—এইগুলি তাঁহার অতীব প্রিয়কার্য্য মধ্যে গণিত ছিল। সুলতান স্বধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন।

সুলতানের কতিপয় মহার্ঘ দ্রব্য ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট বিজয়চিহ্নস্বরূপ আত্মসাৎ করিলেন। সেগুলি তখনকার মত বিলাতের উইণ্ডসর প্রাসাদে প্রেরিত হইয়াছিল। দ্রব্যগুলি আপাততঃ কলিকাতার মিউজীয়মে রক্ষিত আছে। *

---

* The valuable Bird of Paradise formed with precious stones, and other parts of Snltan's throne, his armour, swords, muskets, and other curions articles were placed in Windsor Castle, one of the residence of our beloved Sovereign.

Vide Memoirs of Tipoo Sultan. P. P. 313.

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হিঁয়ালি।

১। নেত্রাক্ষরে জন্ম তার যুবতী রঞ্জন।
প্রথমাক্ষর ঘুচাইলে শিবের ভোজন॥
শেষাক্ষর ছেড়ে দিলে দংশন করিবে।
সাবধানে থেকো কেন প্রাণেতে মরিবে॥

২। জনম হইল যার সমুদ্র-মন্থনে।
স্থান না পাইয়া যিনি উঠিলা গগনে॥
তাঁর সহোদরা যিনি বিবাহ করিল।
তাঁর সপত্নীর নাম বল কি হইল।

৩। পতির গমনে যার গমন হইবে।
পতির বিরহ সতী নাহিক সহিবে॥
সেই সতী থাকে কিন্তু সদা অনাহারে।
গৃহে প্রবেশিলে সতী অগ্নিসতী মরে॥

৪। দুই বর্ণে জন্ম তার পৃথিবীর অংশ।
আদ্যাক্ষরে আকার দিলে করে সব ধ্বংস॥
[illegible]াক্ষরে ইকার দিলে হন নারায়ণী।
আদ্যাক্ষর দিলে পরে নূতন বাখানি॥

৫। উৎপত্তি হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়।
যত্ন করি শেষে তারে নর লোকে খায়॥

শ্রীহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণ।

অষ্টমীতে একাদশী বিধবা রহিল বসি,
পূর্ণশশী গগনে উদয়,
খাইলে গর্ভ হয়, না খাইলে পাতক হয়,
সে নাড়ীর উভয় সঙ্কট,
প্রকাশ হইল ইহার সূত্র, প্রসবিল দুই পুত্র,
একপুত্র হ'ল তার স্বামী
ইহাতে যেই দ্রব্য হয়, অরণ্যেতে পাওয়া যায়
যতনে আনিবে হে তুমি।

বেহারে জুড়-শীতল।

বঙ্গীয় পাঠকের কর্ণে 'জুড়-শীতল' শব্দ নূতন। অনেক বেহারীর কর্ণেও নূতন। বেহারের স্থান বিশেষে যাঁহারা থাকিয়াছেন, কিম্বা কোনক্রমে সে সময় সে দেশে থাকিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা নূতন হইতে না পারে। বাঙ্গালা নববর্ষের দিনে জুড়-শীতলের অধিবেশন হয়; কিম্বা ইহার পার্ব্বণ সমারোহে সমাহিত হয়। ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে,—সভ্য বর্ব্বর নির্ব্বিশেষে, বিদ্বান মূর্খ নির্ব্বিশেষে, বেহারের অনেক স্থানে জুড়-শীতল পার্ব্বণ মহা আড়ম্বরে সমাহিত হয়।

জুড়-শীতল কোন শাস্ত্রের অনুমোদিত, অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোন কিনারা করিতে পারা যায় না। পৌরাণিকও তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। স্থানীয় ইতিহাসেও এরূপ কোন ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই—যাহার স্মরণার্থে কিম্বা যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই পার্ব্বণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেশাচারের মধ্যেও এরূপ কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না—যাহা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। তবে কিসের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা সংসারে আবির্ভূত হইল? প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন।

জুড়-শীতল উপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসীগণের—ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের মহা উৎসাহ। কোন বিশিষ্ট পার্ব্বণ বা উৎসব সমাগতপ্রায় হইলে, কিম্বা কোন সম্ভ্রান্ত জগন্মান্য ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে লোকে যেরূপ উৎসাহী হইয়া উঠে, চৈত্র-সংক্রান্তিতে তাহাই দেখিলাম। আফিস কাছারী বন্ধ হইল,—গৃহস্থবাটীর ঝী-চাকরেরা দিনেকের জন্য ছুটী লইল। যাহাদিগের ছুটীর আবশ্যক নাই, তাহারা সকাল সকাল কাজ সারিয়া লইল—পরদিনের অনেক কাজ সারিয়া রাখিল।

সন্ধ্যাকালে——

রন্ধনশালায় ধূমের পরিসীমা নাই। অপর দিন সায়ংকালে রাত্রের ভোজ্য-সামগ্রী যেরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে, এ দিনত তাহা হইবেই, ইহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই, কিন্তু চৈত্র-সংক্রান্তিতে সায়ংকালের নির্দ্দিষ্ট ভোজ্য প্রস্তুত করিলে চলিবে না। নববর্ষের দিন পাকশলায় অগ্নি জ্বালিত হইবে না, নববর্ষ অরন্ধনের দিন। বাঙ্গালীর অরন্ধন ভাদ্রসংক্রান্তির দিন। পূর্ব্বে আমাদিগের অরন্ধন ছিল একদিন, কিন্তু গত দুই বৎসর হইতে আর একদিন

অরন্ধন বাড়িয়াছে। এই শেষোক্ত আমাদিগের 'পলিটিকেল অরন্ধন'। ইহা লর্ড কর্জ্জনের সৃষ্টি; অথবা তাঁহার বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফল। অরন্ধনের দিন বাড়ীতে উনান জ্বালিতে নিষেধ কিন্তু অনাহার নিষিদ্ধ নহে,একথা অপর দেশের লোকে শুনিলে বিস্মিত হইতে পারে। অপর দেশের অধিবাসীরা হয়ত জানে না যে, বাঙ্গালী জাতি কত বড় বুদ্ধিজীবী। নিরীহ ও দুর্ব্বল জাতি পৃথিবীতে স্থান পায় না, আর যদিও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে পায় তাহা হইলে তাহাদিগকে আমেরিকার আদিমনিবসী তামাটে ভারতী (Red-Judians) অথবা মসিবর্ণ নিগ্রোজাতির ন্যায় চিরদিন ক্রীতদাস হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয় ও অবশেষে পৃথিবীর চিত্রপট হইতে বিলুপ্ত হইতে হয়। আমরা নিরীহ, দুর্ব্বল, অপরন্তু বিজিত এবং 'নিজবাসভূমে পরবাসী' হইয়া আছি—এখনও আছি, বিলুপ্ত হুই নাই সে কেবল আমাদিগের বুদ্ধির দৌড়ে। পরাধীন আমরা বহুদিন বটে—কিন্তু যে জাতিই আমাদিগের রাজ্যভার লইয়াছে, সেই আমাদিগের বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া কেবল যে বিস্মিত হইয়াছে তাহা নহে, অপর সকলের অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়াছে। হিন্দুর রাজত্বকালে, মোগল-পাঠানের প্রভুত্বের দিনে,—আজও ইংরেজের এক ছত্রাধীনে বাঙ্গালীর প্রাধান্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। রাজকার্য্যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে, দর্শনালোচনায়, বিজ্ঞানচর্চ্চায়, দুর্ব্বল বাঙ্গালী চিরদিন কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিতেছে। ইংরেজের দুরূহ ভাষা শিক্ষা করিয়া, কঠিন কঠিন শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া এই বাঙ্গালী ইংরেজের দেশে গিয়া ইংরেজের বুকে বসিয়া ইংরেজকে পরাজিত করিতেছে, ইহা কি কম গৌরবের কথা! যে বাঙ্গালীর এত জ্ঞান, এত বুদ্ধি, সে বাঙ্গালী যে অরন্ধনের দিন রন্ধন না করিয়াও উপবাসে থাকিবে না বরং অন্যদিনাপেক্ষা চব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয় দ্রব্যে উদর-সেবা করিতে পারে ইহা আর অধিক কথা কি? অরন্ধনের দিন উপবাসের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তৎপূর্ব্বদিবস সমুদয় রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া রাখিতে হয়। যুড়-শীতলের দিন বেহারে তাহাই হয়।

চৈত্র-সংক্রান্তী কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে মৃদুমন্দস্মীরণ বহিতেছে,—পাখীগুলির আনন্দ ধরে না, কলরবে চারিদিক সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। প্রভাকর প্রশান্ত মহাসাগরে স্নান করিয়া রক্তিম আঁখিতে দিগ্মণ্ডল পানে তাকাইতে আরম্ভ করিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে জুড়-শীতলের হল্লা উঠিল—সে তরঙ্গ পুং-মহলে প্রবেশ করিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। আগন্তুক চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি?

দেখিতে দেখিতে একদল ভুক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। কাহাকেও চিনিলাম, কাহাকেও আদৌ চিনিতে পারিলাম না। কি সাজ-সজ্জা! মরি মরি! নশ্বর চক্ষেত চিনিতে পারিবই না। তখন এই ভূতদিগকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বোধ হয় চিনিতে পারিতেন না। মরি মরি কিবা রূপ—কিবা রুচি! জেন্যানা মহলেও তাহাই—আগা-গোড়া সকলেরই সর্ব্বাঙ্গ কাদা, পাঁক, রাস্তার ধূলা, গোবর ইত্যাদিতে পূর্ণ। ইহা দেখিয়া দুর্গোৎসব কালে মহিষ বলিদানের পর কাদা-মাটির কথা মনে হইল। যাহা হউক, জুড়-শীতলের দল নিজ নিজ বাটীতে কাদা-মাটি করিয়া সদলে রাস্তায় বহির্গত হইয়া অপরকে অক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন—ভূতদলে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ফাগুয়াতে (দোলে) ফাগের ছড়াছড়ি হয়—ফাগ মাখামাখী হয়, কিন্তু জুড়-শীতলে পয়সা খরচ নাই,—রাস্তার ধূলা লও, পথের গোবর কুড়াইয়া লও,—বিষ্ঠা কুড়াইয়া লও আর লোকের গায়ে দাও। বিনা খরচায় কত আমোদ! মরি মরি, ইচ্ছা করিল যে আমোদের বালাই লইয়া মরি! শুনিতে পাই, নববর্ষের দিনে লোকের গায়ে বিষ্ঠা-গোবর দিলে তাহার বৎসরটা ভালয় ভালয় যায়! বর্ষটা আমার দুঃখে দুঃখে—কষ্টে কষ্টে যাউক কিন্তু বিষ্ঠা-গোবর মাখিয়া আমি দীর্ঘজীবী হইতে চাহি না, অথবা বছরটা সুখ-স্বচ্ছন্দে কাটাতে চাহি না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

হিন্দু-জ্যোতিষ।

গ্রহনক্ষত্রাদির সাধারণ নাম জ্যোতিষ। যদ্দ্বারা উহাদের স্বরূপ, অবস্থা, গতি ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়, তাঁহার নাম জ্যোতিষশাস্ত্র। জ্যোতিষ শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—জ্যোতিস্ (নক্ষত্রাদির দীপ্তি) অ (ইদমর্থে) ষড়ঙ্গ বেদের জ্যোতিষ একটী প্রধানতম অঙ্গ, এইজন্য ইহাকে বেদাঙ্গ শাস্ত্রও বলে। বেদাঙ্গ শাস্ত্র ছয়টী যথা,—

"শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাচয়ঃ।
জ্যোতিষাময়নচৈব বেদাঙ্গানি ষড়েবতু॥"

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় প্রকার বেদের অঙ্গ অর্থাৎ অবয়ব গ্রন্থ। শিক্ষা, উচ্চারণ, বিজ্ঞান। শিক্ষ ধাতুর মূল অর্থ,—দান; গুরু শিষ্যকে বেদ দান করিতেন; শিষ্যকে গুরুর মুখে শুনিয়া বেদ

কণ্ঠস্থ করিতে হইত, সুতরাং তৎকালে আবৃত্তি ও উচ্চারণ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার একটী অতি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। আবৃত্তি ও উচ্চারণের নিয়ম সকলের নাম ছিল "শিক্ষা।" দ্বিতীয় বেদাঙ্গের নাম "কল্প।" অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলী। যজ্ঞ লইয়া বেদ; যজ্ঞে ব্যবহারই বেদের প্রয়োজন, যজ্ঞের জন্যই বেদের রচনা। বেদের আগেই যজ্ঞ, যজ্ঞের আগে বেদ নহে; বেদের অর্থ বোধের জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক হয়; এই দুই শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কোন্ বৈদিক শব্দ কিরূপে গঠিত, তাহা জানা যায় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের অর্থবোধের সাহায্য হয়। ছন্দস্ শাস্ত্রে পদ্য রচনার নিয়ম নিবদ্ধ। ঋক্ সকল ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, জগতী প্রভৃতি নানা প্রকার সুললিত ছন্দে রচিত, যে যে নিয়মে ঐ সকল ছন্দ গঠিত, তাহাদের নাম ছন্দস্ শাস্ত্র।

ষষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রধান বেদাঙ্গের নাম জ্যোতিষ। যে সকল নিয়মের অধীন হইয়া জ্যোতিষ্ক সকল খভোমণ্ডলে ভ্রাম্যমান হয়, তাহাই—জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়। অন্যান্য কয়েকটী বিজ্ঞান বেদের ভাষা অবলম্বন করিয়া নির্ম্মিত, কেবল জ্যোতিষই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে, ইহার সুবিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া সকল কোন লোকের বা কোন জাতির নিজস্ব নহে। অপরিজ্ঞেয় আদিকালে তাহার বীজ নিহিত রহিয়াছে, তবে সভ্যতার অন্যান্য চর্চ্চায় সহিত জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনাও যে প্রাচীন ভারতে ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধুনাতন যে সকল উন্নতি হইতেছে, তাহার যেরূপ ধারাবাহিক বিবরণযুক্ত পরম্পর সুসম্বদ্ধ গণিত গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়, প্রাচীনকালের ভারতের সে সকল কিছুই নাই—অথবা যাহা কিছু আছে তাহা কালের অতল গর্ভে নিহিত রহিয়াছে; এই সকল প্রতিবন্ধক বশতঃ এ বিষয়ে কোন প্রাচীনতম কালের ইতিহাস লেখা, আর ভারতীয় আর্য্যগণের জ্যোতিঃশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করা একই কথা, নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় যে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়,—ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাশ্চাত্য মহানুভব ব্যক্তিদিগের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, এবং তাঁহাদের বাক্য অকাট্য বোধে শিরোধার্য্য করিতে হয়। (Kasani) ক্যাসিনী, (Bali) বেলি (Plafare) প্লেফেয়ার ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিতেরই মত যে, "খৃষ্টের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের

আলোচনা প্রবল ছিল।" আর্য্যদিগের দাওয়ার প্রধান বিরোধী বেণ্টলী সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, আর্য্যগণের আবিষ্কৃত অনয়ন মণ্ডলের (Ecliptic) সপ্তবিংশতি চন্দ্র বিভাগের (খৃঃ পূঃ ১৪৪২০) অব্দে নির্দ্ধারিত হয়, তবে তিনি ইহাও বলেন যে, ৫৩৮ খৃঃ ভারতবর্ষে ব্রহ্মগুপ্ত দ্বারা যথার্থ গণনার বীজরোপিত হয়, তাঁহার কথা কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীনতম কালে যে সকল মহাত্মা জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; তাঁহাদের নাম যথা,—

"সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠাত্রি পরাশরাঃ।
কশ্যপো নারদো-গার্গো মরীচির্ম্মনুরঙ্গিরাঃ॥
রোমশোপুলশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌন কাষ্ঠা দশোহেতে জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদাঃ॥

ইঁহাদের প্রত্যেকেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্ত বা সংহিতা নামে খ্যাত। ইঁহারা অষ্টাদশখানি সিদ্ধান্ত বা সংহিতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আবার এই সকল গ্রন্থ অবলম্বনে তৎপরবর্ত্তী জ্যোতির্বিদগণ কর্ত্তৃক বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভাস্করাচার্য্য কৃত "সিদ্ধান্তশিরোমণি," গণেশ দৈবজ্ঞ কৃত "গ্রহলাঘব" ও বরাহমিহির কৃত "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইগুলি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গণিত ও ফলিতভেদে জ্যোতিষ শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাহা দ্বারা নক্ষত্রাদি দিব্য পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও গতি প্রভৃতির বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) এবং যাহার দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতি ও মিলনক্রমে মানবের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনার বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম জ্যোতিষ (Astrology) মুশলমান শাস্ত্রে ইহাকে সচরাচর "নুজুম" বলিয়া থাকে। জ্যোতিষ বলিলে বঙ্গভাষায় যেমন গণিত ও জ্যোতিষ বুঝায়, মুসলমানেরাও "নুজুম বা নজুম" বলিলে সচরাচর সেইরূপ বুঝায়।

গণিত জ্যোতিষ আবার তিন প্রকার, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও করণ; ইহাদের গণনার প্রভেদ অতি সামান্য, সিদ্ধান্তে কল্প হইতে, তন্ত্রে যুগ হইতে এবং করণে ইষ্টশাক হইতে গণনা করিবার প্রণালী প্রচলিত আছে, এক্ষণে আমাদের দেশে করণ গ্রন্থেরই বহুল প্রচার। গণিত জ্যোতিষের ন্যায় ফলিতও আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। জাত-কোষ্ঠী গণনা (Genethlialogy), প্রশ্নগণনা

(Harary); রাষ্ট্রবিপ্লবগণনা (Mundane), ঝড়বৃষ্টিগণনা (Atmospherical), এবং রোগ মৃত্যুগণনা (Medical Astrology)। এতদ্ভিন্ন যাহার দ্বারা কর, কপালাদি রেখা ও তিলকাদি চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া ইহ-জীবনের শুভাশুভ গণনা করা যায়, তাহাকে সামুদ্রিক (Palmistry) বিদ্যা কহে এবং পশুপক্ষ্যাদিরূপ শকুন দ্বারা যে শাস্ত্রে মনুষ্যের শুভাশুভ নিরূপিত হয়, তাহাকে শাকুন শাস্ত্র বা কাকচরিত্র গ্রন্থ বলে। হিন্দু-জ্যোতিষের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া একে একে সমস্ত বিষয়ই বিবৃত করা গেল, আশা করি পাঠকগণ ইহা হইতে সন্তোষ লাভ করিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

দিন কি ফিরিবেনা ?

(১)

দীননাথ ! এ দীনের দিন কি ফিরিবেনা,
পোহাবেনে দুঃখ-নিশা,
মিটিবেনা সুখ-তৃষা,
শান্তি-সলিলের ধারা গায়ে কি পড়িবেনা ?

(২)

কত যে বাণের ঘায়ে হ'তেছি জর্জ্জর,
তবু আছি স'য়ে র'য়ে
শুধু এক আশা ল'য়ে,—
আলোক অবশ্য আসে আঁধারের পর।

(৩)

অনন্ত আঁধারে হেরি অস্ফুট আলোক,
ধাইতেছি তার পানে,
মোহিয়ে আশার গানে,
সুখের কাননে ছেড়ে যাইরে ভূলোক।

(৪)

কিন্তু হায় ! কোথা যাই নাহিক নিশ্চয়,
মন যেন কারে চায়,
ঘুরি দিশাহারা প্রায়,
মুখ চেয়ে কেহ মোরে দেয়না অভয়।

(৫)

একাকী পথিক আমি ভ্রমি এ কাননে,
কোথা হ'তে আসিয়াছি,
কোথাই বা যাইতেছি,
নাহি জানি নাহি বুঝি ঘুরি কি কারণে।

(৬)

কি যেন অলক্ষ্যে কভু হিয়া মাঝে পশি,
বাজায় মধুর বেণু।
পুলকিত হয় তনু
—"ভয় নাই, পোহাইল তব দুঃখ-নিশি।"

(৭)

অমনি অনন্ত সুখে ভুলিয়ে আপন,
হায়রে কোথায় যায়,
কাঁদা'য়ে এ অভাগায়,
পরক্ষণে; পুনঃ সেই ভীষণ দহন।

(৮)

ফেলে দিয়ে সুগভীর কূপে তমোময়,
বলেরে নিঠুর ভাষা,—
"ছেড়ে দে সুখের আশা
মিটিবেনা ও পীপাসা পাবিনে আশ্রয়।"

(৯)

বল নাথ! কত দিন কাটা'ব এ ভাবে,
চাহিয়া আকাশ পানে,
কাঁদিব আকুল প্রাণে,
অকূল চিন্তা-সাগরে তরি না মিলিবে?

(১০)

কাল বশে নিশা শেষে আঁধার ত থাকেনা
দুরন্ত হিমানী অন্তে,
আসে ত পুনঃ বসন্তে,
কেবল এ অভাগার দিন কি ফিরিবেনা?

শ্রীরাধাগোবিন্দ আচার্য্য।

———

গুরু অর্জ্জুন সিং।

গুরু অর্জ্জুনের জীবনী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনিই প্রথম স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ আত্মজীবন বিসর্জ্জনকারী গৌরবান্বিত মহাপুরুষ। বিপদ-সঙ্কুল মোগল-রাজত্বের সময়; ভারতে হিন্দু-ধর্ম্মের ঘোরান্ধকার অপসারিত করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মকে আলোকিত এবং পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

গুরু অর্জ্জুনের উন্নতি দেখিয়া কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। এই সকল দুরন্ত স্বার্থপর লোকসমূহ তখনকার আর্য্য-সমাজের পরম শত্রু ছিল। তাহারা সর্ব্বস্থানে গুরু অর্জ্জুনের নিন্দা এবং দুর্নাম রটনা করিত। এমন কি তাহারা রাজ-সরকারে জানাইত যে, অর্জ্জুন ঘোরতর রাজদ্রোহী। তাহাকে অচিরে দমন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ এই সকল কথায় কোন রাজ-কর্ম্মচারী কর্ণপাতও করিল না। শেষে সকলে মিলিয়া একখানি রাজদ্রোহ পুস্তক লিখিয়া বলিল—ইহা গুরু অর্জ্জুনের লেখা এবং সেই, রাজ্য মধ্যে অশান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে।

ইউরোপে রোমরাজ্যের পরম দয়ালু বাদশাহ মারকস্ এরিলিউয়সের রাজত্ব সময়ে যে বীভৎসকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, গুরু অর্জ্জুনের জীবনেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। অত্যাচার, অবিচার এবং ষড়যন্ত্রের সংঘটনে তথায় জীবন্তাবস্থায় মানুষের শরীর হইতে চর্ম্ম খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল—ফলে এই অত্যাচারে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবলাকার করিয়াছিল। গুরুর প্রাণপাতেও শিখধর্ম্মের অচল লৌহভিত্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া যান। পুত্র-গণের নাম; যথাক্রমে মহাদেব, পৃথ্বীচাঁদ ও অর্জ্জুন। জ্যেষ্ঠ মহাদেব সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। পৃথ্বী-চাঁদ অত্যন্ত সাংসারিক এবং বর্দ্ধিষ্ণু ধর্ম্ম-মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। কনিষ্ঠ অর্জ্জুন—তাঁহার বিদ্যা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সুতরাং তিনিই গুরুদিগের পবিত্র গদীতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীচাঁদ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহাসন দাওয়া করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, জন-সাধারণের ইচ্ছায় আমি এই পদে আসীন হইয়াছি, তজ্জন্য আমি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিতে পারি না। পৃথ্বীচাঁদ অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং

নূতন গুরু অর্জ্জুনের ধ্বংস করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই ভারতবর্ষ কোনকালেই বিশ্বাসঘাতক শূন্য নয়; তজ্জন্য গুরু রামদাসের পরিবারবর্গ দুশ্চরিত্রহীন ছিল না। পৃথ্বীচাঁদ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির আশায় লাহোরের নবাবের আশ্রয় লইলেন। এবং নানাবিধ কৌশলে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি সহোদর ভ্রাতার বিরুদ্ধাচরণ করাতে নবাবের সন্দেহ হইল, সেইজন্য নবাব তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু নবাব তাঁহার পক্ষে থাকিলেন—তাহা প্রকাশ করিলেন।

পৃথ্বীচাঁদ নবাবের জোর পাইয়া, ভ্রাতা অর্জ্জুনের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, এবং ভয় দেখাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ধৈর্য্যসহকারে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীচাঁদও পদে পদে নিজ স্বার্থসাধনায় ব্যস্ত হইয়া ভ্রাতার উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলেন।

পৃথ্বীচাঁদের অত্যাচার এতদূর চরমে উঠিল যে, গুরু অর্জ্জুনের অনুচরেরা মাসিক তাঁহাকে হাজার টাকার জিনিষ খোরাকী বাবদ দিত, তিনি তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন কি গুরু অর্জ্জুন কত দিন অনাহারে কাটাইতে লাগিলেন। তথাপি পৃথ্বীচাঁদকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। শুনা যায় পৃথ্বীচাঁদের অত্যাচারে, মাসের মধ্যে পনর দিন অনাহারে কাটাইতেন।

সে যাহা হউক, পৃথ্বীচাঁদের নূতন কৌশল-জাল গুরু অর্জ্জুনের কালস্বরূপ হইল। তিনি ভ্রাতার সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। সরল হৃদয় গুরু অর্জ্জুনও দাদার কথায় সমস্ত ভুলিয়া যাইলেন। ইহাতে তাঁহার কোন লাভ ছিল না, তথাপি অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথ্বীচাঁদের পুত্রের উপর স্বীয় কর্ম্মভার ন্যস্ত করিলেন। দাদা পৃথ্বীচাঁদ বড়ই সন্তুষ্ট ও প্রীত হইলেন। এবং ভাবিলেন যে, বাবা নানকের পবিত্র এবং উন্নত সিংহাসন তাঁহার পুত্রই পাইবে।

কিন্তু বিধাতা তাহাতে বাদ সাধিলেন। এই সময় গুরু অর্জ্জুনের এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই বালক শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ও সর্ব্ববিষয়ে পৃথ্বীর পুত্রাপেক্ষা সর্ব্বগুণ সমন্বিত হইল—কালে এই বালকই যৌব-সিংহাসনে আরোহণ করিল। পৃথ্বীর বহুকাল সঞ্চিত বুকভরা আশা ব্যর্থ হইল। তাঁহার হৃদয়ে হিংসার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতার দীপ্ত দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্ব-পথ অনুসরণ করিলেন, শাসনকর্ত্তাদের

কাছে যাইয়া গুরু অর্জ্জুনের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুনই রাজ্যের ঘোরতর শত্রু ও সেই, রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ প্রচার করিতেছে। ইহাতে গুরু অর্জ্জুনের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, তবে রাজ্যমধ্যে যে অর্জ্জুন একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, ইহাই শাসনকর্ত্তাদের মনোমধ্যে ধারণা হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের তীক্ষ্ণ চক্ষু সর্ব্বদাই গুরুর কার্য্যের উপর ন্যস্ত থাকিত।

যখন উন্নতিশীল মানবের পতন হয়, তখন চারিদিকেই তাহার শত্রু অবস্থান করে, এমন কি বন্ধু প্রবল শত্রু হয়—ইহা অদৃষ্টের ফল মাত্র।

গুরু অর্জ্জুনের গৃহ-শত্রু অপেক্ষা আর এক প্রবল শত্রু হইয়াছিল। তিনি লাহোরের নবাবের প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান চান্দু সা। একটি সামান্য পারিবারিক ঘটনা হইতে এই হলাহল সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা পরে লিখিতেছি।

ঠিক এই সময় কতকগুলি লোক জাতীয়-উন্নতি দেখিয়া কালসর্পের মত হিংসায় ফুলিতেছিল। কি করিলে জাতীয়-বল নষ্ট হয়, তাহারা তাহার চেষ্টা করিতেছিল,—ভাই জান ত? গৃহ-শত্রু বড় ভয়ানক শত্রু।

পদগর্ব্বে গর্ব্বিত দেওয়ান চান্দুসার বিবাহ-বয়ঃপ্রাপ্তা একটি কন্যা ছিল। সেই কন্যার বিবাহের পাত্র খুঁজিবার জন্য তাঁহার পারিবারিক পুরোহিতকে গ্রামান্তরে পাঠাইয়াছিলেন। পুরোহিত ঠাকুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া গুরু অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দকে উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিলেন এবং শিখ-রীত্যানুসারে পাত্রকে কয়েকটি টাকা ও কয়েকটি নারিকেল দিয়া পাত্র ঠিক করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই বিবাহে গুরু অর্জ্জুন মত দিয়াছিলেন।

অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণ, পাত্র সুস্থির করিয়া বিপুল অর্থ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিলেন—দেওয়ান সাহেব! গুরু অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দকে পাত্র ঠিক করিয়া আসিলাম এবং গুরু অর্জ্জুনের সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার লিখিত পত্রখানি দেওয়ান চান্দুসার হাতে দিলেন। এই কথা শুনিয়া দেওয়ান চান্দুসা রাগে জ্বলিয়া গেলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, মূর্খ ব্রাহ্মণ! তুমি একটা ফকিরের ছেলের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিবে—এই সম্বন্ধ করিয়া আসিয়াছ? অর্জ্জুন এবং আমি; আকাশ পাতাল তফাৎ—আমি রাজার উচ্চ প্রাসাদে, আর সে দুর্গন্ধময় নর্দ্দমায়! তুমি দেখিতে পাইলে না—দুই জনে কত পৃথক কত প্রভেদ? গর্ব্বিত দেওয়ান ব্রাহ্মণকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন এবং গুরু

অর্জ্জুনকেও কত নিন্দা—কত ধিক্কার দিলেন। অর্থাশাভঙ্গ-ব্রাহ্মণ হতাশ্বাস-হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। এইখানেই বিবাহের যবনিকা পতিত হইল না।

কয়দিন গত হইল। দেওয়ান ব্রাহ্মণকে আবার ডাকিলেন—তিনি হুজুরে হাজির হইলেন। ব্রাহ্মণ এত অপমান সহ্য করিয়া কেন আসিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে ব্রাহ্মণদের ঘৃণা-পিত্ত কিছু কম—অর্থ পাইলেই আর কোন দোষ থাকে না।

সে যাহা হউক, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, দেওয়ান পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলেন,—"ঠাকুর! আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাতে রাগ করিবেন না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পুত্রে কিছু বলিলে কি, পুত্র পরিত্যাজ্য? তাহা নহে—আমি রাগ করি নাই।" দেওয়ান চাঁন্দু সা বলিলেন, "আপনি বিবাহের বাগ্দানপত্র ও আবশ্যকীয় উপঢৌকনাদি লইয়া বিবাহের দিনস্থির করিয়া আসুন।" পুরোহিত আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া অর্জ্জুনের বাটীর দিকে ছুটিলেন। যথা সময়ে পুরোহিত ঠাকুর গুরু অর্জ্জুনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত জিনিষ-পত্র দিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই গুরু অর্জ্জুন দেওয়ান চাঁন্দু সাহের উপহাস ও অপমানসূচক বাক্যাবলী শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বগর্ব্বে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং স্পষ্টই বলিলেন, তাঁর কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব না। পুরোহিত অনেক সুপারিশ করিলেন, কিছুতেই কোন ফল ফলিল না। ঠাকুরের হতাশ্বাসই লাভ হইল। তিনি লাহোরে আসিয়া দেওয়ানকে সমস্ত কথা বলিলেন।

দেওয়ান চাঁন্দু সা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি একজন ফকিরের পুত্রকে শিখ-গুরুর পুত্রের ন্যায় মান্য করিয়া নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইলাম, তথাপি ফকির অর্জ্জুন তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি রাগে লগুরাহত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। তিনি একজন ক্ষত্রিয়-সন্তান—তাঁহার কন্যা যখন বাক্‌দত্তা হইয়া গিয়াছে, তখন অন্য স্থানে বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত অপমানজনক, গর্হিত এবং কলঙ্ককর কার্য্য, এইজন্য দেওয়ান গাত্রদাহ সংযম করিলেন। দেওয়ান চাঁন্দু সা নিজে যত ভীত না হইলেন—সমাজের ভয়ে তিনি আকুল হইলেন।

তিনি তখন কি করেন—জাতি যাওয়ার বিষয় হইয়া উঠিল—তখন তিনি অগত্যা গুরু অর্জ্জুনের বাটীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। গুরু অর্জ্জুন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আহারান্তে দেওয়ান চাঁন্দু সা

বলিলেন,—গুরু! আমার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে হইবেই—নতুবা আমার জাত থাকে না। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্বীয় মূঢ়তার কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। গুরু অর্জ্জুন অচল ভাবে বলিলেন,—ফকিরপুত্রের সঙ্গে দেওয়ানপুত্রীর বিবাহ সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ দিব না এতএব দেওয়ান মহাশয় আমায় মাপ করুন—আমাকে সত্যচ্যুত করিবেন না।

তথাপি দেওয়ান পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরু অর্জ্জুন বলিলেন,—আমার প্রাণ দিতে পারি—কিন্তু ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারিব না। আমার প্রতিজ্ঞা এবং সত্য রক্ষা করিবই। উপায়ান্তর না দেখিয়া দেওয়ান চাঁন্দু সা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন অর্জ্জুন! ইহার প্রতিহিংসা একদিন চরিতার্থ করিবই করিব।

গুরু অর্জ্জুন এইরূপে কষ্টের লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। এই নির্য্যাতনই তাঁহার অমূল্য প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র জীবনের শেষ করিয়াছিল।

কি প্রকারে গুরু অর্জ্জুনের পতন হইয়াছিল তাহা আমরা পরে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঞ্জাববাসীরা জানিতেন না যে, পাঞ্জাবের বাহিরে অনেক সুন্দর সুন্দর কবি ছিলেন এবং তাঁহারা যে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন—তবে তাঁহাদের কবিতাবলী বংশানুক্রমে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল কবিতা গুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক একত্রিত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত হইল। গুরু অর্জ্জুনই ইহার সঙ্কলনকর্ত্তা। এই কেতাবে এরূপ ধর্ম্মভাব স্থাপন করা হইয়াছিল যে, সহজে লোকের ভ্রম বিশ্বাস বিদূরিত হইয়া, পরম পিতা পরমেশ্বরের সত্যালোক দেখিতে পাইল। কিন্তু প্রথমে লোকের বুদ্ধি বিকৃতি হইবার সম্ভব হইয়াছিল। গুরুর অনুচরেরা কোন্‌টি প্রামাণিক দলিল বলিয়া গ্রহণ করিবে—তাহারই চিন্তায় তাহারা অধীর হইয়াছিল। শেষে সত্য-পথে আসিয়াছিল।

এই সময় শিখগণের এইরূপ পুস্তকের দরকার হইয়াছিল—গুরু অর্জ্জুন সেই অভাব দূরীকরণার্থে গতায়ু গুরুগণের পুস্তক হইতে এবং অন্যান্য লেখকগণের পুস্তক হইতে সার-নীতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলেন—এখানে বলা আবশ্যক, ভাই গুরুদাস বল্লা নামক একজন দক্ষ এবং দায়াধজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি এই বিষয়ে গুরু অর্জ্জুনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক

স্থানে তিনি রচনা সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তকে এরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছিল যে, পবিত্র হৃদয় কবি কবির এবং ফরিদ প্রভৃতি করিতে সমর্থ হন নাই। এই পুস্তকের নাম 'আদি গ্রন্থ সাহেব' এখন ইহাই শিখদিগের ধর্ম্ম পুস্তক। এই পুস্তকে অনেক স্থলে হিন্দু-মুশলমানদের বাহ্যিক ব্যবস্থা সমূহকে নিন্দা করা হইয়াছে।

মহাত্মা বাবা নানক দেখাইয়া গিয়াছেন যে ;—'প্রকৃত যজ্ঞোপবীত' দয়ার আধার। ইহা ঈশ্বরের সন্তোষের মিলনে—মনুষ্য শরীরে লম্বিত থাকে এবং ইহার গ্রন্থি সকল আত্ম-সংযম সত্য প্রভৃতি গঠন করে। অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত সদাসর্ব্বদা সৎপথে পরিচালিত করিবে এবং সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দিবে। সহজ কথায় বলিতে হইলে লম্বিত যজ্ঞোপবীতে অষ্টপ্রহর হাত লাগিয়া থাকে, তৎক্ষণাৎ মনে করিতে হইবে যে, আমাকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার অনুরোধ করিতেছে এবং ঠিক সেই সময় অন্যান্য উপবীতহীন জন সমূহকে ঈশ্বরের প্রেম-গুণগাথা শুনাইয়া তাহাদিগকেও সেই সত্যজন সিঞ্চিত প্রেমময়ের প্রেম-পথের পথিক করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম-পথে চালিত হইলে অতি সহজে দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবমনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট সত্য।

তিনি বাবা নানকের জটিল উপদেশের সহজ ব্যাখ্যা করিয়া শিখ-হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের বৈদ্যুতিকছটা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন।

তিনি বাহ্যিক ধর্ম্ম ব্যবস্থার ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন, সেইজন্য ইস্‌লাম ধর্ম্মের বাহ্যিক ব্যবস্থাগুলির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাহ্যিক কার্য্য এবং ব্যবস্থাগুলি ধর্ম্ম-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি বাহ্যিক দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃশ্য দর্শন করিতে হিন্দু-মুশলমানকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাহ্যিক নিত্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম গ্রহণ করিতে উভয় সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্ম এবং স্বদেশ-ভক্তির জন্য তিনি কি প্রকার অমানুষিক হৃদয় স্তম্ভন নির্য্যাতন সহ্য করিয়া আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা আগামী মাসে লিখিব। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং প্রবল হৃদয়বল ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে দাম্ভিক রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে তুচ্ছ তৃণ-জ্ঞান করিয়া হাস্য। এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি দেখাইব। ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

———

মা ।

মা' নাম কি মধুর কথা শুনি শ্রবণে ;
সদা ইচ্ছা ওই নাম জপি মনে মনে ।
জমায়ে চাঁদের সুধা ;
নিবারিতে ভব ক্ষুধা,
তাই বুঝি এ ধরায় ;
বিধি বিতরিল তায় ?
মা নামে শান্তি পায় দুখী জনার মন ;
মা নামে হৃদয়ে বয় প্রেম প্রস্রবণ ।

(২)

নিদ্রাগত শিশু, কেঁদে উঠে মা-মা ব'লে ;
ভাবে সে, অভয় দিয়ে মা নেবেন কোলে ।
আকুল তৃষিত প্রাণ ;
তাই চাহে ঘনে ঘন ;
তবুও চঞ্চল মন ;
স্থির নয় অনুক্ষণ ;
দ্বার পানে চায় সদা মাতৃ আগমন ;
মাতৃ দরশনে তার জুড়াবে জীবন ।

(৩)

অসহন পুত্র শোকাতুর নর নারী ;
শোকের লাঘব করে মা-মা-মা-মা করি ।
মাতা নামে কত গুণ ;
ভাল জানে গুণী জন ;
মাতা নাম দুঃখহরা ;
মাতা যে ত্রিতাপ তারা ;
মার নামে ব'য়ে যায় মন্দাকিনী ধারা ;
মা নয়, আমার যে পূজ্যা পরাৎপরা ।

(৪)

মাতৃরূপে জননী পর নর রূপিনী ;
আমি পুজে সুখী হব শ্রীপদ দুখানি।
পদে কিবা ফুল সাজে ;—
যেন কোটি শশী রাজে ;
মাগে ! তব শ্রীচরণ ;
আমার—শিরোভূষণ ;
কিবা, শ্রীপদের শোভা আহা ! মরি মরি ;
ও পদ সরোজে হেরি, গয়া-গঙ্গা-হরি।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

ভুল।

আপনার কাজে আপনার ভুল
কি যেন বুঝি না মোরা,
আপনা আপনি হারাইয়া মূল।
তালাসে পাইনা গোড়া।
মিছামিছি ধাই লক্ষ্য হারা হ'য়ে
কোথা যাই ভেবে সারা,
এধার ওধার উদাস্ত লইয়ে
খুঁজে খুঁজে দিশেহারা !
উপেক্ষা করিয়া পরের কথায়
কি যেন গণিয়ে সারা,
বাস্তবের প্রতি করি কষাঘাত
সজোরে হাঁকিয়া খাঁড়া।
ভ্রান্তির তাড়না সতত সহিয়া
থাকি যেন হয়ে মরা,
স্থূলে করি ভুল বাতুল হইয়া
ধরাকে ভাবি যে সরা।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সমদ্দার।

বিজয়া।

তিন দিন মাতৃপূজার মহামহোৎসবের পর বিজয়ার শারদ-গোধূলিতে চিন্ময়ীর মৃন্ময়ী-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে ফিরিয়াছি, উৎসবের আনন্দ উচ্ছ্বাস-প্লাবিত হৃদয় লইয়া আবার কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছি! এই অবসরে, দাসত্ব-শৃঙ্খলমুক্ত—চিন্ময়ীর চরণ-চিন্তাযুক্ত হৃদয়ে একবার ইহজীবনের জমাখরচটা মিলাইয়া দেখিলে হয় না? ইহজীবনে এমন শুভ অবসর আর না আসিতেও পারে!

আমরা বিজয়ার মহোৎসবে উন্মত্ত হইয়াছি, কিন্তু আমরা বিজয়লাভ করিয়াছি কি? সুরথ শত্রু জয় করিয়াছিলেন—রামচন্দ্র রাক্ষস বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের বিজয়লাভ হইয়াছিল, তাই তাঁহারা আত্মীয়-বন্ধুগণকে লইয়া মাতৃপূজার পর বিজয়ার মহোৎসব করিয়াছিলেন! আমরা আমাদিগের কোন্ শত্রু সংহার করিয়াছি?—আমরা কোন্ রাক্ষসকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছি?—আমরা আমাদিগের নষ্ট-সম্পত্তির কোন্‌টুকু উদ্ধার করিতে পারিয়াছি? কাম ক্রোধাদি শত্রুসমূহ এখনও আমাদিগকে মায়াপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,—দুষ্প্রবৃত্তি-রাক্ষসগণ এখনও আমাদিগকে মোহমন্ত্রে ভুলাইয়া, আত্ম-তত্ত্বের পবিত্র-পন্থা হইতে দূরে বিতাড়িত করিতেছে,—আমাদিগের স্বধর্ম্ম-ভক্তিরূপ নষ্টসম্পত্তি এখনও উদ্ধার করিতে পারি নাই! আমাদিগের আবার বিজয়ার মহোৎসবে মত্ত হওয়া কেন?

আমরা আকণ্ঠ সিদ্ধি পান করিয়া মনে করিতেছি, এই বিজয়ার শুভ সন্ধ্যায় সিদ্ধেশ্বরীর প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলাম। কিন্তু বুঝি না এ মাদক সেবনের মহোৎসব কেন? আমরা কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছি? শ্যামা-সাধনা কি মুখের কথা! ভক্তি চাই, নিষ্ঠা চাই, একাগ্রতা চাই; তবেই শ্যামা-সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আগে চিত্তশুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে দমন কর, তার'পর লজ্জা ভয় দূর করিয়া আসনের দিকে অগ্রসর হইও, শ্যামা-সাধনায় সমর্থ হইবে। নতুবা শ্মশানের শবাসন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিবে, প্রেত-পিশাচের দল তোমাকে আসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে, বিষম আঘাতে তোমার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে!

তখন সাধন-পথে সিদ্ধিলাভ করা দূরে থাকুক, তোমাকে নিশ্চয়ই নিধন-পথের যাত্রী হইতে হইবে। প্রকৃত সাধন-পথ হইতে দূরে থাকিলে, কখনও সিদ্ধি-লাভ করিতে পারিবে না; কেবল বুনোসিদ্ধির বিকট নেশায় উন্মত্ত হইয়া আত্ম-নাশের পথ পরিস্কার করিবে মাত্র!

আমাদের এই বিজয়ার আলিঙ্গন, আমাদিগকে প্রেমের পথে পরিচালিত করুক। আমাদিগের হৃদয় একতার স্বর্ণ-সূত্রে সংবদ্ধ হউক। আমরা সকল ভ্রাতা সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে স্নেহময়ী মাতার অঞ্চলাশ্রয়ে থাকিয়া, সমস্বরে যেন মাতৃমহিমাই কীর্ত্তন করি। যেন দুঃখ, দৈন্য, বিপদ, বিষাদের মধ্যে পড়িয়াও আমরা আমাদের ঐশ্বর্য্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী মহাশক্তি মাকে বিস্মৃত না হই।

মা! নানা শস্ত্রাস্ত্রধারিণী, সিংহবাহিনী, দুর্গতিহারিণী দুর্গা, তোমার এই অধম সন্তান দলের প্রাণে শক্তি-সঞ্চার কর—তাহাদের দুর্গতি দূর কর। ঐ শুন মা, অনশনক্লিষ্ট রোগজীর্ণ শরীর হইয়া তোমার সন্তানগণ ক্ষীণকণ্ঠে আজ তোমাকে বন্দনা করিতে দিবানিশি ডাকিতেছে—"বন্দেমাতরম্!"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধোঁয়া।

অয়ি! ধোঁয়া রাণী,
তোমারে বাখানি,
তপ্ত হিয়া খানি
জুড়া'লে ভাই।
উপেক্ষি অনলে,
উঠিলে স্ববলে,
জ্বালা অবলে,
বলিহারি যাই॥
দুরন্ত হুতাশ,
তোমা হৈতে নাশ,
বুক ভরা আশ
করেছিল বোম।

তাহার কি সাধ্য,
করিবারে দগ্ধ,
দেবের আরাধ্য,
সতীর জীবন।
পূত হিয়া তোঁর,
প্রেমেতে বিভোর,
তাই অগ্নি চোর,
নারিল হরিতে।
আগুনেরে তাই,
মুখে দিয়ে ছাই,
গেলি চলি ভাই,
হাসিতে হাসিতে।

নহ এবে কাল
হ'য়ে গেলে ভাল
অনন্তে মিশাল
হিয়া তোমার।
বড় সাধ মম,
হব তব সম,
নাশি পাপ তম
লহ আমার॥

পাতক অনলে,
অঙ্গ গেল জ্ব'লে,
তাই ব'লে কোলে
করহ গ্রহণ।
স্মরি তব মন্ত্রে
বিমুখি দুরন্তে
মিশাই অনন্তে
তোমার মতন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ আচার্য্য।

"ছেলে মেয়ে।"

কে তোরা অবোধ ছেলে
কাঁদিসরে মা মা বলে
চাঁদমুখে অশ্রু ঝরে
দেখে প্রাণ ফাটে।
আয় বাছা কাছে আয়
পেয়েছে কি বড় ক্ষুধা
আয়রে নিকটে।
কাঁদ কাঁদ করি মুখ
নাহি চাহে সুখ দুঃখ
দুটী অন্ন চায়।
কে হেন সে পাষাণ
দেয়নি দুইটী অন্ন
দিয়াছে তাড়ায়।
আয় তোরা কোলে আয়
চুমি মুখগুলি।
প্রাণের সকল ব্যথা যায়
বুঝি ভুলি।

কে তুই অনাথ মেয়ে
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে
কেন দ্বারে দাঁড়াইয়ে
মা বলে কাঁদিস।
রুখু রুখু চুলগুলি
পড়েছে দুপাশে ঝুলি
সারা গায় মাথা ধূলি
আহা শীতেতে কাঁপিস।
আহা! শুখায়েছে কচি মুখ
কি বেদনা ভরা বুক
আয় কোলে আয়
প্রাণের নিভৃত দেশে
রাখিব লুকায়ে।
আয় তোরা কোলে আয়
কেন মুখ চেয়ে।
আমিই (অভাগি) মা তোদের
তোরা ছেলে মেয়ে।

সুশীলাবালা দে।

আবার যদি গো বাজাতে বাঁশরী।

আবার যদি গো বাজাতে বাঁশরী,
পুলকে যমুনা বহিত উজান,
আবার ছুটিত প্রেমের লহরী,
মাতিয়া উঠিত অলস প্রাণ।

সে বীণার তানে, নিকুঞ্জ কাননে,
আসিত ছুটিয়া ব্রজের ললনা,
মাতয়ি পরাণ তুঁহু গুণ—গানে
সরম জড়িত আবেশ মগনা।

ঋতুপতি-চির আসিত ধাইয়া,
শুক সারী সুখে পুলকে মাতিয়া,
ময়ুর ময়ুরী নাচিত শিহরি,
ধরিত বিহগ ললিত তান।

বহিত মৃদুলে মলয় অনিল,
উছলিত ধীরে যমুনা সলিল,
ধীর তানে মানে, পুলক পরাণে
পঞ্চমে—পিক গাহিত গান।

উলসিত প্রাণে—ফুটি ফুল কুল,
বিতরি সুবাস করিত আকুল,
ঝরিত সুষমা, প্রেম মধুরিমা
বরষি প্রকৃতি হাসাত ধরা।

হাসি হাসি চাঁদ সুনীল আকাশে,
হাসাত কুমুদে প্রেমের পরশে,
সে সুখ লালসে, অলস আবেশে
মেলিত নয়ন অযুত তারা!

শত বরষের অলস পরাণ
জাগিত শুনিয়া—সে বীণার তান,
হরষ আবেগে, নব প্রেম রাগে
নব বলে হৃদি হ'ত বলীয়ান্।

নবপ্রেমাবেশে মাতিত হৃদয়,
নেহারিত ধরা নব ভাবময়,
নবীন তপনে, নবীন কিরণে
উজলিত বিশ্ব অনন্ত মহান্।

পুন শ্যাম গান সুললিত তানে,
তুলিত লহরী দূর তপোবনে,
গভীর ওঁঙ্কার, ব্যাপি চারি ধার,
ছুটিত অসীম বিমান পথে।

দিগঙ্গনাগণ নাচিত সে তানে,
পুলকে চপলা চমকিত ঘনে,
প্রেম জলদল, ঢালিত শীতল
সুধা ধারা, মরি পুলক চিতে।

মুগধা প্রকৃতি উঠিত জাগিয়া,
নব বেশে, নব জীবন লাগিয়া,
নিনাদ গম্ভীরে গরজিত ধীরে,
চির-মোহ মাখা এ মৃতপ্রাণ!

ছুটিত পরাণে তড়িৎ অনল,
নাচিয়া উঠিত ধমনী শীতল
গভীর স্বাননে, গাহিত সঘনে
"বন্দেমাতরম্" এ নব গান।

তব প্রবর্ত্তিত নব ধরমের
তুলিয়া নিশান, পশিত গরবে
জীবন সংগ্রামে, ধরি—করমের
খর অসি, কীর্ত্তি রাখিত ভবে!

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার।

অভিমান।

(তুমি) জীবনের সুখ-মাধবী উষায়
যাবে কিগো সখি, চলিয়া?
যাবে যদি মনে অধরের কোণে
(কেন) রেখেছিলে হাসি লুকিয়া?

সবে উষা সখি প্রেমরবি হাসি
এখনো উঠেনি পূরবে
প্রেমের মলয়া এখনো বহেনি
প্রেমের সুরভি মাখিয়া।

(সখি,) আধ ফোটা শুধু প্রেমের প্রসূণ
আধ প্রেম-বায়ে নাচিয়া
বলিছে ভ্রমরে আধ প্রেমভাবে,
যেওনা হে সখা চলিয়া।

প্রেম-অভিনয় আধ সাঙ্গকরি
কেন সখি, যাও চলিয়া?
কেন গো সুধাংশু অমিয় হাসিয়া
পূরবে পড়িল ঢলিয়া?

এত প্রেম হাসি এত ভালবাসা
ক্ষণেকে গেলেকি ভুলিয়া?
গেল কি সরলে, গরলে মিশিয়া
(মোদের) মধুর-প্রণয়-অমিয়া?

যাবে যদি যাও মরমে দলিয়া
বিকচ-কমল-আননে,
দোষ তোমা নহে নহ তুমি দোষী
জগৎ করম-বিধানে।

তোমা বিনে যবে কাঁদি হো হো রবে
উদাস মলয় বহিবে
জেন' জেন' সখি, সেমলয়ে থাকি
অভাগা পরাণো কাঁদিবে।

(যবে) শূন্যবাসতব তোমা বিনে পড়ি
উদাস-আকুল হইবে
অভাগা পরাণো তার দুঃখেদুঃখী
কাঁদিয়া ধরণী লুটিবে।

যাবে যদি সখি, অবহেলি পদে
অভাগা আঁখির জল
চঞ্চল চরণে ফির একবার
নিরখি বদন-কমল।

দেখিব-রাখিব-লেখিব হৃদয়ে
তোমার ও বয়ান খানি
সরমে মরমে রাখিব গাথিয়া
তোমার ও মধুর বাণী।

(তোমার) মুখ-শশী হতে অমিয় কুড়ায়ে
রাখিব স্মরণ-কমলে
নয়ন কোণের চাহনীর ছটা
হৃদয়-আকাশে খেলিবে।

যাবে যদি যাও কাঁদায়ে সবায়
পাশরি করুণা হৃদয়ে
বিদায় সময়ে হাসিয়ে হাসিয়ে
পূরব পিপাসা জাগায়ে—

বলে যাও সখি, বল একবার
ভাল বাসি আমি তোমাকে
বলিলেনা সখি, অথির চরণে
চলিলে চরণে ঠেলিয়ে ?

কার আশা তবে বুকে করি বসি
ভাসিব অকূল-পাথারে !

এত প্রেম এত প্রেমমাখা হাসি
কাহার অধরে থাকিবে ?

ছিড়ে গেল সখি, প্রাণের বাধন
টুটিল প্রাণের তার
নীরবে থামিল প্রাণবীণা তান
(জগতে) সকলি নেহারি আধার

যাক্ যাক্ সব ভেঙ্গে চুরে যাক্
খাক্ হক্ সব অনলে
রবি শশী তারা যাক্ রসাতলে
ভাসিয়া প্রলয়-সলিলে।

আকুল-বাসনা হৃদয়ে ধরিয়া
উপেক্ষি গো যদি প্রাণ
(তোমার) নয়নের কোণে
এক ফোটা জল ঝরিবেনা কি গো
ভাঙ্গিবেনা অভিমান ?

শ্রীকুসুমেন্দু শীল।

রেণু।

রেণু কহে—ওহে বিশ্ব !
শ্রেষ্ঠতুমি,—তবদৃশ্য
কিমহান—প্রশান্ত—সরল !
ক্ষুদ্রআমি—তুচ্ছআমি
অসহায় দীন আমি
অর্থহীন—জনম বিফল।

বিশ্ব কহে—আর কেন
বৃথালজ্জা দাও হেন !
সুবিশাল—আমিত অসার,
ক্ষুদ্র আমি—তুচ্ছ আমি
ধন্য তুমি—শ্রেষ্ঠ তুমি
তোমাতেই আমিত্ব আমার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

রমণী-রহস্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সখিনা।

তাহার অনুমতি ব্যতীত ভৃত্য কাহাকেই এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিত না,—তিনি যে সময় সময় এই বাড়ীতে বাস করেন, তাহা তাঁহার ভৃত্য ও সুশীল বাবু ব্যতীত আর কেহই জানিত না,—সেই জন্য এই রাত্রে সহসা এই স্ত্রীলোককে একেবারে উপরের ঘরে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভৃত্যের উপর বিশেষ রাগত হইয়া, তিনি ক্রোধে তাহাকে ডাকিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু রমণী মৃদু হাস্য করিতেছে দেখিয়া তিনি আত্ম-সংযম করিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, "এ যেই হউক, ইহার সম্মুখে ধরা পড়া উচিত নহে,—ভৃত্যকে ডাকিয়া গোলযোগ করিলে স্ত্রীলোক তাহাকে পুলিশের লোক বলিয়া জানিতে পারিবে। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি ছদ্মবেশে আছেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিন্ন তাহাকে রাম অক্ষয় বলিয়া কেহই চিনিতে পারিবে না। আর রঙ্গিনী,—সে তাহার নাতিনী।"

তিনি দেখিলেন, "স্ত্রীলোকের বয়স ২৫ সের ঊর্দ্ধ নহে,—তবে এখনও পূর্ণ যুবতী,—অতি সুন্দরী,—এমন সুন্দরী সহজে চক্ষে পড়ে না। আয়ত লোচনা,—চক্ষু দুইটিতে যে এক অপরূপ বিভা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, এ চখের সম্মুখে যোগীরও যে মস্তক বিঘূর্ণিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি!

পরিধানে একখানি রঙ্গিন কাপড়—হাতে বেনারসী চুড়ী ভিন্ন আর কোন অলঙ্কার নাই। এরূপ অপরূপ সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারের আবশ্যক হয় না।

রামঅক্ষয় বাবু অনিমিষ নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুন্দরীকে দেখিতে ছিলেন। তাহার বিস্মিত, ক্রুদ্ধ বিরক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া রমণী মৃদু মৃদু হাসিতে ছিল, তাহার মধুর হাসিতে রামঅক্ষয় বাবুর ক্ষুদ্র গৃহ যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়া ছিল।

তিনি কথা কহিবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোক বলিল, "চাকরের উপর রাগ করিবেন না,—তাহার দোষ কি,—দোষ আপনাদের।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "তুমি কে,—এখানে কি জন্য আসিয়াছ,—কি বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।"

রমণী আবার হাসিয়া বলিল, "আপনার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের এটা বুঝিতে ক্লেশ পাইতে হইল ?"

"তুমি আমায় কি জান, যে আমায় এ কথা বলিতেছ ?"

"কিছু কিছু জানি বই কি ? বলিতেছিলাম, আপনার চাকর আমায় অবধি এখানে আসিতে দিয়াছে বলিয়া আপনি তাহার উপর অন্যায় রাগ করিতেছেন।"

"আমি বৃদ্ধ লোক,—নাতিনীটী লইয়া নির্জ্জনে থাকি, সংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, তাহাই কেহ যে আমায় বিরক্ত করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না।"

এই কথায় রমণী হাসিয়া আকুল হইল। রামঅক্ষয় বাবু তাহার হাসিতে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "তবে কি এ আমায় চেনে ? কিরূপে—চিনিবে! এ বাড়ীর কথা কেহ জানে না,—তবুও যেরূপ ভাব দেখিতেছি এ স্ত্রীলোক সহজ ব্যাপার নহে। সাবধান হইতে হইল।"

রমণীর হাসি আর থামেনা, রামঅক্ষয় বাবু বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "তুমি বুড়ো মানুষ দেখিয়া হাসিতেছ,—এটা কি ভাল ?"

রমণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা নয়,—আপনার চাকরের বিন্দুমাত্র দোষ নাই। সে ঘরে শুইয়া আছে,—আমায় ভাল দেখিতে পায় নাই। আমায় দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে আপনার স্ত্রীরূপী সুশীল বাবু আসিতেছেন।

সহসা সম্মুখে কাল সর্প দেখিলে মানুষের যেরূপ ভাব হয়, রামঅক্ষয় বাবুর সেই ভাব হইল। তবে তাহার বিষয় কিছুই গোপন নাই,—তিনি জানিতেন তাহার এই গুপ্ত বাড়ীর কথা কেহ জানিত না,—এখন তিনি বুঝিলেন তাহার এত সাবধানতা সমস্তই পণ্ড হইয়াছে। যদি এই স্ত্রীলোক জানিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই আরও অনেকে জানিয়াছে।

তিনি আরও বিস্মিত হইলেন যে, তাহাদের অদ্যকার ছদ্মবেশের কথা কেহই জানিত না। তবে এই স্ত্রীলোক কিরূপে জানিল ? কেবল এ কেন, অপরেও জানিয়াছে, গুনেন্দ্র ও বরেন্দ্রও জানিয়াছে, নতুবা তাহারা কিরূপে

পথে বালিকাকে বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহার নিকট ফেলিয়া পলাইল। অথচ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কেহই জানিত না যে, তাহারা আজ রাত্রে কি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কোথায় যাইবেন,—তবুক্ত হঠাৎ ধরা দেওয়া উচিত নহে। তিনি কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগলের ন্যায় কি বলিতেছ,—সুশীল বাবুর স্ত্রী কি?"

রমণী হাসিয়া বলিল, "রামঅক্ষয় বাবু,—আপনি মনে করেন, আপনিই বুদ্ধি ধরেন, আর কাহারও ধড়ে বুদ্ধি নাই। এটা আপনার বিষম ভুল!"

আর ছদ্মবেশের ছল করা বৃথা দেখিয়া রামঅক্ষয় বাবু—অতি দৃঢ় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তুমি কে আমি তাহাই শুনিতে চাহ।"

রমণী হাসিয়া বলিল, "তবে শুনুন,—আমি সখিনা।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ধূর্ত্তে-ধূর্ত্তে।

রামঅক্ষয় বাবু মধুপুরের ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে করিতে সখিনার ইতিহাস সাবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন,—সখিনাই যে গোঁসাই বাবুর স্ত্রী সাজিয়া কাশি হইতে আসিয়া বনমালি রায়ের স্কন্ধে চাপিয়া তাহার সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া সহস্র অনর্থ ঘটাইতেছে,—তাহাও তিনি অবগত হইয়াছিলেন, সেই সখিনা যে স্বইচ্ছায় বাঘের মুখে আসিয়াছে,—ইহাতে তিনি কেন সকলেই বিস্মিত হইত। তিনি বুঝিলেন তাহার সহস্র সাবধানতা সত্বেও গোঁসায়ের দল তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ—সকলই অবগত হইয়াছে। তিনি যাহা করিয়াছেন, যাহা করিতেছেন, ইহারা তাহার সকলই জানে, এখন আবার দুঃসাহসিকতার সহিত তাহার সঙ্গে এই রাত্রে দেখা পর্য্যন্ত করিতে আসিয়াছে,—ধূর্ত্তে ধূর্ত্তে, কঠিনে কঠিনে যুদ্ধ,—এ যুদ্ধ সহজ নহে, ইহাদের নিকট পরাজিত হইলে তাহার এত দিনের মান সম্ভ্রম সমস্তই নিন্দায় ও লজ্জায় অতল সাগরে নিমগ্ন হইবে।

তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার বিস্মিতভাব হৃদয় হইতে দূর করিয়া, মুখে ঘোর কঠোরভাব আনিয়া বলিলেন। "যখন তোমরা এত দূর জানিতে পারিয়াছ,—তখন তোমাদের কাছে ছলকরা বৃথা——"

সখিনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

রামঅক্ষয় বাবু রাগতস্বরে বলিলেন, "তুমি হাসি-তামাসার কথা মনে করিতে পার,—কিন্তু এ হাসি-তামাসার ব্যাপার নয়।"

"তবে কি ব্যাখ্যা করুন।"

ব্যাখ্যা আদালতে,—তাহার পর কাশীতে দ্বীপান্তর হইবে।"

"আপনার ন্যায় একটা লোক গাধা হইয়াছেন বলিয়া আপনাকে একটু হিতোপদেশ দিতে আসিয়াছি।"

রামঅক্ষয় বাবু সহসা রাগিতেন না। এতকাল ডিটেক্‌টিভগিরি করিয়া তাহার হৃদয় হইতে সকল প্রকার বৃত্তিই প্রায় স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল তবুও চপলা স্ত্রীলোকের উদ্ধত কথায় তাহার হৃদয়ে রাগের উদয় হইল,—তিনি রাগতস্বরে বলিলেন, "জান, আমি তোমায় এখনই গ্রেপতার করিতে পারি?"

সখিনা অবিচলিত ভাবে বলিল, "না পারেন না।"

"পারি না?"

"নিশ্চয়ই নয়!"

"তাহা হইলে দেখাইতেছি পারি কি না।"

"কেন সকলের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইবেন। আপনার ন্যায় আমার ও একটু আইন জ্ঞান আছে,—আমার বিরুদ্ধে আপনি কোনই প্রমাণ দিতে পারিবেন না,—কোন প্রমাণও পান নাই।"

"তুমি গোঁসাইয়ের দল,—তাহার জাল স্ত্রী সাজিয়া, সখিচাদকে জাল ছেলে বানাইয়া—"

"আসুন, অত দৌড়াইবেন না,—আপনি যাহা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা আমি জানি, আমি যে কাশীর সখিনা তাহা স্পষ্ট স্বীকার করি,—গোঁসাই যে আমার উপপতি ছিল তাহাও স্বীকার করি,—তবে সখিচাদ গোঁসাইয়ের যথার্থ ছেলে, তাহার স্ত্রীর ছেলে,—একজন ব্রাহ্মণ জমীদার তাহার মত ব্রাহ্মণের ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইবে,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ইহাতে কোজদারির ব্যাপার কি আছে!"

"তোমরা বনমালী রায়কে ঠকাইয়া—এই কাজ করিতেছ?"

সখিনা হাসিয়া তাহার অপরূপ লাবণ্যময় অঙ্গের দিকে চাহিয়া বলিল, "রামঅক্ষয় বাবু, আপনার ন্যায় বিবেচক লোকের মুখে এ কথা শোভা পায় না—এরূপ দেখিয়া একটা বুড়ো জমীদার যে পাগল হইয়া সর্ব্বস্ব দিতে চাহিবে, ইহা কি আপনি এই প্রথম দেখিলেন? হা, আমার অদৃষ্ট!

সে যদি আমার জন্য পাগল হয়, তাহাতে আমার অপরাধটা কি? ইহাতে আপনার ন্যায় পুলিশের কি করিবার আছে।"

এই কথায় রামঅক্ষয় বাবু প্রায় নির্ব্বাক হইলেন। কিন্তু তিনি সহজে পরাভূত হইবার লোক ছিলেন না। বলিলেন, "তোমাদের নামে কাশীতে অনেক কথা শুনিয়াছি।"

সখিনা হাসিয়া বলিল, "আমিও আপনার নামে অনেক কথা শুনিয়াছি। শোনা কথা যে বিশ্বাস করে, সে গাধা নয় কি পুলিশ বাবু?—কাশীতেই তাহা হইলে আপনারা আমাদের শ্রী-ঘরে রাখিতেন। প্রমাণ নাই—রাম-অক্ষয় বাবু,—প্রমাণ নাই।"

"তোমরাই মধুপুরে হত্যাকাণ্ড করিয়াছ।"

"আপনার ন্যায় পণ্ডিত লোক এই কথা বলিতেছেন?—অখিল আমাদের লোক, তাহা আপনি জানেন,—সে আমাদের কাজ করিতেছে, আর আমরাই তাহাকে খুন করিব।"

এবার এতক্ষণে রামঅক্ষয় বাবু সুবিধা পাইলেন, সগর্ব্বে বলিলেন, "তাহা হইলে স্বীকার করিতেছ যে, তোমরাই রাণীর মেয়েকে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে,—ইহাতেই তোমাদের দ্বীপান্তর হইবে।"

সখিনা হাসিল,—বলিল,—"কাহার সাক্ষীতে—এই রঙ্গিণীর সাক্ষীতে,—যাকে লোকে আপনাকে যাহা বলিবে,—তাহা সমস্ত দিন ধরিয়া মুখস্থ করাই-য়াছে। হা, হা,—রাম অক্ষয় বাবু!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সখিনার প্রস্তাব।

রামঅক্ষয় বাবু প্রকৃতই এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হইলেন। বলিলেন, "যখন তুমি স্বইচ্ছায় আমার এখানে আসিয়াছ,—তখন তোমার নিশ্চয়ই কোন কথা বলিবার আছে,—বৃথা কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ কি?"

সখিনা হাসিয়া বলিল, "এতক্ষণে আপনার মুখে একটা বুদ্ধিমানের কথা শুনিলাম। নিশ্চয়ই কোন প্রস্তাব না থাকিলে কখনই মহাশয়ের কাছে আসিতাম না। আমার এ রূপ এ স্থানে তাহলে দেখাইবার নহে।"

এই বলিয়া সে তাহার সুন্দর চক্ষের অপরূপ ভাব ধরিয়া তাহার উন্নত বক্ষের দিকে চাহিল।

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "রূপ দেখিবার বয়স আমার আর নাই।"

অনেকে ঐ কথাই বলে,—"বুড়ো বনমালি রায় আমার গোলাম হয়েছে।"

"থাক এখন প্রস্তাবটা কি তাই শুনি।"

"তবে অতি সংক্ষেপেই বলি,—আমি গোঁসাইকে সরাইতে চাহি।"

রামঅক্ষয় বাবু বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি! কি!"

সখিনা মৃদু হাসিয়া বলিল, "ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি দেখিতে পাইলেন,—সে কি আমার পায়ের আঙ্গুলের যোগ্য?"

রাম অক্ষয় বাবু এবার হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়।"

"হা—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই,—তাহাকে আমার যত দিন দরকার ছিল, তত দিন তাহার উপর অনুগ্রহ করিয়াছি, এখন সে কেবল বিরক্তজনক হইয়া উঠিয়াছে—"

"হইবারই কথা।"

"উপহাসের কথা নয়,—তাহাকে আর আমার প্রয়োজন নাই;—তাহাই তাহাকে সরাইতে চাহি।"

"সব পরামর্শ।"

"আবার উপহাস!"

"উপহাস করিতেছি না,—এখন এ দাসের উপর কি হুকুম।"

"হুকুম এই তাহাকে সরাইতে হইবে।"

"কি রূপে—আমি তাহাকে সরাইব কি রূপে"

"অতি সহজে।"

"ব্যাখ্যা করুন।"

"তাহার দ্বীপান্তর হইতে পারে।"

"তাহা জানি, কিন্তু—"

"অধীর হইবেন না,—কথা কহিতে দিন।"

"বলুন।"

"প্রথম আমি তাহাকে ধরাইয়া না দিলে পুলিশের বাপের সাধ্য নাই যে তাহাকে কিছু করে!"

"তাহা কতকটা বুঝিয়াছি।"

"তাহাকে দ্বীপান্তর পাঠাইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন,—আমি আপনাদের সে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

"বেশ—ভাল কথা, আমিও আপনার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।"

"কড়ার আছে।'

"কড়ার! কি কড়ার?'

"প্রথম,—আমার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবেন না।"

"বলুন—সব শুনি"

"দ্বিতীয়,—গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্র আমায় লাক টাকা দিবে।"

"এটা আমার সাধ্যায়ত্ত কিরূপে?"

"সবই বলিতেছি।"

বলুন—আর কথা কহিব না।"

"তৃতীয়,—আমি বনমালি রায়কে লইয়া কাশী গিয়া বাস করিব,—আমি যতদিন বাঁচিব মাসে মাসে ৫০০৲ করিয়া টাকা জমিদারি হইতে দিতে হইবে।

"তাহার পর?"

"তাহার পর, চতুর্থ—উপস্থিত বা ভবিষ্যতে আপনারা কেহই আমার অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।"

"আর কিছু আছে?"

"না ইহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট,—বুড়া বনমালি রায়ের স্ত্রী নাই,—সে আমার সঙ্গে কাশী যাইয়া বাস করিতে রাজী হইয়াছে।"

"সকলই শুনিলাম,—প্রথমতঃ যদি আপনি সাহায্য করিয়া গোঁসাইয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেন, তাহা হইলে তাহাকে দ্বীপান্তরে পাঠাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

"বেশ, আমি তাহাই চাই।"

"কিন্তু গুণেন্দ্র বা বরেন্দ্র টাকা দিতে রাজী হইবে কি না তাহা কিরূপে বলিব।"

"রাজি না হইলে তাহাদের উপায় কি। বারেন্দ্র গুণেন্দ্র প্রাণের ভয়ে সদাই সশঙ্কিত রহিয়াছে,—বরেন্দ্র বাড়ী ছাড়া হইয়াছে,—তাহার জমীদারি পাইবার আশা নাই,—গুণেন্দ্র ও তাহার বাপ মকর্দ্দমা মামলায় আস্থর হইয়া উঠিয়াছে, এ অবস্থায় আমার প্রস্তাবে তাহারা আনন্দের সহিত রাজী হইবে।"

আপনিই তাহাদের এ প্রস্তাব করেন নাই কেন?"

"আমি প্রস্তাব করিলে তাহারা আমার কথা বিশ্বাস করিত না,—ভাবিত আমি আবার একটা কি গোল বাধাইতেছি। আপনি গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করিলে,—আর এই প্রস্তাব করিলে তাহারা অবিশ্বাস করিবে না—নয় কি?"

"কতকটা বটে!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রঙ্গিনীর অন্তর্দ্ধান।

সখিনা হাসিয়া বলিল, "আপনি দিনকতক আমার কাছে থাকিলে আপনার বুদ্ধি বাড়িতে পারে।"

রামঅক্ষয় বাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, "দোহাই আপনার সে অনুগ্রহটায় আর কাজ নাই।"

"অনেকেই ইহাতে চরিতার্থ হইয়া যায়,—যাক্—এখন কি বলেন, আমার প্রস্তাবে রাজী?"

"প্রথম গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্রের সহিত দেখা করিতে হয়। এই মধুপুরের খুনে যে তাহারা জড়িত আছে,—যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে তাহাদের উপর বিশেষ সন্দেহ হয়।"

"আমারও হয়।"

"কেন—শুনিতে পাই কি?"

"অখিল আমাদের লোক,—মেয়েটাকে হাত করিবার জন্য সুখচাঁদ ও অখিল সাহেবটাকে জোগাড় করিয়াছিল,—এ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্র প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিল,—কাজেই তাহারা ব্যতীত অখিল ও সাহেবকে খুন আর কে করিবে? তাহারা নিজ হাতে গুলি না করিলেও তাহাদের লোকে যে এই কাজ করিয়াছে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

"খুব সম্ভব, তাহাই ঠিক।"

"নিশ্চয়ই তাহারা বা তাহাদের লোক সর্ব্বদাই রাণীর বাড়ীর পাহারায় ছিল। সুখচাঁদ, অখিল প্রভৃতি মেয়েটাকে বাহির করিয়া আনিলে,—ইহারা নিশ্চয়ই তাহাদের পিছু পিছু গিয়াছিল,—তাহার পর সাহেব মেয়ে আনিতে ভুল হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে, এই সময়ে অখিলকে ও সাহেবকে ইহারা খুন করিয়াছে।"

"খুব সম্ভব,—তবে দুঃখের বিষয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করা যায় না,—তাহাতে তাহারা বড় লোক,—বড় বড় উকীল কৌন্সিল দিবে। আপনারা ইচ্ছা করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে পারেন।"

"কেমন করিয়া?"

"অখিল ও সুখচাঁদ একলা যায় নাই—সঙ্গে লোক ছিল;—তাহারাই—সে আহত হইলে ধরাধরি করিয়া লইয়া পলায়,—তাহার পর তাহারা মৃত দেহ বটগাছ তলায় রাখিয়া পলাইয়াছে। কে গুলি করিয়াছিল,—নিশ্চয়ই তাহারা তাহাকে দেখিয়াছিল,—তাহারা সাক্ষী দিলে প্রকৃত খুনী ধরা পড়ে।"

"কথা ঠিক,—তবে আসল কথা,—অখিল ও সুখচাঁদ যে সব লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল,—তাহারা কে তাহা আমি জানি না।"

"গোঁসাই জানে।"

"সে এখানে আদৌ আসে নাই।"

"সুখচাঁদ তো জানে?"

"নিশ্চয়ই!"

"তাহার কাছে জানিয়া লইলেই হইল,—সে নিজেও নিশ্চয় খুনীকে দেখিয়াছিল।"

"আপনার মত বুদ্ধিমান লোক হইয়া এ কথা বলিতেছেন?"

"কেন?"

"সে তাহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? খুনী ধরাইয়া দিতে গেলে তাহাকে মেয়ে চুরি স্বীকার করিতে হয়,—কেহ কি আপনার পায় আপনি কুড়াল মারিতে পারে?"

"তাহাকে সরকারী সাক্ষী করা যাইতে পারে।"

"তা বটে,—তবে সে যদি গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্রের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়,—তাহা হইলে কেহ কি তাহার কথা বিশ্বাস করিবে?"

"সে ভার আমার থাকিল।"

"তবে সত্য কথা বলিতে হইল;—সে পলাইয়াছে।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিয়া উঠিলেন, "পলাইয়াছে, সে কি!"

সখিনা বলিল, "এই জন্যই আমি বদমাইশ গোঁসাইকে দ্বীপান্তর পাঠাইতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। সে ও সুখচাঁদ পরামর্শ করিয়া আমায় ফাঁকি দিবার চেষ্টা পাইয়াছে,—আমার সঙ্গে বদমাইস!

"তাহারা কি করিয়াছে।"

"বনমালী রায়ের সিন্দুকে প্রায় দু'লাখ টাকার সোণা রূপার জিনিষ ছিল, সুখচাঁদ সে সমস্ত লইয়া পলাইয়াছে।"

"উপযুক্ত পোষ্যপুত্র বটে।"

"কেবল ইহাই নহে,—আমার সমস্ত গহনা,—আমার যাহা কিছু ছিল সমস্ত লইয়া পলাইয়াছে। নেমকহারাম,—আমি এতদিন খাওয়াইয়া আসিতেছি!"

"এখন বুঝিলাম অনেক দূর গড়াইয়াছে। গোঁসাই কোথায়!"

"সে সুন্দরপুরেই আছে।"

"সে কি বলে?"

"সে দিব্বি করিয়া বলিতেছে যে, সে ইহার কিছুই জানে না।"

"পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে?"

"না,—আমিই বনমালী রায়কে বারণ করিয়া রাখিয়াছি—প্রথমে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিব বলিয়া আসিয়াছি।"

রামঅক্ষয় বাবু সকল শুনিয়া চিন্তিত হইলেন,—তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—সহসা তিনি একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রঙ্গিনী—সে কোথায়?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন সন্দেহ।

রামঅক্ষয় বাবু সখিনার কথোপকথনে এতই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, যে তিনি একরূপ রঙ্গিনীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে ঘরে বসিয়াছিল,—কখন উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে,—তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। তাহাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ভাবে গৃহের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, তাহার পর সন্দিগ্ধভাবে সখিনার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলেন,—তবে কি ইহার এই সকল কথাই তাঁহার চক্ষে ধুলি দিবার জন্য,—কৌশলে মেয়েটাকে হস্তগত করাই উদ্দেশ্য,—সখিনা কি তাহাকে তাঁহার

চক্ষের উপর সরাইয়া দিয়াছে,—কিছুই ইহার নিকট অসম্ভব নহে। কিন্তু সখিনার মুখ দেখিয়া তাহার উপর সন্দেহ করা যায় না;—সেও বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাইতো,—এই ঐখানে মেয়েটা বসে ছিল—কোথায় গেল।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "সে কথা তুমি ভাল জান?"

এই কথায় সখিনা আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি,—দেখিতেছি, আপনি মনে করিতেছেন যে আমিই মেয়েটাকে সরাইয়া দিয়াছি,—ইহাতে আমার স্বার্থ কি। বাপ মা নেই একটা দাসীর মেয়ে লইয়া আমি করিব কি?"

"তাহা তুমিই জান,—তোমার লীলা বোঝা ভার।"

"যথার্থই রামঅক্ষয় বাবু,—যথার্থই বলিতেছি আমি ইহার কিছু জানি না,—সে যে এখানে আছে,—তাহাও এখানে আসিবার পূর্ব্বে জানিতাম না। আপনার উপর লোক পাহারায় রাখিয়াছিলাম, তাহা ঠিক,—তাহার কাছেই আপনাদের ছদ্মবেশের কথা শুনিয়াছিলাম,—আপনি যে একটা বাক্স লইয়া আসিয়াছিলেন, সে খবরও পাইয়াছিলাম,—তবে সেই বাক্সের মধ্যে মেয়েটা ছিল তাহা জানিতাম না।"

রামঅক্ষয় বাবু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "সুশীল কোথায় গিয়াছে,—তাহাও বোধ হয় খবর রাখেন?"

সখিনা হাসিয়া বলিল, "তাহা রাখি,—আপনার সঙ্গে একটু একা কথা কহিব স্থির করিয়াছিলাম,—তাহাই বাধ্য হইয়া খানিকক্ষণের জন্য তাঁহাকে একটু সরাইয়া রাখিতে হইয়াছে,—আমি এখান হইতে চলিয়া গেলেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন,—কি হইয়াছে তাঁহার মুখেই শুনিবেন। এই মেয়েটাকে আমি সরাই নাই,—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "সে কলিকাতায় মোটে তিন দিন আসিয়াছে,—তাহার পর তাহাকে বাক্সবন্দি করিয়া আমার কাছে রাখিয়া পলাইয়াছিল,—সে যাহাদের বাড়ী আছে,—তাহাদের নাম জানে না,—তাহারা কোথায় থাকে তাহার কিছুই জানে না,—এ অবস্থায় সে কি কখনও সাহস করিয়া কলিকাতার পথে বাহির হইতে পারে?"

"রামঅক্ষয় বাবু,—আপনি এত বড় বিবেচক লোক হইয়া কিরূপে তাহার সমস্ত কথা বেদবাক্য বলিয়া মনে করিতেছেন? সে কি মিথ্যা কথা বলিতে জানে না,—সে যে মুখস্থ করা কথা বলিয়াছে,—তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? যাহারা তাহাকে আপনার চোকে ধুলো দিবার জন্য

পাঠাইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই কাছে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,—মেয়েটাকে বলা ছিল, সুবিধা পাইলেই সে বাহির হইয়া তাহাদের কাছে যাইবে—সে এত কি হাবা মেয়ে,—ঠিক তাহাই করিয়াছে।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব!"

সখিনা বলিল, "কিসে অসম্ভব?"

"কারণ-আছে।" বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু বাহিরে গিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন,—সে ছুটিয়া আসিল।

অসম্ভব বলিবার রামঅক্ষয় বাবুর বিশেষ কারণ ছিল,—সখিনার সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি একবার উঠিয়া গিয়া ভৃত্যকে কানে কানে বলিয়া আইসেন, "দরজায় থাক্,—কেউ যেন বাড়ীতে না আসতে পারে,—রাস্তায়ও নজর রাখিবি—যেন একমিনিটের জন্যও দরজা ছাড়িস না, যতক্ষণ আমি না আসিব,—ততক্ষণ কিছুতেই দরজা ছাড়িস না।"

সখিনার মত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তিনি এরূপ সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন ভৃত্য দরজায় পাহারায় আছে,—তিনি ভৃত্যকে দরজায় থাকিতে বলিয়া ঘরে আসিয়া রঙ্গিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন,—সুতরাং সে কোন মতেই বাহির হইয়া যাইতে পারে না, তাহার ভৃত্য এরূপ নহে,—তাহাই তিনি অসম্ভব বলিয়া উঠিয়াছিলেন।

ভৃত্য আসিলে তাহাকে বলিলেন, "মেয়েটাকে বাহিরে যাইতে দিয়াছিস কেন?"

সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বাবু!—আমি বরাবর দরজায় বসে আছি। কেউ বাহিরে যায় নি,—সে নিশ্চয়ই এই বাড়ীতে আছে।

সখিনা বলিল, "হয়তো পায়খানায় গিয়াছে।"

"সম্ভব" বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু আলো লইয়া রঙ্গিনীর সন্ধানে বাহির হইলেন। সমস্ত বাড়ীর উপর নীচে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন,—কিন্তু রঙ্গিনীকে পাইলেন না। সে কি বাতাসে মিলিয়া গেল?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সখিনার শেষ কথা।

রামঅক্ষয় বাবুর ভৃত্য অতি পুরাতন বিশ্বস্থ ভৃত্য,—এই তিন বৎসর সে তাহার দক্ষিণ হস্তরূপে কাজ করিতেছে,—বিপদে আপদে নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে,—এরূপ ভৃত্যকে তিনি কখনই অবিশ্বাস করিতে পারেন না,—নিশ্চয়ই সে দরজায় পাহারায় ছিল,—রঙ্গিনী নিশ্চয়ই দরজা দিয়া পলাইতে সক্ষম হয় নাই, তবে সে কিরূপে এ বাড়ী হইতে পালাইল!

এক ছাদের উপর দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ছাদে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহার এই বাড়ীর ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই, কেবল একটা মই আছে,—নিশ্চয়ই রঙ্গিনী এই মই দিয়া ছাদে উঠিয়া অপর বাড়ীর ভিতর দিয়া পলাইয়াছে। তাহাই যদি হয়, তবে কেহ পূর্ব্ব হইতে তাহাকে কিরূপে পলাইতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহারা তাহার বাড়ীর সকল সমাচারই জানিত,—তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর লোকের সহিত নিশ্চয়ই পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহারা যেই হউক তাহাদের এরূপ লুকোচুরি করিবার অর্থ কি!

অথচ সখিনা যেরূপ ভাব দেখাইতেছে, তাহাতে তাহার উপর সন্দেহ হয় না—তবে এরূপ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই, আজীবন অভিনয় করিয়াই আসিতেছে,—সত্য কথা কি তাহা ইহাদের কথায় ও ভাবে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

রামঅক্ষয় বাবু ভাবিলেন, যাহা হউক, এ এখন আমার হাতে আসিয়াছে, আমি সহজে ইহাকে চোকের আড়াল করিতেছি না,—যাহা যাহা এ বলিল, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানা এখন আর বড় কঠিন হইবে না। সে যে রঙ্গিনাকে সুখচাঁদ, অখিল ও গোঁসাই প্রভৃতির বিরুদ্ধে পাঠাইবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই, সে যাহা বলিল, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার দুশ্মন লোকের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য সে যে পারতপক্ষে সবই করিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রামঅক্ষয় বাবু মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন, সুচতুরা সখিনা তাহা বুঝিল,—বলিল "রামঅক্ষয় বাবু,—সন্দেহ করিবেন না, আমি যাহা বলিলাম, তাহার এক কথাও মিথ্যা নহে। স্বীকার করি, আমি জীবনে বড় একটা

সত্য কথা বলি নাই, তবে এখন আর ভাল লাগে না,বয়স হইয়া আসিতেছে,—এখন স্থিরভাবে শান্তিতে ও সুখে জীবন কাটাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি বুড়ো বনমালী রায়কে পাইয়া আমি যাহা চাই, তাহাই পাইয়াছি,—গোসাইয়ের মত লোকের সঙ্গে আসিয়া আর জাল জুয়াচুরি বদমাইসিতে মিশ্রিত হইতে ইচ্ছা নাই ; বিশেষতঃ তাহারা এখন কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়া আমারই সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কিন্তু আবার বলিতেছি যে আমি এখন মিথ্যা কথা বলিতেছি না।"

রামঅক্ষয় বাবু সন্দিগ্ধচিত্তে সখিনার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। সে নীরব হইলে তিনি বলিলেন "অবিশ্বাস করা কি অন্যায় !"

সখিনা বলিল "আমি কি বলিতেছি অন্যায় ! আমি নিজে আপনার কাছে আসিয়াছি, আমি জানি আপনি সহস্র চেষ্টা করিলেও আমার বিরুদ্ধে কোন কিছু প্রমাণ করিতে পারিবেন না। অখিল মরিয়া গিয়াছে;—সুখচাঁদ পলাইয়াছে। গোঁসাই নিজের স্বার্থের জন্য আমার নামে কোন কথা বলিবে না।"

"গোসাই কি কলিকাতায় আসিয়াছে ?"

"না সে সুন্দরপুরে আছে—জমীদারি দেখিতেছে—আমি বনমালী রায়কে লইয়া কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছি। প্রধান উদ্দেশ্য আপনার সঙ্গে দেখা করা, অবশ্য আমাদের বাসা দেখিবেন,—হয়তো আপনার সন্দেহ দূর হইবে। এখন কি বলেন—আমার প্রস্তাবে সম্মত ?"

গুণেন্দ্র বা বরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা না হইলে কিরূপে কি বলিব।"

"সে কথা ঠিক,—কাল সকালেই তাহাদের সঙ্গে দেখা করুন।"

"তাহারা কোথায় আছে জানা।"

"আপনার এত খবর রাখিয়াছি, আর তাহাদের খবর রাখি নাই ;—যাহাদের সহিত লড়িতে হয়, তাহাদের সকল খবর রাখা কি উচিত নয়, রামঅক্ষয় বাবু ?"

রামঅক্ষয় বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই,—এখন তাহারা কোথায় আছে।"

"১২ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে আছে, তবে কয়দিন এখানে থাকিবে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। আপনি বোধ হয় জানেন আমাদের ভয়েই

তাহারা এক স্থানে বেশি দিন থাকে না। কখন বদ্দিনাথ, কখন কারমাঠা,—কখন কলিকাতা,—কখনও বা গ্রামে থাকে। গোঁসাই বরেন্দ্রকে একেবারে সরাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহে,—তাহার স্ত্রীকেও গুলি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। গুণেন্দ্র রাত্রে শাঁওতালনীর সাহায্যে তাহাকে নিচে না লইয়া গেলে,—গোঁসাই নিশ্চয়ই তাহাকে খুন করিত।"

"সকলই শুনিলাম,—আজ রাত্রে ভাবিয়া স্থির করিয়া যাহা হয় কাল করিব।"

"তবে আজ এই পর্য্যন্ত।"

রামঅক্ষয় বাবু কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সখিনা সত্বর উঠিয়া দ্রুতপদে শিড়ি দিয়া নিম্নে নামিল।

রামঅক্ষয় বাবুও সত্বর পদে নিম্নে আসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "পথ ছেড়ে দেও।"

সখিনা তাহার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "গোপনে পিছু লইবার আবশ্যক কি, রামঅক্ষয় বাবু,—হয় নিজে সঙ্গে আসুন না হয় চাকরকে সঙ্গে দিন। দূরে আমার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। এটা স্থির যে আমি যদি আপনার চক্ষে ধুলি দিয়া পালাইতে ইচ্ছা করিতাম,—তাহা হইলে আপনার সমস্ত ভারতবর্ষের পুলিশ আমার পিছু লইতে পারিত না।"

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা সহস্রবার স্বীকার করি। তবে যখন তোমার সঙ্গে একত্রে কাজই করিতে হইতেছে,—তখন পরস্পরের বাসার ঠিকানাটা জানা উচিত নয় কি?"

"নিশ্চয়ই?"

"তুমি বহুকাল হইতেই আমার ঠিকানা জান,—সে বিষয়ে তোমার জিত আছে,—আমি অন্যদিকে তোমার ঠিকানা জানি না?

"এইটাই আপনাদের ন্যায় পুলিশের বিচক্ষণতা।"

"হয় তো স্বীকার করিতেছি।"

"তবে সঙ্গে আসুন।"

"কিছু কাজ আছে,—চাকরকে সঙ্গে দিতেছি।"

"বেশ—সে সঙ্গে আসুক।"

রামঅক্ষয় বাবু ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন,—সে সত্বর তাহার ঘর হইতে চাদর লইয়া ছুটিয়া আসিল।"

সখিনা নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া বলিল, "ঐ পাশের ছোট গলির মধ্যে গেলে একটা চাবি দেওয়া পড়ো বাড়ী দেখিতে পাইবেন,—আপনার বন্ধু সেখানে আছেন;—এই চাবি নিন,—তিনি উপস্থিত থাকিলে আপনার সঙ্গে এত কথা হইত না,—তাহাকে একটু কষ্ট দিয়াছি,—মাপ করিতে বলিবেন,—আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের তাঁহার মতন যুবা পুরুষের উপরে অনেক জোর চলে।"

হাসিতে হাসিতে চাবিটা ফেলিয়া, সখিনা চাকরকে বলিল, "আয়।"

তাহার পর সে দ্রুদপদে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। ভৃত্য তাহার সঙ্গে ছুটিল।

রামঅক্ষয় বাবু বাহির হইয়া দেখিলেন, সখিনা দ্রুতপদে সে রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তায় অন্তর্দ্ধতা হইয়া গেল—ভৃত্যও তাহার পশ্চাত পশ্চাত দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তখন রামঅক্ষয় বাবু মনে মনে বলিলেন, "বোধ হয় নিজে সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। সখিনার ন্যায় স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার চাকর সহস্র চালাক হইলেও আটিয়া উঠিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।"

তিনি বাড়ীর ভিতর হইতে চাবি কুলুপ আনিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সুশীল বাবুর সন্ধানে গেলেন,—তাহার বাড়ী হইতে শত হস্ত দূরে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার গলি। এক সময়ে ইহা একটী নর্দ্দমা ছিল,—উভয় দিককার বাড়ীর পশ্চাত এই গলির দিকে,—ইহার ভিতর কোন বাড়ীর যে সদর দরজা আছে, তাহা রামঅক্ষয় বাবু জানিতেন না, তবুও দেখিতে চলিলেন।

গলির ভিতর কিয়দ্দুর গিয়া দেখিলেন যে যথার্থ ই একটা বাড়ীর দরজায় চাবি বন্ধ,—তাঁহার হস্তস্থ চাবি সেই কলুপে লাগিল,—তিনি দরজা খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

সঙ্গে পুলিশ লণ্ঠন আনিয়াছিলেন, তাহার আঁলোকে দেখিলেন যে বাড়ীটি একতালা,—সম্মুখে একটা উঠান। বাড়ীতে আলোক পড়ায় একটা ঘর হইতে গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল,—রামঅক্ষয় বাবু সেই দিকে গিয়া দেখিলেন, "হস্ত পদ মুখ বন্ধ সুশীলবাবু পড়িয়া আছেন,—রামঅক্ষয় বাবুকে দেখিয়া তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পড়িয়া গেলেন,—এ দৃশ্যে রামঅক্ষয় বাবু হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।—

সুশীলকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, তাহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা হইয়াছে

দেখিয়া তিনি সত্বর সুশীল বাবুর বন্ধন মুক্ত করিলেন,—সুশীলবাবু উঠিয়া অতি রাগত হইয়া বলিলেন, "ইহাতে হাসিবার দেখিলেন কি! এইরূপ উপহাস করা কি উচিত? প্রায় তিন ঘণ্টা আমি কষ্ট পাইতেছি?"

রামঅক্ষয় বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সুশীল! তুমি কি মনে করিতেছ যে, আমি তোমার এ দশা করিয়াছিলাম! যে করিয়াছে সে বলিয়াছে যে তোমার উপর তাহার জোর চলে,—তুমি আর সে জানে,—আমি কিরূপে জানিব বল।"

সুশীলবাবু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন,—তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি চাকরকে আপনার নিকট পাঠাইয়া বাড়ীর পাহারায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটা লোক ব্যাস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর, শীঘ্র আসুন,—ইনেস্পেক্টর বাবু এখনই ডাকৃচেন।" আমি বলিলাম, "কে তুই?" সে বলিল, "ডিক্টেটিভ কনেষ্টবল,—শীঘ্র আসুন,—আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন, শীঘ্র আসুন দেরি কর্‌বেন না।"

"কি হয়েছে!"

"জানিনে—নিশ্চয়ই কোন ভারি গোল হয়েছে।"

আমি তাহার সঙ্গে ছুটিলাম, সে আমাকে এই গলির মুখে আসিয়া বলিল, "হুজুর—এ দিকে!" আমি বলিলাম, "তিনি তো ঐ দিকে ছিলেন।" সে বলিল, তিনি এই গলির ভিতর একটা বাড়ীতে গিয়াছেন—শীঘ্র আসুন।"

তার পর আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্র, পাঁচ সাত জন লোক নিমিষ মধ্যে আমার হাত পা মুখ বেঁধে ফেলিল,—তাহার পর তাঁহারা চলিয়া গিয়াছে,—আমি তিন ঘণ্টা এখানে পড়িয়া আছি,—এ সব কি?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "এস,—বাসায় গিয়ে সবই শুনিতে পাইবে।'

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুশীল বাবুর ক্রোধ।

সুশীলবাবু এই লাঞ্ছনায় এতই রাগত হইয়াছিলেন যে, পথে একটী কথাও কহিলেন না। অতি গম্ভীর ভাবে রামঅক্ষয় বাবুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এ অবস্থায় তিনি যাহা বলিলেন, সুশীল তাহাই উপহাস বিদ্রূপ মনে করিবে ভাবিয়া তিনিও এ সময়ে তাহাকে কিছু কথা বলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

উভয়ে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "বসো—অনেক কথা আছে,—সব শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।"

সুশীলবাবু কথা কহিলেন না,—রাম অক্ষয়বাবু বাক্স ও রঙ্গিনী হইতে আরম্ভ করিয়া সখিনার সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক সমস্তই সুশীল বাবুকে বলিলেন। শুনিয়া সুশীলবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"অন্য বিষয় পরে বিবেচা—এখন আমার এই লাঞ্ছনা করার জন্য সেই মাগীকে আমি আজ এই রাত্রেই গ্রেপ্তার করিব।"

রামঅক্ষয় বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "একটা মেয়ে মানুষ, তোমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে ইহা শুনিয়া পুলিশ আসিলে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে; আমিই হাসি বন্ধ করিতে পারিতেছি না।"

সুশীলবাবু অতি রাগত হইয়া বলিলেন। "আর আপনি কি বলেন যে আমি এ—অপমানীত হইয়াও চুপ করিয়া থাকিব?"

সে তো বলিয়াই গিয়াছে,—"তোমার উপর তাহার জোর চলে।"

"আর রাগাইবেন না।"

"সুশীল,—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া কেলেঙ্কারি করিয়া হাস্যাস্পদ হইও না। সখিনা ও আমি ভিন্ন এ কথা আর কেহ জানে না,—সুতরাং একথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার অবস্থায় পড়িলে আমারও ঠিক এই অবস্থা হইত, অন্য উপায় কি ছিল?"

"এখন কি করিতে বলেন?"

উপস্থিত এ সম্বন্ধে কি করা উচিত,—তাহারই পরামর্শ আমি তোমার সঙ্গে আজ রাত্রেই করিতে চাই,—"

"আমি এ ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,—এই মাত্র বুঝিয়াছি, মাগীই সয়তানী,—ইহাকে দীপান্তরে না পাঠাইলে আমাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হইবে—ভগবানের কাছে ও পাপী হইব।"

রাম অক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি,—তুমি তাহার উপর মৰ্ম্মান্তিক রাগিয়াছ—"

"রাগিয়াছি—"

"যাক,—তাহাকে দেখিলে ও তাহার কথা শুনিলে এত রাগিতে পারিতে না।

"এখন আপনি কি বলিতে চাহেন—বলুন।"

"তুমি একটু স্থির না হইলে, কি বলিব বল।"

"আমি যথেষ্ট স্থির হইয়াছি, বলুন্।"

"প্রথম আমার বিশ্বাস যে সখিনা যাহা বলিল,—তাহা মিথ্যা নয়।"

"যদি তাহাই হয়,—তবে তাহার কথামত কাজ করা ভাল, তবে সে যে সত্য কথা বলিয়াছে তাহার প্রমাণ হওয়া আবশ্যক।"

"তাহাতো নিশ্চয়ই,—তাহার কথার সত্য মিথ্যা প্রমাণ হওয়া বিশেষ ক্লেশ-কর হইবে না।"

"এখন বুঝিলাম যে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই,—সে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিলে গোঁসাইকে দীপান্তর পাঠান যায়,—এ সবই বুঝিলাম,—কিন্তু আসল মামলার কি? মধুপুরের খুনের সম্বন্ধে কি? সে খুন কে করিল? আমাদের উপর সেই খুনী ধরিবার ভার আছে,—দারোগাকে যাহারা গুলি করিয়াছে,—তাহাদের ধরিবার ভার আছে,—এ সবের কি! বুড়ো বনমালি রায়ের প্রেম,—গোঁসাইয়ের ঘরে সম্পত্তি আত্মসাত করিবার চেষ্টা,—এতো রোজই হইতেছে,—সাহেব আমাদের এ সবের ভার দেন নাই।"

"তুমি যাহা বলিতেছ,—তাহা ঠিক। এই মধুপুরের খুনের জন্যই এসব উঠিয়াছে। সুখচাঁদ ও অখিল গার্ডস্মিথের সাহায্যে রাণীর মেয়ে-টাকে চুরি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, রাণীর বিশ্বস্থ দাসীকে হাত করিতে গিয়াই তাহাদের কাজের সমস্তই গলদ হইয়া গিয়াছিল,—সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া মেয়েটীকে লইয়া গিয়া অন্য বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—পাছে অন্য কাহাকে এ কথা বলিলে সুখচাঁদ ও অখিল অন্য উপায় অবলম্বন করে বলিয়া যে, এমন কি রাণীকেও কোন কথা না বলিয়া মেয়ে লইয়া পালাইয়া—আর একটা খালি বাড়ীতে লুকাইয়াছিল, তাহাই অখিল ও সুখচাঁদ ভুলক্রমে রাণীর মেয়েকে না লইয়া রঙ্গিণীকে লইয়া গিয়াছিল।"

"এতো সবই বুঝিলাম,—এখন অখিল ও গার্ড স্মিথকে খুন করিল কে?"

"এ অবস্থায় গোঁসাই বা সুখচাঁদকে সন্দেহ করা যায় না। তাহারা বিনা কারণে নিজের লোককে খুন করিবে কেন?"

"তাহা হইলে খুন কিরিল কে?"

"গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্রের উপর ষোলো আনা সন্দেহ হয়। গোঁসাই তাহাদের খুন করিবার চেষ্টায় ছিল, রাণীর মেয়েকে চুরি করিবার চেষ্টা পাইতেছিল,—উভয় দলে এইরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল,—প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে গোঁসাই-য়ের দল রাণীর মেয়ে চুরি করিতে না পারে,—তাহার ইহারা বিশেষ বন্দবস্ত করিয়াছিল,—এ অবস্থায় তাহারা মেয়েটাকে গলায় দড়ি দিয়া মারিতেছে দেখিয়া যে অখিল ও স্মিথ কে গুলি করিবে তাহাতে আবশ্যক কি"

"সন্দেহ হয় সত্য,—কিন্তু প্রমাণ কই!"

"ঐ টুকুই সমস্যা!"

এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "হুজুর, গোল হয়েছে!"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "তা আমি আগে থেকেই জানি।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভৃত্যের কথা।

সুশীলবাবু ভৃত্যের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তাহা হইলে তোর চোখে ধুলো—দিয়ে সে পালিয়েছে,—গাধা?"

ভৃত্য মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিল, "ঠিক,—তা নয় হুজুর। তিনি গাড়ী করে শেয়ালদায় যান,—সেখানে একটা বাড়ীর দরজায় গাড়ী হতে নেবে বলেন, "এই বাড়ীতে আমি থাকি,—যা তোর বাবুকে বলিস।" এই বলে তিনি বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। বাড়াটা ভাল করে একটু দেখা উচিত বলে আমি একটু সরে গিয়ে বাড়ীটা ভাল করে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম—"

"বুঝেছি—তার পর!"

"তারপর গাড়ীখানা ফিরে যায় না দেখে আমার একটু সন্দেহ হলো,—আমি অন্ধকারে লুকিয়ে বাড়ীর দরজারদিকে চেয়ে রইলেম, আদঘণ্টা কাট্‌ল, তবু গাড়ীখানা যায় না,—আমি ব্যাপার কি জানিবার জন্য গাড়ীর কাছে যাচ্ছিলাম এই সময়ে একজন লোক একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়ীর ভেতর হতে বার হয়ে এল,—সে গাড়ীতে ব্যাগ তুলে দেবার পরেই, সেই তিনি বাড়ীর ভিতর হতে বার হয়ে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন,—লোকটা কোচবাক্সে উঠে বস্‌ল,—অমনই কোচমাণ গাড়ী হাকাইয়া দিল।"

সুশীলবাবু রাগত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তার পর তুই বেটা কি কল্লি?"

রামঅক্ষয় বাবু—সুশীল বাবুর ক্রোধে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ওকে ওর মতই বলে যেতে দেও।"

ভৃত্য বলিল, "আমি অমনই ছুটে গিয়ে গাড়ীর পেছনে উঠে বস্‌লেম্—"

সুশীলবাবু বলিলেন, "তবুও একটু বুদ্ধি আছে দেখিতেছি।

রাম অক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সুশীল—ও বিশ বৎসর আমার কাছে আছে।"

সুশীল বাবুর মন আজ সম্পূর্ণ খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—প্রতি কথায় তাহার রাগ হইতেছিল। তিনি কোন কথা কহিলেন না, রাম অক্ষয় বাবু ভৃত্যকে বলিলেন, "বল।"

সে বলিল, "গাড়ী বরাবর শেয়ালদা ষ্টেশনে আসিল,—তখন তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী হতে নেবে ষ্টেশনে চলে গেলেন,—লোকটাও গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে ব্যাগ নিয়ে তার পেছন পেছন ছুটিল;—আমি ও ছুটিলাম,—কিন্তু কনেষ্টবল আমায় দরজায় আটক কল্লে,—তার হাত ছাড়িয়ে যেতে একটু দেরি হল,—যখন ভিতরে গেলাম, তখন গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে,—দেখিলাম তিনি একখানা সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ীতে বসে রয়েছেন,—লোকটাকে কিন্তু আর দেখ্‌তে পেলেম না,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেল। তাই বলছিলাম হুজুর একটু গোল হয়েছে,—আর কি কর্ব্বে বলুন।"

রাম অক্ষয় বাবু বলিলেন, "তাতো ঠিক,—থাক তোর কোন দোষ হয় নি—যা।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, ভৃত্য যাহা বলিয়া গেলো তাহাতে "আর একটা রহস্য এই রহস্য জালে অধিকন্তু আলিল,—সখিনা হঠাৎ কলিকাতা ছাড়িয়া পালাইল কেন।"

সুশীলবাবু মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তাহা সেই জানে—বদমাইশ মাগী!"

রাম অক্ষয় বাবু এ কথায় কান না দিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—তাহার পর বলিলেন, "সুশীল! কাল দুই প্রহরে আমি তোমায় এখানে চাই।"

"কবে আপনার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছি।"

"কাল সকালেই আমি প্রথমে সখিনা যে বাড়ীতে ছিল,—সেই বাড়ীর—সন্ধান লইব। যাহা জানিতে পারি জানিয়া তাহার পর গুণেন্দ্রও

বরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিব,—তাহারা কি বলে শোনা আবশ্যক,—তুমি এই খানে হাজির থাকিবে। আর নয়,—গুণেন্দ্র, বরেন্দ্র, সখিনা, গোঁসাই—যেই হউক, আর নয়, আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। কালই ইহার একটা হেস্ত ন্যাস্ত করিব, তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে।"

"যেরূপ হুকুম করিতেছেন,—সেইরূপই হইবে।"

"তবে রাত হইয়াছে,—যাও, আমার অনেক লিখিবার আছে।"

সুশীল বাবু বিদায় হইলেন,—ভৃত্য অতি সাবধানে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোঁসাই জখম।

প্রাতে উঠিয়াই রামঅক্ষয় বাবু বনমালি রায়ের বাড়ীর সন্ধানে প্রস্থান করিলেন। তিনি তাহার ভৃত্যের নিকট তাহার বাড়ীর ঠিকানা ভাল করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং সে বাড়ী খুজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

প্রকৃতই তাহাই ঘটিল,—তিনি অতি সহজেই সে বাড়ী খুঁজিয়া পাইলেন। দেখিলেন বড় রাস্তার উপর ক্ষুদ্র বাগান সমন্বিত একটী ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী,—দ্বারে একজন দ্বারবান বসিয়া আছে। রাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে লক্ষ করিয়া দেখিলেন,—বাড়ীতে আরও দুই চারিজন লোক চলা ফেরা করিতেছে।

এখন কি করা উচিত রামঅক্ষয় বাবু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, হয়তো যাহারা আছে তাহারা বনমালি রায়, বা সখিনার লোক হইলেও— অস্বীকার করিবে,—কিন্তু প্রথমে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক,—তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় করা যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি দ্বারবানের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এইটাই কি বনমালি বাবুর বাড়ী?"

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁ,—বনমালি রায়, সুন্দরপুরের জমিদারের বাড়ী।"

"বাবু বাড়ীতে আছেন।"

"হাঁ—আছেন।"

"একবার দেখা হতে পারে?"

"না—দেখা হবে না।"

"কেন,—বিশেষ জরুরি কাজ আছে।"

"কাল রাত থেকে তাঁহার ভারি অসুখ,—দেখ্‌চেন না,—ডাক্তার আস্‌চে,—সরে দাঁড়ান।"

রামঅক্ষয় বাবু দেখিলেন যে যথার্থই একটী ভদ্রলোক গাড়ী করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন। তাহার বেশ ও সম্মুখে ব্যাগ দেখিয়া তাহাকে ডাক্তার বলিয়া বুঝিতে ক্লেশ পাইতে হইল না।

রামঅক্ষয় বাবু সরিয়া দাড়াইয়া ভাবিলেন, "তাইতো, যদি লোকটা যথার্থই পীড়িত, তবে সখিনা তাহাকে ফেলিয়া এত তাড়াতাড়ি পলাইল কেন। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে,—অথবা হয়তো তাহার এইরূপ হঠাৎ পালায়নের জন্য বৃদ্ধ বনমালি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, আবার একটা গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহাই হউক দেখিতেছি এ বেশে কোনই সন্ধান পাইব না—কোন রকমে একটা চাকরের সঙ্গে আলাপ করিতে হইতেছে। পরে সেজেগুজে আসিতে হইবে, তবুও একবার সখিনার কথাটা জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি দ্বারবানের কাছে গিয়া যতদূর মিষ্ট ও সম্মানসূচক স্বর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া বলিলেন, "দরোয়ানজী,—তাইতো কর্ত্তা বাবুর সঙ্গে বড় জরুরি কাজ ছিল, তারই কাজ, আহা, তাহার অসুখ হয়েছে,—কেমন আছেন।"

দ্বারবান তাহার প্রতি বোধ হয় একটু প্রীত হইল, বলিল, "শুনেছি একটু ভাল আছেন। তোমার কাজ কি?"

"একটা জরুরি মকদ্দমার কথা বলতে এসেছিলাম,—বড় আদালতে তার একটা মকদ্দমা হবে———"

"বাবু ভাল না হলে তার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"দাসী দেখ্‌চি,—বাড়ী থেকে মেয়ে ছেলেরা তা'হলে এসেছেন।"

"না—মেয়ে ছেলে বৌ এখানে নেই।"

"তাহা হলে চাকরাণী যে দেখ্‌চি।"

"ও গোঁসাই বাবুর স্ত্রীর চাকরাণী।"

"তা হলে তিনি এখানে আছেন।"

"না তিনি দেশ থেকে তারযোগে খবর পেয়ে রাত্রির গাড়ীতে তাড়াতাড়ি চলে গেছেন।"

"এত তাড়াতাড়ি যাবার মানে কি?"

"শুনেছি গোঁসাই বাবু নাকি জখম হয়েছেন।"

রামঅক্ষয় বাবুও এ কথায় নিজের বিস্ময় ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, "সে কি, জখম হইয়াছেন,—তিনি কর্ত্তার সর্ব্বে-সর্ব্বা ম্যানেজার? তাহাকেই তো পত্র লিখিতে চলিলাম। কর্ত্তা এখানে এসেছেন শুনে তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিলাম,—আহা অসুখ হয়ে পড়লো,—শীঘ্র ভাল হোন। কর্ত্তার সঙ্গে কি কোন কর্ম্মচারী আসেনি, তাদের এক জনের সঙ্গে দেখা হলেও আমার কাজ হয়?"

দ্বারবান বলিল, "না,—চাকর ভিন্ন আর কেউ আসে নি।"

"তাহলে আর কি হবে,—কাজটা দেরি পড়ে গেল,—গোসাই বাবু জখম হয়েছেন, কিসে কিছু শুনেছ?"

"না—বাবু,—অত কিছু শুনি নি। সরে দাড়ান—ডাক্তার বাবুর গাড়ী আস্‌চে।"

অগত্যা রামঅক্ষয় বাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন, ডাক্তারটীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। প্রথমবার ডাক্তারকে ভাল করিয়া দেখেন,—এবার দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "ও,—সবই গোল।"

তিনি দ্বারবানের সহিত আর দেখা না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। "এ ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে, এখন একবার গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্রকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা যাক।" এই বলিয়া তিনি পটলডাঙ্গার দিকে চলিলেন। ক্রমশঃ।

গীত।

যদি হস মন পাপে মুক্তি।
তারা পদে সদা রাখ ভক্তি॥
ঐ পদ মানসে থাকিলে—
অতি ত্বরায় পাবে মুক্তি॥
তারা নাম জপ কর সদা—
বাড়বে তোমার বিবেক শক্তি॥
মন সে শক্তি নয় ক্ষণস্থায়ী—
থাকবে শক্তি হলেও মুক্তি॥
সে বিবেক চায় এ অধমে—
মাগো শেষে যেন থাকে ভক্তি॥
ভক্তি হীনের ভাবনা সদা—
শেষের দীনে কেমন যুক্তি॥
নরেন্দ্র বলে শত্রু নাশিনী—
ভক্তি দিয়ে করিশ মুক্তি॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ নাথ।

আশক্তি।

আশার কাননে,
ফিরি অন্য মনে,
সুখ নাহি মিলে আবাসে আর।
তাইত এসেছি
কাননে পশেছি
পরিতে হৃদয়ে রমণী হার॥
দিব্য সরোবরে
পূর্ণ স্বচ্ছনীরে,—
[illegible] তথায় এক।
স্না[illegible]র নীরে
উঠি ত্বরা করে
হেরিনু সন্মুখে কামিনী এক॥
হেরি তরু তলে
মম মন গলে
ত্বরা করি আমি দাঁড়ানু সেথা।
যিনি শত মনি
সেই সুবদনী
উদিত ভূতলে হইল তথা॥
চাহি মুখ পানে
রহি এক মনে
রূপের তুলনা কি দিব তার।
হেরি রূপ রাশি
সুখ নদে ভাসি
বচন সরেনা বদনে আর॥
হরিদ্রা মথিত
সোনাতে জরিত
নবনী মাখানো নিটোল গোল।

সর্ব্ব অঙ্গ যেন
কমলে গড়ানো
কোন খানে কিছু নাহিক টোল॥
কিবা নাক মুখ
ভুরু দুটি বাঁকা
ভাসা, ভাসা চোক, পটল চেরা।
নাক চোক যেন
তুলি দিয়ে আঁকা
জোড়া ভুরু তার ভ্রমরে ঘেরা॥
রাজীবের মত
ঢলঢলে মুখ
গালের মাঝারে গোলাপী রেখা।
সরু মিহি ঠোঁট
রাঙা টুক্ টুক্
হাসিতে ভরিলে না যায় দেখা॥
ফুটন্ত পুরন্ত
পূর্ণ-শতদল—
আমারি সাধের রূপের ডালি।
সোণার প্রতিমা
সোণার কমল
নিরখিলে ঘুচে মনের কালি॥
রেশমের মত
একরাশ চুল
আলো করি পিট পড়েছে পায়
চুলের ভিতরে
দুলিতেছে ফুল
আমরি আমারি কি শোভা তায়॥

কানের দুপাশে
দুলিছে অলক
অলকের কোলে মানিক দুলে।
নাকেতে শোভিছে
মুকুতা নোলক
চপলা যেমন মেঘের কোলে॥
সুখে ভাসিলাম
ভাল বাসিলাম
করিলাম তারে বুকের ধন।
নিধি পাইলাম
চুমা খাইলাম
রূপ দেখে মম মজিল মন॥

হাত ধরি টানি
সোহাগের মনি—
টিপি, টিপি হাসে, নোয়ায়ে মাথা।
কথাটি না কয়
চুপ করি রয়
লাজেতে বুজায় চোকের পাতা॥
মুখে মুখে বসে
মজি প্রেম রসে
সোহাগ বাড়াই চিকুর ধরি।
ছাড়ি গৃহ দ্বারা
ভুলি আত্ম পর
হেসে খেলে, শুধু— আমোদ করি॥

শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোৎস্না।

(১)
শুভ্র বেশে হে'সে হে'সে,
ধরার আঁধার হরিয়া,
কে তুমি পাড়ছ ছড়িয়া?

(২)
কাহার দুহিতা, কাহার দয়িতা,
কুল মান ভয় ভুলিয়া,
বেড়াও দুলিয়া দুলিয়া!

(৩)
কে আপন পর, না করি বিচার,
গায়ে পড়িতেছে ঢলিয়া,
কোন্ ভাবে গলিয়া!

(৪)
চেয়ে তব পানে শশী হাসে কোলে,
কোন্ কথা মনে তুলিয়া,
কি এসেছ তা'রে বলিয়া?

(৫)
যেখানে যাও সোহাগ পাও,
কেউ'ত উঠে না রাগিয়া,
বল সই! কিবা লাগিয়া?

(৬)
রূপেতে কি শুধু? অথবা কি মধু,
আসিয়াছ সাথে করিয়া,
বলনা ছলনা ছাড়িয়া!

(৭)
না-না-না হবে না, তাত বলিবেনা,
আমারে পাতকী জানিয়া,
নিবে নাত দোষ মানিয়া!

(৮)

তব প্রেমালাপ, যথা সে গোলাপ,
রয়েছে গরবে ফুটিয়া।
তথা যাও তুমি ছুটিয়া।

(৯)

অথবা যথায়, নদী ব'য়ে যায়,
সুমধুর স্বন্ স্বনিয়া,
তারে তোষ তুমি চুমিয়া।

(১০)

বল দেখি মোরে তৈলাক্ত শিরে,
কি ফল তৈল ঢালিয়া?
চাহ দীন পানে ভুলিয়া।

(১১)

রূপটী দিওনা নাই সে ভাবনা,
হৃদি মাঝে শুধু পশিয়া,
যাও লো একটু হাসিয়া।

শ্রীরাধাগোবিন্দ আচার্য্য।

আশ্বিনে দৃশ্য।

শরৎ আসিয়াছে, ঘনঘটাচ্ছন্ন মলিন আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। শেফালিকা মৃদু সৌরভ বিস্তার করিয়া, মাঠে মাঠে কাশ কুসুম ফুটিয়া, নদী নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়া শরতের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া দিল। শরৎ আসিয়াছে,—শারদীয়া ও আসিতেছেন।

মা আসিতেছেন, ঐ দেখ দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে মঙ্গল মধুর উদ্বোধনের জন্য কিরূপ আনন্দ ও উৎসাহের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। চির পরাধীন হতভাগ্য চাকুরী জীবি পল্লীপ্রান্তে তাহার নিরানন্দময় গৃহে মায়ের মূর্ত্তি দেখিবে বলিয়া, তাহার মাথার উপর হইতে স্তুপাকার কর্ম্মভার নিঃশব্দে নামাইয়া—শকটে, রেলপথে, নদীপথে, গৃহমুখে ছুটিয়াছে। হর্ষের কলকল্লোলে পল্লীগ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইতেছে।

সহৃদয় পাঠকবর্গ, মহামায়ার আগমনে ক্ষুদ্র-প্রাণা পল্লীবাসীর মনের আনন্দ দেখ! আগামী কল্য মহামায়ার পূজা, আজ হইতে পল্লীবাসীর নরনারী সকলেই তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। বালকগণের বেশী আনন্দ, তারা একখানি নীলাম্বরী কাপড় পাইয়াই কত আমোদ অনুভব করিতেছে, তাহাদের আশা অতি ক্ষুদ্র। আর সহরবাসী পাঠক, তোমরা মণিমুক্তা বিভূষিত হইলেও এত আনন্দ পাও না। আজ পল্লীকুটীরের চারিদিকে হাসি খেলিতেছে। মায়ের আগমনে বৃক্ষ-লতাও মৃদু সমীরে দুলিয়া

হাসিতেছে। দেখ দেখ! কুটীর প্রাঙ্গণের শশা, ঝিঙা গাছে কেমন, ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, ফুল ফুটিয়া তারা কত আমোদ করিতেছে। সহরবাসী পাঠক, তোমরা গোলাপ বেলায় মুগ্ধ, তাই বলিয়া ক্ষুদ্র ফুলের প্রতি উপেক্ষা করিওনা, একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ! আকাশের কত উপরে নক্ষত্র থাকে, তাহারা সেখান হইতে ভালরূপে মা মহামায়ার দেখা পাইবে না বলিয়া যেন আজ তাহারা শশা, ঝিঙা গাছে অধিষ্ঠান হইয়াছে, পাঠক, ধরাতলে নক্ষত্র শোভা দেখ!

তার পরদিন মায়ের সপ্তমী পূজা হইল। পল্লীবাসী, দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত মায়ের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া মন প্রাণ ভক্তিতে পূর্ণ করিল। আর বালক বালিকার আনন্দ, উৎসাহ বর্ণনাতীত। তাহাদের এ তিনদিন খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, সদাই পূজা-মণ্ডপ প্রাঙ্গণে সদাই নাচিয়া বেড়াইতেছে।

তার পর যথা নিয়মে অষ্টমী পূজা সমাপ্ত হইল। তার পরদিন নবমী, নবমীতে নূতন আমোদ দেখ, দ্বিপ্রহরে মায়ের পূজা শেষ হইলে বৃদ্ধের 'কাদা খেঁড়ে' মাতিয়া উঠিল, তাহাদের আদিরস মিশ্রিত গানে, সকলে বিহ্বল হইল।

তার পর দিন দশমী। আজ আর কৈলাশে মহেশ তাঁহার মহিষীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি আকুল আহ্বান করিলেন, মাও পল্লীবাসীদের ছাড়িয়া চলিবার উপক্রম করিলেন। পল্লীবাসী আজ শেষ দিনে বিপুল আয়োজনে মায়ের সেবায় ব্যাপৃত হইল। পুরমহিলারা নবীন বেশে কুলা, ডালা লইয়া মায়ের বরণ করিয়া মায়ের হাতে সন্দেশ দিয়া গেল, আর সদানন্দ বালকেরা সেই সন্দেশ লুকিয়া লইয়া যেন, মায়ের প্রসাদ পাইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। মাতৃ-প্রতিমা প্রাঙ্গণে অবতরণ করান হইল। অহো, কি প্রাণারাম দৃশ্য দেখ! আর নিরক্ষর, মূর্খ, পল্লীবাসীর ভক্তি দেখ! দলে দলে প্রতিমার শ্রীচরণে তাহাদের অঙ্গুলাগ্র দ্বারা, চরণধুলি লইয়া ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতেছে। তারপর মা পল্লীবাসীর অন্তরে যে ভক্তি বীজ বপণ করিয়া গেলেন, তাহার অঙ্কুর দেখ! সন্ধ্যার পর হইতে নিরক্ষর কৃষকগণ পর্য্যন্ত নূতন বেশে দলে দলে, বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

পাঠকগণ, পল্লীবাসীর মহামায়ার উৎসব দেখিলে। পল্লীবাসীর আশ্বিন মাসের আর একটী দৃশ্য দেখ।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা। আজ মা-লক্ষ্মীর পূজা! এই নদীমেখলা, ছায়া শীতলা, বঙ্গ জননীর পক্ষে ইহা স্মরণীয় দিন। ঐ দেখ, পূর্ব্বাকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র সুধা ধবল হাস্যে ধরাতলে উদয় হইলেন। আর সন্ধ্যার সময় হইতে পল্লীবাসীর প্রতি-কুটীর হইতে শঙ্খধ্বনী উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। দেখ, প্রতি গৃহস্থের আঙ্গিনায় আলিপনায় মা-লক্ষ্মীর পদ অঙ্কিত, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন, সত্য সত্যই মা-লক্ষ্মী আজ সকলের গৃহে আগমন করিলেন, এই তাঁর পদচিহ্ন। প্রকৃতি দেবী ও শেফালিকার পুষ্প স্তবকে, রজনীগন্ধার মৃদু সৌরভে, বণান্তরালবর্ত্তী বন কুসুমের মধু ভাণ্ডারের উপহারে মা-লক্ষ্মীর উদ্বোধন করিতেছেন আর সেই সঙ্গে ধূপ ধুনার গন্ধে মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আনিতেছে দেখ! মায়ের পূজা শেষ হইল। এখন মুড়ী বিতরণের পালা পড়িল। বালকগণ দলে দলে "কোজাগর লক্ষ্মী পুজো, মা ঠাকুরুণ দুটি ভুজো" বলিয়া প্রতি গৃহে মুড়ী সংগ্রহ করিতে লাগিল। সেই তিল ছাঁই ও পক্কানের সহ মুড়ীর অমৃত স্বাদ! ঐ মুড়ী সংগ্রহতেই নূতন আমোদ দেখ! একটী স্ত্রীলোক খুব ঘোমটা দিয়া এক গৃহস্থের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে মুড়ী প্রার্থনা করিল। গৃহকর্ত্রী ধামায় করিয়া মুড়ী দিতে হস্ত বাড়াইলেন, অমনি সেই স্ত্রীলোক অসাবধানে গ্রহকর্ত্রীকে ছুঁইয়া ফেলিল, তাহাতে গৃহকর্ত্রী রাগিয়া বলিলেন,—"তুইকে, আমার ধামা শুদ্ধ মুড়ী হাতে, তুই ছুঁয়ে দিলি?

স্ত্রীলোকটি ভয় জড়িত কণ্ঠে বলিল, "মা ঠাকরুণ হঠাৎ ছোঁয়া পড়েছে।"

গৃহকর্ত্রী। তুই কে?

স্ত্রীলোক। ও পাড়ার ডোম বৌ।

গৃহকর্ত্রী একথা শুনিয়া অত্যন্ত রাগিয়া ধামার সমস্ত মুড়ী তাহার আঁচলে ঢালিয়া বলিলেন,—"মর ছুঁয়ে দিলেন, এই সব মুড়ী খাও—" এমন সময় একদল বালক সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল আর সকলে মহানন্দে হাসিয়া উঠিল। গৃহকর্ত্রী হাসির ঘটা দেখিয়া বলিলেন,—"এত হাসিস কেন?" বালকেরা হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিল, বলিল, "আজ বড় আনন্দ, তোমার কাছে এক ধামা মুড়ী পাওয়া গিয়েছে।" তখন সমস্ত প্রকাশ পাইল, একজন বালক ডোম বৌ সাজিয়া গৃহকর্ত্রীর সব মুড়ী ঠকাইয়া লইয়াছে। তখন সকলে মিলিয়া হাসির মাত্রা আবার বাড়াইয়া দিল, গৃহকর্ত্রীও তাহাতে যোগ দিলেন। একটী ছোট বালক গৃহ মধ্যে বসিয়াছিল, সে এই তুমুল হাস্যধ্বনি শুনিয়া স্থির থাকিতে

পারিল না, সে দুলিতে দুলিতে বাহিরে আসিয়া হাসির মাত্রা বাড়াইবার জন্য তাহার কচি হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া কচি মুখে গাহিয়া ছিল,

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে?
ওই আস্‌ছে কেষ্ট ঠাকুর
রাধা ঘোমটা টেনে দে?

প্রকৃতই তখন গৃহিণীর স্বামী আমোদ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। আবার হাসির তুমুল স্রোত প্রবাহিত হইল।

হে নব্য যুবক-বৃন্দ! তোমরা পল্লীতে সুখ পাওনা বলিয়া এক পয়সার মানুষ হইয়াই, দলে দলে সহরে ছুটিতেছ. কিন্তু বল, এরূপ আনন্দ তোমরা সহরে বসিয়া ক'দিন পাও, আর আমরা পল্লীবাসী বার মাস এ আমোদ উপভোগ কর্চ্ছি. 'অবসরে' স্থান অল্প আজ এই পর্য্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা থাকিলে পল্লীবাসীর নূতন আনন্দ দেখাইব।

জনৈক পল্লীবাসী।

অবশেষে।

সারাটী জীবন মরম ঢালিয়া
সাধিনু তোমায় কত।
কত যে নীরব তপ্ত আঁখিজল
ফেলিয়াছি অবিরত।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া উন্মত্ত আহ্বান
যে'ত সদা তব পানে;—
তুমি গো হেলায় অবহেলি সব
যাইতে তোমার স্থানে।
অবশেষে যবে জীবন প্রদীপ
জ্বলিয়া নিবিয়া এল;
কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয়ের তার
ছিঁড়িয়া বেসুরা হল,—

জগতের আলো, নয়ন সমুখে
নিভিয়া আসিল যবে;—
ছায়াময় আঁখি নিমেষে ধাঁধিয়া
দাড়াইলে আসি তবে!
খুলে দিলে তুমি হৃদয় দুয়ার,
দুইটী বাহু প্রসারি—
"যেওনা, যেওনা, থাক, ফির" বলি
দাড়ালে পথ আবরি!
হায়! দুনিমেষ আগে কেননা শুনিনু
অমিয় মাখা ঐ কথা!
ফুরাল সময় যাই—যাই—আর
থাকিতে পারি না হেথা।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

সেকাল ও একাল।

কমলা বাঙ্গালীর প্রতি চিরপ্রসন্না। বাঙ্গালার মাটীতে চিরদিন সোণা ফলিয়াছে; বাঙ্গালা দেশের ন্যায়, এমন উর্ব্বরা এমন শস্যদায়িনী এমন কল্যাণময়ী ভূমি পৃথিবীর আর কোথায় আছে, জানি না। তাই কবির ভাষায় বার বার বলিতে ইচ্ছা হয়,——

"আমার সোণার বাঙ্গলা
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
ধেনু চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
সারাদিন পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা,
তোমার পল্লীবাটে.
তোমার ধানে-ভরা আঙ্গিনাতে,
জীবনের দিনকাটে
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

কিন্তু আর কি সে কাল আছে; একদিন বাঙ্গালার ধন ছিল, ধাম ছিল, মান ছিল, প্রাণ ছিল। বাঙ্গালার মাঠে মাঠে ধেনু চরিত, প্রান্তর বঙ্গলক্ষ্মীর মধুর হাস্যে পূর্ণ দেখিতাম, সপক্ক ধান্যশীর্ষ যখন বায়ুভরে আন্দোলিত হইত, প্রভাতরৌদ্র তাহাতে প্রতিফলিত হইত, গাছে গাছে শ্যামা, দৈহিয়াল, পাপিয়া গান করিত, গোপপল্লী দুগ্ধ, দধী, ছানা, ক্ষীরে মধুচক্রের ন্যায় পূর্ণ থাকিত, কৃষকের গৃহদ্বারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধানের গোলা, গৃহস্থের আঙ্গিনা ধান্যস্তূপে পূর্ণ, প্রাঙ্গনের অদূরে সুশীতল সুপরিষ্কৃত স্বচ্ছ পাণীয় পূর্ণ দীর্ঘিকা তাহাতে রাজহংসের ক্রীড়া, দীর্ঘিকার জলে নানাবিধ মৎস্যের চঞ্চল পক্ষ সঞ্চালন; তখন মনে হইত, সত্যই পৃথিবীর মধ্যে এই দেশ জননী কমলার

অধিষ্ঠানেরই যোগ্য ভূমি, তখন মনে হইত ; এই দেশের প্রতি লক্ষ্মীর অপার করুনা, বিশেষ অনুগ্রহ !

আবার যখন দেখিতাম, পল্লীতে পল্লীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইতেছে, গৃহে গৃহে অতিথি সম্মানিত হইতেছেন, ভিক্ষুক পূর্ণ হস্তে দান লইয়া প্রসন্ন মুখে গৃহান্তরে ফিরিতেছে, শঙ্খ, ঘণ্টা কলরবে ও মঙ্গল শঙ্খের সুগভীর নিনাদে প্রত্যেক দেবায়তন মুখরিত হইতেছে, প্রফুল্ল বদনা স্বাস্থ্য ও উৎসাহের প্রতিমূর্তি পুরাঙ্গনাগণ মণের সুখে প্রশান্ত হৃদয়ে সারাদিন সংসারের কাজ শেষ করিয়া শন্ধ্যাকালে গৃহে গৃহে ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন, তুলসী মঞ্চে দীপ রাখিয়া ভক্তিভরে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতেছেন, শরতের পূর্ণ শশধর সুধাধবল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন,—আর প্রতি গৃহ হইতে ধূপ ধুণার মৃদু গন্ধ উঠিয়া সান্ধ বায়ুস্তরে তরঙ্গীত হইতেছে, তখন মনে হইত, মা অন্নপূর্ণা, তাহার চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করিয়া বঙ্গভূমিকেই বুঝি তাঁহার স্থায়ী লীলা নিকেতনে পরিণত করিয়াছেন !

কিন্তু হায়, আমাদের সে মোহ দুর হইয়াছে, বাঙ্গালার সে সুখের দিন আর নাই, বাঙ্গালীর আর সে উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই, বাঙ্গালীর মুখে হাসি নাই, প্রাণে মধু নাই, বাঁশী আর তেমন করিয়া বাজে না, ফুলের আর তেমন হৃদয়োন্মাদক সৌরভ নাই, পাখীর গানে আর তেমন চিত্তবিমোহীত হয় না, চন্দ্রের সুধাধবল হাস্তে তেমন করিয়া আর বাঙ্গালীর মন নাচিয়া উঠে না, লক্ষ্মী, তাঁহার কমল আসন ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় খুঁজিতে গিয়াছেন, তাঁহার পেঁচক কেবল অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া ভগ্ন, পরিত্যক্ত গৃহের মাটীর প্রাচীরে বসিয়া শ্মশানপ্রায় বাঙ্গালার শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যের অন্তরালে বসিয়া গভীর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, শিবাদল অশিবধ্বনীতে দিন দ্বিপ্রহরে নানা অকল্যানের বার্ত্তা বহন করিয়া আসিতেছে, বায়ুপ্রবাহে মৃত্যুর সুতীব্র বিষ সমগ্র দেশ পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

নদীতে জল নাই, আকাশ মেঘশূন্য, ক্ষেত্রসমূহ নিরশ শুষ্ক প্রখর সূর্য্য-কিরণে তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত ঝলসিয়া গিয়াছে, ধানের গাছ শুষ্ক প্রায় বিবর্ণ, রবিশস্য উৎপাদনে সুদুর সম্ভাবনা ও বর্ত্তমান নাই, পানীয় জলের ভয়ঙ্কর অভাব, যেখানে এক আধটু জল আছে রাশী রাশী পাঠ পচাইয়া তাহাকে নরককুণ্ডে পরিণত করা হইয়াছে, পচা পাঠের দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ সেই সকল নরককুণ্ড হইতে বাষ্পরূপী যমদূতেরা বাঙ্গালার আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে,

দেশের কৃষকেরা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বাঙ্গলা জুড়িয়া কেবল উদ্বন্ধনরজ্জু নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত! হায় মা ভারতভূমি, তোর অদৃষ্টে এত লাঞ্ছনাও ছিল!

ঐ শোন আজ বঙ্গের প্রতি গৃহ হইতে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইতেছে; রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অর্দ্ধাশন, অনশন, অপমৃত্যু—আপদরাশী প্রলয়ের মেঘের মত চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমরা মৃত্যুর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অবসন্ন ও হতাশ হইয়াছি। নিরুপায় অদৃষ্টের ঘাড়ে আমাদের সকল বিড়ম্বনার বোঝা চাপাইয়া শান্তনা লাভের চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু একবারও কি আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি, আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য আমাদের অদৃষ্ট অপেক্ষা আমরাই অধিক দায়ী?

বাঙ্গালার সঙ্গে একবার অন্যান্য দেশের তুলনা করিলে দেখিতে পাই, আর কোথাও জীবিকা-নির্ব্বাহ এত সহজ নহে, জমীতে লাঙ্গল দিয়া দুমুটা বীজ ছড়াইয়া দিলে সময়ে সুবৃষ্টির কল্যানে আমাদের বাঙ্গালা দেশে সোণা ফলে। কিন্তু গত বর্ষের ন্যায় কোন বৎসর বৃষ্টির অভাব হইলে আর হাহাকারের সীমা থাকে না; কৃষক মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসে, গৃহস্থের গৃহে দুই বেলা অন্নের সংস্থান হয় না, জমীদার খাজনা পান না, গবমেণ্টের ট্যাক্সের দায়ে ঘটি বাটী লেপ কাঁথা বিক্রয় হইয়া যায়। আমাদের এই দেবমাতৃক দেশ দেবতার করুণার উপর নির্ভর করে। পাঞ্জাবে যুক্ত প্রদেশের অনেকস্থলে এবং মধ্যপ্রদেশের কোথাও কোথাও কৃত্রীম পয়োনালার জলে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু গুর্জ্জর দেশে নদী নাই, খাল নাই, সুবৃষ্টিও সেরাজ্যে নিতান্ত বিরল, তথাপী প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও সেখানকার কৃষকের উৎসাহ ভগ্ন হয় না; ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে জননী বসুন্ধরার পরিচর্য্যায় রত হয়, বলদ জুড়িয়া কপিকলে জল তুলিয়া তদ্দারা ক্ষেত্রকে সরস, উর্ব্বর ও শস্যশালী করে, আমরা বৃষ্টির অভাবে হাহাকার করি, শুনিয়া তারা হাসে, যদি বাঙ্গালার মত তাহাদের জমি হইত, তাহা হইলে তাহারা এই জমিতে কি ফলাইত, বলিতে পারি না।

মরুচর পর্ব্বতের অনেক লোক কত কষ্টে আহার্য্য সংগ্রহ করে, তাহা তাঁহারাই জানে। আহারের জন্য তাহারা সে সকল কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা কি করি? সংসারের ভার যত বর্দ্ধিত হয়, ততই আমরা ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া সকল দিক বজায় রাখিতে চাই।

কিন্তু পৃথিবীর জীবিত জাতি সমূহের তাহা লক্ষণ নহে; যখন ব্যয় বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে, ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিণ প্রভৃতি জাতি যেমন করিয়া হউক, আয় বৃদ্ধি করিবে; আমাদেরও এই পন্থা অবলম্বন না করিলে অপমৃত্যুর হস্তে অব্যাহতি নাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জীবিকার পথ সঙ্কীর্ণ হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে পৃথিবীতে যাহারাই বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয় তাহাদের সকলেরই জীবন ধারণের অধিকার আছে। আমাদের একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না, অনাহারে মৃত্যু কখনই প্রকৃতিসিদ্ধ নহে, ইহা প্রকৃতির বিকার মাত্র। কিন্তু আমাদের ঔদাসীণ্যে, যে দেশে জীবিকার সংস্থান এত সহজ সাধ্য, সেখানেও লোকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, কৃষি ও বাণিজ্যে আমাদের উপেক্ষাই ইহার প্রধান কারণ।

চলিত কথায় আছে, "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ" এ কথা যে সত্য, মার্কিণ জাতি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছে। কৃষি ও বাণিজ্যে ধন বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বাণিজ্যে আমরা শিশু, বহির্বাণিজ্যে আমাদের এখনো হাতেখড়ি হয় নাই, অন্তর বাণিজ্যের সীমাও সঙ্কীর্ণ, আমাদের বঙ্গভূমি কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতির কোনও চেষ্টাই নাই। জীবনসংগ্রাম যত অধিক হইতেছে, জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতেছে আমাদের কৃষিরও ততই উন্নতির আবশ্যক, ভূমি দিন দিন নিরশ ও অনুর্ব্বর হইতেছে, তাহাকে সরস ও উর্ব্বরা করিবার জন্য যে সকল নব নব বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা দারুন অনভিজ্ঞ। অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপকৃষ্ট ক্ষেত্রেও যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেশে আবার মা লক্ষ্মীকে আবাহন করিয়া আনিতে হইলে দেশের সুসন্তানগণকে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, মানুষের দুইখানি হাত বিধাতার বলে এমন অনেক কার্য্য করিতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতে যাহা বলিয়া অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু মানুষের চেষ্টা, যত্ন, ও উৎসাহ অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে।

এতকাল পরে শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা সুখের কথা, আশার কথা, আনন্দের কথা। আমাদের ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ দেশ। এদেশে যে সকল সামগ্রী উৎপন্ন হয় তাহাতেই আমাদের সকল অভাব বিমুচীত হইতে পারে, বিদেশের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হয় না।

পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার অগতির গতি ছিল; আমাদের লজ্জা নিবারণের প্রধান সহায় ছিল। কিন্তু আমরা স্বদেশী বস্ত্রের উন্নতির জন্য একটু চেষ্টা করিতেই ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রাধান্য খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে; আমাদের দেশী কলে ও তাঁতে যে সকল সাধারণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহা মূল্যে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র অপেক্ষা অধিক নহে, বাহ্য দৃশ্যে কিন্তু মলিন ও রুক্ষ হইতে পারে, কিন্তু স্থায়িত্বে অতুলনীয়।

আমরা যদি স্বদেশের বস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে আমাদের দেশের সম্পদ, শ্রী যে বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে যে কথা সত্য, অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও তাহা সত্য; দেশের লক্ষ্মী যাহাতে সমুদ্র পারে গিয়া বিদেশীর মস্তকে বিজয়মুকুট দান করিতে বাধ্য না হন, তাহা করা আমাদের প্রত্যেকেরই এখন কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই কর্ত্তব্যপালনের জন্য যদি আমাদিগকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, তাহাতেও বিমুখ হইলে চলিবে না; কারণ ইহার উপরই আমাদের জাতীয় সুখ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি, উন্নতি, অবনতি নির্ভর করিতেছে। স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিয়া মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীকে নিষ্পীড়িত করিয়া অনেকে পূর্ব্বে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং আজকালও করিতেছেন।

আজ আমরা দৃঢ়ব্রত হইয়া স্বদেশী শিল্পকলাকে গৃহে বরণ করিয়া সেই মনে প্রাণে স্বদেশী হই, দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া প্রাণ খুলিয়া বলি,—মা! বাঙ্গালার লক্ষ্মী! তুমি সোণার বাঙ্গলা ছাড়িও না, বাঙ্গালায় তুমি অচলা হও, আবার তেমনিই করিয়া আমাদের গৃহ ধন-ধান্যে পূর্ণ হউক, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের করাল কবল হইতে দেশের দীন দরিদ্র প্রজা মুক্তিলাভ করুক, দেশের অন্ন দেশের বস্ত্র দেশে থাক। বঙ্গজননীর সেবা যে তোমার সেবা, স্বদেশের উন্নতি চেষ্টাই যে তোমার সাধনা, স্বদেশ হিতে আত্মবিসর্জ্জনে সঙ্কল্পই যে তোমার অর্চ্চনা এ কথা আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত কর। আমাদের সকলের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া আমাদের মনে প্রাণে বলিতে শিখাও

"বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে,
ত্বং হি প্রাণা, শরীরে।"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদায়ে।

গিয়াছ বিদায় নিয়ে
আসিবেনা আর
তবু ভাবি চিরতরে
তুমিই আমার—

তৃষিতের হাহাকার
ব্যাথিত সে রব
কভু কি পশেনা তব
শ্রবণ বিবর ?

বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্তি
সুধাংশু গগণে
উজলিছে জল স্থল
বিমল কিরণে—

আম্র মুকুলের সেই
মধু গন্ধ ভরা
সুস্বরে গাহিয়া পিক
হইতেছে সারা

তেমনি চৌদিগে সখা
হেরি শোভা ময়
শুধু, আমার নয়নে অশ্রু
করি হায়! হায়!

জানি,—গেছ চিরতরে—
আসিবেনা আর
তবু' তো মানেনা হায়,
হৃদয় আমার!

কল্পনা কাননে বসি
গাথি ফুলহার
সাজাই মনের সাধে
ও তনু তোমার

কেন ভাবি নাহি জানি
শুধু মনে হয়
সকলি জানি'ছ তুমি
আমার হৃদয়

এই যে আকুল ব্যাথা
দীরঘ নিশ্বাস
নিরাশার শত বহ্নি
জ্বলে বারমাস

দেখিছ দেখিবে তুমি
নহে তাহা ভুল
তাই এ অকুলে দেব
হেরি যেন কুল।

বঙ্গ-মহিলা।

জাতীয় বিদ্যালয় ও শিল্প শিক্ষা।

জাতীয় শিক্ষা পারিষৎ স্থাপিত হওয়ার পর বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এক একটী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন জেলার পল্লীগ্রামেও দুই একটী জাতীয় স্কুল স্থাপিত হওয়ার সংবাদ অবগত হওয়া যাইতেছে। এ সমস্তই যে দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? গোলামী আকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালী জাতি গোলামীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া যে মনুষ্যত্ব লাভে অগ্রসর হইতেছেন ইহা বস্তুতই পরম আনন্দের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ, জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন অভিনব শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই যদ্দ্বারা শিক্ষিত লোকের মনোযোগ তৎপ্রতি আকর্ষিত হয়। সরকারী বিদ্যালয় সমূহে যেরূপ পাঠ্য পুস্তক ও পঠনপ্রণালী গৃহীত হইয়াছে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তদ্রূপ পাঠ্য পুস্তক ও পঠন প্রণালীই জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ফলতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত লোকের দ্বারা উক্ত বিদ্যালয়েরই অনুকরণ করা হইয়াছে। কোনরূপ নূতন প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই।

পাঠ্য পুস্তক সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সরকারী বিদ্যালয় সমূহে সে সমস্ত পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে, কিম্বা পুনঃ পুনঃ পঠিত হইয়া পুরাতন বোধে যে সমস্ত পুস্তক পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। জাতীয় ভাবের উন্মেষক, জাতীয় কাহিণীপূর্ণ কোন পাঠ্য পুস্তকই এ পর্য্যন্ত এ সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য সঙ্কলিত হইল না। কলিকাতার জাতীয় কলেজে বহু মনিষী ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহারা এই সমস্ত বিদ্যালয়ের পাঠ উপযোগী পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলনের প্রতি আদৌ কোনরূপ মনোযোগ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রচলিত ইতিহাস ও ভূগোলে যেরূপ ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বিশদ বিবরণ ও ব্রিটীশ দ্বীপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নদী নালার কাহিণী বিবৃত হইয়াছে, তদ্রূপ জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস ও ভূগোলে ভারতে হিন্দুরাজত্বের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ ও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিশদ বিবরণ বিবৃত থাকাই

সমীচীন। সুকুমারমতী বালকগণের হৃদয়ে স্বদেশ হিতৈষণা—স্বদেশ প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে স্বদেশের মহিমাপূর্ণ গ্রন্থরাজীই তাহাদের সম্মুখে সজ্জিত রাখিতে হইবে। পর দেশের মহিমা পরদেশের মহিমা পাঠ করিয়া কে কখন স্বদেশ প্রাণ হইয়াছে ?

জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য কি না তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইল না। যদিও পরীক্ষার উত্তরে, বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির উত্তর লিখিতে আপত্তি করা হয় নাই—তথাপি পঠন প্রণালী দেখিয়া ইংরাজী ভাষার প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় পড়াইলে ক্ষতি কি ? বরং ইহাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই অনেক সুবিধা হইতে পারে। ইংরাজ আমাদের রাজা। সুতরাং রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষা না করিলে সম্মান লাভের কোন উপায় নাই। অধিকন্তু ভারতীয় বিভিন্ন জাতীর মধ্যে মনোভাব আদান প্রদান করার জন্যও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় বটে। কিন্তু তাই বলিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত, মনোযোগ প্রদান করার কোনই আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। যে সমস্ত বিষয় ইংরাজী ভাষার সাহায্য ব্যতীত সম্যকরূপে শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই কেবল সেই সমস্ত বিষয়ই ইংরাজীতে অধীত হওয়া উচিত। যে সমস্ত বিষয় মাতভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান অক্লেশে সম্পাদিত হইতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দানে বৈদেশীক ভাষার সাহায্য গ্রহণ কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। উপরোক্ত বিষয় তিনটীর বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দান অক্লেশে চলিতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ যে মানরূপী পরীক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের সঙ্গে তুলিত করিতে হইলে, অনেকের পক্ষে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ৫ম মান এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার সমতুল্য, ৭ম মান এফ, এ পরীক্ষার সমতুল্য, প্রফিসেন্সি বি, এ বা এম, এ পরীক্ষার সমতুল্য ইত্যাদি মুখস্থ না করিলে কে কতদূর পড়িতেছে তাহা স্থির করা সুকঠিন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ মানের পরিবর্ত্তে উপাধির সৃষ্টি করুন না কেন ? যে সরকারী ডাক্তারী স্কুল সমূহ যেরূপ নিজ নিজ উপাধির সৃষ্টি করিয়া ছাত্রগণকে উপাধি দিতেছেন, তদ্রূপ ৫ম, ৭ম ও প্রফিসেন্সির জন্য তিনটী উপাধি সৃষ্টি করিয়া ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিলে ক্ষতি কি ?

তাহাতে শিক্ষাপরিষদের সুবিধা ব্যতীত কোনই অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ৭ম মানের পর ৪ বৎসর পাঠ করিয়া প্রফিসেন্সি লাভ করা বড়ই কঠিন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সরকারী বি, এ পরীক্ষার ন্যায় ২ বৎসর পরে আর একটী পরীক্ষার সৃষ্টি করিলে ক্ষতি কি ছিল? কিম্বা ৭ম মান পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া ৫ম মানের পর ৪ বৎসর অধ্যাপনান্তে প্রফিসেন্সির নিয়ম করিলেও হইত। ফলতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যপনা শেষ করিতে সরকারী কলেজের অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় কখনও সুবিধা জনক নয়।

প্রত্যেক জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গেই এক একটী শিল্প শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে প্রধানতঃ সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কাজই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ সরকারী সব-ওভারসীয়ারী স্কুলে ও টেকনিক্যাল স্কুলে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, এ স্কুল সমূহেও সেই প্রণালীরই অনুকরণ করা হইয়াছে। সরকারী ওভারসীয়ারী স্কুলে যাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা কর্ম্মকার কিম্বা সূত্রধরের কার্য্যে কখনও নিযুক্ত হন না। সব-ওভারশীয়ারী কিম্বা তদনুরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন গোলামীর মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য উৎসুক, তখন তাহাদিগের শিল্পশিক্ষা প্রণালী নিশ্চয়ই অন্যরূপ হওয়া উচিত। কোন ভদ্রলোকই বোধ হয় নিজ সন্তান সন্ততিগণকে সূত্রধর কিম্বা কর্ম্মকার করিতে ইচ্ছুক নন। অধিকন্তু এই দুইটী ব্যবসায়ের উপার্জ্জনও এরূপ অধিক হইতে পারে না যদ্দারা ভদ্রলোকের সংসার চলিতে পারে। আর দেশের কর্ম্মকার ও সূত্রধরগণেরই যখন অন্ন সংস্থান হইতেছে না তখন এই দুইটী ব্যবসায়ে আর অধিক লোকের প্রয়োজন কি? সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে এরূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহা দেশে নূতন কিম্বা যে সমস্ত শিল্প-দ্রব্য আমরা বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতেছি। ফলতঃ শিক্ষা প্রণালী উন্নত করিয়া জাতীয় শিক্ষার প্রতি যাহাতে দেশের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ হয় তাহাই করা বিধেয়। বারান্তরে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনবকুমার দত্তগুপ্ত।

আকুলতা।

বসন্ত পবন, বহে ঘন ঘন,
শেফালি মালতি চুমিয়া,—
চাঁদিনী রজনী বসি একাকিনী
কাঁদিছে বিরহে মজিয়া॥
কহিতেছে বালা, মন দুঃখ জ্বালা,
নাথেরে উদ্দেশ করিয়া।
বিরহ পাথারে ভাসায়ে আমারে
কোথা গেলে তুমি চলিয়া॥
অবোধ অবলা, নাহি জানি ছলা,
কেন তবে গেলে ছলিয়া?
দেখিলে ও মুখ ঘুচে মন দুঃখ
রয়েছি মরমে মরিয়া॥
হায়! হায়! বিধি কোথা মম নিধী
কে দিবে সে ধনে আনিয়া।
চন্দ্রমা-শালিনী এমন যামিনী
কেমনে থাকিব জাগিয়া,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
রহিব মরমে মরিয়া;
এ নব চাঁদিনী বসি একাকিনী
রয়েছি তোমারি লাগিয়া॥
তোমার বিহনে বাঁচিনে পরাণে
যায় যে জীবন জ্বলিয়া—
এস ত্বরা করি, ঢাল শান্তিবারি
আমার হৃদয় ভরিয়া;—
চাতকী যেমন চাহে নবঘন
তেমতি রয়েছি চাহিয়া।
এ নব যৌবন হইলে পতন
আর না আসিবে ফিরিয়া॥

এসহে সত্বর বিলম্ব না কর
রেখেছি যৌবন ধরিয়া
আসিলে হেথায় বাঁধিব তোমায়
যাইতে দিব না চলিয়া ।

শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

রুষ-জাপান যুদ্ধের একটা চিত্র ।

আজ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার । আকাশ অতি নির্ম্মল, মেঘের চিহ্নমাত্র নাই ; ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্র-কিরীটিনী রজনীর নীরব গাম্ভীর্য্য বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হইতেছে ।

এই গভীর নিশীথে এসিয়ার প্রাচ্য ভূখণ্ডে রুষাধিকৃত আর্থার বন্দরের চতুর্দ্দিক নীরব—নিস্তব্ধ ! প্রহরীগণ নিঃশব্দে সশস্ত্রে অবস্থিত ;—অদূরে স্বচ্ছ সলিলোপরি তিনখানি পোতধ্বংসী তরি নিঃশব্দে বন্দরস্থ রণপোত শ্রেণীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত । অন্যান্য ধ্বংসী তরিগুলি তীরবর্ত্তী পোতাশ্রয়ে বিরাজিত । তত্রত্য আলোক গৃহে নিষ্কম্পভাবে একটী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত । সমরোপকরণে পরিপূর্ণ সত্বেও বন্দরটীতে শান্তির পূর্ণধারা প্রবাহিত । চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীতে পীত-সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি যেন, শান্তির পূর্ণস্রোতে উচ্ছসিত হইয়া দুর্গের চরণদ্বয় বিধৌত করিতে সমুদ্যত । দুর্গোপরি স্থাপিত কামানগুলি ও বন্দরাভ্যন্তরীস্থিত সুরম্য হর্ম্যাবলী বিমল সলিলোপরি প্রতিবিম্বিত হইয়া, অতি মধুর দৃশ্যের অবতারণায় নিযুক্ত । বোধ হইতেছে যেন, প্রাচ্যখণ্ডের সেই শান্তিময় দৃশ্যের শেষ মুহূর্ত্ত অবলোকন করিবার নিমিত্ত, নিশানাথ সুনীল অম্বরে তারকামালা সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল নেত্র ধারণ করিয়া, জগতের নেত্র সেই ভূখণ্ডে নিপাতিত করিতে সচেষ্ট ।

যে প্রদেশ একণে শান্তির নিকেতন, বিলাসের রঙ্গস্থল, বাণিজ্যের সারস্থল, —হায় কে জানিত যে সেই রমণীয় প্রদেশই ক্ষণপরে বীভৎস শ্মশানের

আকার ধারণ করিবে! কে জানিত এমন শান্তিময় ভূখণ্ডে ক্ষণপরে ভীষণ কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইবে!

সেই গভীর নিশীথে যখন সমস্ত আর্থারবন্দর নিস্তব্ধ,—যখন তারকামালা আর্থারবন্দরের মধুর দৃশ্য সুদূর অম্বর হইতে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে ব্যস্ত, যখন কতিপয় প্রহরী ব্যতীত আর্থারবন্দরের জনসাধারণ নিদ্রিত,—সেই সময় প্রধান রুষ সেনা-নায়ক ষ্টার্কের আবাসে তাঁহার কণ্যার জন্মতিথি উপলক্ষে প্রমোদের পূর্ণস্রোত প্রবাহমান। প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ, কর্ম্মচারীগণ, নাবিকগণ—সকলেই সে সময় সেই প্রমোদ স্রোতে যোগদান করিতে সমাগত। রুষীয় বিলাসিনীগণের কোকিলকণ্ঠ প্রসূত সুমধুর সঙ্গীতে, অপরূপ হাবভাবে, মনোহারিণী নৃত্যে সভাস্থ সকলেই মোহিত। অবিশ্রাম নৃত্য গীত চলিতেছে, মুহুর্মুহু সুরাদেবীর অর্চ্চনা হইতেছে,—উত্তরোত্তর সভ্যগণ আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তত্রাচ নৃত্য গীত নিবৃত্ত হইল না;—মহোল্লাসে, মহোৎসাহে, মহানন্দে রঙ্গ-ভঙ্গ চলিতে লাগিল। এদিকে জাপানের কয়েকখানি টর্পিডো-বোট রুষীয় ধ্বজা পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া, ধীরে ধীরে বন্দরের ভিতর প্রবেশ করিল। বন্দরের প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমরা"? জাপানী টর্পিডোবোটস্থ অধ্যক্ষ, রুষের সঙ্কেত এবং রুষের ভাবে উত্তর দিলেন,—"আমরা রুষেরই লোক,—ডালনী হইতে আসিতেছি।" প্রহরীরা মনে করিল, আমাদেরই টর্পিডো-বোট ডালনী হইতে আসিতেছে। তাহাদের মনে কোন সন্দেহই রহিল না।

জাপানের টর্পিডো-বোটগুলি ক্রমশঃ আরো ভিতর বন্দরে রুষ রণতরী সমূহের নিকটে আসিয়া পড়িল। অমনি দেখিতে দেখিতে চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, জাপানের ক্ষিপ্রহস্ত নাবিকগণ, সেই ভীষণ যমদণ্ড স্বরূপ টর্পিডোগুলি জলে ডুবাইল। পরক্ষণে শত বজ্রপাতের ন্যায় একটী ভীষণ শব্দে বন্দরটী কাঁপিয়া উঠিল। বন্দরস্থ নগর কাঁপিল, দুর্গ কাঁপিল, সেনাপতি মহাশয়ের প্রমোদ ভবন কাঁপিল, বন্দরতলের অতল জল কাঁপিয়া উঠিল,—মহাসমুদ্রে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল দেখিতে দেখিতে রুষের বড় বড় মানোয়ারী জাহাজগুলি ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। লোমহর্ষণ বিভীষণরবে রুষীয় নাবিকগণের কালনিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে তাহারা দেখিল, প্রমাদ উপস্থিত। রক্ষার বুঝি আর উপায় নাই। সকলে স্তম্ভিত হইল,—

থতমত খাইল,—কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিল—হৃদয়ভেদী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল।

এই দুর্ঘটনার বিষয় প্রমোদ ভবনে সেনাপতি ষ্টার্ক মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল না। সহকারী সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইতেছিলেন; সঙ্গীত শ্রবণে, নৃত্য দর্শনে, তীব্র সুরাপানে তাঁহারা স্বশরীরে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছিলেন।

পূর্ণমাত্রায় নাচ-গান-পান চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই সভাস্থল কম্পিত করিয়া, বাদ্যের নিক্কন ব্যঙ্গ করিয়া ভীষণ শব্দে জাপানের কামান গর্জ্জন করিল—"গুড়ুম্—গুম্।"

ক্ষণেকের তরে সঙ্গীতোন্মত্তা রমণীগণের সঙ্গীত লহরী নিবৃত্ত হইল, মধুর বাদ্যধ্বনি নিবৃত্ত হইল, সভ্যগণ উৎকর্ণ হইয়া হইয়া নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিল,—বিশাল প্রমোদ কক্ষ স্তব্ধ, স্তম্ভিতভাব ধারণ করিল।

"ও কিছু নহে!" পরক্ষণে সেনাপতি ষ্টার্ক অবজ্ঞাতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ও কিছু নহে; আমাদেরই সেনাদলের তোপধ্বনি,—শত্রুর নহে; ভয় নাই!—চলুক নাচ—চলুক গান—চলুক পান—ঢাল মদ!"

আবার কোকিলকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ সুতানে ললিত-লহরী তুলিয়া সভার নীরবতা ভঙ্গ করিল; বাদ্যকারগণ বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিল, নাচ গানের উজান বহিতে লাগিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার সভ্যগণ প্রমোদ স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

আবার বাধা পড়িল;—আবার দুর্গ শিখর কম্পিত করিয়া, সন্নিহিত শৈলমালার প্রতিধ্বনীত হইয়া, প্রমোদালয় স্তম্ভিত করিয়া, বিলাসিনীগণের বিলাস স্রোতে বাধা দিয়া, জাপানের কামান ডাকিয়া উঠিল—"গুড়ুম্—গুম্।"

আবার সভা কাঁপিয়া উঠিল। বাদ্যকারগণের বাদ্যযন্ত্র হস্ত স্খলিত হইল, প্রেমসঙ্গীত প্রশমিত হইল, রঙ্গিনীগণ সেনাপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু এবারও প্রত্যাক্ষাত্ত হইল,—সভ্যগণ এই শব্দায়মান গোলা, রুষ সৈনিকগণের রণখেলা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। পুনরায় সঙ্গীত স্রোত বহিতে লাগিল, বাদ্যযন্ত্র আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, প্রমোদোন্মত্ত সভ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—"হিপ্—হিপ্—হুর্‌রে!" "হুর্‌রে" রবে বিরাট সভা প্রতিধ্বনিত হইল।

শত শত রুষ বীরের সেই আনন্দ-কোলাহল শূন্যে বিলীন হইতে না হইতে আবার জাপানের কামান ডাকিয়া উঠিল—"গুড়ুম—গুম্!" তত্রাচ

রুষ বীরগণের ভ্রূক্ষেপ হইল না,—তথাপি প্রমোদ স্রোত রুদ্ধ হইল না, পূর্ণ মাত্রায় প্রমোদ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

আবার—আবার গুড়ুম—গুড়ুম গুড়ুম শব্দ উত্থিত হইল। জাপানের কামানগুলি এবার মুহুর্মুহু ধুম উদগীরণ করিয়া ডাকিতে লাগিল—গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম! পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে—দূরস্থ তটিনীর তরঙ্গে তরঙ্গে সেই ধ্বনি প্রতিহত হইয়া ডাকিয়া উঠিল—"গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম!"

এবার রুষীয় বীরগণের বীর-বপু বিকম্পিত হইল;—এবার সকলে বুঝিল, এ সব রমণী-কণ্ঠ-প্রসূত প্রেমসঙ্গীত নয়,—বাদ্যযন্ত্রিকার মধুর নিক্কন নয়,—রুষ-সৈনিকের রণখেলাও নয়,—দুরন্ত জাপানের দুর্দ্দমনীয় কামানের ভৈরব গোলা—জ্বলন্ত আগ্নেয় গোলা!

তখনই সভা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রেম সঙ্গীতের স্থলে সমর-সঙ্গীত শ্রুত হইল, বাদ্যধ্বনির পরিবর্ত্তে অস্ত্রের নিক্কণে প্রমোদ সভা পূর্ণ হইল। হুর্‌রে—হুর্‌রে রবে রুষ-সেনাপতিগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে বন্দরে ছুটিলেন; গিয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অবিমৃষ্যকারিতায়—ঘোরতর অসাবধানতায় তাঁহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! তখন তাঁহারা আপন আপন জাহাজে উপনীত হইয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষেই ভীষণ সমর বাধিল। রাত্রি চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের গোলা বর্ষণ হইল। জাপান তাঁহার সংহার কার্য্য শেষ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

রাত্রি চারি ঘটিকার পর আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। চন্দ্রিমার রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নায় জগৎ আচ্ছন্ন হইল। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, প্রাতঃকালে এরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্য নেত্রপথে পতিত হইবে।

প্রাতঃসূর্য্য রক্তরাগ-রঞ্জিত হইয়া গগন-পটে উদিত হইল। রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে শত্রুপক্ষের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে রুষ নাবিকেরা দেখিতে পাইল,—দূরে দিগ্বলয় রেখার সমীপে তিনখানি জাপানি জাহাজ ভাসিতেছে!

ইহাই বিগত রুষ-জাপান-যুদ্ধের প্রথমাঙ্কের প্রধান উপাখ্যান ভাগ। এই দুর্ঘটনায় রুষের বিষম ক্ষতি হইয়াছিল। জাপানের অদ্ভুত কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই উপাখ্যানটী লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম।

শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতায় প্রভেদ কি? যদি বল চেষ্টা পূর্ব্বক কোন বিষয় আয়ত্ত করার নাম শিক্ষা, এবং স্বাভাবিক গুণজাত যে জ্ঞান তাহাই অভিজ্ঞতা, তাহা হইলেও সম্যক ভাব প্রকাশ হয় না। বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞান স্বাভাবিক গুণ জাত ও হইতে পারে, চেষ্টার ফলেও হইতে পারে। অপিচ, স্বাভাবিক গুণ প্রসূত জ্ঞান ও শিক্ষার সোপান স্বরূপ হইতে পারে। চেষ্টাই যে জ্ঞানের প্রসূতী এমন কিছু কথা নহে জ্ঞান লাভ চেষ্টার অনুকুলেও হইতে পারে, প্রতিকুলেও হইতে পারে। চেষ্টার প্রতিকুলে, জ্ঞান লাভ কি প্রকারে সম্ভবে তাহা আলোচনা সাপেক্ষ। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারে, মনুষ্যের জ্ঞান অজ্ঞাতসারে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তবে চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি সাধন হইতে পারে। অতএব শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা একই জিনিষ।

শিক্ষা অভিজ্ঞতার নামান্তর মাত্র, যেখানে শিক্ষা, সেইখানে অভিজ্ঞতা। শিক্ষার অভাবে অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। লেখা পড়া শিক্ষা করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানিচয় উত্তীর্ণ হওয়ার নামই যে শিক্ষা এ কথা কেহ যেন মনে না করেন। যে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করার নামই শিক্ষা। একজন কৃষক তাহার আপন ব্যবসায়ে শিক্ষিত কিন্তু তুমি, এম এ উপাধিধারী,—তুমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কৃষকের যে শিক্ষা তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক গুণজাত বলা যাইতে পারে।

জ্ঞানার্জ্জন প্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ। শিশুর বাক্য স্ফুর্ত্তি হইবামাত্র সে সকল বিষয় জানিতে চেষ্টা করে; তাহার সেই শিশু হৃদয়ও জ্ঞানামৃত-পানের জন্য তৃষাকুল অনভিজ্ঞ বা অশিক্ষিত লোক জগতে কেহ নাই। যাহার যে বিষয়ে যতটুকু শিক্ষা সে সেই বিষয়ে ততটুকু অভিজ্ঞ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুস্তকগত বিদ্যার নামই যে শিক্ষা এমন কিছু কথা নহে। একজন নিরক্ষর কৃষক হয়ত সাংসারিক অনেক বিষয়ে তোমাপেক্ষা শিক্ষিত, সে লেখা পড়া জানে না বলিয়া কি তাহার সে শিক্ষাকে শিক্ষা বলিব না? শিক্ষার নামান্তর অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার ফলই অভিজ্ঞতা। সুতরাং যে অভিজ্ঞ সেই শিক্ষিত।

পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জ্ঞানলাভ করা। কেন না সংসারে কোন কার্য্যই উদ্দেশ্য শূন্য হইতে পারে না। শিক্ষার আধার

অভিজ্ঞতা ইহাদের পরস্পর এত নিকট সম্বন্ধ যে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব। কিন্তু শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বা ফল কি? উদ্দেশ্য বা ফল যাহাই হৌক, মনুষ্যকে জীবন ধারণের জন্য বাধ্য হইয়া শিক্ষিত হইতে হয়। আগুণে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় ইহা কেহ চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করে নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আপনা হইতে এই প্রকারের শিক্ষা মানবমনে নিহিত করিয়া দেয়। এই প্রকারের শিক্ষার নাম চেষ্টার প্রতিকূলে শিক্ষা। * জগতের বিবিধ বিষয়ে আমরা আপনা হইতে জ্ঞান লাভ করি। মনুষ্য যতই নিরক্ষর হৌক না কেন, সাংসারিক নানা বিষয়ে তাহার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছেই, সুতরাং শিক্ষাশূন্য মানুষ জগতে নাই, থাকিতে পারে না।

শিক্ষার প্রয়োজন কি তাহা বলিয়াছি। প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, শিক্ষালাভ মনুষ্য ভাগ্যে অনিবার্য্য। তবে শিক্ষা যত নানা বিষয়ে প্রসারিত হইবে, মার্জ্জিত এবং সুরুচি পূর্ণ হইবে, মনুষ্যের অন্তঃকরণ তত প্রসারিত উচ্চ এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। ধর্ম্মের প্রতিকূলে যে শিক্ষা, সে শিক্ষা উচ্চ হইলেও সম্পূর্ণ নহে। শিক্ষিত হৃদয় ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে প্রভাসিত না হইলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদি বল যে এমন অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না,—তাঁহাদের শিক্ষা কি সম্পূর্ণ নহে? ইহা আলোচনার বিষয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস অবিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মের কতটুকু সম্বন্ধ তাহা বিচার্য্য। একজন ব্যক্তি যদি পরোপকার পরায়ণ, সত্যবাদী, দয়ালু, ন্যায় পরায়ণ হন, অথচ তিনি যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি ধার্ম্মিক বলিব না? ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্ম পথের প্রধান সহায় এবং পরিচালক সন্দেহ নাই। মনুষ্য যখন ধর্ম্ম পথ ত্যাগ করিয়া, বিপথে যায়, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভয় তখন তাহাকে সুপথে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু যদি কেহ স্বীয় মনোবলের সহায়ে এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্ম পথগামী হইতে পারে, অথচ সে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহাকে কেন ধার্ম্মিক বলিব না? ধর্ম্ম কি? শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। এমন অনেক লোক দেখা যায় যে তাহারা ত্রিসন্ধ্যা পূজা আহ্নিক প্রভৃতি করে, অথচ

* চেষ্টার প্রতিকূলে শিক্ষা অর্থে কেহ যেন মনে না করেন, চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া শিক্ষা।

পরনারী হরণে, বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদানে, লোকের সর্ব্বনাশ সাধনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এই প্রকৃতির লোক সংসারে বিরল নহে। তাহাদিগকে 'ধার্ম্মিক বলা কি ন্যায় সঙ্গত? ৺বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "যাহা লোক হিতকর তাহাই ধর্ম্ম।" বাস্তবিক তাই। দয়া স্নেহ মমতা প্রভৃতি গুণ যাহা ধর্ম্মের অলঙ্কার, সে গুলি সমস্তই লোক হিতকর। এক কথায় ধর্ম্মের এমন সুন্দর পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস যে ধর্ম্মের একটা অঙ্গ নহে সে কথা আমি বলিতে পারি না। সর্ব্বোপরি ইহাকে আসন দান করা যায়। কিন্তু সুধু ঐটুকুতে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না, ইহাই আমার বক্তব্য।

ধর্ম্ম ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না কেন? শিক্ষা বা জ্ঞান কিসের জন্য? আত্মোন্নতি ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও পরের হিতসাধন ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। তোমার শিক্ষার গুণে যদি আর পাঁচ জনের কোন উপকার না হইল, তবে সে শিক্ষা কিসের জন্য? যদি বল আত্মোন্নতি, তাহাই বা কই? তুমি উচ্চ শিক্ষিত, বিজ্ঞান শাস্ত্রে তোমার অগাধ পাণ্ডিত্য, কিন্তু তাহাতে তোমার কি এমন উন্নতি হইয়াছে? যবক্ষার, অঙ্গার, বাষ্প, আকাশ, জল, মাটী, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তোমার কি উন্নতি হইয়াছে? কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবলে যদি তুমি কোন একটা নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া লোকের উপকার করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার শিক্ষা সার্থক হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আজি জগতের প্রাণী সমূহ তাহা হইতে কত উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তোমার মনে যদি ধর্ম্মভাব না থাকে, মমতা, দয়া, উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রভৃতি গুণ যদি তোমাতে না থাকে, তাহা হইলে তোমার প্রবৃত্তি ওপথে যাইবে না। কিন্তু ইহকাল পর্য্যন্ত যত বৈজ্ঞানিক জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি পরোপকার জন্য বৈজ্ঞানিক সত্য সমূহের আবিষ্কার জন্য ঐ সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, না যশোপার্জ্জনের জন্য? মুখ্য উদ্দেশ্য কাহারও যশোপার্জ্জন হইলেও গৌণ উদ্দেশ্য পরোপকার সাধন। যশঃ কি প্রকারে লাভ করা যায়? আমি কোন একটা কার্য্য করিলাম, লোকে যদি তাহা হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেইতো আমার যশঃগান করিবে, নচেৎ উপকার না পাইলে কেন আমার গুণ গান করিতে যাইবে?

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ধর্ম্ম ব্যতীত শিক্ষা অসম্পূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগতে অশিক্ষিত লোক কেহ নাই,—কোন না কোন বিষয়ে

তাহার শিক্ষা আছেই। কিন্তু শিক্ষা যদি সম্পূর্ণ, প্রসারিত এবং পরোপকার পরায়ণ না হয় তবে সে শিক্ষা কিসের জন্য? তাহাতে ফল কি? কিন্তু শিক্ষা মাত্রেই ফলপ্রসূ, যাহার যে বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান, সে তদ্দ্বারাই পরের হিত-সাধন করিতে পারে। একজন কৃষক একটা সামান্য মুষ্টিযোগের সহায়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিতে পারে।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ের জ্যোতি সম্মিলিত হইয়া মনুষ্য হৃদয়কে স্বর্গসম পবিত্র উন্নত এবং আলোকিত করে। জ্ঞান, ধর্ম্মের সহায়, ধর্ম্ম জ্ঞানের সহায়। একের অভাবে অন্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, কেন, তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছি।

জ্ঞানের আকর্ষণ বড় মধুর, যে একবার জ্ঞানের আস্বাদন পাইয়াছে সে আর কিছুতেই উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। ধর্ম্মের আস্বাদনও ততোধিক মধুর। সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মের সংযোগ মধুরতম। যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সংযোগ স্থল, তিনি এ সংসারে অতি পুণ্যবান। যেমন পূর্ণে-ন্দুর সুধাময় নির্ম্মল কিরণে প্রকৃতির মলিনতা ঘুচিয়া প্রকৃতি অনুপম সৌন্দর্য্য-শালিনী হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি মানব মনের মলিনতা ঘুচাইয়া সে হৃদয় অপূর্ব্ব প্রভায় বিভাসিত করে। ধর্ম্ম ও জ্ঞান সাধকের সাধনার সামগ্রী,—ইহা এমনই দুর্লভ যে দেবতারাও ইহা লাভ করিবার জন্য যুগ যুগান্তর কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র,—ইহার প্রভাব অক্ষয় অবিনশ্বর এবং সর্ব্ব সুখ দাতা।

শ্রীকালীভূষণ মৈত্র।

মিলন।

(ওই) স্নিগ্ধ হিল্লোলে লহর তুলি,
ছুটেছে অনন্তে তটিনী,
মরম-মাঝারে প্রেমভরা গীতি—
প্রবাহ কল্পনা ধ্বনি;
যাইছে সাগরে সাগর বধূ
অতৃপ্ত বাসনা মানসে;
ভুলিবে সকল বাসনা কামনা
প্রণয় পয়োধি পরশে।

দেখনা চাহিয়ে বাগান মাঝারে
পেলব মাধবী লতা,
আলিঙ্গি রসালে, পিক বধু স্বরে,
গাহিছে প্রণয় গাথা;
কুসুম কলিকা অস্ফুট স্বননে
ডাকিছে মলয় বায়;
"প্রাণের মিলন" প্রকৃতীর খেলা
বড়ই মধুর হায়!
(তাই) রয়েছি চাহিয়ে তোমারই পানে
স্নিগ্ধ শান্তির ধারা,
জীবন ঝঞ্ঝায় তুমি থাক যদি
হবনাকো পথহারা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন।

ভাঙ্গিয়াছে ভুল।

১

ভাঙ্গিয়াছে ভুল মোর,
ওগো, ভাঙ্গিয়াছে ভুল,
যে দিন দেখিছি তব
বাগানে তুলিতে ফুল।

২

যখন দেখিনি তোমা
শুনেছি রূপের কথা,
তখনও প্রাণে মোর
পাইনিকো কোন ব্যথা।

৩

যখন শুনেছি তুমি
'রূপে কালো গুণে আলো'
তখনো গরবে আমি,
বলেছি তুমিই ভালো।

৪

তখনো তোমার স্মৃতি।
অশরিরী ছায়া প্রায়,
জেগেছিল হৃদে মোর,
দিবা-স্বপনের প্রায়।

৫

তখন তোমায় যদি
ভাল নাহি বেসে থাকি,
দিতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ
ছিল নাকো বেশী বাকী।

৬

কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ভুল
আজ ছুটেছে স্বপন,
কর্ম্ম পথে চলে যেতে
তোমা দেখিনু যখন।

শ্রীফণিভূষণ রায়।

ওমা! মায়ানিদ্রা ত্যজ।

ওমা দুর্গতি নাশিনী দুর্গে! মা উঠ, ও তোর মায়ানিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া পরিক্ষা লওয়া কি এখনও শেষ হলনা? ওমা শিবশিবানী! তোর সন্তানের সঙ্গে কি এত ছলনাও ছলতে হয়। মা আজন্ম কালটাই কি ভক্তের সঙ্গে তোদের রঙ্গ করতে হয়। দেখ্‌ দেখিনী মা আজ তোর কত শত শত সন্তান কাল করকবলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষে গ্রাম, নগর রাজধানী প্রভৃতি জনশূন্য করিল। যাহারা কোন রকমে প্রাণধারণ করিল, অমনি সহসা বৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাদের সকল আশার স্থল ধান্য সকলকে ডুবাইল, পচাইল, অবশেষে "ধসা" ধরিয়া তাহা সাঁথাড় করিল। চতুর্দ্দিকের পচানিতে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। যাহারা ঘাস, পাতা, খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল, তাহাদের আর বাঁচিতে হইলনা; সকল আশা ফুরাইল,—প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি রোগে তাহাদিগকে আমাদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল—দিলনা, ছাড়িয়া দিলনা, দিলনা, টানিয়া লইয়া গেল। ভারতের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অসহায়ের দারুণ অত্যাচার। মা! তুই যদি এসব না দেখিবি, তবে এ সমস্ত কে দেখিবে মা! ওই দেখ কত সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় হা অন্ন! হা অন্ন! বলে রোদন করছে, জাতি মানিছে না, যাহার, তাহার, অন্ন খাইতেছে। এক মুঠা ভাত দাও, এক মুঠা ভাত দাও বলে রাস্তায় রোদন করছে, কেহ এক মুঠা চাউলের জন্য লালায়িত, কেহ ক্ষুধার জ্বালায় স্বীয় পরিবার, সন্তানদের কাতর-ধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতেছে। নতুবা নিজে আত্মহত্যা করিতেছে।' কেহ আপনা আপনি ভাগ্যের দোষ দিতেছে মাগো!! এক মুঠা ভাত দাও, আজ ৭।৮ দিন কিছু খাই নাই। কাল রাত্রে ঘাস খাইয়াছি, কেহ বলিতেছে আমি শৃগাল, কুক্কুরের মাংস ভক্ষণ করিয়াছি, এক মুঠা চাল দাও ক্ষুধায় প্রাণ যায়। হায়! হতভাগিনী মা কেন এ অধম সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলি, হা প্রভো! এত কষ্টের জন্যই কি আমাকে পাঠাইয়াছিলে; প্রভৃতি সন্তানগণ ক্ষুধায় কত রোদন করিতেছে। কেহ রোগ যন্ত্রণায় স্বীয় জীবন আপনা আপনি হত্যা করিয়া মরিতেছে। এমত সংসারের দারুণ জ্বালা, তাতে আবার এই সমস্ত অমঙ্গল। ওমা

বিশ্বজননী! আর মায়া নিদ্রায় কতক্ষণ থাক্‌বে মা! উঠ আর তোর ভক্তদের কষ্ট দিস্‌ না। ওমা পরমেশ্বরী! জাগো! জাগিয়া তোমার পিত্রালয় হীমগিরির পাদ পীঠস্থ "সুজলা সুফলা শস্তশ্যামলা" ভারত ভূমিরদিকে একবার করুণা কটাক্ষে কৃপাদৃষ্টি কর। ওমা নয়ন-ত্রয়-শোভিতা! তুমি ত আমাদেরই মায়ায় ঘুমাইয়ে রেঁখেছ, কিন্তু মা, তোকেত কেউ ঘুম পাড়ায় নাই। তবে যার কোলের ছেলে পেটের জ্বালায় মরে, তার কি-এ মায়ায় নিদ্রা শোভা পায়? মা নিদ্রানিধি! দেশ যে রসাতলে গেল, "দুর্দ্দর্শ্বর প্রকোপে যে, অসহায় লোকেরা যে মরিল।" তোর নিদ্রা লীলার আজ কি এ পালা সাঙ্গ করিবি মা? মা যদি একেবারে সাঙ্গ করিস্‌ তবে একেবারে সাঙ্গ কর, নতুবা এ যাতনা আর যে দেখতে পারা যায়না মা! তোর যদি রাখ্‌বার ইচ্ছা হয় তবে এ দুর্দ্দিনে তাদের রক্ষা কর। সাগরে, ভূগর্ভে, বনে, রণে সকল স্থানেই "তাদের অভয় দে। ওমা! অভয়ারূপিনি! একবার মায়ানিদ্রা ত্যজ, ত্যজে আজ সন্তানদের অভয় দেমা, ওমা পূর্ণানন্দময়ী! এখনও কি তোর নিদ্রা ভাঙ্‌লোনা মা? এখনও কি পূর্ণানন্দ ধামে সদানন্দ ক্রোড়ে পূর্ণানন্দে নিদ্রিত আছ? আর তোমার দুর্দ্দস সিংহ বুঝি অবসর পাইয়া ভারতের নানা স্থানে বদন ব্যাদান করিয়া নর শোণিত পান করে স্বীয় উদর পুষ্ট করিতেছে। একবার নয়ন উন্মিলন করিয়া মৃত মানবের অস্থিকঙ্কাল ও নরমূর্ত্তি সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—অনশনক্লিষ্ট, খাদাবশিষ্ট, নর-মৃত্যু সকল হের। অসহায় শিশুদিগের শোচনীয় মৃত্যু সকল হের। হাঁ মা এই কি তোর করুণাময়ী নামের পরিণাম? আর তোমার পালিত পশুরাজ ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে তোর শত শত সন্তান মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধরিতেছে। নখ, দন্ত দ্বারা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্ত ভক্ষণ করিতেছে; আবার কতকগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃসংশরূপে হত্যা করিতেছে। আর তুমি কৈলাসধামে সুখে নিদ্রা যাইতেছ; ধন্য তোর করুণাময়ী পরিচয় আর তোর নিদ্রাকে ও ধন্য। মা যদি করুনাময়ীর নাম বজায় রাখিতে চাও, তবে, ওমা মায়া নিদ্রাত্যজ, আর ঘুমাইও মা! দুর্গতি হারিণি! অস্ত্র শস্ত্র ধারিণি! তোর কালান্তকর শাণিত বর্শা আজ বঙ্গবাসীর বুকে কেন মা? তা'রা ত সুর নয় অসুরও নয়,—তা'রা দেবদেবী দানব নয়,—তা'রা ঋষি মাংস ভক্ষণকারী অসুরও নয়,—তা'রা দুর্ভিক্ষ প্রপিড়ীত, রোগ জর্জ্জরিত অদৃষ্ট বাদী ক্ষুদ্র মানব। হ্যাঁমা! তাদের বুকে কি তোর এ নিদারুণ বর্শা

শোভা পায়? মা! দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার হইতেছে বলে কি, তুইও সেইরূপ কর্‌বি? তাই বলি মা! আর একবার মায়া নিদ্রা ত্যজ। ওমা সর্ব্বার্থ সাধিকে! তোমার হস্তস্থিত যে নাগপাশে একদিন দুর্জ্জয় অসুরকে বন্ধন করিয়াছিল, সেও আজ অবসর পাইয়া বিষাক্ত তীব্র নিশ্বাসে নানাস্থানের ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছে ও আনন্দিত মনে বেড়াইতেছে। ঐ, হের মা! আজ কোথাও প্লেগ, জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি রোগ দ্বারা লোকগুলাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। একে দুর্ভিক্ষের ভাবনা, বর্ষার তাড়না, তার উপর রোগের যাতনা, ভাগ্যহীন বঙ্গবাসীর শান্তি কোথায় মা! জাগ মা, আর ওমায়ার খেলা সাঙ্গ কর।

মা! তোর নিদ্রা দেখিয়া, আজ তোর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও পোতারোহণ পূর্ব্বক সাগর পারে গমন করিয়াছে, তাই আজ আমরা অন্নপূর্ণার সন্তান হইয়া নিরন্ন হইয়াছি, মা! মোরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি। ধনরত্নের অধিশ্বরী পর কুহকে ভুলিয়া বিদেশে গিয়া কত অনর্থক সংঘটন করিতেছেন। মা! উঠ আর কষ্ট দিও না, উঠ, উঠ।

মা ভব ভবানি! আজ বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরস্বতী সময় পাইয়াই কি দেশে অবিদ্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন? তাই এখন সেকালের বিদ্যা ও একালের বিদ্যার এত প্রভেদ? তখনকার শাস্ত্রকারেরা যে ধর্ম্ম মানিতেন, এখন তাহা কুসংস্কার। তখনকার লোকের যাহা শ্রেয় ছিল, এখন বিজ্ঞান-বীত পণ্ডিতের পক্ষে সেটা অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর এখন স্বরস্বতীদেবী আমাদের প্রতি বিমুখ, নতুবা আজ শিক্ষার এ দুর্দ্দশা কেন?

মা! আজ তোর একি রূপ শাসন, দেখ দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের কি ভীষণ প্রকোপ, ঐ যে তোর সন্তান সকল কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতেছে, আর এক মনে ডাকিতেছে—"মা, মা, মা।"

শত সহস্র সন্তান ডাকিতেছে—"মা, মা" উঠ, মায়ানিদ্রা ত্যজ, তোমার আর লীলা কি এখনও সাঙ্গ হইল না। ঐ যে চিতা দাউ দাউ শব্দে জ্বলতে জ্বলতে নিকটে আস্‌ছে, "মা" রক্ষা কর, রক্ষা কর, মায়ানিদ্রা ত্যজ, জীবন বোধ হয় গেল মা, উঠ, উঠ।

ওমা দুর্গে! তোমার সন্তানের জন্য এসব অমঙ্গল কে করিল মা? মা এ অধমাধম সন্তানকে বুঝাও মা? এ অমঙ্গল কিসের জন্য? তোমার করুণা ভিন্ন এ সব কিছুই নহে, জানি তবে বড় ভয় হয় পাছে, এ সন্তানদের কোন বিপদ হয়। সাধারণের চক্ষে যেটা অমঙ্গল, এক জনের চক্ষে সেটা মঙ্গলময়ী

ঐশ্বরীক নীতি বর্ত্তমান। যাহা হউক মা, উপস্থিত বিপদ রাশির মধ্য হইতে সুমঙ্গল চিহ্ন দেখাও নতুবা এ সংসারাচ্ছন্ন মোহান্ধ বদ্ধজীব, তোমার যে সংসার নীতির করুণার অনন্তধারা প্রবাহিত তাহা আমার পক্ষে বোঝা অসাধ্য। তাই বলিতেছি মা! মায়ানিদ্রা পরিত্যাগ কর। তোমার ত সকলই মায়া, কোনটাকেই বা মায়া শূন্য বলি। মা! আবার যে তোমার পূজার সময় আগত মা! তুমিই যদি না উঠ তবে, কে তোমার পূজা করিবে। সকলেই নিজের আহারের জন্য লালায়িত। তুমি উঠ, দুর্ভিক্ষ রোগ প্রভৃতি দূর কর, আবার সন্তানদের হৃদয়ে নূতন শক্তি দাও, আনন্দিত কর; তবে সকলে আবার তোমার পূজা করিবে, নতুবা যে সকলেই অস্থির, ছন্নছাড়া মা! মা! তোর অধম সন্তানদের প্রতি কৃপাদানে, কৃপণতা করিও না। পাষাণনন্দিনী বলে,—নিজেও পাষাণ হইও না মা! তাই কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছি, মা! মায়ানিদ্রা ত্যজ।

মা! তোকে সহস্র কটুকাটব্য বলিয়াও যদি একবার "মা" বলে প্রাণের সহিত ডাকা যায় তবে তোর সিংহাসন টলে।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত, দেখি কি মা থাকতে পারে।"

শাস্ত্রেতে আছে যে, তুই পাষাণের বেটী, কিন্তু তুই ভক্তের মনবাসনা পূর্ণের জন্য সদাই ব্যস্ত থাকিস্। তবে মা তোর ভক্ত সকলকে এত কঠিন দণ্ড দিচ্ছিস কেন মা? মা তোকে সকল কথা বলবার ক্ষমতা আছে বলেই আজ একথা বল্‌ছি, ওমা মহাশক্তি! সকলকার হৃদয়ে শক্তিদান কর মা, বাহুতে বল দাও, কোমর শক্তিতে বাঁধিয়া দাও! মা মহিষমর্দ্দিনী। অধমের কথা একবার কাণে শুনিস মা! তোর সন্তানেরা যেন তোকে কখনও না ভুলে। ওমা জগদম্বে! তোর অধমাধম সন্তানেরা আজ তোর পদতলে পড়ে বলিতেছে,—

"সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুর্ভিভুজৈঃ
শঙ্খং চক্র ধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎ কাঞ্চীকণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতুবোরত্নোল্লসৎকুণ্ডলা।

মায়াময়ী মা! মায়া নিদ্রা ত্যজ, আর ঘুমাইও না।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য জ্যোতিরত্ন।

মাসিক সংবাদ।

বোম্বায়ের রাষ্ট্রমাতা পত্রে প্রকাশ বিপিনবিহারী মণ্ডল এবং পেট্রিয়টের সম্পাদক মিঃ মুখার্জ্জিকে বোম্বায়ের পুলিশসাহেব মিঃ শ্লোন তাঁহার আফিসে ডাকিয়া পাঠান। উভয়ে উপনীত হইলে শ্লোন সাহেব মণ্ডলের গাত্রবস্ত্রাদি উন্মোচন পূর্ব্বক পরীক্ষা করেন। বিপিন বাবু নাকি কুষ্টিয়া ডাকাইতি মোকদ্দমার আসামী শ্রেণীভুক্ত আছেন। বাবু তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিপিন বাবু বিগত ছয় মাস এক বাসায় বাস করিতেছিলেন বলিয়া তারাপদ বাবুর বাসা পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়াছে, কিন্তু কিছুই পায় নাই। পুলিশ বিপিন বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুরে চালান দিয়াছে।

খালী বারাকপুরে বাবু রামকালী মৈত্রের বাটী সেদিবস পুলিশ খানাতল্লাসী করে। রামকালী মৈত্রের বাটীতে বাবু মোক্ষদা চরণ সামাধ্যায়ী নাকি বাস করিতেন। মোক্ষদা বাবু বিঘাটী ডাকাইতি মোকদ্দমার আসামী শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। পুলিশ এত দিবস তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় নাই। সম্প্রতি তিনি কাশীতে ধরা পড়িয়াছেন। রামকালী বাবুর বাটী অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ প্রায় চারি হাজার টাকার অলঙ্কার ও কতকগুলা কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। পুলিশের বিশ্বাস, এই সকল অলঙ্কার মধ্যে অপহৃত অলঙ্কারাদি আছে। আগামী ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বিঘাটীর ডাকাইতি মোকদ্দমা শ্রীরামপুর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মুলতুবী করিয়াছেন।

এষ্টিনী নিউইং এক যুবতী শ্বেত রমণীর নাম। মিউনিসিপ্যাল বাজারে আব্দর রহমান নামক জনৈক দোকানদারের নিকট হইতে এষ্টিনী দশটাকা মূল্যের পরিচ্ছদ জুয়াচুরী করিয়া লয়। ইহার নিমিত্ত পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণহীল সাহেবের নিকট সে অভিযুক্ত হয়। প্রথম অপরাধ বলিয়া থর্ণহীল সাহেব সেইবার তাহাকে ক্ষমা করেন। এষ্টিনীর কিন্তু ইহাতে চরিত্র সংশোধন হইল না। সে তাহার প্রভুপত্নী শ্রীমতী গিবসের একটা ঘড়ি অপহরণ করে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

তুর্কের শক্তিহ্রাসের জন্য ইয়ুরোপীয়ান শক্তিপুঞ্জ সচেষ্ট। ইয়ুরোপের মধ্যে তুর্কই একমাত্র মুসলমান রাজ্য, বাকী সমস্তই খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশ। কাজেই তুর্ক খৃষ্টানদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তুর্ককে ক্রমশঃ বলহীন করা হইতেছে। সম্প্রতি তুর্কের অধিকার হইতে কয়েকটীর খৃষ্টান অধ্যুষিত প্রদেশকে স্বাধীন করিবার যে প্রয়াস হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ব্যর্থ হইল না।

বঙ্গের মসনদ ফ্রেজার সাহেব ত্যাগ করিলেন, বেকার মহোদয় ছোটলাট হইলেন। আমাদিগের প্রার্থনা, সদয় ব্যবহারে, নিরপেক্ষ শাসনে বেকার মহোদয় জনপ্রিয় হউন।

রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা সম্বন্ধে নূতন আইনের সৃষ্টি করিবার জল্পনা হইতেছে। শুদ্ধ ইহাই নহে বোমা বা ষড়যন্ত্রাদির মোকদ্দমার সরাসরি বিচারের জন্য বিলাতের লোকে এবং এদেশে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানেরা আবেদন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, বর্ত্তমান বিচার পদ্ধতি অনুসারে এই সকল অপরাধের বিচার কার্য্য সমাধা করিতে বহুকাল বিলম্ব হইয়া থাকে। ইহা না করিয়া এরূপ বিধান করা হউক যে, ষড়যন্ত্রকারীদিগের বিচার একেবারে হাইকোর্টের বিচারকদ্বারা গঠিত ধর্ম্মাধিকরণে একেবারে হইবে; এবং সেই বিচার ফল চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকারী কানাই দত্তের ফাঁসী হইবার পর তাহার শবদেহ শ্মশানঘাটে যেরূপ সম্মানের সহিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক নীত হইল, কানাই দত্তের সংকারে যেরূপ জনতা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক রাজপুরুষ ক্রুদ্ধ হন। গবর্ণমেণ্ট ইহার পর আইন করিয়াছেন, অতঃপর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহাদিগের শবদেহের সংকারে জনসাধারণের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকিবে, জেলকর্ত্তৃপক্ষ সেই শবদেহ মৃত-ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে প্রদান করিবেন না।

গুরু অর্জ্জুন সিংহ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গুরু অর্জ্জুন তাঁহার সঙ্কলিত কেতাব আদি গ্রন্থ সাহেবে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, মুসলমান কে ? যাঁর মসজিদে দয়া-কার্পেট (প্রার্থনা-কারীর আসন) হয় সন্তোষ এবং কোরান হয় সত্য ও সততা, অর্থাৎ যাহার পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিবে এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-গণকে শত্রুভাবে না দেখিয়া ভ্রাতৃভাবে দর্শন করিবে, যত্ন আদর দয়া করিতে হিন্দু মুসলমানকে পৃথক করিবে না, এমন হিংসা শূন্য ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত মুসলমান। কাজী কে ? না, যিনি সত্য ও ন্যায়ের অবতার অর্থাৎ বিচারপতি। হাজী—যিনি যথার্থ তীর্থযাত্রী অর্থাৎ যিনি আত্ম জয় করিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়াছেন,—মোল্লা (মুসলমান পুরোহিত) তিনি কে ? না, যিনি ষড়রিপুকে জয় করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা ও মত হিন্দুদের অনুরূপ, তাহাও মুসল-মানগণকে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ; মুসলমানগণও ধীরভাবে তাঁহার ব্যাখ্যা ও উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গুরু অর্জ্জুন আরও দেখাইয়া-ছিলেন যে,—নামাজ কিছুই নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি একাগ্রতা-ধর্ম্মের কার্য্যই নামাজ। আমরা আরো দেখিতে পাই যে, মুসলমানগণ হিন্দু-দাহকার্য্যকে বিদ্রূপ ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, যখন মৃত হিন্দুকে অগ্নিতে অর্পণ করা হয় তখন সে কাঁদিয়া উঠে। গুরু অর্জ্জুন ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলি-লেন, যে, হিন্দুদের মত মুসলমানগণকেও দাহ করা হয় তবে দুদিন পরে এই কার্য্য হয়। যখন মুসলমানগণকে কবর দেওয়া হয়, তখন সেই মাটি দিয়া কুমার মৃত্তিকা পাত্র প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে দেয় তখনো মুসলমান-গণ উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া উঠে ইত্যাদি। ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে উক্ত ছত্র কয়টী হাস্যজনক কিন্তু দূষনীয় নহে।

উপরোক্ত কয়েক ছত্র এবং আরও কয়েক ছত্র তাহা আমরা অনাবশ্যক বোধে লিপিবদ্ধ করিলাম না। ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া শত্রুরা গুরু অর্জ্জু-নের নির্য্যাতনের কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অনেক দিন হইতে দেওয়ান চান্দু সা তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধান করিতেছিলেন—যখন তিনি শুনিলেন যে, গুরু অর্জ্জুন কতকগুলি ধর্ম্ম পুস্তকের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি কেতাব প্রস্তুত

করিয়াছেন, তখন তাঁহার বৈরীনির্য্যাতন প্রতিহিংসা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ লাহোরের নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—জাহাপনা; গুরু অর্জ্জুন মুসলমানগণকে এবং মুসলমান ধর্ম্মকে গালি দিয়া একখানি রাজ বিদ্বেষ পূর্ণ পুস্তক প্রনয়ন করিয়া রাজ্য মধ্যে বিতরণ করিতেছেন; ইহাতে শীঘ্রই রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিভ্রাট উপস্থিত করিবে। নবাব বলিলেন,—অর্জ্জুন যে রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছে তাহার প্রমাণ কি?

চাঁন্দু সা বলিলেন,—হুজুর! বহুত প্রমাণ আছে। আজ কাল কোন জাতীর বিরুদ্ধে কোন জাতিকে উত্তেজিত করিলে ১২৪ ক এবং ১৫৩ ক ধারামতে যাবজ্জীবন অথবা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাসন অথবা কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় বা হইতেছে।

সে যাহা হউক নবাব সাহেবের আদেশে গুরু অর্জ্জুনকে ধরিয়া আনা হইল। বন্দীর হস্তপদ লৌহ নিগড় আবদ্ধ, যেন ক্রুদ্ধকেশরীকে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহার নির্ভীক মুখশ্রী হইতে এক প্রকার তেজঃব্যঞ্জক জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। নবাব দরবার গৃহে আসিয়া উপবেশন করিয়া গুরু অর্জ্জুনকে তথায় আনিতে হুকুম দিলেন। অনতি বিলম্বে সশস্ত্র প্রহরি আবেষ্টিত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষসিংহ গুরু অর্জ্জুন নবাব সমক্ষে নীত হইলেন। নবান সাহেব গুরুর নির্ভীকতা ভাব দেখিয়া মোহিত হইয়া বলিলেন,—অর্জ্জুন! শুনিলাম তুমি একখানি কেতাব লিখিয়া রাজ্য মধ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছ, তোমার মত শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট লোকের কার্য্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি; সে যাহা হউক আমি তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে, তুমি তোমার পুস্তক খানি পোড়াইয়া ফেল এবং রাজদ্রোহ প্রচার বন্ধ কর। গুরু অর্জ্জুন তর্ক বিতর্ক না করিয়া পুস্তক পোড়াইতে অস্বীকার করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন, তাহাদের নিকট তর্ক বিতর্ক কিম্বা আত্ম পক্ষ সমর্থন করা বৃথা—এবং করিলেও কোন ফল হইবে না। নবাবের কথায় অবাধ্য হওয়াতে তাঁহাকে বেত্রদণ্ডে জর্জ্জরিত করা হইল—বেত্রাঘাতে চর্ম্ম কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল তিনি নির্ভীক অন্তঃকরণে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আবার ভয় দেখাইয়া বলা হইল, এই পুস্তক পোড়াইয়া ফেল অথবা প্রচার বন্ধ রাখ,—তুমি শিখদিগের মস্তক স্বরূপ, তোমার পুস্তক পড়িয়া তোমার অনুচরেরা রাজ্য মধ্যে ঘোরতর

রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। কিন্তু গুরু অর্জ্জুন এত যন্ত্রণাতেও অচল—অটল। নবাবের কথা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সঙ্কল্প—জীবিত থাকিতে পরিত্যাগ করিবেন না ইহাও প্রকাশ করিলেন। গুরুর বীরত্ব পূর্ণ গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া নবাব এবং দেওয়ান চাঁন্দু সা ও অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিলেন,—তাঁহার হস্তপদ কঠিন লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখা হইল। এই সময় তিনি অনাহারে কাটাইতে লাগিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন,—অর্জ্জুন! এখনও নবাবের কথায় সম্মত হও মুক্ত করিয়া দিব। তিনি তাচ্ছল্য পূর্ব্বক বলিলেন,—"আরে নির্ব্বোধগণ! যিনি মুক্ত করিবার কর্ত্তা তিনিই আমাকে মুক্ত করিবেন—তিনি মুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করেন এবং বন্দীকে মুক্ত করেন। তোমাদের মুক্ত করিবার কি ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতা তাঁর—তোমাদের অত্যাচারে আমি এক পদও নড়িব না।"

তিনি নির্ভীকচিত্তে প্রকৃত বীরের মত বীরত্ব পূর্ণহৃদয়ে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভেদ্য লাহোর দুর্গে—তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল কয়েকদিন অন্নজল দেওয়া হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তিনি নিরম্বু এবং অনাহারে কাটাইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে আবার অত্যাচারীরা তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "অর্জ্জুন! তুমি তোমার পুস্তক পোড়াইয়া ফেল ছাড়িয়া দিব।"

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "না, এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি তথাপি ধর্ম্মপুস্তক পোড়াইতে রাজি নহি।" তাঁহার সাহসিক বাক্য শুনিয়া সকলেই চমকাইয়া গেল এবং প্রীত হইল তখন রাজকর্ম্মচারীরা যতখানি লবন ততখানি খাদ্য মিশ্রিত করিয়া তাহাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া খাইতে দিল। কয়েকদিনের পর এই খাদ্য দেখিয়া তাঁহার অধর কোনে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল,—তিনি ঈশ্বরের নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, প্রভু! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিব না। সহাস্য মুখে সেই লবন পূর্ণ খাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর জল্লাদরা বলিল, "অর্জ্জুন! তোমার পুস্তকখান কোথায় বল, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়।"

তিনি বলিলেন; "তোমরা মুসলমান, সে পুস্তকে তোমাদের কোন আবশ্যক নাই, আমি পুনঃপুনঃ বলিয়াছি প্রাণ থাকিতে সে পুস্তক কোথায় আছে বলিব না; বলিলে তোমরা তাহা আনিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।"

তখন জল্লাদরা সাঁড়াশী দিয়া গুরুর নাসিকা টানিতে লাগিল, নাসিকা দিয়া ঝর ঝর রক্ত পড়িতে লাগিল ইহাতেও গুরু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তৎপর নিষ্ঠুর রাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহার উপর আর এক নূতন অমানুষিক হৃদয়ভঞ্জন নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা কতকগুলি লৌহচাদর পোড়াইয়া গুরু অর্জ্জুনকে বাঁধিয়া তাহার উপর ফেলিয়া দিতে লাগিল এবং কতকগুলি বালি পোড়াইয়া গুরুগাত্রে ঢালিয়া দিতে লাগিল। গুরুর দেহ পুড়িয়া ফট্ ফট্ শব্দ হইতে লাগিল। তথাপি কঠোর হৃদয় জল্লাদরা ছাড়িল না,—বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিল "কেমন অর্জ্জুন, এখন বলিবে ?" তখনও তিনি বলিলেন "না, ধর্ম্ম পোড়াইতে পারিব না," এ অবস্থাতেও অর্জ্জুন সুখী। তখন প্রায় অর্দ্ধমৃত, ভালরূপ কথা বাহির হইতেছে না,—প্রাণের আবেগভরে বলিলেন, "পবিত্র আদি গ্রন্থ সাহেব কিছুতেই নষ্ট করিতে দিব না।" এই সব ভয়ঙ্কর অমানুষিক সংবাদ শুনিয়া নবাব এবং দেওয়ান চাঁন্দু সা অর্জ্জুনের অবস্থা দেখিতে আসিলেন, অর্জ্জুনকে দেখিয়া তাহাদের কঠোর হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইল। গুরুর সমস্ত অঙ্গ পুড়িয়া বড় বড় ফোস্কা হইয়াছে, বাহুর মাংস কুকুর দংশনের মত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র চক্ষু দুটি অক্ষত আছে। দেওয়ান চাঁন্দু সা এবং নবাব সাহেব বলিলেন, অর্জ্জুন ! এখনো আমাদের প্রস্তাব রাখ। তিনি পূর্ব্বের মত বজ্রনির্ঘোষ শব্দ করিয়া বলিলেন, "আমি ঈশ্বরের প্রস্তাব রক্ষা করিতেছি, সামান্য কৃতঘ্ন ব্যক্তিদের প্রস্তাব রাখিয়া আমার লাভ কি, আমি এই অবস্থাতেই পরম পিতার চরণ তলে থাকিয়া সুখী—তাঁহার ইচ্ছা যে, আমি এরূপ কষ্ট পাই—তোমরা উপলক্ষ মাত্র, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর আমায় আর বিরক্ত করিও না ইহাই অনুরোধ।" এত যন্ত্রণা দিয়াও তাঁহাকে নরম করিতে না পারিয়া নবাব এবং দেওয়ান চাঁন্দু সা অত্যন্ত কুপিত হইয়া চলিয়া গেলেন। দরবার বসিল,—তাহাতে দেওয়ানচাঁন্দু সাহা বলিলেন, শীঘ্রই রাজদ্রোহি অর্জ্জুনের জীবন শেষ করিতে হইবে। এই প্রস্তাব সকলের মনোনীত হইল। নবাব বলিলেন, দেওয়ান সাহেব ! কি প্রকারে অর্জ্জুনকে মারিয়া ফেলা হইবে। দেওয়ান-চাঁন্দু সা বলিলেন, অর্জ্জুনকে একটি বংশ দণ্ডে বাঁধিয়া জীবন্তাবস্থায় পোড়াইয়া মারিতে হইবে। নবাব এবং সভাস্থ সকলেই তাহা অনুমোদন করিলেন।

যথা সময়ে এই সংবাদ সেই দৃঢ়চেতা পবিত্রহৃদয় বন্দীর নিকট পৌঁছিল

তিনি ধীর স্থিরভাবে তাহা গ্রহণ করিলেন—ইহাতে তাঁহার মনের গতি কিছুমাত্র শিথিল হইল না। তিনি নিস্পন্দ মহীসরের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি নবাবের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে পোড়াইবার পূর্ব্বে একবার জন্মের শোধ রাভী নদীতে স্নান করিবার অনুমতি দেওয়া হউক। কারণ তিনি হিন্দু, হিন্দুদের ধর্ম্মানুযায়ী মৃতব্যক্তিকে পোড়াইবার পূর্ব্বে একবার স্নান করান হয়—ইহাই আমার প্রার্থনা। প্রতিহিংসা পরায়ণ হিন্দু-দেওয়ান চাঁন্দু সা নবাবকে বন্দীর প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিলেন; নবাব স্নান করিবার অনুমতি দিলেন।

এখন স্বচ্ছসলিলা রাভী লাহোর হইতে এক ক্রোশ দূর দিয়া যাইতেছে—তখন লাহোর দুর্গের প্রাচীরের নিকট দিয়া প্রবাহিন ছিল, ইহা অবশ্য ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন গুরু অর্জ্জুন অর্দ্ধমৃত—গাত্রে বড় বড় ফোস্কা পড়িয়াছে চলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব ব্যঞ্জক দেহ হইতে তখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রবল স্রোত বহিতেছে। তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রক্ষীদল আবেষ্টিত হইয়া রাভীজলে নামিয়া ডুব দিলেন কিন্তু আর উঠিলেন না। যন্ত্রণা কষ্ট সব গেল—সব ফুরাইল। বোধ হয় রাভী অর্জ্জুনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে দুই মত প্রচলিত আছে—কেহ কেহ বলেন তিনি শত্রু হস্তে মরা অপেক্ষা ডুবিয়া মরা ভাল বিবেচনা করিয়া জলে ডুবিয়া মরিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি তখন অর্দ্ধমৃত শরীর-অবসন্ন রাভীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। সে যাহা হউক তিনি যেখানে ডুবিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাকে সেখানে রক্ষীদল না পাইয়া নবাবকে সংবাদ দিল। নবাব আর কিছু বলিলেন না। তারপর কয়েক ক্রোশ তফাতে গুরুর মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছিল; তাঁহার অনুচরেরা মৃত দেহ আনিয়া যথারীতি দাহকার্য্য করিয়াছিলেন।

যে স্থানে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ গুরু অর্জ্জুন তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,—সেই পবিত্র স্থানে একটী সমাধি মন্দির এবং ধর্ম্মশালা স্থাপন করা হইয়াছে। এই পবিত্র এবং বিখ্যাত স্থান লাহোর দুর্গের পশ্চিম ফটকের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ও ইহার পশ্চিমেই ভারতবিখ্যাত পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি মন্দির। বর্ত্তমান শতাব্দী সমূহের প্রথম স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ আত্মজীবন উৎসর্গকারী—বীর পুরুষ গুরু অর্জ্জুনের স্মরনার্থ প্রত্যেক বৎসর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে লাহোরে জাঁক জমকের সহিত মেলা

হইয়া থাকে। ইহাতে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে লোক আসিয়া একত্র হইয়া গুরু অর্জ্জুনের প্রতি স্ব স্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গুরু অর্জ্জুন চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মধুময় চরিত্র আমরা হৃদয়ে আঁকিয়া স্মৃতিসুখ অনুভব করিতেছি। ইঁহারই তেজস্বিতার আদর্শে—দশম গুরু গুরু-গোবিন্দ শিখ জাতিকে সামরিক জাতি করিয়া তুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই প্রতিভার দৃষ্টান্তে উত্তরকালে সুদৃঢ় খালসা প্রাধান্য এবং রণজিতের সাম্রাজ্য লাভ ঘটিয়াছিল! ধন্য গুরু অর্জ্জুন! ধন্য তাঁর হৃদয় বল!! ধন্য তাঁর ধর্ম!!! মাতৃভূমি পঞ্জাবও এহেন পুত্র রত্ন প্রসব করিয়া ধন্যা হইয়াছেন।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

দিবে কি দেখা?

সদা প্রাণ চায়,
দেখিতে তোমায়,
তুমি কেন সখা,
দেওনা দেখা?

দেখিতে তোমায়
কেন মন ধায়,
কি জানি কি আছে
তোমাতে সখা?

তুমি মম প্রাণ
অন্তরে আমার,
আছে তব নাম
হৃদয়ে—লেখা।

তবে এত কষ্ট
দি'ছ কেন সখা,
একবার—কেন
পাইনা—দেখা?

তুমি মম আশা
তুমি হে ভরশা,
তুমি যাহা কিছু
আমারি সখা।

এততেও সখা
পাইনা অন্তর,
জানি না হে, কেন
দেওনা দেখা।

না জানি হে কিছু
তোমা বিনে আমি,
তুমি কি আমার
বল হে সখা?

যদি হও মোর
মিনতি হে করি,
"শ্রীহরি"কে সখা—
(বারেক) দিবে কি দেখা?

শ্রীহরিদাস মিত্র মুস্তোফী।

নৃসিংহ মন্দিরে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বহুদিন পূর্ব্বে—তবে তাহা কত দিনের কথা জানিবার উপায় নাই—তখন এই সমস্ত স্থান ঘোর অরণ্য বেষ্টিত হইয়া দিবাভাগেও কৃষককুলের ভীতি উৎপাদন করিত। অসংখ্য ভীম মহীরুহরাজি লতাগুল্মে বেষ্টিত হইয়া দিবা-ভাগেও ব্যাঘ্র ভল্লুকের বিহারভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। নদীয়া জেলার বিখ্যাত দস্যুগণের প্রভাবে কেহ ভয়ে এ পথে আসিত না। মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ গ্রামবাসীরা দেখিত, হয়ত দুই একটী হৃতসর্ব্বস্ব পথিক মৃত অথবা মরণাহত হইয়া জলাশয় পার্শ্বে পড়িয়া আছে। ভুত প্রেতের ভয়েও সাহসী মনুষ্যও সন্ধ্যার পরে এদিকে আসিত না। প্রকৃতপক্ষে সে সময় এ স্থানটি দস্যুদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। কারণ বনমধ্যে এখনও পুরাতন গৃহের ভিত্তি দেখা যায়। এই উচ্চ ভুমে নিশ্চয়ই কোন সময়ে একটী বৃহৎ প্রাসাদ শোভিত ছিল। কালক্রমে তাহা ধ্বংশ হইলে উহা দস্যুগণের আবাস গৃহ হইয়া উঠিয়াছিল। এখনও দুইএকটি পুরাতম অশ্বত্থ ও তিন্তিরী বৃক্ষ তাহাদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

এই বনপ্রদেশে একটি গোয়ালার অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। রাখালের সযত্ন চেষ্টার মধ্যেও দুই একটি গাভী স্বেচ্ছা বিহারক্রমে ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে বিপদে ফেলিত। কারণ সন্ধ্যার অন্ধকারে বনভূমি আচ্ছন্ন হইলে বহুলোক দলবদ্ধ না হইয়া গাভী অন্বেষণে যাইবার উপায় ছিল না। কখনও বা উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইতে হইত। এইরূপে দিন যাইতেছিল। একদিন গোয়ালা দেখিল যে তাহার একটী আশু প্রসূতা গাভী দুগ্ধ দিতেছে না। গাভী বনমধ্যে প্রবেশ করিলে নিশ্চয় কেহ দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়—অথবা দুষ্ট রাখাল বালক ভক্ষণ অথবা বিক্রয় করে—এই ধারণাই গোপের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। কয়েকদিন তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের পর দেখা গেল যে গাভীটি দ্বিপ্রহরের সময় সহসা যূথভ্রষ্টা হইয়া গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করে, তৎপরে একটী মৃত্তিকা প্রোথিত শিলাতলে দুগ্ধধারা বর্ষণ করে। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে গ্রামশুদ্ধ সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। রাত্রে দেপাড়া গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে ভগবান স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহার

আবির্ভাব বার্ত্তা ব্যক্ত করিলেন। প্রাতে গ্রামবাসীগণ বনমধ্যে যাইয়া দেখিল নৃসিংহদেব পূর্ণ মূর্ত্তিতে সেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ললাট-শোভিত মণি-প্রভায় বনভূমি আলোকিত হইয়াছে। ভাগ্যবান কৃষকগণ স্ব স্ব জন্ম ও জন্মভূমি সার্থক ও পবিত্র হইল ভাবিয়া ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িল। তাহারা শীঘ্র হস্তে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেবতার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল। বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ কোন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পূজায় ব্রতী হইলেন। গ্রামবাসীগণ প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দেবতার মন্দিরে পৌঁহছিয়া দিত। বিপদে আপদে তাহারা নৃসিহ দেবের পূজা মানিত, নৃসিংহও অকৃতজ্ঞ নহেন; তাহাদিগকে বিপদ হইতে আশু উদ্ধার করিতেন। দেবতার কৃপায় অপুত্রক পুত্র, নির্ধন ধন পাইত।

কালক্রমে এই অরণ্যে এক সন্ন্যাসী আসিয়া জুটিল, সে কাহারও সহিত বড় বাক্যালাপ করিত না। তাহার একটী কৌতুকাবহ অনুষ্ঠান ছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে বনপ্রান্তে ঘুঁটে কুড়াইত এবং তাহারই সাহায্যে অরণ্যের মধ্যে এক মহাগ্নি প্রজ্বলিত করিত। উজ্জ্বল আলোক প্রভায় বনভূমি ঘোর অন্ধকারে দৈত্যের অধরে হাস্য বিকাশের মত আলোকিত হইয়া উঠিলে, সকলে "বাবা গো" "মা গো" "পুড়িয়ে মারলে" 'তোমরা সব এস গো' ইত্যাদি কাতর উক্তি শুনিতে পাইত। প্রথম দুই এক দিন আর্ত্তের করুণ চীৎকার মনে করিয়া সরল স্বভাব কৃষকগণ গভীর রাত্রেও দলবদ্ধ হইয়া বনমধ্যে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাইয়া দেখিল সন্ন্যাসী অগ্নি কুণ্ড সম্মুখে বসিয়া আছে এবং তাহাদের আগমনে বিরক্ত হইয়া অকথ্য ভাষায় তাহাদের গালি দিতেছে। এই রূপে প্রতারিত ও ভর্ৎসিত হইয়া তাহারা আর সন্ন্যাসীর কাতর চীৎকারে কর্ণপাত করিত না। সন্ন্যাসী যখন দেখিল যে তাহার আহ্বানে আর কেহ বনমধ্যে আসিতে ইচ্ছা করে না, তখন একদিন স্তুপাকার কাষ্ঠ সাহায্যে সে নৃসিংহ দেবকে ঢাকিয়া ফেলিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। বলা বাহুল্য যে দেবতার ললাট শোভী মণির লোভেই পাষণ্ড এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হইয়া ঠাকুর চীৎকার পূর্ব্বক গ্রাম বাসীগণকে সাহায্যার্থে ডাকিতে লাগিলেন। * প্রতারিত

* এই বিবরণের অধিকাংশ স্থলই এরূপ বিশ্বাস যোগ্য যে তাহা আষাঢ় মাসেরই কথা।

কৃষকগণ সে দিন কেহ আর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল না। সন্ন্যাসীর হস্তে ঠাকুর দগ্ধ হইলেন, কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও মণি লাভ হইল না। ভগবানের ললাট বিদীর্ণ করিয়া মহাবেগে মণি নিকটস্থ জলাশয়ে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইল। কিন্তু পাষণ্ডের হৃদয় ইহাতে বীত-তৃষ্ণা হইল না। সে জলমধ্যে নামিয়া হারামণির অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাত্রি শেষে মণি মিলিল। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে মণিচোর গ্রাম ছাড়িয়া গেল।

প্রভাতে দেবতার অবস্থা দেখিয়া কৃষকগণ হাহাকার করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরদিন নূতন গৃহে দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল। বর্ত্তমান দেবমূর্ত্তির অনেক স্থল, এখনো চটিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসীর নির্য্যাতনের ইহাই নাকি সাক্ষ্য।

এদিকে প্রভাত হইয়া গেলে সন্ন্যাসী কিছু দূরবর্ত্তী হাঙ্গারী বাঁক নামক গ্রামে (আধুনিক দেবগ্রাম) দেবনাথ পাল নামীয় কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সারা দিবস সন্ন্যাসী গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। এই রূপে কিছু দিন গত হইলে এক দিন প্রাতঃকৃত্যার্থে সন্ন্যাসীর অনুপস্থিতি কালে দেবনাথ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল তাহার কোদালী ও 'দা' খানি সহসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিল যে গৃহ প্রাচীর বিলম্বিত সন্ন্যাসীর 'ঝোলা'র মধ্যে একটী অত্যুজ্জ্বল পদার্থ রহিয়াছে এবং গৃহ পটল-ছিদ্রবাহী বরষার বারিধারা ঐ পদার্থ বহিয়া কোদালীতে পড়িয়াছে মাত্র! বিস্মিত দেবনাথ, মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ পদার্থটী লুকাইয়া রাখিল। সন্ন্যাসী যাত্রা কালে ঐ মণি না পাইয়া কুম্ভকারকে দোষারোপ করিতে লাগিল। কিন্তু দুষ্ট কুম্ভকার কিছুতেই মণির অস্তিত্ব জ্ঞান স্বীকার করিল না। শেষে ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী কুম্ভকারকে অভিসম্পাৎ করিয়া প্রস্থান করিল। স্পর্শ মণির সাহায্যে দেবনাথ পাল দশবৎসরের মধ্যেই একটী সুবৃহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। তাহার নাম ক্রমে দেবনাথ পাল হইতে দেবপাল পরে দেবল মাত্র পর্য্যবসিত হইল। দেবল রাজ দেবগ্রাম নামে তাঁহার এক রাজধানী নির্ম্মাণ করাইলেন।

চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত—সৈন্যসামন্ত সঙ্কুল নগর অপূর্ব্ব শ্রীতে বনমধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর শাপে এবং দৈব কোপে দেবল দেবের দ্বাদশ মহিষী ষোড়শ সংখ্যক কন্যা, পঞ্চদশ পুত্র ও শতাধিক পরিজন কুবেরের ধন

সম্পত্তি এক মুহূর্ত্তে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বয়ং দেবরাজও অশ্বসহ দীর্ঘিকার জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। *

দেবলরাজের রাজধানী—রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। সুবিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় রাম শঙ্কর সেন যখন রাণাঘাটের শাসন কর্ত্তা ছিলেন তখন রায় দীনবন্ধু মিত্রের অনুরোধে তিনি দেবলরাজের বিবরণ সংগ্রহ করেন। তাঁহার বিবরণে দেবলের ইতিহাস এইরূপ,— "এক সময় বঙ্গদেশ "বার ভূঁয়ার" বারটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে যাহাদিগকে রাজশ্রী প্রথমেই অঙ্কে স্থান দান করেন, আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক দেবলরাজ তাঁহাদের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু এই প্রবল পরাক্রান্ত রাজার একটী দীর্ঘিকা ও রাজধানীর চতুষ্কোণে চারিটী 'থুব' অর্থাৎ মৃণ্ময় স্তূপ ছাড়া আর কোনও স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই স্মৃতি চিহ্ন যে গ্রামে বর্ত্তমান তাহার নাম দেবগ্রাম। দেবগ্রামই দেবলরাজের রাজধানী ছিল। ইতর লোকে এখন উহাকে 'দেগাঁ' বলিয়া থাকে। দেবগ্রামের অভ্যন্তর ও উপান্ত সূক্ষ্ম দর্শনে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবলরাজের রাজধানী পরিখা-বেষ্টিত ছিল। হাঁঙ্গর নামে একটী চক্রগামিনী তটিনীর চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উহার এক মুখ চূর্ণী নদীর সহিত ও আর এক মুখ গোপাল নগরের নিকটবর্ত্তী ইচ্ছামতীর সহিত মিলিত। ভৈরব ও হাঙ্গরের ন্যায় বক্রতা অন্য কোন নদ নদীর আছে কিনা সন্দেহ। দেবগ্রামের নিকট হাঙ্গরে বক্রতা অদ্ভুত। শুষ্ককালে ইহা ভাল বুঝিতে পারা যায় না কিন্তু বর্ষার প্লাবনে যখন নদী দুকূলে ভরিয়া উঠে তখন যদি কোন নৌকাবাহী হাঙ্গর বহিয়া চূর্ণীতে আগমন করেন, তাহা হইলে হাঙ্গর নদী দেবলের রাজধানীর নিকটে আসিয়া কিরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেবলরাজ হাঙ্গরের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বকীয় রাজধানীকে কিরূপ পরিখা বেষ্টিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন।" * •

ইহার মতে দেবলরাজ সের সাহের রাজত্বকালে বঙ্গে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেন। যাহা হউক এখন দেবলের প্রাসাদ বা প্রাকারের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান

---

* দেবলরাজের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লিখিবার বাসনা আছে। সেই স্থলে পাঠকগণ এই প্রবন্ধে অস্পষ্ট ঘটনা গুলি সম্যক্ বিবৃত দেখিতে পাইবেন।

* বামা বোধিনী পত্রিকা ১৩০৪ ভাদ্র।

নাই, কাল স্রোতে সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। এই দেবলরাজের সহিত—যশোহরের প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ জনশ্রুতি।

মণিহরণ ব্যাপার এইরূপ। নৃসিংহদেব আবার গ্রামবাসীর পূজা পাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার খ্যাতি দিগে দিগে পরিব্যাপ্ত হইল। বহুদেশের লোকেরা পূজার্থী হইয়া দেপাড়ায় জমিতে লাগিল। পরে কালক্রমে কৃষ্ণনগর রাজের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। তাঁহারা একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেব সেবার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহাদের অনুকম্পায় দীর্ঘিকাটীও সংস্কৃত হইয়াছিল। দেপাড়া ও নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুপুরের ব্রাহ্মণগণের উপর দেব পূজার ভারার্পিত হইল। রাজা শুধু দেবতার অধিকারী—প্রাপ্য সমস্তই ব্রাহ্মণদিগের। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক দিন করিয়া পালা পড়িত। পূর্ব্বে তাঁহাদের যথেষ্ট পাওনা ছিল। এখনও মন্দ নাই। উপস্থিত সেবাইৎগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান। মাসের মধ্যে দশদিন তাঁহার পূজাধিকার। * ইনি এখানকার একজন ভূম্যাধিকারী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ইঁহার সুন্দর ব্যবহারে এবং সৌজন্যে পূজার্থ আগত সকলেই মোহিত হয়। কাজেই তাঁহার প্রাপ্যও যথেষ্ট।

সন্তানার্থীগণ দেবতার মন্দিরে সন্তান কামনায় রজ্জু গ্রথিত ইষ্টক খণ্ড বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। দেবতার প্রসাদে তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইলে—সেবকগণের প্রাপ্য অনেক। স্বর্ণালঙ্কার—দিব্য বস্ত্র হইতে সামান্য ফল মূল পর্য্যন্ত সকলে দেবতার চরণে উৎসর্গ করে। বর্ত্তমান নদীয়া রাজ কি একটা সামান্য কারণ দর্শাইয়া দেবসেবাধিকার ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দানপত্র (পারসীক ভাষায় লিখিত) দেখাইয়া মহারাজকে নিরস্ত করেন।

ক্রমে দিনমণি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেন। মেলা বেশ জমিয়া উঠিল। কোথাও ছেলের পাল 'নাগর দোলায়' উঠিতেছে—কোথাও বনপার্শ্বে সিগারেট ভক্ষণে নবাভিজ্ঞ দুষ্ট ছেলের দল সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে আর অতি সন্তর্পণে ধূম ছাড়িতেছে—রূপার গহনা পরা কৃষক বধূগণ দল বাঁধিয়া ঘুরিতেছে—তাহাদের অঙ্গ আজ তৈল মসৃণ এবং সীমন্তের শুভ সিন্দুর খুব প্রশস্ত রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক পার্শ্বে গ্রাম্য যুবকদের কুস্তী ও লাঠী খেলার ধূম।

* দেবতার এই 'পালা' বিক্রয় ও বন্ধক দেওয়া চলে—এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সহিত এই 'পালা' উত্তরাধিকারীর হস্তে আসিয়া পড়ে।

গ্রামের চৌকীদার নফরচন্দ্র মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া একটি নীল কোর্ত্তায় তাহার প্লীহাটী বৎসরের মধ্যে শুধু আজিকার মত আবৃত করিয়াছে। ছেলেরা বাঁশীর জন্য মার আঁচল ধরিয়া টানিতেছে—যে ছেলেটী নূতন পড়িতে শিখিয়াছে সে একখানি প্রথম ভাগের জন্য কাঁদিতেছে। আমরা দেবতাকে শেষবার প্রণাম করিয়া মেলা স্থল ত্যাগ করিয়া অদূরস্থিত "হরিহর" মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। এই দেবমূর্ত্তি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। একটী বিস্তৃত ময়দানের মধ্যে দেব মন্দিরটী—আপনার গৌরবে আপনি দাঁড়াইয়া আছে। পার্শ্বে ক্ষুদ্র নদী 'অলকানন্দা' সন্ধ্যা হিল্লোলে তরঙ্গায়িত। পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহ এই স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। নদীয়া রাজ বাটীর মুমূর্ষুগণের শেষ মুহূর্ত্তগুলি এই খানে অতিবাহিত হইত। এখন গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে—শুধু ক্ষীণা অলকানন্দা বহুদিন বিস্তৃত স্মৃতিটুকু অতি কষ্টে জাগাইয়া রাখিয়াছে। নিকটেই একটী ধ্বংশোন্মুখ বৃহৎ প্রাসাদ। এটী রাজ জামাতার বাসস্থান ছিল। আমরা নদীতীরে তৃণাসনে উপবেশন করিলাম। পূর্ণিমার পূর্ণশশী তিন্তিড়ী বৃক্ষের পশ্চাতে থাকিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছিলেন। অলকানন্দার স্বচ্ছ সলিলে চন্দ্র কিরণ পড়িয়া দ্রব কাঞ্চনের মত দেখাইতেছিল। নদী তীরস্থ বনরাজি যেন বহুদূরাগত পথিকের মত ক্লান্ত সেই সমস্ত চন্দ্রালোক বিজড়িত মহীরুহ—নির্জ্জনতার মাঝে নীরব মন্দিরটী—পার্শ্বে কতদিনের স্মৃতিভরা ধ্বংশের কুক্ষিগত ভগ্ন প্রাসাদ—পরপারে হিল্লোল মুখর নব শস্য ক্ষেত্র—এই সব মিলিয়া মিশিয়া যেন আমার নয়ন সমক্ষে এক স্বপ্ন রাজ্যের রচনা করিল। আমরা দেখিলাম তীরের অবিচ্ছিন্ন বৃক্ষরাজির কম্পিত ছায়া অলকানন্দার সোনার নীরে প্রতিবিম্বিত—মধ্যে মধ্যে দুই একটী পত্র বৃন্তচ্যুত হইয়া জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সত্যই তখন আমাদের রবীন্দ্রনাথের

"তাঁহারি আনন্দধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,"

গানটী মনে পড়িল আর এই মনুষ্যবাস হইতে দূর প্রান্তে বসিয়া আজি মর্ম্মে মর্ম্মে সঙ্গীতটীর যথার্থ উপলব্ধি করিলাম।

কতক্ষণ পরে আমরা গৃহে ফিরিবার জন্য উঠিলাম। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায়—এমন মলয়ের মধু-হিল্লোলে—আর গোযান গর্ভে প্রবেশ করিবার সাধ হইল না। আমরা মাঠের মধ্যপথ বহিয়া পদব্রজে চলিলাম। তখন জ্যোৎস্না-ফুল্ল প্রান্তরে স্তব্ধ নিশিথিনী বিরহিণীর মত শুইয়া আছে। প্রকৃতির

মাঝে তখন যেন একটা অশান্ত চেতনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তখন অদূরস্থিত গ্রাম্য পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া কে একজন গাহিতেছিল:—

আমার পরাণটী করিয়া চুরি,
আসি ব'লে গেলে নাথ, এখনো এলে না ফিরি।
কত মধু যামিনী, কত অশ্রান্ত বাসর, কত সন্ধ্যা সকাল বেলি,—
কত বার মাস, কত যুগ যুগান্তর, অতীতে প'ড়েছে ঢলি,
কত নদী মিশিয়াছে সাগরে, শুখায়েছে কত সাগর বারি ॥
কত শশী ডুবিয়াছে পশ্চিম অচলে,
কত তারা লুকায়েছে গগনের কোলে,
শুখায়েছে কত ফুলমালা,
গলিয়াছে কত হিম গিরি ॥
(এখনো এলেনা ফিরি)
মরমে বেঁধেছি ডোর, যাবে কোথা চিত চোর,
যখন হেরেছি, তখন ভুলেছি,
আর কি ছাড়িতে পারি।

বাস্তবিক এই মধু যামিনীতে সঙ্গীতের এই মধু মূর্চ্ছনায় বিরহ-মথিতা 'স্নেপের' ছবিখানি আমার মরমে জাগিয়া উঠিল। যেন অভাগিনী তাহার যৌবন সম্ভার লইয়া গৃহ বাতায়নে সমুদ্রপথে চাহিয়া বসিয়া আছে। এই স্বপ্নময় রজনীতে প্রেম-দেবতার আকুল আহ্বান হৃদয় দ্বারে আসিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তবে প্রণয়ী দূরে থাকিলেও সে যে তাহার আছে—অন্ততঃ মরণের বৈতরণী পারেও তাহারা মিলিত হইতে পারিবে এই ধারণা বিরহ-বিধুরার হৃদয়ে বদ্ধমূল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল। আমরা তাহার স্মৃতিটুকু হৃদয়ে বহিয়া—মাঠ ছাড়াইয়া পথে উঠিলাম। নগরে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল।

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রশ্ন।

আমি এসেছি আজি এ প্রভাতে
শুধু বারেক তোমারে শুধাতে,—
কার লাগি তব উদাস নয়ন
বদ্ধ সুদূর শোভাতে?
ওগো কি লাগিয়া তব নয়ন পল্লব,
নিহার-সিক্ত হয় অনুভব?
কিসের নেশাতে আছগো মগন
পাছ নয়ন বাঁধিতে!
এই বিমল-শরত-প্রভাতে!

ওই শান্ত পূরব গগনে,
ওই তরুণ-প্রভাত-তপনে
কি ভাবে বিভোরা আছ গো ভামিণী,
ভূতল-ন্যস্ত-নয়নে!
ওগো রহি রহি কেন নীরব নিশ্বাস,
আঁধারিয়া তুলে হৃদয় আকাশ?
বলনা কেন গো, অয়ি বিষাদিনি,
ক্ষুব্ধ কিসের কারণে!
হের শান্ত পূরব গগণে।

এই বিশাল জগত মাঝে,
দেখ সবাই ধাইছে কাজে,
মোহ ত্যজি ধনি, বলগো আমারে
যাইবে কাহার কাছে?
ওগো এই পথ ধরি অনেকে যাইবে
যেতে যেতে ফিরে তোমাপানে চা'বে
এস মোর সাথে ক্ষণিক এধারে,
নতুবা পড়িবে লাজে,
এই ব্যস্ত জগত মাঝে!

যদি নাহি থাকে তব ঠাঁই,
দুজনে চলিয়া যাই ;—
আমিও একাকী তোমার মতন,
আমার (ও) আলয় নাই !
আমি চ'খে চ'খে সদা রাখিব তোমারে,
ভুলেও যাব'না বিরহ-আঁধারে ;
ওই দেখ হাসে অরুণ-কিরণ,
এসগো চলিয়া যাই,
নহে আর কোথা তব ঠাঁই ?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার নাগ।

জানিনা তোমায়।

জানিনা তোমায় ;
আকাশের রাঙ্গা মেঘে, পাহাড়ের গায়
ধীরি ধীরি ঢেউ ব'য়ে যায়।
চেতনার মৃদু তান, বনে বিহগের গান,
স্বরগের বারিধারা তোমারি কৃপায় ;
সাগরের নীল জলে, উন্নত হিমাচলে,
তোমারি মহিমা লেখা প্রকৃতির গায় ;
তোমারি আদেশে বায়ু তোমাপানে ধায়।
গ্রহ উপগ্রহ তারকার কুল,
নন্দনের পারিজাত ফুল,
ক্ষীরধারা মন্দাকিনী চরণ ধোয়ায়,
কুলুনাদে সুরধুনী তব গুণ গায় ;
আমি শুধু জানিনা তোমায় !

শ্রীবেণীমাধব মুখোটী।

সুনন্দা।

(বৌদ্ধ—আখ্যায়িকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা শাক্যসিংহ যখন নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার ভারত সন্তানের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিতেছিলেন, যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্ষীণ আলোক রেখা ধীরে ধীরে হিংসান্ধকার দূর করিতেছিল সেই সময় গিরিব্রজ বা রাজগৃহ নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরে বিম্বসার নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহীপাল নামে এক পুত্র হয়। ইনিই উত্তরকালে অজাতশত্রু নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। মহারাজ বিম্বসারের মৃত্যুর পর অজাত শত্রু পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন রাজগৃহ নগরীর প্রতি অজাতশত্রুর তাদৃশ আস্থা ছিল না; সেইজন্য প্রাচীন গিরিব্রজ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে নূতন রাজগৃহ নগর স্থাপিত করেন।

মহারাজ অজাত শত্রুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উদয়াশ্ব রাজগৃহের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পুত্রের নাম মুণ্ড। তাঁহার কাকবর্ণি নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ তারকারি ইহাঁরই পুত্র। ইনি প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র লাভ করেন। প্রসেনজিৎ নরপতির পুত্রের নাম নন্দ। মহারাজ বিন্দুসার নন্দের সুযোগ্য পুত্র। পৈতৃক রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, মহারাজ বিন্দুসার গঙ্গার পশ্চিমকূলে পাটলীপুত্র নগরে নূতন রাজধানী সংস্থাপিত করেন। মহারাজ বিন্দুসারের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুসেন, কনিষ্ঠ অশোক। অদৃষ্ট চক্রের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনবলে কনিষ্ঠ রাজকুমার অশোকই পাটলীপুত্রের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের মধ্যে মহারাজ অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন,—ইনি স্বপ্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছিলেন। আমরা মহারাজ অশোকের শাসনকালের একটী মর্ম্মস্পর্শী আখ্যায়িকা পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব।

মহারাজ অশোকের শাসনকালে উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ এক একটী দুর্গবৎ সুবৃহৎ প্রাসাদ ও তদনুযায়ী ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। উক্ত প্রাসাদগুলি 'কোটঠক' নামে অভিহিত হইত। রাজধানী পাটলীপুত্রের সন্নিকটে একটী সুবৃহৎ 'কোট্ঠক' ছিল। মহারাজ অশোকের সুযোগ্য

সেনাপতি ব্রহ্মদত্ত এই 'কোট্ঠকের' অধিকারী ছিলেন। ব্রহ্মদত্ত প্রাচীন মগধের ক্ষত্রিয় রাজবংশজাত ছিলেন। মৌর্য্যবংশের প্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মদত্ত মহারাজ অশোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বীয় সাহস, প্রভু-বাৎসল্য ও বীর্য্যবলে অত্যল্পকালের মধ্যে মহারাজ অশোকের প্রধান সেনানীর পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজ অশোক ব্রহ্মদত্তের গুণে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার জন্য সুবৃহৎ 'কোট্ঠক' নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও সন্নিহিত শত গ্রামের অধিকার প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত রাজকার্য্যেই জীবনপাত করেন; এক ভীষণ সংগ্রামে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সংসারে ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা ও কিশোর বয়স্ক পুত্র ইন্দ্রনাথ ব্যতিত আর কেহই ছিল না। পুত্র ইন্দ্রনাথ পিতা কর্ত্তৃক অস্ত্র ও সমর বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইলে সম্রাট অশোক ইন্দ্রনাথকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ সম্রাট আদেশে পঞ্চ সহস্র সেনার সেনানী হইয়া সম্রাটের কুসুমপুরস্থ রাজ প্রাসাদ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রনাথ প্রায়ই কুসুমপুরে থাকিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সুনিধ এক শত নির্ব্বাচিত সৈনিক লইয়া 'কোট্ঠক' রক্ষা করিতেন।

একদা ইন্দ্রনাথ স্বীয় প্রাসাদে অবস্থান কালে 'কোট্ঠক' রক্ষক সৈনিক-গণকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জননী সেই স্থানে ব্যস্তভাবে আসিয়া কহিলেন,—"ইন্দ্রনাথ! বড়ই বিপদ উপস্থিত! দুর্ম্মতি কাক খড়্গ-বর্ম্মার কন্যাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। খড়্গবর্ম্মার স্ত্রী আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। তুমি শীঘ্র দুর্ম্মতি কাকের হস্ত হইতে তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার কর।"

খড়্গবর্ম্মা ইন্দ্রনাথের পিতা ব্রহ্মদত্তের স্বজাতীয় এবং তাঁহার একজন বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ছিলেন। যে যুদ্ধে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে খড়্গবর্ম্মাও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। খড়্গবর্ম্মার বিধবা পত্নী, পুত্র সুসেন ও কন্যা সুনন্দাকে লইয়া ইন্দ্রনাথের পিতৃদত্ত বাসভগ্রামে বাস করিতেন। কাক একজন সুতজাতীয় দুর্দ্ধর্ষ দস্যু; সন্নিহিত পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহার আস্থানা; অনেকগুলি পরাক্রান্ত রণদুর্ম্মদ সুত তাহার আজ্ঞাধীন ছিল। একদা কাক বাসভগ্রামে মৃগয়াব্যপদেশে আগমণ করে। ঘটনাক্রমে খড়্গবর্ম্মার দুহিতা সুনন্দা তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হয়। দুর্মতী কাক সুনন্দার অসাধারণ রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হয়। রূপবতী ক্ষত্রিয় ললনাকে পত্নীরূপে লাভ

করিবার অভিপ্রায়ে সে সুনন্দার মাতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করে। তিনি নীচজাতীয় কাকের প্রার্থনা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। খড়্গবর্ম্মা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল; অতঃপর একদিন সে একদল অস্ত্রধারী অনুচরসহ বাসন্তগ্রাম আক্রমণ করিল এবং অনায়াসে সুনন্দাকে হস্তগত করিয়া স্বীয় 'কোট্‌ঠকাভিমুখে' অগ্রসর হইল। সুনন্দার জননী অনন্যোপায় হইয়া পুত্র সুসেনকে ইন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন।

ইন্দ্রনাথ দুর্ম্মতি কাকের এবং প্রকার ধৃষ্টতার কথা শ্রবণ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই মুহূর্ত্তে তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সুসেন নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইলেন। বাসন্তগ্রামের সীমান্ত পথে ইন্দ্রনাথ পলায়মান কাককে দেখিতে পাইলেন। অবিলম্বে তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যদল সদল কাককে আক্রমণ করিল। ইন্দ্রনাথের পরাক্রম সহ্য করা কাকের সাধ্য ছিল না; ইন্দ্রনাথ যে তাহাকে আক্রমণ করিবে, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। ইন্দ্রনাথের আগমন বার্ত্তাও তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, ইন্দ্রনাথ কুসুমপুরে অবস্থান করিতেছে; ইহাতেই সে খড়্গবর্ম্মার কন্যাকে হরণ করিতে সাহসী হইয়াছিল। এক্ষণে ইন্দ্রনাথের আগমনে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বিজয়লব্ধ সুনন্দাকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্ম্মতি কাক তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল; তাহার অনুচরবর্গও প্রভুর দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিল; ইন্দ্রনাথের সেনাদলের আক্রমণে অনেক হতাহত হইল।

অতঃপর ইন্দ্রনাথ সুনন্দাকে স্বীয় কোট্‌ঠকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুঃখিনী জননী এতক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় হাহাকার করিতেছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রনাথের নিকট কন্যার উদ্ধার কাহিনী শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন, সজল নয়নে দেবগণের নিকট ইন্দ্রনাথের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি শীঘ্রই কুসুমপুরে গমন করিব; তখন আমার অবর্ত্তমানে দুর্ম্মতি কাক পুনর্ব্বার আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি আপনার কন্যাকে আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রেরণ করিয়াছি। আর অদ্য আপনার পুত্র সুসেনের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, সুসেনকেও আমি আমার নিকট রাখিতে ইচ্ছা করি; কিছুকাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সে ভবিষ্যতে রাজ সৈন্য দলে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে আমি আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।"

সুনন্দার মাতা স্বপ্নেও এরূপ অনুগ্রহ লাভের আশা করেন নাই। তিনি গদগদ স্বরে বলিলেন,—"বাবা! আমি এখন অনাথা; তুমি ছাড়া আমাদের আর অভিভাবক কে আছে? তুমি যাহা স্থির করিয়াছ, তাহার উপর কথা কহিবার সাধ্য আমার নাই। ভগবানের নিকট তোমার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।"

অতঃপর ইন্দ্রনাথ সুনন্দার মাতার নিকট বিদায় লইয়া স্ববাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং যথা সময়ে জননীর নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। পুত্রের সদুদ্দেশ্যে তিনি পরম প্রীত হইলেন। সুনন্দা ও সুসেন পরমসুখে ইন্দ্রনাথের আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন।—ক্রমশঃ।

শ্রীমতী পঙ্কজকুমারী দেবী।

২। আর্য্য ক্ষেত্র।

এই সে ভারত ভূমি, ভূতলে প্রখ্যাত,
এই সে ধরম ক্ষেত্র, জগত বন্দিত।
এই সে স্বাধীন ভূমি, পুরাণ বিখ্যাত,
এই সে পৃথ্বী কিরীট, স্বরগ নিন্দিত।
এইখানে নারায়ণ নররূপে আশি,
কুরুক্ষেত্রে করিলেন, কৈবল্য প্রচার—
এইখানে শ্রীচৈতন্য স্বরূপ প্রকাশি,
অদৃশ্য হ'লেন পুনঃ, করিয়া বিহার।
হেথায় প্রতাপাদিত্য ভীষণ বিক্রমে,
করেছেন বার বার বিপক্ষ দলন—
এইখানে সীতারাম ভীম পরাক্রমে,
হিন্দুর রাজত্ব পুনঃ করিলা স্থাপন।
গরিয়শী ভূমি তুমি, করি নমস্কার
স্বরূপে উদয় যেন, হওগো আবার!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চাতকিনীর প্রতি।

উষার অমল ভাতি বিকাশে আকাশেরে,
লোহিত বরণ ;
একটী উজল তারা হয়ে যেন দিশে হারা
উষার কুন্তলে দোলে অলক রতন ;
মরি মরি কি সুষম ! কি লাবণ্য অনুপম !
অনন্ত সুষমা স্রোতে ভাসিয়াছে গগন,
চাতকিনী ধৈর্য্য ধর সেই নীর পান কর
"স্ফটিক জলের" তরে করোনা ক্রন্দন।

উষা-উরুণিমা মাখি হাসে ফুল বালারে,
কাননের মণি,
সুরসী সমীর তা'য় চুম্বন করিয়া যায়,
লাজে-ভয়ে থর থর কাঁপয়ে অমনি,
মরি কি সুন্দর হায় ভাব-নীরে ভাসি যায়,
অসীম আকাশ-সিন্ধু অনন্ত অবনী ;
চাতকিনী ধৈর্য্য ধর সেই নীর পান কর,
"স্ফটিক জলের" তরে কাঁদিওনা ধনী।

সলিল শয্যায় শুয়ে হাসে কমলিনীরে
সরসী রতন,
বাজায়ে সেতার বীণ শিলীমুখ লাজহীন
হেররে হৃদয়ে বসি লুঠে মধু-ধন,
কমল সোহাগ ভরে পরাগ লেপন করে
বিলাসী ভ্রমর অঙ্গে করিয়া যতন,
চাতকিনী ধৈর্য্য ধর সেই মধু পান কর
কি ছার নিঠুর মেঘে এত আরাধন।

প্রসারি লহরী-বাহু অশান্ত হৃদয়েরে
ধায় স্রোতস্বতী,

ছু'কূলে তুকুল তার গুল্মলতা শোভাধার
নানারঙ্গে সুচিত্রিত ফুল্ল ফুলবতী,
সাগর সঙ্গম তরে ধায় নদী তর তরে,
কে আছে মরতে আর হেন রসবতী ?
চাতকিনী শান্ত হও সেই রসে ডুবে রও,
নিদয় নিরদ আশা নহেগো সুকতি।

কভু সায়ন্তন নভে দেখে থাক যদিরে
নভ বিহারিণি !
সৌর করে উদ্ভাসিত চিত্রবাসে সুরঞ্জিত—
মনোজ্ঞ নীরদগণে, ঘনাম্বরহাণি !
তারা কি তোমার তরে সলিল সেচন করে ?
তারা কি তোমার দুঃখে দুঃখী গো দুঃখিনি ?
কত রঙ্গে কত ভাবে ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাবে,
বিলাসী জলদ অঙ্কে চপলা দামিনী।

সজ্জিত সে বরবপু নীরদ নিচয় রে
চপলা ভূষিতে,
তব দুঃখে দুঃখী নয় বিচিত্র জীমূত চয়
দুঃখিনীর দুখে দুখী কে আছে মহীতে ?
সৃজিলা বিধাতা তোরে চির বিরহিণী করে
অনন্ত বিরহানলে পুড়িয়া মরিতে,
তুমিও শিখেছ পাখী ক্ষণে ক্ষণে থাকি থাকি
নিদয় নীরদ তরে আকুলে কাঁদিতে।

আঁধারিয়া দশ দিক কাঁপাইয়া ধরারে
অশনি ঝঙ্কারে,
ঘোর আরম্বরে যবে আসিয়া সুন্দর ভবে,
ঝারবে সলিল মেঘ অবিরল ধারে,
তাহে কি বিহগ বালা মিটে মরমের জ্বালা ?
পুলকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে তিত কি আসারে ?

যাও পাখী উড়ে যাও ভালবাসা ভুলে যাও
নিদয় নীরদ কি লো প্রণয়ে আদরে ?
বাসর যৌবনে যবে আকুল পরাণিয়ে
প্রচণ্ড কিরণে,
তখন (ও) আকাশ পানে তাকাইয়া এক ধ্যানে,
কি ছার "স্ফটিকজল" যাচ বরাননে ?
মেঘের অস্তিত্ব নাই বল শুনি মোরে তাই,
কে তুষিবে তোমা স্নিগ্ধ সলিল সেচনে ?
কিসে যা'বে সে পিপাসা ? কে পূর্ণিবে চির আশা ?
স'পেছ শঠের করে সরল জীবনে।
অথবা নিন্দিনু বৃথা আদর্শ জগতেরে
পতি পরায়ণা,
থাকিতে তড়াগ হৃদ, স্বচ্ছ তোয়া নদী, নদ,
অনির্দ্দিষ্ট ঘনাসারে করিস পারণা,
এমনি পতির প্রতি কয়জনে রাখি মতি
সুলভ তেয়াগি করে দুর্ল্লভ কামনা ?
কোন ধনী কুতূহলে পুড়িয়া বিরহানলে
চাতকিনি ! তব সম লভয়ে যাতনা ?
(রামের জানকী তুমি নলের ললনা।)

শ্রীজগন্মোহন সিংহ।

আশার-স্বপন।

(১)

(কেন) দেখালে মহিনী ছবি, আশার স্বপন।
তাই আজ নিশাশেষে,
কি যেন কি মোহবশে,
ব্যথিত হিয়ার মাঝে কাঁদিছে পরাণ।
সাধের কুসুম কলি,
তাপেতে পড়েছে ঢলি,

ভস্ম হয়ে গেছে মোর নন্দন কানন।
আর কেন জাগ হৃদে আশার-স্বপন॥

(২)

বুকে চাপি দুঃখ ভার,
ভাঙ্গা বীণা ছিন্ন তার,
জাহ্নবী সলিলে তায় করেছি বর্জ্জন।
হিমাদ্রি পাষাণ দিয়া,
বাঁধিয়া রেখেছি হিয়া,
তবু কেন বহে ধারা, গঙ্গার মতন।
আর কেন জাগ হৃদে আশার স্বপন॥

(৩)

জীবনের কার্য্য যত,
নিষ্ফল হতনা এত,
হায়! যদি বুঝিতাম মোহের ছলন।
আজি আমি লক্ষ হারা,
কক্ষচ্যুত ধ্রুবতারা,
মরুমাঝে পথ ভ্রান্ত পথিক যেমন।
(আর) কর্ম্মপথে ভুলাওনা আশার স্বপন.

(৪)

কোথা ভব কর্ণধার শ্রীমধুসূদন।
অকূল-সংসার-পরি,
ভাসায়েছি দেহ তরি,
হৃষিকেশ! হৃদে মোর হও অধিষ্ঠান।
রিপুর তরঙ্গ ঠেলে,
অবহেলে যাই চলে,
শক্তি দাও তব কার্য্য করিতে সাধন
অন্তে সখা! দিও মোরে রাজীব চরণ।

শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার।

রমণী-রহস্য।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেয়াই।

রামরূপ শর্ম্মার মেজাজ যে নিতান্ত খারাপ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহাতে মেজাজ খারাপ না হওয়াই আশ্চর্য্য! তিনি এতই রাগত হইয়া উঠিলেন যে তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইয়া এই দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু নিমাই খুড়ো তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার গতি-রোধ করিল,—হাসিয়া বলিল, "বেয়াই, রাগ করিতে নাই।"

ব্রাহ্মণ দুই হস্ত জোড় করিয়া প্রায় রোরুদ্দমান স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যেই হোন, আমায় ক্ষমা করুন, দোহাই আপনার,—আমি বড়ই বিপদে পড়িয়া প্রায় পাগলের মত হইয়াছি,—দোহাই আপনার, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

এবার নিমাই খুড়োর মুখ গম্ভির হইল,—তিনি বলিলেন, "তাহাই ভাবিতে ছিলাম,—তুমি রায়গ্রামের ঘাটে কেন! বিপদ!—নিশ্চয়ই কিছু হইয়াছে,—রামরূপ শর্ম্মা কি হইয়াছে, আমায় বলিলে তোমার সাহায্য হইতে পারে।"

রামরূপ শর্ম্মার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি গরিব হইলেও কোন কারণে এক দল ডাকাতের চক্রান্তে পড়িয়াছেন। কেন পড়িয়াছেন তাহা তিনি সহস্র চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। এই লোকটার কথা বার্ত্তায় তিনি বেশ বুঝিলেন যে এই অদ্ভুত লোক খুব সম্ভব সেই ডাকাত দলের সর্দ্দার। তিনি আবার জোড় হাত করিয়া কাতরে বলিলেন, "মহাশয় আমায় ক্ষমা করুন।"

নিমাই খুড়োর আর হাসি নাই, তিনি অতি গম্ভির;—তিনি অতি দৃঢ় ভাবে বলিলেন, "কি হইয়াছে আমি শুনিতে চাই।"

এই সময়ে এক জন ভৃত্য কোচান ভাল কাপড়,—সুন্দর জুতা,—সুগন্ধি তৈল, সাবান গামছা লইয়া তথায় আনিয়া বলিল, "হুজুর কি এই ঘাটে স্নান করিবেন, ঘাটটা—ঘাটটা তত—তত ভাল নয়।"

"হা—মধু। এই ঘাটেই আমি স্নান করিব।"

এই বলিয়া গোঁসাই বাবু রামরূপ শর্ম্মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে, আমি শুনিতে চাই—তুমি এখানে কেন?"

এতক্ষণে ভৃত্য, কাপড়, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি দেখিয়া রামরূপ শর্ম্মার সমস্ত সন্দেহই দূর হইল,—তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, এই লোকই ডাকাত দলের সর্দ্দার। বাহিরে বড় লোকের ন্যায় থাকে,—রাত্রে ডাকাতি করে—কেন ইহার তাহার ন্যায় গরিব ব্রাহ্মণের উপর এত আক্রোষ জন্মিয়াছে! হা ভগবান—অদৃষ্টে এ দুঃখ কেন লিখিয়াছিলে!

ব্রাহ্মণ কম পক্ষে শতবার মনে মনে এ কথা বলিলেন। হৃদয়ে ইহাও বেশ বুঝিলেন যে ইহার হাতে রক্ষা নাই,—না কোন কথা কহিলে হয়তো রাগত হইয়া এই ডাকাতের সর্দ্দার অবলীলাক্রমে তাঁহাকে হত্যা করিবে! ডাকাত কি না পারে। এ অবস্থায় যাহা যাহা হইয়াছে, ইহাকে সমস্ত খুলিয়া বলাই ভাল। ব্রাহ্মণ বেশ জানিলেন যে এই দুর্ব্বৃত্ত তাহার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকলই অবগত আছে, নিজেই সব করিয়াছে, অথচ কেবল তাঁহাকে কষ্ট দিবার জন্য তাঁহার সহিত এই রূপ ভাবে কথা কহিতেছে! কিন্তু উপায় কি। না বলিলে—ইহার কথা অমান্য করিলে হয় তো এ আরও যন্ত্রণা দিবে, ব্রাহ্মণ সব কথা বলাই শ্রেয় মনে করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে গোঁসাই বাবুকে সমস্ত বলিলেন।

তিনি নীরবে সমস্ত শুনিলেন,—একটী কথাও কহিলেন না। তাহার এই ভাব দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "ডাকাত হইলে মানুষ কি দুর্ব্বৃত্তই হয়,—এমনই ভাব দেখাইতেছে যেন কিছুই জানে না, অথচ সমস্তই নিজের কাণ্ড।"

সমস্ত শুনিয়া গোঁসাই বাবু ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মধু, এখনই সাহেব মহাশয়কে ডেকে নিয়ে আয়।" মধু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

গোঁসাই বাবু ব্রাহ্মণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহার গোড়ার কতক কতক আমি জানিতাম; কিন্তু শেষেরটুকু নূতন বটে।"

ব্রাহ্মণ কোন কথা কহিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "বাবু সব জান, তা আমি জানি।"

তিনি কথা কহিলেন না দেখিয়া গোঁসাই বাবু বলিলেন, "জঙ্গলী শাওতালনীকে আমি চিনি।"

রামরূপ শর্ম্মা আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তুমি সব জান তা আমি জানি।"

গোঁসাই বাবু মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিত ভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি জান ?"

ব্রাহ্মণ রাগতস্বরে বলিলেন, "আমার আর প্রাণের মমতা নাই, তাই তোমায় ডরাই না। তোমার মুখের উপর বলিতে ভয় করি না।"

গোঁসাই বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কি বলিতে ভয় কর না।"

ব্রাহ্মণ সবেগে প্রায় উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন, "তুমি ডাকাতের সর্দ্দার ?"

গোঁসাই বাবু হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—তিনি হাস্য সম্বরণের চেষ্টা করিতে গিয়া তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি কথঞ্চিত হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "রামরূপ শর্ম্মা, ঠিক বলিয়াছ, আমরা কতকটা ডাকাত বটে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নায়েব মহাশয়।

এই সময়ে পলদ ঘর্ম্ম হইয়া নায়েব মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন।

নায়েব মহাশয়ের একটু বর্ণনা আবশ্যক। তিনি দৈর্ঘে তিন হাতের অধিক উচ্চ নহেন, প্রস্থেও প্রায় তিন হাত;—তাহার ভুড়িটী ওজন কম পক্ষে এক মণ,—বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, এত কৃষ্ণ যে কালিকেও হার মানিয়াছে,—তাহার উপর নায়েব মহাশয়ের বাল্যকাল হইতে গোঁপ দাড়ির অভাব, মস্তকের সম্মুখে কেশ মাত্র নাই। কেবল পশ্চাত ভাগে স্কন্ধের উপরে, অতি সামান্য দুই এক গাছা আছে মাত্র। নায়েব মহাশয়ের পরিধান এক তসরের ধুতি, স্কন্ধে উত্তরিয়, পায় তালতলার চটি;—তিনি এত ছুটিয়া আসিয়াছিলেন যে অজস্র তাহার নগ্ন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় কে যেন তাহার উপর এক বোতল দেশীকালি ঢালিয়া দিয়াছে।

তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া গোঁসাই বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "নায়েব মহাশয়,—ঠাণ্ডা হউন,—ঠাণ্ডা হউন!"

নায়েব মহাশয় জরগ্রস্থ ভল্লুকের ন্যায় সশব্দে হাপাইতেছিলেন,—বাক্য উচ্চারনের ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়াছিল। তাহার কণ্ঠ হইতে কেবল মাত্র বাহির হইল "হু———"

গোঁসাই বাবু হাসিয়া বলিলেন, "হয়েছে—ঠাণ্ডা হও।"

নায়েব মহাশয় উদ্গিরণ করিলেন "জুর—হু—কু—ম———"

"ঠাণ্ডা হও হে বাবু—ঠাণ্ডা হও।"

"হু—হু—হু—কু—"

"মধু—নায়েব মহাশকে হাওয়া কর।"

মধু মহা বিপদে পড়িল,—এই নদী তীরে পাখা পায় কোথায়? সে একবার হতাশ ভাবে চারিদিকে চাহিল,—তাহার পাখার অভাবে কাপড় গামছা বামহাতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত সেই কষ্ট-জালাবত নায়েব মহাশয়ের বৃহৎ ভুড়িতে হাওয়া করিতে লাগিল। এই অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া গোঁসাই বাবু আরও অধিকতর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—তাহাতে নায়েব মহাশয় আরও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘর্ম্মের স্রোত বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

গোঁসাই বাবু বলিলেন, "নায়েব মহাশয়, একটু আগে এই রামরূপ শর্ম্মা একখানা নৌকা করিয়া এই ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াছিলেন,—"

নায়েব মহাশয় আরম্ভ করিলেন "হু—হু—জুর?"

"হয়েছে—ঠাণ্ডা হও।"

"হু—জু—র—"

"আবার,—ঠাণ্ডা হও।"

"হু—জু—র—"

"ফের—চুপ" করে শোনই না বাপু। ইনি বাজারে খাবার কিনিতে যান;—ফিরে এসে দেখেন নৌকা এখানে নাই। এখনই কাছারির বরকন্দাজদের হুকুম দেও,—তারা সেই নৌকা খুজে দেখুক। ইনি বললেন—সেই নৌকায় তেতুল তলা হতে জঙ্গলী শাওতালনীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন—এখনই সেই নৌকা খুঁজতে হুকুম দেও।"

নায়েব মহাশয় আবার আরম্ভ করিলেন, "হু—হু—জুর—"

এবার গোঁসাই বাবু বিরক্ত ভাবে ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "যাও,—যা বল্‌চি তাই কর।"

নায়েব মহাশয় কি বলিতে উদ্যত হইতেছিলেন,—কিন্তু গোঁসাই বাবু

রাগত পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করায় তাহার মুখের যেমন উন্মুক্ত ওষ্ঠ তেমনই রহিল,—তিনি আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন,—কিন্তু বলা বাহুল্য নায়েব মহাশয়ের পক্ষে দৌড়মান হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব,—তিনি এ কার্য্যে যতই ব্যগ্র হয়েন,—ততই তাহার হাপানি ও গলদ ঘর্ম্ম বৃদ্ধি পায়।

যতক্ষণ গোসাই বাবু অদ্ভুত নায়েব মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ রামরূপ শর্ম্মা বিস্মিত ভাবে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তিনি তাহাদের কোন কথাই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এই গোসাই বাবু কে? তিনি এখন বেশ বুঝিয়াছিলেন,—এই গোঁসাই বাবু ডাকাতের সর্দ্দারই হউন আর যিনিই হউন,—তিনি যে একজন বড় লোক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই নায়েব মহাশয়ই বা কে? তিনি কি যথার্থই এখানকার নায়েব,—তাহা যদি হয়,—তবে গোঁসাই বাবু নিশ্চয়ই এখানকার জমিদার,—তাহা হইলে তিনি ডাকাতের সর্দ্দার নহেন।—তিনি কে?

এই সকল চিন্তায় রামরূপ শর্ম্মা একেবারে স্তম্ভিত প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে কি কুক্ষণে—তিনি কন্যার সঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন,—সেই দিন হইতে প্রতিপদে তিনি নানা বিপদে পড়িতেছেন,—নানা অদ্ভুত লোকের সহিত তাহার দেখা হইতেছে,—সহসা মনে হয় যে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন,—কিন্তু এ যে স্বপ্ন নহে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই! এ সব কি,—কেন তাহার ন্যায় গরিব ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে এত বিপর্য্যয় ঘটিতেছে?

রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এই সময়ে গোঁসাই বাবু বলিলেন, "বেয়াই এস,—আমার বজরায় আজ খাওয়া দাওয়া হবে—চল স্নান করা যাক—তার পর তোমার নৌকায় ব্যবস্থা দেখা যাইবে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জমিদার গোঁসাই বাবু।

রামরূপ শর্ম্মা প্রায় লুপ্তশ্বাস হইয়াছিলেন। বিশেষ বিপদে পড়িলে তখন আর লোকের ভয় ডর থাকে না,—তাহারও ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ে পূর্ণ বল বাঁধিয়াছেন,—বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যেই হউন,—আমায় ক্ষমা করুন,—আমি অনাহারে মরিব সেও ভাল,—তবু ও আপনার বা অপর কাহারও সঙ্গে যাইব না। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ,—ভিক্ষা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিব।"

গোঁসাই বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রামরূপ শর্ম্মা,—তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না বটে, কিন্তু তোমাকে আমি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিয়া জানিতাম—"

রামরূপ ব'ললেন, "আমি গরিব ব্রাহ্মণ মাত্র।"

গোঁসাই বাবু তাঁহার কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "তুমি কি রাজা নিমাই নারায়ণের নাম পর্য্যন্ত শোন নাই?"

এই নাম শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ফারিত নয়নে গোঁসাই বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ নাম তাহার নিকট অবিদিত ছিল না,—তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, "শুনিয়াছি—নিশ্চয়ই এ নাম শুনিয়াছি—শুনিয়াছি দুর্ব্বৃত্ত গোবিন্দ রায় আমার ছোট মেয়ের—এই রাজা নিমাই নারায়ণের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে,—আমি গরিব লোক,—ক্ষমতা থাকিলে এই দুর্ব্বৃত্তদের সমুচিত শিক্ষা দিতাম।"

গোঁসই বাবু হাসিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ রায় দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া যে নিমাই নারায়ণও দুর্ব্বৃত্ত হইবে তাহার কি কোন মানে আছে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নিমাই নারায়ণ গোবিন্দ রায়ের ভায়রা ভাই,—দুই বেটাই দুর্ব্বৃত্ত—"

গোঁসাই বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার হাসিতে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ রাগে কাঁপিতে লাগিল,—তিনি কোন কথা না কহিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন,—কিন্তু হাসিতে হাসিতে গোঁসাই বাবু তাহার হাত ধরিলেন,—ব্রাহ্মণ বল প্রকাশে তাহার হাত ছাড়াইয়া পালাইতে উদ্যত হইলেন,—কিন্তু দেখিলেন কৃষকায় গোঁসাই বাবুর দেহে অসীম বল। গোঁসাই বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বেয়াই,—ছেলে বেলা থেকে একটু কসৎ করার অভ্যাস আছে।"

ব্রাহ্মণ কাতরে বলিলেন, "মহাশয়—আমায় ক্ষমা করুন।"

"বেয়াই,—তোমায় কি বলে ক্ষমা কর্ব্বো।"

"মহাশয়,—আমায় বেয়াই,—বেয়াই বল্‌বেন কেন?"

"কেন? যে হেতু—মশায়ের কন্যা আমার পুত্রবধু।"

এই কথায় রামরূপ শর্ম্মা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া গোঁসাই বাবুর মুখের দিকে স্তম্ভিত প্রায় চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ তিনি কোনই কথা কহিতে পারিলেন না,—গোসাই বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথা কি বিশ্বাস হইল না।"

তাহার পর তিনি পশ্চাতে দণ্ডায়মান ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন। "মধু!"

"হুজুর।"

"আমি কে বেয়াইকে বল।"

"হু-জু-র!"

"আরে বেটা,—হুজুর হুজুর কি,—আমি কে তাই বল।"

"হুজুর?"

"আবার হুজুর কিরে বেটা,—আমি রাজা নিমাই নারায়ণ কি না তাই বল।"

"হুজুর?"

"না বেটা—এটা প্রকাণ্ড গণ্ড মূর্খ—ডাক আবার সেই কাল মোষটাকে।"

যখন প্রভু ভৃত্যে কথা হইতেছিল সেই সময়ের মধ্যে রামরূপ শর্ম্মাও কতকটা তাহার বিস্ময়ভাব হৃদয় হইতে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—তিনি বলিলেন, "মশায়, আপনি যাহা বলিতেছেন,—তাহা কি সত্য।"

গোঁসাই বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে সকলে রসিক লোক বলিয়া জানে,—এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ আমাকে মিথ্যা কথা কহিতে শুনে নাই।"

"আপনি যথার্থই কি রাজা নিমাই নারায়ণ।"

"এই রকম তো লোকে বলে।"

'যথার্থই তাহা হইলে আপনি আমার বেয়াই।"

"কাজেই—যেহেতু আপনার কন্যা আমার বৌমা।"

"আমি শুনিয়াছিলাম যে আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল,—আপনি যথার্থই যদি রাজা নিমাই নারায়ণ হয়েন—"

"বেয়াই,—আগে সেইটাই তোমায় বিশ্বাস করাইয়া দি,—তার পর অন্য কথা হবে,—এখন আমার বজরায় এস—বেলাও যে এ দিকে মাথায় উঠ্‌ল।"

রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে এই সকল ব্যাপার আন্দোলন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তাহার আর কোন বিষয়ই আর ভাবিবার ইচ্ছা ছিল না,—তিনি হতাশ ভাবে বলিলেন, "চলুন।"

গোঁসাই বাবু বা রাজা নিমাই নারায়ণ রামরূপ শর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে তীরে চলিলেন,—এতক্ষণ তাহারা যেখানে ছিলেন,—তথায় কেহই আসে নাই;—রামরূপ শর্ম্মা এখন বুঝিলেন যে গোঁসাই বাবুর জন্যই সেখানে

কেহ আসে নাই,—এখন চারিদিকে যে তাহার সম্মুখে পড়িতেছিল, সেই অবনত মস্তকে তাহাকে সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যাগ।

এই সকল দেখিয়া রামরূপ শর্ম্মার এখন বিশ্বাস হইতেছিল যে হয়তো এই লোক যথার্থই রাজা নিমাই নারায়ণ। তাহার জমিদার গোবিন্দ রায় তাহার দুই সুন্দরী কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দেশান্তরিত করিলে তিনি শুনিয়াছিলেন যে তাহার ছোট কন্যার সহিত তিনি তাহার ভায়রাভাই রাজা নিমাই নারায়ণের ছেলের বিবাহ দিয়াছেন। বড় কন্যা উষার বিবাহ তাহার নিজের ছেলের সহিত দিয়াছেন,—তিনি শুনিয়াছিলেন, এই মাত্র,—আর কিছুই জানেন না,—জানিবার চেষ্টা পাইয়া আরও বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন,—সুতরাং তিনি তাহার ছোট জামাতা বা তাহার পিতাকে কখনও দেখেন নাই। বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি তাহার ছোট কন্যা নীশার কোনই সম্বাদ পান নাই;—পত্রাদি পর্য্যন্তও লেখা পড়া ছিল না।

গোঁসাই বাবুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে তাহার গত ঘটনা সকল অনিচ্ছা সত্বেও আবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সহসা বাড়ীতে একাকিনী এক শ্বেতবস্ত্রা কন্যার আগমন, তাহার পর সহসা তাহার শ্বশুর বাড়ী যাইবার জন্য ব্যগ্রতা,—তাহাকে একশ টাকার নোট দেওয়া,—তাহার পর তাহার কন্যার শ্বশুর বাড়ী গমন,—তাহার—তথায় লাঞ্ছনা ও পলায়ন,—তাহার পর রাত্রে কন্যার অন্তর্দ্ধান,—সকালে ডাইনী শাওতালনীর সঙ্গে সাক্ষাত;—তাহারই প্ররোচনায় তাহার ছোট কন্যা নীশার বাড়ীর দিকে যাত্রা,—তাহার পর এই বাগ গ্রামের হাটে তাহার নৌকা পর্য্যন্ত অন্তর্দ্ধান,—কত অদ্ভুত অদ্ভুত লোকের সহিত সাক্ষাৎ—শেষ—এই গোঁসাই বাবু,—ইনি কি যথার্থই রাজা নিমাই নারায়ণ। যথার্থই কি তাহার কন্যার শ্বশুর,—তাহার—বেয়াই!

হাটের লোক সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া দুই দিকে সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ দিতেছিল। সম্মুখে গোঁসাই বাবু,—মধ্যে রামরূপ শর্ম্মা—পশ্চাতে মধুসূদন চাকর

এক ঘাটে একখানি বৃহৎ বজরা বাঁধা রহিয়াছে। বজরার পশ্চাতে বৃহৎ পতাকা বায়ু প্রকোপে উড্ডিয়মান হইতেছিল,—বজরার ছাদের পাঁচ সাতজন দ্বারবান উপবিষ্ট,—নদী তীরে দূরে দাঁড়ি মাজিগণ রন্ধন করিতেছে। একটু দূরে আম্র কানন মধ্যে দুইটী তাম্বু পড়িয়াছে,—তথায়ও অনেক লোকজন চলা ফেরা করিতেছে।"

দেখিলে মূর্খেও বুঝিতে পারে যে কোন খুব বড় লোক এইখানে আসিয়াছেন; রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে বলিলেন, "কোন ডাকাতের সর্দ্দার সে যত বড় চালাকই হউক না কেন;—কখনই এরূপ প্রকাশ্যভাবে বেড়াইতে পারে না। বোধ হয় যথার্থই এই লোক আমার বেয়াই রাজা নিমাই-নারায়ণ। লোকটাকে মন্দ লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না,—তবে অনেকটা আমোদ প্রিয়,—আমাকে দেখিয়াই চিনিয়াছে,—নিশ্চয়ই গোবিন্দ রায়ের বাড়ী যখন গিয়াছিল,—তখন কোন সময়ে আমায় গ্রামে দেখিয়া থাকিবে। বড় লোক আমি তত লক্ষ করি নাই। যদি যথার্থই রাজা নিমাই নারায়ণ হয়,—আর যেরূপ আমার সহিত ব্যবহার করিতেছে,—তাহার ভিতর কোন কুমতলব না থাকে, তবে ভগবান নিরুপায় অবস্থায় আমার সহায় জুটাইয়া দিয়াছেন। যদি লোকটা যথার্থই ভাল লোক হয়,—তবে এতদিন পরে আমার নীশাকে দেখিতে পাইব,—আর হয়তো উষার রহস্যও জানিতে পারিব।"

বজরার সম্মুখে আসিলে গোঁসাই বাবু বলিলেন, "মধু!"

"হুজুর।"

"বেয়াইকে তেল মাখা।"

মধুও বিস্মিত হইয়াছি,—তাহার মুখে বিস্ময়ের ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছিল,—কিন্তু সে কোন কথা না বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইয়া বলিল, "ঠাকুর বসো।"

গোঁসাই বাবু বলিলেন, "বেটা,—দেখ্‌ছিসনে আমার বেয়াই।"

"হুজুর—"

"ফের হুজুর হুজুর করে—বেয়াইকে তেল মাখা—বেলা হয়েছে।"

তাহার পর তিনি আর এক ব্যক্তিকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "বসন্ত খুড়ো,—আমার বেয়াই শীঘ্র আহারের বন্দবস্ত কর।"

বসন্ত খুড়ো বিস্মিতভাবে রামরূপ শর্ম্মার দিকে চাহিয়া আর কোন কথা না বলিয়া তাম্বুর দিকে ছুটিলেন।

মধু, রামরূপ শর্ম্মার হাত হইতে তাঁহার আহারীয় বহু উত্তরিয় লইয়া বলিল, "বসুন।"

এ জীবনে রামরূপ শর্ম্মাকে অপর কেহ তেল মাখাইয়া দেয় নাই,—তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "একটু তেল দেও মাখ্‌চি।"

মধু বলিল, "বসুন,—মাখিয়ে দি।"

"না—না হাতে একটু তেল দেও।"

এই বলিয়া রামরূপ শর্ম্মা মধুর হস্তস্থ তেলের শিশি লইতে হাত বাড়াইলেন, —ইহা দেখিয়া গোঁসাই বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বেয়াই,—সে কি হয়, চাকরে তেল মাখিয়ে দেওয়াই আমাদের ঘরের প্রথা।"

অগত্যা ব্রাহ্মণ বসিলেন,—মধু সবলে তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিল,—ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আর্ত্তনাদ সম্বরণ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে একজন বরকন্দাজ ঊর্দ্ধশ্বাসে গলদঘর্ম্মে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর—ব্যাগ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে আনিল?

ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বরকন্দাজের কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। "ব্যাগ? কিসের ব্যাগ? কাহার ব্যাগ!"

গোঁসাই বাবু বলিলেন, "বেটা স্থির হ! সব বেটাই সমান।"

বরকন্দাজ হাপাইতে হাপাতে বলিল, "হু—জু—র—ব্যাগ।"

গোঁসাই বাবু বা রাজা নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "শুনিলাম,—স্থির হ,—কার ব্যাগ।"

বরকন্দাজ কথঞ্চিত স্থির হইয়া বলিল, "তা জানি না, হুজুর।"

নিমাই নারায়ণ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "জানি না?—তবে কিসের জন্য এমন করে ছুটে এসেছিস?"

"হুজুর, নায়েব মহাশয় ছুটে হুজুরকে খবর দিতে বলিলেন।"

"খত পাখা নিয়ে কাজ? আর কি নায়েব মশায় তোকে বলেছেন।"

"বল্লেন, হুজুরকে ছুটে গিয়ে বল যে, যে ব্যাগ হারিয়েছে,—তা পাওয়া গেছে।"

"দূর হ বেটা সন্মুখ থেকে।"

এই বলিয়া নিমাইনারায়ণ রামরূপ শর্ম্মার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেয়াই, বোধ হয়,—তোমারই ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে,—যাক নায়েব আসিলে সকলই শোনা যাইবে, এখন বেলা হইয়াছে,—আর বৃথা এই বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইয়া কোন ফল নাই,—স্নান করা যাক্।"

নানা কারণে রামরূপ শর্ম্মার মস্তক বিপর্য্যস্ত ছিল,—তিনি কোন কথা কহিলেন না। মধুর তৈল মর্দ্দনে তাঁহার মাংসপেশি প্রায় চূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নীরবে স্নানার্থে নদী গর্ভে নামিলেন,—এ দিকে মধু বৃক্ষ ছায়ায় উপবিষ্ট প্রভুর গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

রামরূপ শর্ম্মা দুই ডুব দিয়া নদী তীরে বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে লাগিলেন,—দেখিলেন রাজা নিমাইনারায়ণ যথার্থই একজন রসিক পুরুষ,—নিকটস্থ দণ্ডায়মান নানা লোকের সহিত নানা সুমিষ্ট কথা কহিয়া তাহাদের হাসাইতেছিলেন। রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে আবার বলিলেন, এরূপ লোক কখনই ডাকাত বা বদ লোক হইতে পারে না।

এই সময়ে নায়েব মহাশয় হেলিতে দুলিতে ভাঁটার ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে হুজুরের সন্মুখিন হইলেন,—পশ্চাতে কয়েকজন পাইক ও বরকন্দাজ,—তাহাদের এক জনের হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

তাহারা সকলে আসিয়া উপবিষ্ট তৈলমর্দ্দন নিযুক্ত প্রভুর নিকটে আসিয়া সেলাম ও নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইলে নিমাইনারায়ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি নায়েব মহাশয়?"

নায়েব মহাশয় গামছায় কপাল ও মুখের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, "হুজুর এই ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে।"

"তাহাত দেখিতেছি—কাহার ব্যাগ।"

"বোধ হয় সেই ঠাকুর মহাশয়ের।"

"বেয়াইয়ের?"

"হুজুর,—তাঁরই হবে—"

"নায়েব মহাশয়,—বেলা হয়েছে, পেট ক্ষিধেয় কো কো কচ্চে—

এখন বাজে কথা শোনবার সময় নয়। ব্যাপারটা কি সংক্ষেপে বল দেখি শুনি।”

নায়েব মহাশয় দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, “হুজুর বলে-ছিলেন যে ঠাকুর মহাশয়ের—”

“আবার বলে ঠাকুর মহাশয়ের?”

“তবে কি বলব হুজুর?”

এবার নিমাইনারায়ণ বিপদে পড়িলেন, যথার্থই নায়েব মহাশয় রামরূপ শর্ম্মাকে কি সম্বোধন করিবেন। তিনি যদি রাজার যথার্থ বেয়াই হন,—তবে সম্মাননীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি তাহা হইলে তাঁহাকে কি বলিবেন।

নিমাইনারায়ণও তাহা বুঝিলেন, একটু পরে হাসিয়া বলিলেন, “শর্ম্মা মশায় বল,—আর কি বলবে।”

“তাই বলব হুজুর।”

“এখন ব্যাপারটা কি বল,—তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে আট-চল্লিশ ঘণ্টায় দিন মনে করে নিতে হয়।”

“না—হুজুর—”।

“বল এখন কি হয়েছে।”

“শর্ম্মা মহাশয়ের ব্যাগ নৌকায় ছিল,—ব্যাগ সুদ্ধ নৌকা পালিয়েছে,—আমি নৌকার সন্ধানে হুজুরের হুকুমে কূলে কূলে দুই দিকেই পাইক ছুটাইয়াছি—”

“বেশ করেছ,—এখন ব্যাগের বিষয় কি বল।”

“তারপর—হুজুরের কাছ থেকে কাছারিতে গিয়ে দেখি যে গদির উপর এই ব্যাগ।”

এই বলিয়া তিনি পশ্চাতে চাহিলেন। পশ্চাতস্থ ব্যাগ হস্তে পাইক অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে রাজার সম্মুখে ব্যাগ স্থাপিত করিল। সালগ্রাম শীল হইলেও ব্যাগের আজ এত সমারোহে স্থাপনা হইত না। রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, “গদিতে এ ব্যাগ কিরূপে আসিল?”

নায়েব মহাশয় অধিকতররূপে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, “হুজুর,—ঐটাইতো সমস্যা! অনুসন্ধানে জানিলাম, কে কখন গদিতে ব্যাগ রাখিয়া গিয়াছে,—তাহা কেহ জানে না।”

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নৌকা।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "সমস্যা থাক! তোমার প্রকাশ্যে কাছারিতে গদির উপরে কে একটা ব্যাগ রাখিয়া গেল,—আর তাহা কেহই দেখিল না—"

"হুজুর,—আমি হুজুরের কাছে এসেছিলাম—"

"তা জানি,—তা বলে কি কাছারিতে কেহ ছিল না,—আর সব লোক কোথায় গিয়াছিল,—পাইক বরকন্দাজেরা সব কোথায় ছিল—"

"কেউ ঘরের ভিতর ছিল—কেউ বা এদিকে ওদিকে ছিল—"

"চাসা গেল ঘর,—লাঙ্গল তুলে ধর—নয় কি নায়েব মশায়?"

"তা—তা—হুজুর—"

"সে বোঝা গেছে—এখন কি তাই বল।"

"সকলকে জিজ্ঞাসা করেছি,—কখন কে গদির উপর ব্যাগটা রেখে গেছে তা কেউ বলতে পারে না।"

"ব্যাগে কি আছে?"

"হুজুরের হুকুম ব্যতীত—খুলতে সাহস করি নি।"

"মধু?"

"হুজুর!"

"বেয়াইয়ের সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ হয়েছে কি না দেখ।"

তাহা দেখিবার জন্য নদীগর্ভে ছুটিবার প্রয়োজন হইল না,—উপরে একটা কিসের গোল হইতেছে,—তাহাই দেখিবার জন্য রামরূপ শর্ম্মা সংক্ষেপে সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া উপরে আসিতেছিলেন,—মধু আসিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়,—হুজুর আপনাকে তলপ দিয়েছেন।"

"চল—যাচ্চি।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রাজা নিমাইনারায়ণের নিকট আসিলেন,—তিনি বলিলেন, "বেয়াই,—এই কি তোমার ব্যাগ?"

ব্রাহ্মণ ব্যাগ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ—এই ব্যাগই আমার—কে আনিল?"

"নায়েব মহাশয় বল্‌ছেন ঐটাই সমস্যা। ওঁর গদির উপর কে ব্যাগ রেখে

গেছে, তা কেউ বল্‌তে পারে না।—যাক্ সে খবর পরে লওয়া যাইবে—এখন ব্যাগ খুলে দেখ,—টাকা কড়ি ঠিক আছে কি না।"

ব্যাগের চাবি তাঁহার উত্তরিয়ের কোনে বাঁধা ছিল,—তিনি ব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন,—নোটের তারা ঠিক আছে;—অন্য টাকায়ও কেহ হাত দেয় নাই। ব্যাগে যে সামান্য বস্ত্রাদি ছিল,—তাহাও ঠিক রহিয়াছে,—তিনি বলিলেন, "হাঁ—সব ঠিকই আছে,—কেহ ব্যাগ খোলে নাই!"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বেয়াই,—তোমার চোর সাধু দেখ্‌চি—পাছে বিদেশে বিভুমে বিঘোরে পড় বলে দেখ জমিদারের কাছারির গদিতে তোমার ব্যাগ রেখে গেছে,—জানে তুমি বিপদে পড়ে নিশ্চয়ই কাছারিতে যাবে—নায়েব মহাশয়,—সমস্যাই বটে,—এই দাঁড়ি মাজিরা গরিব ব্রাহ্মণকে এমন করে ফেলে পালাবার মানে কি?"

নায়েব মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "ভেবেছিল হয় তো ভাড়াটার বিষয়—তা—শর্ম্মা মশায়—"

রাজা নিমাই নারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "তারা তো নোটের তাড়া দেখেছিল,—তবে ভাড়া পাবার ভয় কর্ব্বে কেন? নায়েব মশায় আপনার এ কথাটার জোর হলো না।"

"হুজুর তবে তারা পালাবে কেন?"

"আপনার কথাই ঠিক হইতেছে,—আপনার গদির উপর ব্যাগ আসার মত ঐটাও একটা সমস্যা। বেয়াই কিছু বুঝিতে পার?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিছুমাত্র না,—এই কয়দিন যাহা যাহা ঘটিতেছে,—তাহার কিছুমাত্র আমি বুঝিতেছি না,—এ সকলই আমার কাছে ঘোর সমস্যা। এখনও যাহা ঘটিতেছে,—তাহাও সমস্যা।"

"কি বিষয়?"

"এই আপনার বিষয়—আপনি কে,—আমার কন্যার যথার্থ শ্বশুর কি না,—তাই যদি সত্য হয়,—তাহলে এত দিন আমারি কোন সংবাদ না লইয়া—আমার কন্যাকে গুমি করিয়া রাখিয়া হঠাৎ আমাকেই বা আজ এত আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন কেন,—আর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা যে আপনার কীর্ত্তি নয়,—এই রকম এ সমস্তই আমার কাছে ঘোর সমস্যা!"

যতক্ষণ সবেগে ব্রাহ্মণ এই সকল কথা কহিতেছিলেন,—ততক্ষণ রাজা গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে

তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠিক বলেছ বেয়াই—সত্য কথাই বটে,—তবে আমার সম্বন্ধে সমস্যা এখনই ঘুচিয়া যাইবে,—আহারে বসিয়া আমি আমার কথা বলিলে আমার সম্বন্ধে সমস্যা দূর হইবে,—কিন্তু তোমার বড় মেয়ে উষা সম্বন্ধে সমস্যা তাহার সঙ্গে দেখা না হইলে দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। আর তোমার এই নৌকার সমস্যাও রহস্যজনক সন্দেহ নাই—এ আবার কি?"

এই কথায় সহসা রাজা যে দিকে চাহিলেন,—সকলেই সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন বৃহৎ অতি দীর্ঘ বাঁশের লাঠি স্কন্ধে দুই ব্যক্তি উদ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "আমি এই দিকে যে দুইজন পাইক পাঠাইয়াছিলাম, তাহারাই ফিরিতেছে।"

পাইকদ্বয় রাজার নিকট আসিয়া সেলাম করিতে গিয়া ভূমিসাৎ হইয়া বলিল, "নৌ—হুজুর—নৌ—ক—"

ক্রমশ।

প্রভাত! প্রভাত।

পোহায়ে গিয়াছে তিমির রজনী,
নব আশা লয়ে জেগেছে ধরণী,
শাখায় বসিয়া ডাকিছে 'কোয়েল'
কানন মাঝারে গাহিছে 'দোয়েল'
জাগরে অবনি! নাইক রজনী
প্রভাত! প্রভাত!

হাসিয়া উঠেছে 'সেফালী' 'মালিকা'
সৌরভ ভরেতে অধীরা যুথিকা,
সমীর বহিয়া কাননে কাননে,
কহিছে ছুটিয়া অমীয় বচনে,
ফুল 'বেল' 'জাতি' পোহায়েছেরাতি
প্রভাত! প্রভাত!

উজলি' অবনী উজলী' গগন
শোভিয়া কানন শোভিয়া গহন
পূরব হইতে জোছনা উঠিয়া
জগৎ মাঝারে গেল জানাইয়া
ধরি' চারু ছবি, উঠিতেছে রবি,
প্রভাত! প্রভাত!

নব উৎসাহে নবীন হরষে,
ঝিরি ঝিরি মৃদু বিমল বাতাসে,
অনতিদূরে যাইছে বহিয়া,
যমুনা কিশোরী গাহিয়া গাহিয়া,
আয়গো সকলে, গাহি বাহু তুলে,
প্রভাত! প্রভাত!

মোহাম্মদ হারুণ।

অগ্রাণে দৃশ্য।

(৩)

শারদীয় পূজা শেষ হইয়াছে, শরৎও সেই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। শরৎ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু হেমন্ত আসিয়া আদর করিয়া আমাদের কোলে তুলিয়া লইলেন ও স্নেহ করিয়া হৈমন্তিক শস্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন।

পল্লীবাসীর নিত্য নূতন আনন্দ। হেমন্ত প্রভাতে দিনদেব কুহেলিকা রাশি সরাইয়া উদয় হইবার পূর্ব্বেই, সূর্য্যরশ্মীর প্রথম কিরণ সম্পাতে নব দূর্ব্বাদলের উপর শিশির বিন্দু মুক্তার শোভা না হইতে হইতেই, দেখ, রসের বাঁক কাঁধে করিয়া হেলিয়া দুলিয়া রসিক শিউলি রসের গান করিতে করিতে চলিয়াছে। কোথাও বা শিউলি রস পাড়িতে খেজুর গাছে উঠিয়াছে এমন সময় ছেলের দল, আকণ্ঠ পুরিয়া রস পান করিয়া মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে আর সহর বাসী, তোমরা জল মিশ্রিত রস পান করিয়া সে সুখ মিটাইতেছ। ছোট ছোট বালিকাগণ ভোর না হতেই দলে দলে শিউলি তলায় যাইয়া কোঁচ পুরিয়া শিউলি ফুল কুড়াইতেছে, কেহ বা গাছ নাড়া দিতেছে, আর ঝর ঝর করিয়া ফুলের রাশি তাহাদের মাথায়, গায়ে, পায়ে, পড়িয়া তাহাদিগকে বনদেবী সাজাইতেছে। বালিকাগণ শিউলি ফুলে কাপড় ছোবাইয়া, সেই কাপড় পরিয়া পার্শী সাড়ির সাধ মিটাইতেছে, বাস্তবিক সেই কাপড়ের এক নয়নাভিরাম বর্ণ। কেহবা 'ইতু পুজা'র জন্য ফুল কুড়াইতেছে। সহরে এসময় হয়ত পিতা মাতা তাঁহাদের বালিকা কন্যাকে 'কিণ্ডার গার্ডেনের বই হাতে দিয়া খ্রীষ্টানী বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষার জন্য পাঠাইতেছেন।

এ সময় একবার মাঠের দৃশ্য দেখ, হেমন্তকালের মাঠের দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া কবি গাহিয়াছেন, "ওমা আঘ্রাণে তোর ভরা খেতে, কি দেখেছি মধুর হাসি।" মধুর হাসি কা'র? সকলে বলিবেন প্রকৃতির। আমরা বলি প্রকৃতি ও কৃষক দুয়েরই। কৃষকগণ দলে দলে মিষ্ট মধুর কলরবে হৈমন্তিক ধান্য কাটিতে ব্যস্ত। ধান কাটার আমোদ আমরা "ভাদুরে দৃশ্য" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ওদিকে চাহিয়া দেখ, অড়হর বৃক্ষ সকল মস্তক উন্নত করিয়া, হরিৎ ফুলের শোভায় দিক আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রভাত সূর্য্য কুহেলিকা রাশি ভেদ করিয়া তাহার

উপর সোণার কিরণ ফলাইতেছে, আর বালকগণ দলে দলে অড়হর ফল তুলিতেছে। অড়হর ফলের সঙ্গে মুড়ী, বালকগণের এক রসনা তৃপ্তি কর খাদ্য। ওদিকে সর্ষপ ক্ষেত্র ও হরিৎ ফুল বিস্তার করিয়া প্রকৃতির বক্ষে কার্পেট বিছাইয়া রাখিয়াছে; ঐ সর্ষপ শাকেরই কি অমৃতস্বাদ কোন গুপ্ত কবি আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়াছেন,

নূতন সর্ষপ শাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
স্বল্প ব্যয়েন সুন্দরী গ্রাম্য জনো মিষ্ট মশ্নাতি॥"

কচি কচি সর্ষে শাকের চড়চড়ি, আর নূতন ধানের ফেনে ফেনে ভাত, তার সঙ্গে একটু লুন; আর সেই সঙ্গে পেছলা দই বা ঘোল হইলেই পল্লী-বাসীর অমৃত।

পল্লীবাসী নাগরিকগণের বারমাসে তের পার্ব্বন। অগ্রাণে তাদের নূতন ব্রত, 'ইতুপূজা' ও "কুলুই চণ্ডী ব্রত।" ইচ্ছা ছিল উভয় ব্রতেরই উদ্দেশ্য ও তার কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিব কিন্তু অবসরের বহুমূল্য স্থান আমরা বেশী নষ্ট করিতে চাই না, তাই কেবল মাত্র 'ইতুর কথা' পল্লীবৃদ্ধার মুখে শুনিয়া লিখিলাম।

ইতুপূজা অতি সামান্য ব্যাপার; সামন্য একটু নৈবেদ্য, সামান্য বন্যজ পুষ্পেই পূজা হয়। প্রতি বৃহস্পতিবারে বা রবিবারে অগ্রহায়ণ মাসে পূজা হয়। ইতু পূজার কতদিন হইতে উৎপত্তি তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ঠিক করুণ আমরা এই অবসরে 'ইতুর কথা' পাঠক পাঠিকাগণকে সংক্ষেপে শুনাইব।

এক দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। সংসারে তার দুটি কন্যা ও একমাত্র স্ত্রী। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিত। ব্রাহ্মণের এক দিন পিঠা খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় ব্রাহ্মণীকে বলিল, ব্রাহ্মণীতো চটিয়াই অস্থির বলিল, "চাল কোথা, কি কোথা পিঠে খাবেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া চাউল আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণী পিঠা তৈরি করিতে বসিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে চাউল যোগাড় করিয়াছে, তাহার প্রাণের প্রাণ পিঠা কাউকে দেবার ইচ্ছা নয়, তাই সে কোনে লুকাইয়া ক'খান পিঠা হয় গনিয়া রাখিল"। এমন সময় তাহার কন্যা দুটি আসিয়া কাঁদিয়া দুখানি পিঠা চাইল, ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে লুকাইয়া দুজনকে দুখানি পিঠা খাইতে দিল। পরে ব্রাহ্মণ খাইতে বসিয়া দু'খানি পিঠা কম দেখিয়া বকিতে লাগিল ও বলিল, "নিশ্চয় তোর মেয়ে দুটোকে দিয়েছিস?" পরে ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ মেয়ে দুটিকে মামার বাড়ী

লইয়া যাইবার কথা বলিয়া, তাহাদের লইয়া এক গভীর বনের মধ্যে গেল ও গভীর বনের মধ্যে বিশ্রাম করিতে বলিল। বালিকা হু'টি পথ হাটিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে ব্রাহ্মণ বালিকা দুটিকে সেই ভীষণ বনে রাখিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে বালিকা দুটি ঘুম হইতে উঠিয়া তাদের বাপকে না দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। ছোট বালিকাটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী সে বলিল, "দিদি, আমরা পিঠে খেইছিলাম বলে বাবা আমাদের বনবাস দিয়ে গিয়েছেন।" এ দিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সেই গভীর বনের মধ্যে গাছের পাতায় পাতায় মেশা মিশি বিচ্ছেদ শূন্য, ছিদ্র শূন্য, আলোক প্রবেশের পথ মাত্র নাই, তাহাতে অন্ধকার রাত্রি। এই ভীষণ বন মাঝে বালিকা দুটি নিতান্ত নিরাশ্রয়, অদূরে বন্য পশুর ভীতি বিহ্বল কর্কশ স্বর। বালিকা দুটি গাছে চড়িতে জানিত, গাছে চড়িয়া রাত্রি কাটাইল।

প্রভাতে বালিকা দুটি ক্ষুৎ পিপাসাতুর হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অদূরে একটী সুন্দর নীল জলে কুমুদ-কহ্লার-বেষ্টিত পুষ্করণী দেখিয়া তাহার নিকটে যাইল। গিয়া দেখে কয়েকটি দেবকন্যার মত রমণী ঘট লইয়া 'ইতু পূজা' করিতেছে।

বালিকা দু'টি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। দয়ালু রমণীগণ তাহাদিগকে ইতুপূজার নৈবেদ্য খাইতে দিল ও একটী একটী ঘট দিয়া বলিল, "তোরা ভক্তি সহকারে 'ইতুপূজা' কর, ইতুঠাকুরণ তোদের দুঃখ দূর করিবেন।" বালিকা দু'টি সেই বনমধ্যে একান্ত ভক্তি সহকারে ইতুঠাকুরুণের পূজা করিতে লাগিল।

ভগবান দুঃখিনী বালিকা দু'টির করুণ প্রার্থনা শুনিলেন। একদিন সেই বনে দু'টি রাজপুত্ররা শিকার করিতে আসিয়া তাহাদের রূপে মুগ্ধ হইয়া বালিকা দু'টিকে বিয়ে করলেন।

পরদিন রাজ পুত্র দুইজন দেশে যাইবার উপক্রম করিলেন। বড় বালিকাটি রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে জেনে, সকালে উঠে নিজের বেশ ভূষা কর্‌তে লাগিল। কিন্তু ছোটটি সকালে স্নান করিয়া 'ইতুপূজা' করিয়া ইতুর ঘটটি কোলে করিয়া পাল্কীতে উঠিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিল। আর বড়টি নগণ্য ইতুর ঘটকে গ্রাহ্যও না করিয়া পাল্কী চড়িয়া দেমাগভরে শ্বশুর বাড়ী চলিল।

কিন্তু ভগবান বড়টির প্রতি বিরাগ হইলেন। সে যে দিক দিয়া শ্বশুর

বাড়ী চলিল, সে দিকে কেবল দুর্লক্ষণ দেখিতে লাগিল। কারো ঘর বাড়ী পুড়িতেছে, আর গৃহস্থ কাঁদিতেছে; কারোবা নয়নের মনি পুত্র ধন মারা যাইতেছে। কিন্তু ছোটটি যে দিক দিয়া যাইতে লাগিল; সে দিকে সবই আনন্দ সূচক; কারো বিবাহ হইতেছে, কারো পুত্রের অন্ন প্রাশন ইত্যাদি।

বড় বালিকাটির শীঘ্রই দুরদৃষ্ট হইল। এত যে রাজার রাজত্ব ঐ পাপিণীর বাতাসে সব উড়িয়া কোথায় গেল। আশ্চর্য্য কিছুই নহে যখন ভগবান বিরূপ হন তখন ঐরূপই হয়। শেষে উহারা এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল হইল। কে কোথায় অন্নের জন্য চলিয়া গেল। ঐ বালিকাটি অন্নের কষ্টে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তার ছোট ভগ্নীর নিকট গেল।

ছোটর কিন্তু দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুখে ঘর-কন্না করিতে লাগিল। ছোট বোনটি বড়র দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইল। বলিল, "দিদি, তুমি, 'ইতুঠাকুরুণের' প্রতি অগ্রাহ্য করেছিলে, পূজা কর্‌তে না, তাই তোমার অমন হয়েছে, তুমি আবার ভক্তি সহকারে 'ইতুপূজা' কর তুমি আবার সুখি হবে। বড়টি আবার ভক্তি সহকারে "ইতুপূজা" করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে যথার্থ ই বড়টি পুনরায় সুখী হইল। সেই রাজা অর্থশালী হইয়া খোঁজ করিয়া বড় বোনকে লইয়া গেল। তখন হইতে বড়টি আর ইতুঠাকুরুণের প্রতি অভক্তি করে নাই, আর রাজরাণী হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে নাই।

ইহাই ইতুপূজার শ্লোক। কি ভক্তির উৎস! ছোট ছোট বালিকাদের মনে ইহাতে কি দেব ভক্তির উদয় হয়। আমাদের বিশ্বাস এখনকার বালিকারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যত না জ্ঞান লাভ করে, একদিন তাদের দিদিমাদের নিকট এই শ্লোক শুনিলে বেশী উপকার হয়। পাঠকগণ বলিবেন, সামান্য ঘট পূজায় দেবতার প্রতি কি ভক্তি দেখান হয়? কিন্তু পূজার কথা ছাড়িয়া দিয়া বাল্যকালে ঐরূপ উপদেশ শুনিয়া তাহাদের হৃদয়ে কি জ্ঞানদায়ক হয় তাহা বিবেচনা করুন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। বালিকাদের এই হিসাবে ইতু ঘট পূজাও উপেক্ষার বিষয় নয়। 'কুলইচণ্ডীর পূজা' ও এইরূপ উপদেশ পূর্ণ শ্লোকে পূর্ণ।

পরিশেষে সহরবাসী পাঠকগণের নিকট নিবেদন, তাহারা সহরে বসিয়া পল্লীগ্রামের ভীষণ চিত্র ভাবেন, পল্লীগ্রাম এখনও ততদূর অধঃপতিত হয় নাই।

আরও একটা কথা বলা উচিত যে, সকল লেখকই পল্লীগ্রামের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে আমাদের কি উপকার হয় দেখা আবশ্যক। ঐ সকল চিত্র পাঠ করিয়া অনেক পল্লীগ্রামবাসী সহরে সুখের আশায় ছুটিতেছেন। আর পল্লীগ্রাম দিন দিন মনুষ্য হীন হইতেছেন। আমাদের বিবেচনায় ঐরূপ প্রবন্ধ পাঠে আমাদের অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছু হয় না। যদি প্রত্যেক পল্লীবাসী তাঁহার পল্লী কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকে পল্লীর উন্নতির জন্য মনোযোগ করেন; তবে নিশ্চয় পল্লীগ্রামে থাকিয়া তাঁহারা সুখী হইতে পারেন। পল্লীগ্রামে সুখের অন্ত নাই, পাঠকগণ তোমাদের ইচ্ছা থাকিলে, পল্লীগ্রামের আরও সুখ চিত্র অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

জনৈক পল্লীবাসী।

স্নেহ-উপহার।

মাগো!

ভূধর অম্বর, কানন কান্তার
তোমারই স্নেহেগড়া,
অনন্ত জলধি, নির্ঝর তটিনী,
তোমারি মমতা ভরা।

রবি, শশী, তারা, প্রভাত প্রাদোষ
তোমারি করুণাভাতি;
তোমারি প্রেমের আবেশে মোহিনী
শারদী চাঁদিমা রাতি।

বিহগ ঝঙ্কার ঢালেযে শ্রবণে
সদা সুমধুর প্রীতি,
সেত গো মাতারা, পবিত্র নির্ম্মল
তোমারি বন্দনা গীতি।

নীরদ অশনি, তিমিরা রজনী,
তোমারি স্নেহের দান;
জননী স্নেহের পূত উপহার
সুবিশাল ধরাখান।

দয়া স্নেহাধার পিতামাতা রূপে
আছ এ সংসারধাম;
তুমি প্রেমময় পতি দেবরূপে
প্রাণাধিক প্রাণারাম।

তুমিই জননি! ভ্রাতাও ভগিনী,
সুমধুর স্নেহধারা;
তুমি সখা সখী, প্রিয়তম পুত্র,
সকল সংসার তারা!

সম্পদের মোহে তোমা ভু'লে রই
তাইমা, যাতনা দিয়া,
ঘোর অবশতা মোহ ঘুম ভেঙ্গে
দাও জীবে জাগাইয়া।

সে নহে বেদনা; তোমার করুণা
স্নেহাশীষমা. তোমার!
যা'কিছু সংসারে সকলি মা তারা!
তব স্নেহ উপহার।

প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি রচয়িত্রী।

মন্দাকিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

করিমের ফাঁদ।

দুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক অঙ্গুরীর বিক্রয়ের কথা করিমের কর্ণগোচর হইল। করিম যথা সময়ে এ সংবাদ নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে জ্ঞাপন করিল, বলিল, জাঁহাপনা। আপনার আদেশে কাফের দুর্গাদাসের সর্ব্বস্ব বাজেআপ্ত হইবার কথা। হুজুর কেবল দয়া পরবশ হইয়া তাহার বাস্তব ভিটা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুর্গাদাসের সমস্ত সম্পত্তি বাজেআপ্ত হয় নাই। দুর্গাদাস এখনও অতুল ধনের অধিকারী। যে নবাবের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বহুমূল্য অলঙ্কারাদি গোপন করিয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি জগৎশেঠের নিকট একটী অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিয়া পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে।

করিমের ঔষধ ধরিল। নবাব সিরাজুদ্দৌলা এই সংবাদে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। করিমের কৌশলে নবাবের শ্রীমুখ হইতে এই আদেশ বাণী নিঃসৃত হইল যে, দুর্গাদাস রায়কে সপরিবারে মুর্শিদাবাদে বন্দী করিয়া আনয়ন করা হউক এবং তাহার পৈতৃক বাড়ী পর্য্যন্ত বাজেআপ্ত করা হউক। করিম ইহাই চাহিতেছিল, অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে করিম নবাবের অনুমতি স্বয়ং পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

একশত সৈন্যসহ করিম খাঁ দেবীপুরাভিমুখে প্রধাবিত হইল। সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী হইয়াছে। সায়াহ্নের ধূসর ছায়া তখনও বঙ্গের মুখাচ্ছন্ন করে নাই। বৃক্ষশিরে ভানুরশ্মী পতিত হওয়া পল্লবসমূহ রঞ্জতমণ্ডিত স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল। করিমের অনুগামী অশ্বারোহী সৈন্যগণের অস্ত্রাদি রৌদ্র কিরণে চাকচিক্যশালী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অশ্বের হ্রেষারবে, সৈন্যগণের অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দে প্রান্তর পার্শ্বস্থ পল্লী সমূহের নর নারী চকিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। করিম নীরবে সৈন্যগণসহ দেবীপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

দেবীপুরে নবাব সেনা যখন উপস্থিত হয়, তখন রজনী সমাগম হইয়াছিল। নবাব সৈন্যের আগমনে দেবীপুরের লোক সমূহ ত্রস্ত হইল। সকলেই ভাবিল

লাগিল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন? নবাব সেনা যখন দেবীপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন যে, দেবীপুরের সর্ব্বনাশ সাধন হইবে, তাহা অনুমান করিতে কাহারও বাকী রহিল না। সেকালে নবাব সেনাকে লোকে অত্যন্ত ভয় করিত।

যথা সময়ে সসৈন্য করিম দুর্গাদাস রায়ের দ্বার দেশে সমুপস্থিত হইল। দুর্গাদাস বাবু পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি অবৈধ রাজাজ্ঞা পালন করা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিলেন না, আত্ম রক্ষার্থ যত্নপরায়ণ হইলেন। দুর্গাদাস বাবুর বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত কতিপয় ভূতপূর্ব্ব অনুচর ও তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল। কমলা, লীলাবতী ও মাধবী ব্যতীত, দুর্গাদাস বাবুর বাটীতে সকলেই অস্ত্রাদি গ্রহণ করিল।

করিম দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারে সজোরে পদাঘাত করিলেন। করিমের পদাঘাতে সিংহদ্বার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। জনৈক অনুচর বাতায়ন-পথ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

করিম। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবের অনুমতি অনুসারে আমরা দুর্গাদাস রায়কে সপরিবারে বন্দী করিতে আসিয়াছি। শুদ্ধ ইহাই নহে—দুর্গাদাস রায়ের এই বাটী নবাব বাজেআপ্ত করিয়াছেন, সুতরাং এ বাটীতে দুর্গাদাস রায়ের আর অধিকার নাই।

করিমের কথা শুনিয়া দুর্গাদাস বাবু স্বয়ং বাতায়ন পথে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "যে রাজা প্রজার সুখান্বেষী নহেন, যিনি কুমন্ত্রীর পরামর্শে নিরপরাধ প্রজার পীড়ন করিয়া থাকেন, তিনি রাজা হইলেও—প্রজার শীর্ষস্থানীয় হইলেও প্রজাপীড়ক—প্রজার শত্রু। রাজার অবৈধ আদেশ পালন করিতে প্রজা বাধ্য নহে। স্বার্থপর নরপতি নরকের কীট সদৃশ। রাজা প্রজাপালক না হইয়া প্রজা নাশক হইলে সে রাজার বিরুদ্ধাচরণে পাপ নাই। সকল বিষয়েরই সীমা আছে—সুতরাং সহিষ্ণুতার সীমা থাকিবে বিস্ময়ের বিষয় কি? নবাব সিরাজুদ্দৌলা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আত্মীয় স্বজন, প্রকৃতিবর্গ প্রভৃতির অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে আমি নীরবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি—তখনও রাজভক্তি হীন হই নাই। কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যখন পীড়নের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন, যখন অত্যাচার অবমাননার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন কাপুরুষের ন্যায় আত্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত না হইয়া—রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা মহা পাপ বলিয়া

মনে করি। তুমি তাঁহাকে যাইয়া বল, তাঁহার এই অন্যায় আদেশ দুর্গাদাস রায় অবনত মস্তকে পালন করিতে প্রস্তুত নহে।"

ক। নবাবের অনুমতি লঙ্ঘন করে, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে এমন কেহ আছে বলিয়া জানি না। নবাবের আদেশ আমি এখনই পালন করিব, বলপূর্ব্বক তোমাকে পরিবারবর্গ-সহ বন্দী করিয়া লইয়া যাইব—বলপূর্ব্বক তোমার বাটী বাজেয়াপ্ত করিব। কাফেরের মুখে ধর্ম্ম কথা শোভা পায় না।

করিম খাঁর বাক্য অবসান হইতে না হইতে মুশলমান সেনা দুর্গাদাস রায়ের সিংহদ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দুর্গাদাস রায়ের পুত্রদ্বয় ও দশজন অনুচরসহ দ্বারদেশের ভিতরে সমুপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুশলমানেরা দুর্গাদাস বাবুর দ্বার ভগ্ন করিল। তখন পিপীলিকা শ্রেণীবৎ মুশলমান সেনা ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু দুর্গাদাস বাবু সদলে তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। উভয়দলে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্গাদাস বাবু ও তাঁহার পুত্রদ্বয় বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। দুর্গাদাস বাবু পূর্ব্বাপর করিমকে আক্রমণ করিবার সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। মুসলমান সৈন্যব্যূহ অতিক্রম করিয়া তিনি করিমের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। করিম অশ্বারোহণে দুর্গাদাস রায় ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। দুর্গাদাস বাবুর তরবারির আঘাতে করিমের ঘোটক ধরাতলশায়ী হইল। করিম অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। দুর্গাদাস বাবু করিম খাঁকে সম্মুখে পাইয়া সিংহ বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। করিম ও শস্ত্র বিদ্যায় সামান্য পারদর্শী ছিলেন না। উভয়ের উভয়ের বিনাশ সাধনে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে দুর্গাদাস রায়ের চেষ্টা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। করিমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া দুর্গাদাস বাবু তরবারি উত্তোলন করিলেন। নিমেষ মধ্যে তাহা করিমের মস্তকোপরি পতিত হইয়া দ্বিখণ্ডিত করিবে, করিমের অস্তিত্ব ইহজগত হইতে বিলুপ্ত হইবে, করিমের আর নিস্তার নাই। ঠিক সেই সময়ে করিমের আশু বিপৎ দেখিয়া এক মুশলমান সুবেদার দুর্গাদস বাবুর হস্তে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্গাদাস বাবুর হস্ত হইতে তরবারি পতিত হইল। তখনই কয়েক জন মুশলমান সৈন্য আসিয়া দুর্গাদাস বাবুকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিলেও তাহারা বন্দী হইল।

দুর্গাদাসের ধীরেন্দ্র গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। দুর্গাদাস রায়ের অনুচর বৃন্দের মধ্যে কয়েক জন নিহত ও আহত হইল বাকী কয়েক জন পলায়ন করিল। আদেশ ক্রমে কমলা, লীলাবতী ও মাধবীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করা হইল। দুর্গাদাস রায়ের সেই প্রকাণ্ড পুরী জনশূন্য হইল। ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সংবাদ।

পশ্চিম বঙ্গের ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার গত ১লা ডিসেম্বর বেলভেডীয়ার মসনদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন।—শিবাস্তে প্রস্থানঃ।

মেদিনীপুরের বোমার মামলার আসামী সুরেন্দ্র, সন্তোষ ও যোগজীবনের মামলা শেষ হইয়াছে। গত ৩০ শে নবেম্বর মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রিড তিন জন আসামীকেই দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভুতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এডভোকেট জেনারেল হইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাগর পারে না গিয়াই ব্যারিষ্টারের অধিকার লাভ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ গার্থ কলিকাতায় আসিয়াছেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন।

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত বারালতা গ্রামে সম্প্রতি একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া অকুস্থলে আপতিত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ-দর্শীগণ বলিয়াছেন যে, দস্যুরা ভদ্র সন্তান। পুলিশ দস্যু দলের তদন্ত করিতেছে।

ঢাকার অস্থায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেনের এজলাসে, বারড়ার ডাকাতি ব্যাপারে সংসৃষ্ট সন্দেহে অভিযুক্ত আসামীগণের বিচার চলিতেছে। সাক্ষীরা একখানি নৌকা সনাক্ত করিয়া বলিয়াছে যে, সেই খানিই দস্যুদের নৌকা। ত্রিশ জন সাক্ষী নৌকা সনাক্ত করিয়াছে। মামলা এখনও বিচারাধীন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

২৪ শে ডিসেম্বর তারিখে মহীশূরের মহারাজ, যুবরাজ ও কতিপয় পারিষদের সহিত জাপান যাত্রা করিতেছেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় পদত্যাগ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ সারদা বাবুর কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিলেন না। দেশের এই দুঃসময়ে সারদাবাবুর ন্যায় সুদক্ষ, নিরপেক্ষ বিচক্ষণ বিচারপতির পদত্যাগে কলিকাতা হাইকোর্টের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

১১ই ডিসেম্বর তারে সংবাদ আসিয়াছে, নাগপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, আগামি ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত নাগপুরের মধ্যে কোন ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সভা সমিতির অধিবেশন হইতে পারিবে না। নাগপুরে এই সময়েই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা ছিল তাহাও রহিত হইয়াছে।

শুনা যায় শ্রীযুক্ত কেয়ার হার্ডীর প্রশ্নের উত্তরে, সহকারী ভারতসচিব শ্রীযুক্ত বুকানন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, যে মেদিনীপুরের বোমার মকর্দ্দমার বিচার শেষ হইলে, পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সত্য কিনা, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

এলাহাবাদের দায়রার জজ শ্রীযুক্ত রত্তমজী রাজবিদ্রোহের অপরাধে 'স্বরাজ্যের' সম্পাদক শ্রীরাম হরিকে সাত বৎসর নির্ব্বাসণ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রাউন ও সিম্পসন, ভারত সচিব লর্ড মরলের আদেশে ব্রহ্মদেশে মৌক্তিক-শুক্তির অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। মরগুই দীপ পুঞ্জ ও মস্‌মাস্‌ দীপের নিকটে মৌক্তিক-শুক্তি পাওয়া গিয়াছে।

সার ফ্রেডরিক নিকলসন কোচীনের "ব্যাক্‌ওয়াটারে" মুক্তাপ্রসূ-শুক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

যে সকল মহাত্মাগণ হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় কল্পে জীবন পাত করিয়া এই বিনশ্বর জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন, দয়ানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। এই মহাত্মা আজীবন হিন্দুধর্ম্মের অবনতিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন ও তাহার প্রণষ্ট গরিমা পুনরুদ্ধার মানসে সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দমনীয় বাধা বিঘ্নের সহিত সিংহ-বিক্রমে সংগ্রাম করিয়া স্বীয় মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, কি ধর্ম্মবলে, কি বৈরাগ্যে, কি অসাধারণ পাণ্ডিত্যে, কি বেদাদি আর্যগ্রন্থ ব্যাখ্যা কার্য্যে, দয়ানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী অসাধারণ পুরুষ ছিলেন।

গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার বিভাগের মর্ভিনগরে বা তৎসন্নিহিত কোন পল্লীতে সম্বতের ১৮৮১ অব্দে দয়ানন্দ জন্ম পরিগ্রহ করেন। অনেকে মনে করেন, বাল্যকালে দয়ানন্দ মূলশঙ্কর নামে অভিহিত হইতেন। দয়ানন্দের পিতা একজন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার শৈশবকাল হইতেই যেরূপ বিদ্যানুরাগ ছিল, তিনি আবার তদ্রূপ অসাধারণ মেধাবীও ছিলেন। এই জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সমস্ত যজুর্ব্বেদে ব্যুৎপন্ন ও শব্দরূপাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। ভবিষ্যতে যেই বীরবালক, আর্য্যধর্ম্ম প্রচাররূপ মহৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইবেন, বাল্যকাল হইতেই তাহার সুচিহ্ন সমূহ তদীয় হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু কোনও একটী ঘটনা বিশেষে সেই বৈরাগ্য শতগুণে প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং অবশেষে তাঁহাকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তদীয় জীবনব্রত সমুদ্‌-যাপনে ব্রতী করে। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক, সুলেখক সুধীবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দয়ানন্দ চরিত প্রণয়ণ করিয়া অস্মদ্দেশের একটী বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। যাঁহা-দের ধর্ম্মবিষয়ে ও হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি অনুশীলনে অনুরাগ আছে তাঁহাদের সেই লিপিচাতুর্য্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। সেই গ্রন্থে স্বয়ং দয়ানন্দের মুখবিবরিত অংশ হইতে, তদীয় বৈরাগ্য ও গৃহত্যাগ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। দয়ানন্দ বলিয়া গিয়াছেন "আমাদিগের গৃহে একবার ঘটনা বিশেষ উপলক্ষে নৃত্যগীত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে আমার একজন সহোদরা সাংঘাতিক রূপে পীড়িতা হয়। আমি পীড়ার সংবাদ

শুনিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি কখন কোন লোককে মৃত্যুযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে দেখি নাই। ফলতঃ আমি সেই সহোদরার আসন্নদশা দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইলাম, এবং মনুষ্য মাত্রকেই যে এইরূপে মরিতে হইবে তাহাও উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিলাম। * * * * যখন নবম বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলাম, তখন পিতামহ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। * * * * * পিতামহের বিয়োগে হৃদয়ে যেমন ব্যথা পাইলাম, চক্ষু দুটিকেও তেমনই অশ্রুজলে ভাসাইলাম। অধিকন্তু আমিও যে একদিন এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইব, এই চিন্তাটীও, সেইক্ষণ হইতেই চিত্তকে বিশেষ করিয়া অধিকার করিল। মৃত্যু-ভীতি যখনই প্রবলতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইত, আমি তখনই বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিতাম। আমার কথা শুনিয়া পণ্ডিতেরা যোগাভ্যাসের পরামর্শ দিতেন। তন্নিমিত্ত সংসার ত্যাগের ইচ্ছা করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। পিতা আমার মানসিক অশান্তির কথা বুঝিতে পারিয়া, বোধ হয় তাহা বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়েই, আমাকে জমিদারী কার্য্যের ভারার্পণ করিতে চাহিলেন। আমি সে ভার লইতে সম্মত হইলাম না। তখন পাছে আমি বিপথ-গামী হইয়া যাই, এই ভয়ে পিতা আমার বিবাহ দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। এদিকে বিবাহের কথা যখনই উঠিত, আমি তখনই বলিতাম যে বিবাহ কিছুতেই করিব না। আত্মীয় স্বজনগণ এরূপ সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতেন না। বিবাহের জন্য যখনই বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইতাম, বিবাহের পরিবর্ত্তে তখনই বন্ধু মিত্রদিগের নিকট গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার অনুমতি চাহিতাম। ফলতঃ দেখিতে দেখিতে এদিকে বিবাহোপযোগী সমস্ত আয়োজন এক মাসের মধ্যেই হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে আর কালবিলম্ব করা উচিত নয় বিবেচনা করিলাম। জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি বলিয়া একদিবস শায়ংকালে মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলাম এবং তদ্দণ্ডেই সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া গৃহের বাহির হইলাম।" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "দয়ানন্দচরিত" ও তাহার সম্পাদিত "দয়ানন্দের স্বরচিত জীবন বৃত্ত।"

এইরূপে দয়ানন্দ পার্থিব ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয়স্বজন ও সংসারের অকিঞ্চিৎকরী মায়া তৃণবৎ বর্জ্জন করিয়া, এবং অপরিহার্য্য মৃত্যুকবল

হইতে আপনাকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিবার মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, জগৎপাতা পরমপুরুষ মহান্ ভগবানের সাক্ষাৎকার করিতে প্রস্থান করিলেন। তারপরে, কত কঠোর পরিশ্রম, কত আত্মবিসর্জ্জন, কিরূপ নির্ভীক অবিচলিত সাধনা ও দুর্দ্দমনীয় পুরুষকার প্রভাবে তিনি সিদ্ধ হয়েন, বহুকাল-পোষিত আশার সাফল্য সাধন করেন, জীবনের স্পৃহনীয় মহান্ ব্রতের সম্যক্ উদ্‌যাপন করেন, তাহা অলৌকিক, তাহা বিস্ময়কর, তাহা অবগত হইলে ভয়ে, বিস্ময়ে ও চমৎকারিতায় অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "দয়ানন্দের, স্বরচিত জীবন বৃত্ত" পুস্তকে তাহা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতই, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহোদয়, দয়ানন্দ স্বামীর এইরূপ অলৌকিক বিষয়-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-পিপাসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এইরূপ কঠোর স্বার্থত্যাগ এবং এইরূপ দুশ্চর ব্রত পালনে তাঁহার প্রকৃতি উন্নত, তাঁহার দৃঢ়তা অবিচলিত এবং তাঁহার মহীয়সী ধর্ম্মনিষ্ঠা অপ্রতিহত রহিয়াছিল। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য চারিদিন একবিন্দু জল পান না করিয়া ও অবিচলিত হৃদয়ে ভীতিপ্রদ দুর্গম মরুভূমি অতিবাহন করিয়াছিলেন। দয়ানন্দও এক এক দিন ক্ষুৎ-পিপাসায় অবসন্ন হইয়াও হিমগিরির দুর্গম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যোগীদিগের আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। এই সময়ে এক এক খণ্ড বরফ মাত্র তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন হইয়াছিল। দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যে আত্ম-সংযত এবং সর্ব্ব প্রকার অনাসক্ত ভাবে অবিচলিত না হইলে যে, মহাপুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি চরিতের ন্যায় দয়ানন্দ চরিত ও তাহার সমর্থন করিতেছে।"

দয়ানন্দ হিন্দুধর্ম্মের জন্য কি করিয়াছেন? তিনি আর্য্য সমাজ স্থাপন করিয়া বেদাদি আর্ষগ্রন্থের আলোচনা ও বিস্তৃতি পথ মুক্ত করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষময় ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বেদের মহিমা বিঘোষিত ও সুব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি, বিহার, বঙ্গ, পঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি যে স্থানেই গমন করিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে আপ্তবাণী বেদের প্রাধান্য ঘোষণা ও অদ্বিতীয়তা প্রমাণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে মহীয়ান্ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র পণ্ডিত ও বিদ্বৎ-মণ্ডলী মধ্যে বেদপাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র পারগতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া জয়মাল্য লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দুশাস্ত্র ও ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করেন। সায়ণ মহীধরাদি

আধুনিক ভাষ্য কর্ত্তাদিগের ভাষ্য বিখণ্ডিত করিয়া বেদের ভাষ্য প্রচার করিলেন। গোকুলের কল্যাণের নিমিত্ত গোরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদূর-দর্শিতার পরিচয় দেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের অশেষ হিতসাধক কার্য্য সম্পাদন করিয়া, হিন্দুধর্ম্মকে যশোবিমণ্ডিত করিয়া, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মচারী, বেদ-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এ অক্টোবর তারিখে দেওয়ালীর দিবসে দেহান্তলাভ করিলেন।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অধর্ম্ম কর্ত্তৃক উপদ্রুত বেদের উদ্ধার মানসে দয়ানন্দের অসাধারণ সাধনা ও অবিচলিত চেষ্টার বিষয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে, ভগবানোক্ত গীতাবাক্য সংপূরণার্থই তদীয় শক্তিরূপে দয়ানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সত্যটী প্রোজ্জ্বলভাবে মনে জাগরূক হয়।

জনৈক বঙ্গবাসী।

জ্বালা।

আমি হৃদয়ের মাঝে লুকা'য়ে রেখেছি,
যতেক মরম বেদনা;
হায়! কে আছে আমার, কেই বা শুনিবে,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় যাতনা!
আমি কত আশা ধরি এ হৃদয় মাঝে,
(তার) কতই বা কহিব কথা!
তাই কা'রেও কহিনা, কেহ নাহি শুনে,
আমার হৃদয়ের ব্যথা।
আমি শান্তির আশায় ছুটিতেছি শুধু,
শান্তিরও নাহিক দেখা,
হায়! সাধ না মিটিল, জ্বালা না ঘুচিল,
এ কাঁদা হ'ল শুধু মাথা!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

প্রাচীন ভারতে মুসলমান আক্রমণ।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে—যৎকালে খালিফা ওমার বোগ্‌দাদের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, সেই সময়েই মুসলমানগণ সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে আপতিত হয়। গুর্জ্জর ও সিন্ধুরাজ্যই তখন ভারতের প্রধান বাণিজ্য স্থল ছিল। উক্ত দুইটী সমৃদ্ধরাজ্যের পণ্যদ্রব্য হস্তগত করিবার জন্য খালিফা ওমার সুপ্রসিদ্ধ টাইগ্রেস নদের মোহানাদেশে বসোরা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদির সমৃদ্ধতা-দর্শনে খালিফার দুরাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে সে দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। যে স্বর্ণপ্রসূ ভূমিতে সেরূপ বহুমূল্য রত্ন ও পণ্যদ্রব্যরাজি উদ্ভূত হয়, তাহা দেখিবার জন্য এবং তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আবুল আয়েষ নামক সেনাপতির অধিনেতৃত্বে একটী বিশাল বাহিনী ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইল। আবুল আয়েষ আপনার সেনাদল লইয়া সিন্ধুরাজ্যে আপতিত হইল।

কিন্তু ভারতের আর্য্য সন্তানগণের বীর বিক্রম তখনও পর্য্যবসিত হয় নাই। ম্লেচ্ছগণের দুর্ব্বৃত্ততা-নিবন্ধন অল্পকাল মধ্যে আরোর নামক ক্ষেত্রে সেই আর্য্য-বিক্রম-বহ্নি প্রচণ্ড তেজে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল; দর্পান্ধ খালিফা—সেনাপতি আয়েষ তাহাতে তৃণবৎ বিদগ্ধ হইয়া আশা পিপাসার শান্তি বিধান করিল। কিন্তু তাহাতেও খালিফাগণের দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি কিছুমাত্রও প্রশমিত হইল না। ওমারের পরলোক গমনে খালিফা ওসমান তৎসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ওসমান বোগ্‌দাদের রাজাসনে সমারূঢ় হইয়াই ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য একটী বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। সিংহাসনারোহনের অল্পকাল পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। খালিফা ওসমানের, মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা ঘটনাস্রোতের ঘোরতর আবর্ত্তে পতিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমনের আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর খালিফা আবদুল মোলেক ও খোরাসানের অধিপতি ইয়াজিদের শাসন সময়ে ভারতবর্ষ বিজয়ের উদ্যোগ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে উদ্যোগ সফল হয় নাই। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল; ক্রমে বিধিলিপির অবশ্যম্ভাবী লিখনানুসারে ভারতের কঠোর

ভবিতব্যতার নির্দ্দিষ্ট সময় কাল বিভাবরীরূপে ধীরে ধীরে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সকল ঘটনার পর খালিফা ওয়ালিদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াই তিনি বিশাল সেনাদল সমভি-ব্যাহারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। সেই বিশাল বাহিনীর গতিরোধ করিতে কেহই সক্ষম হইল না; ক্রমে সিন্ধু রাজ্যের সন্নিহিত কতিপয় জনপদ খালিফা ওয়ালিদের হস্তগত হইল।

ইতিহাসে এই সময় মুসলমান বীরগণের পক্ষে স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই সময় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মণ্ডলের দুইটী বিশাল রাজ্য দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানদিগের জলন্ত বিক্রমে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল।—এদিকে সিন্ধু নদের সৈকতশায়ী দেবিলাধিপতি দাহিররাজের অধঃপতনের সহিত ভারতের সর্ব্ব-নাশের সূচনা হইল;—অপর দিকে সম্রাট রডারিক্ রণস্থলে পতিত হইয়া আপনার বিপুল আন্দালুষরাজ্য ও গথরাজকুলের পর্য্যবসান সাধন করিলেন। এই উভয় ভয়াবহ ঘটনাই মুসলমান বিক্রমের অক্ষয় ও জীবন নিদর্শন স্বরূপ জগতের ইতিহাসে শোনিতাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

৭১৮ খৃষ্টাব্দে খালিফা ওয়ালিদের সেনাপতি মহম্মদবীন্ কাসিম সিন্ধুরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দেশবৈরীর করাল গ্রাস হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য সিন্ধুরাজদাহির ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রণক্ষেত্রে বীরোচিত বিক্রম প্রদর্শন করিয়া রাজা দাহির মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। বিজয়ী বীন-কাসিম অর্জ্জিত ও লুণ্ঠিত সামগ্রীর সহিত ক্ষত্রিয় রাজ দাহিরের দুইটী লাবণ্যবতী দুহিতাকে খালিফার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুই ক্ষত্রিয় কুমারী হই-তেই সেনাপতি মহম্মদ-বীন-কাসিমের সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছিল।

আইন আকবরি ও ফেরিস্তা গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সেই দুই রমণীর দামাস্কাশ-নগরে নীতা হইলে খালিফা তাহাদের অনুপম রূপলাবণ্যের বিষয় শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার জয়োল্লাসিত হৃদয় আরও দ্বিগুণতর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই দুই সুন্দরী রমণীর অপ্রমেয় লাবণ্যরাশি উপভোগ করি-বার জন্য তাঁহার হৃদয়ে পাপ-তৃষার উদয় হইল। প্রমোদ ভবনে গমন পূর্ব্বক খালিফা জ্যেষ্ঠা রাজনন্দিনীকে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করি-লেন। আদেশ অচিরে পরি পালিত হইল! পবিত্র ক্ষত্রিয় কুলের কমলিনী কামোন্মত্ত বারণসদৃশ নির্দ্দয় যবনের সম্মুখে নীতা হইলেন!—নিঃসহায়া—

নিয়াশ্রয়া—অনাথিনী] রাজপুতরমণী পাপ ম্লেচ্ছের বিলাসসম্ভোগ্যা হইবার জন্য কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরিতা হইলেন।

জেষ্ঠা রাজনন্দিনী ম্লেচ্ছ গ্রাস হইতে আপনার পবিত্রতম সতীত্বরত্ন রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

জ্যেষ্ঠা রাজনন্দিনী যবনরাজের সম্মুখে নীত হইবামাত্র রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—জাঁহাপনা! আমাকে স্পর্শ করিবেন না। এ দেহ আপনার করস্পর্শের যোগ্য নহে! আপনার সেনাপতি দুর্ম্মতি বীন কাসিম বলপ্রয়োগে ইতিপূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে।"

এই বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র খালিফার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন,—"কাসিমকে জীবিতাবস্থায় দুর্গন্ধময় আমচর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া অবিলম্বে রাজধানীতে আনয়ন করা হউক।"

খালিফার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। হতভাগ্য কাসিম খালিফার রোষানলে পতিত হইয়া আপনার জীবন ও বিজয়গৌরব আহুতি প্রদান করিল! পবিত্র হৃদয়-রাজপুতসতী কৌশল করিয়া আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। প্রবল প্রতাপ খালিফা বাহাদুর সে কৌশল ভেদ করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার শত বৎসর পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ হারুণ-উল রসিদ বোগদাদের সিংহাসনে আরোহন করেন। কাল ক্রমে তিনি আপন পুত্রগণের মধ্যে নিজ রাজ্য ভাগ করিয়া দিবার সময় দ্বিতীয় পুত্র আলমামুনের হস্তে খোরাসন, জাবালিস্থান, কাবুলিস্থান ও সিন্ধু প্রদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন। হারুণ উল-রসিদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু কনিষ্ঠ আলমামুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হন। ইনি ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর সমসময়েই মহারাজ খোমান চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। সম্রাট আলমামুন একদা বিরাটবাহিনী লইয়া চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। মহারাজ খোমান তাঁহাকে পরাস্ত ও বিদূরিত করিয়া দেন।

উক্ত ঘটনার পরবর্ত্তী বিংশতি বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নাই। সেই সময় হইতেই তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাপ ক্রমে ক্রমে হীনতেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের যে সমস্ত প্রদেশ তাহারা অধি-

কার করিতে পারিয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র সিন্ধু ভিন্ন আর আর সমস্ত রাজ্যই ক্রমে ক্রমে তাহাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। ৮৫০ খৃষ্টাব্দে হারুণ-উল-রসিদের পৌত্র মোতাবেকেল বোগ্‌দাদের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পিতৃপুরুষগণের প্রাচীন-রাজ্য ক্ষয়িতমূল জীর্ণ শালতরুর ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে ইহার আভ্যন্তরীন বলবীর্য্য একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় প্রাচীন বোগ্‌দাদ রাজ্যের যে শোচনীয় অধঃপতন হইল, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে বোগ্‌দাদের খালিফাগণের বীর-বিক্রমে একদা ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ড বিলোড়িত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় প্রকাশ্যস্থলে বিক্রীত হইল। যিনি উচ্চতম পণদানে সক্ষম, তিনিই তাহা ক্রয় করিতে পারিলেন।

যে দিন বোগ্‌দাদ রাজ্যের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতম হইল, সেইদিন ভারতের সহিত খালিফাকুলের সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।—সেই দিন ভারতভূমি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণের ভীম পদাঘাত হইতে কিছু কালের জন্য নিস্তার পাইল।

৯৭৫ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্ত্তা সবক্তিগি সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর ইহাঁর পুত্র মামুদ বিশাল বাহিনী লইয়া ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেন। মামুদ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। মামুদের বিজয়ী সৈনিকগণ কৃপাণ ও কোরাণ হস্তে যমদূতের ন্যায় বার বার ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া নিষ্ঠুরতা ও কঠোর হৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। মামুদের দ্বাদশ আক্রমণে ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে আজিও হৃদয় শোকাবেগে আকুলিত হইয়া উঠে।

হিজিরা প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত খালিফাগণের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের যে বিস্তর সম্বন্ধের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই প্রদত্ত হইল। সুলতান মামুদের আক্রমণের পর যে সকল মুসলমান বিজেতা ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন; সুতরাং তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীমণিলাল বন্দোপাধ্যায়।

কাঁদ?

১

কাঁদ—কাঁদ—কাঁদ—কাঁদিয়া বুক ভাসাও, অশ্রুপ্রবাহে হৃদয় প্লাবিত কর, কেহ তোমার দুঃখে দুঃখিত হইবে না,—কেহ তোমার অশ্রু মুছাইবে না,—কেহ তোমার বিদগ্ধ হৃদয়-মরুতে শান্তি-বারি ঢালিবার জন্য অগ্রসর হইবে না, কেহ, তোমার যাহাতে একটু দুঃখের হ্রাস হয় সে চেষ্টাও করিবে না,—তুমি কেবলি কাঁদ,—নীরবে, নির্জ্জনে, প্রকৃতির অশান্তির ক্রোড়ে বসিয়া দিবানিশি নিজ দুঃখময়ী অদৃষ্টদেবীর কঠোর কষাঘাতে জরজরিত হও, কেহ একবার তোমার দিকে শান্তিময় করুণ দৃষ্টিতে চাহিবে না,—তোমার মর্ম্মব্যথা বুঝিবে না,—তোমার এই যাতনাময়ী হৃদয়ের দারুণ রুদ্ধ তৃষা লইয়া কেহ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে সে জ্বালামুখী হৃদয় স্রোত প্রবাহিত করিবে না। যাহার জন্য তোমার হৃদয়ে বিষাদের দারুণ ঝঞ্ঝাবাত রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে,—যাহার জন্য তোমার এক একটি দীর্ঘশ্বাসে ঊনপঞ্চশত পবনের আবির্ভাব হইয়া হৃদয়ের সকল সুখশান্তি অনন্তের পথে বিদায় দিতেছে;—যাহার জন্য শান্তি-হৃদয়ে অশান্তির কালকুট ঢালিয়া তোমার হৃদয়কে বিষময় করিয়াছে, তাহার ব্যথা তুমি ছাড়া এ সংসারে আর কেহ বুঝিবে না। কেন না তুমি যে স্নেহ, সুখ হারা!

কাঁদিলে কি হইবে?—যে কাঁদে সে যদি বুঝিত বা জানিত যে কাঁদিলে কি হ'বে। তাহা হইলে সে কাঁদিবে কেন? কাঁদিলে, হৃদয় বেগ প্রশমিত হয়, তাই লোকের যখন কোন মর্ম্মান্তিক হৃদয় যন্ত্রনা উপস্থিত হয়,—তখনি সে কাঁদে;—কাঁদিলে যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না,—কিম্বা যাহার জন্য কাঁদ,—সে তোমার কান্না শুনিয়া তোমার অশ্রু মুছাইতে আসে না, কিম্বা তোমার শূন্য হৃদয় আবার পূর্ণ করিয়া দেয় না;—অথবা তোমার অশান্তি বালুকা প্রবাহিত মরুমরীচিকায় শান্তি-ছায়া বিতরণ করিবে না। এ কান্না যে তোমার করুণ হৃদয়ের বিষাদ রাগিণী ঝঙ্কার এবং "হারাধন" পাইবার নিষ্ফল, ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

২

প্রকৃতি অনেক ফিরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যাহা যায় তাহা আর তোমার মানস মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার শোকাপনোদন করিতে পারে না। তাই বলি আর যাহা পাওয়া যাইবে না তাহার জন্য বৃথা শোক

করিয়া কি হইবে ?—অশেষ যন্ত্রণা পাও—নিজ দেহ শূন্য করিয়া তোমার প্রাণপাখীকে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায়—তোমার বাঞ্ছিত ধনের অনুসন্ধানে শূন্য পথে প্রয়াণ কর, তথাপি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না! তাই বলি আর কাঁদিলে কি হ'বে ;—মুছ, অশ্রু মুছ,—হৃদয় বেগ সংবরণ কর, যাতনা-দগ্ধ হৃদয়ে পুনঃ শান্তি সংস্থাপন কর, নিরাশার পাষাণ দূরে ফেলিয়া আশার পাষাণে বুক বাঁধ! প্রাণের গভীর মর্ম্মব্যথা দারুণ অসহ্য হইলেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাহা সহ্য কর, অমন আকুল নয়ানে,—তৃষিত পরাণে অধৈর্য্য ভাবে কেবল হাহাকার করিয়া কাঁদিলে কি হইবে। কত পুত্র হারা অভাগী জননী সারাদিন পরিশ্রমের পরে—যখন নীরব নিশার শান্তিময় ক্রোড়ে সুখ-শয্যা রচনা করে, তখন পার্শ্বে আপন পুত্রের স্থান শূন্য দেখিয়া আকুল প্রাণে, হতাশ ভাবে কতই কাঁদে ;—তাই বলিয়া কি সে তাহার পুত্রের স্থান পূর্ণ করিতে পারে ?—কত অভাগিনী দিবসের গৃহ কর্ম্মের পর রাত্রিতে আপন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিরহ শয্যা পাতিয়া নিজ নিজ স্বামীর স্থান শূন্য দেখিয়া হতাশে আকুল প্রাণে সারা নিশা যাতনা-কীট-দষ্ট হৃদয়খানি উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া বিরহ শয়নে জাগিয়া কাটায়,—তাই বলিয়া কি সে তাহার প্রাণের আরাধ্য দেবকে দর্শন করিতে পায় ?—তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন? যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইবে না ;—তাই বলি আর কাঁদিলে কি হইবে। নীরবে আপন প্রাণের ব্যথা আপনার অন্তরে জড়াইয়া নিভৃতে আপন অদৃষ্ট দেবীর কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া প্রতিনিয়ত কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হও! জীবন এক দিন না এক দিন যাইবেই যাইবে। "মোহমুদ্গরের" কবি বলিয়াছেন :—

"নলিনীদলগত জলবৎ তরলম্।
তদ্বৎ জীবনম্ অতিশয় চপলম্॥"

৩

এ জগত মাঝে তোমার দুঃখে দুঃখ করিবার কেহই নাই, তোমার জীবন-ব্যাপী ঘন ঘোর অন্ধকারে আলো বিকীর্ণ করিবার জন্য কেহই এই সংসার পথে—তোমার পথের পথিক হইয়া অগ্রসর হইবে না,—যতই কেন বিপদ হউক না—সকলি তোমাকে অকাতরে বুক পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে। তাহাতে ধীরতা স্থিরতা এবং অধ্যবসায় চাই!

এই জগত মাঝে, কতশত দীন দরিদ্র আছে,—তাহারাও শমনের আশীর্ব্বাদে মর্ম্মব্যথাপূর্ণ ভগ্ন হৃদয়খানি উভয় হস্তে চাপিয়া, অজস্র আঁখিবারি

ঢালিয়া তোমার ন্যায় হৃদয়ের উদ্দামবেগ নিবৃত্তি করিবার জন্য সচেষ্ট,—কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারাও তোমার ন্যায় কাঁদিয়া অস্থির?—

যখন কাঁদিতে আসিয়াছি, তখন হাসিব কেন?—যে কাঁদিয়া সুখী হয় সে কি হাসিতে চায়?—তুমি জান না যাতনা আমার প্রিয়তমা পত্নী, নিরাশা আমার স্নেহের ভগ্নী! এবং দুঃখ আমার শৈশবের আশ্রয় দাত্রী জননী। আমি আজন্ম এই দুঃখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া নয়ন জলে প্রতিবর্দ্ধিত! আমি কাঁদিব নাত আর কে কাঁদিবে?

পার্শ্বস্থিত মহীরুহের শাখা প্রশাখায় আমি আজন্ম সুখ-সূর্য্যের মুখ দেখি নাই—যে একটু সুখ-সূর্য্যের কিরণ,—শাখা, প্রশাখার অন্তরাল দিয়া আমার নয়ন পথের পথিক হইয়াছিল,—তাহাও জীবনের তাপদগ্ধ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে নিভিয়া গিয়াছে!

কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন জল ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন কাঁদিতে গেলে, হৃদয়ের দুই বিন্দু রক্ত অশ্রুরূপে পরিণত হইয়া নয়ন কোণ হইতে গড়াইয়া গণ্ড বহিয়া প্রবাহিত হয়। তাই কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না
বুক ভেঙ্গে ফেটে যায় মা!"

তাই যদি তবে হে বিশ্ব নিয়ন্তা আমার জীবনের অবসান কর। আমি যাতনার শেষ চাহিনা—জীবনের শেষ চাই। আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশ্রু!

কেন অশ্রু অবিরল, দগ্ধ হৃদি'পর,—
পড়িস্, বহিয়া; আমি, নিবারিব স্নেহ,
হেমন্ত-শিশির সম, কাঁদি নিরন্তর,
মেঘাবৃত শশী-ছায়া, মাখিয়াছে দেহ!
কে আর মুছাবে মোর নয়নের ধারা,
আমিরে জগত মাঝে স্নেহ, সুখ, হারা!
নিরাশ-পাষাণ বাঁধে বেঁধেছি এ হিয়া,
আশার প্রদীপ মোর, দিবা-দ্বিপ্রহরে,
হতাশের ঝঞ্ঝাবাতে গিয়াছেনিভিয়া,
ঘন ঘোর অন্ধকারে গেছে হৃদি ভ'রে!
থেমে গেছে হৃদয়ের;—মলয় হিল্লোল,
আর না জাগিবে সেথা, আনন্দ-কল্লোল!

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমণী-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নৌকা।

পাইকদ্বয়ের পতন ও তাহাদের অর্দ্ধস্ফুট কথা শুনিয়া আমোদ-প্রিয় রাজা নিমাইনারায়ণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, নিকটস্থ সকলেই মৃদু হাস্য করিল,—এমন কি মহা বিপন্ন বিষন্নচিত্ত রামরূপ শর্ম্মাও এ দৃশ্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার ওষ্ঠেও হাস্য দেখা দিল।

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেয়াই—তোমার সৌভাগ্য ভাল,—টাকাশুদ্ধ ব্যাগ আপনি ফেরত আসিয়াছে,—আবার এই দেখ তোমার নৌকাও বুঝি ফেরত আসিল।"

তাহার পর তিনি পাইক দ্বয়ের দিকে ফিরিলেন। তাহারা অপ্রস্তুত ভাবে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতেছিল। নিমাইনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু,—এমন মর্ম্মান্তিক দৌড়াইবার মানে কি—"

উভয়েই একত্রে সমস্বরে বলিল, "হুজুর—নায়েব—"

"বাপু, যা হয়েছে,—একজনে বল।"

"হুজুর,—নায়েব মশায়—"

"জানি নায়েব মশায়,—তিনি তোমাদের একখানা নৌকা খুঁজিতে পাঠিয়েছিলেন,—বেশ নৌকা পেয়েছ?"

"হুজুর—"

"ফের হুজুর—হুজুর করে,—বেলা মাথায় চড়ল—এখনও স্নান আহার হল না। কি হয়েছে,—তাই বল,—বাজে কথা নয়!"

"সে নৌকা পাওয়া গেছে।"

"বেস,—তারপর,—কোথায় পাওয়া গেছে।"

"সামপুরের ঘাটে,—নৌকাখানা এমনই এমনই ভেসে যাচ্ছিল।"

"এমনই এমনই ভেসে যাচ্ছিল,—সে কিরে বেটা।"

হাঁ—হুজুর নৌকায় কোন লোক জন ছিল না।"

"দাঁড়ি মাঝি?"

"কেউ না হুজুর,—খালি নৌকা এমনই এমনই ভেসে যাচ্ছিল,—তাই দেখে গ্রামের লোকে নৌকা ধরে বেঁধে রেখে কাছারিতে খবর দিতে আসছিল—এমন সময়ে আমরা গিয়ে পড়লেম।"

রাজা গম্ভির হইলেন,—চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "তাইতো! যা ভাবছিলাম,—তা নয়,—এর ভেতর গোল আছে।"

তিনি এ কথা যে কাহাকে বলিতেছিলেন,—তাহা নহে;—একরূপ প্রকাশ্যে চিন্তা করিতেছিলেন,—সহসা তিনি পাইকদিগের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কেমন করে জান্‌লি যে সেই নৌকা রামরূপ শর্ম্মার নৌকা?"

কথাতো ঠিক,—তাহারা কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন আরম্ভ করিল,—রাজা নায়েবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নায়েব মশায় কি বলেন?"

নায়েব মহাশয় ও একটু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলেন,—লোক শূন্য নৌকা যে নদীতে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাহা নহে,—তবে এই নৌকাই যে রামরূপ শর্ম্মার নৌকা তাহা কে বলিল। আর যদি তাহাই হয় গরিব দাঁড়ি মাঝিগণ তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের ভিত্তি স্বরূপ মূল্যবান নৌকা এরূপভাবে ফেলিয়া পালাইবে কেন? আর সেই ডাইনী শাওতালনীই বা কোথায় গেল,—সেই কি কোন গতিকে মাজিদিগকে নৌকা এইরূপে ভাসাইয়া দিতে রাজি করিয়াছে। প্রভুর কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নায়েব মহাশয় বলিলেন, "হুজুর অনেক সময়ে ডাকাতগণ এ রকম করে।"

রাজা বলিলেন, "এখানে ডাকাতের লক্ষণ কি দেখিলে?"

"তাহাও তো ঠিক,—ডাকাতে পাঁচশত টাকার নোট শুদ্ধ ব্যাগ ফেরত দেয় না।"

নায়েব মহাশয় এদিক ওদিক চাহিয়া কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি এই শাওতালনীটা ডাইনী,—হুজুর, ডাইনীতে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে।"

রাজা মৃদু হাস্য করিলেন,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি গম্ভির ও চিন্তিত হইলেন, এতক্ষণ তিনি যেমন সদানন্দময় ছিলেন,—সহসা তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হইল,—তিনি আবার বলিলেন, "আমি যা ভাবিতে ছিলাম,—তা

নয়—তবে—তবে—ঠিক কথা,—এই নৌকাই যে রামরূপ শর্ম্মার নৌকা তাহা কে বলিল, এমন অনেক নৌকা বাঁধা খুলিয়া স্রোতে ভাসিয়া যায়—নৌকা কোথায় ?”

পাইক সেলাম দিয়া বলিল, “হুজুর,—গ্রামের লোকদের হুজুরের কাছে—নৌকা হাজির কর্ত্তে বলে এসেছি,—নৌকা এখনই এই ঘাটে হাজির হবে—তারা বেয়ে আস্‌ছে,—আমরা দৌড়ে এসেছি।”

“নৌকা না এলে কিছুই স্থির হইতেছে না।”

তাহার পর রাজা রামরূপ শর্ম্মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বেয়াই,—নৌকা খানা দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্ব্বে ?”

রামরূপ শর্ম্মা বলিলেন, “খুব সম্ভব চিন্তে পার্ব্বো,—এত দিন নৌকায় ছিলাম,—বিশেষতঃ আমার একখানা ছোট পুঁতি নৌকার চালে গোঁজা আছে—”

“তবে তো নৌকা অনায়াসেই চিনিতে পারা যাইবে।” এখন স্নান আহার করা যাক,—নৌকা এখানে আসিলে যাহা হয় করা যাইবে।”

রাজা নিমাইনারায়ণ স্নান করিতে নদী গর্ভে নাবিলেন। এই সময়ে মহা কলরব করিতে করিতে গ্রামবাসীগণ এক খানা নৌকা লইয়া উপস্থিত হইল, —নদীগর্ভস্থ রাজাকে সকলে সেলাম দিয়া—যেন একটা মহা যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইয়াছে,—এই ভাবে বলিল, “হুজুর,—এই সেই নৌকা।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নৌকায় পূজা।

রাজা নিমাইনারায়ণ সত্বর স্নান শেষ করিয়া তীরে উঠিলেন,—তাঁহার লোক জনের মধ্যে কেহ কেহ নৌকায় উঠিতে অগ্রসর হইতেছে,—দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, কেহ “নৌকায় উঠিও না,—সকলে নৌকা হইতে নাবিয়া আইস।”

তাঁহারা আজ্ঞা পাইবামাত্র সকলে তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে নাবিয়া পড়িল,—নিমাইনারায়ণ সত্বর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, “এস বেহাই,—দেখ এই নৌকায় তুমি এসেছিলে কি না।”

রামরূপ শর্ম্মা নৌকাখানি গ্রামবাসীগণ আনিবামাত্রই—তাহার দিকে

চাহিয়াছিলেন। সব পান্সি-নৌকাই প্রায় দেখিতে একরূপ,—ঠিক এই খানিতেই তিনি আসিয়াছিলেন কিনা,—তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। তবে নৌকা খানি চিনিবার তাঁহার উপায় আছে,—তাঁহার চণ্ডির পুঁথী নৌকার চালে গোঁজা আছে?

তিনি নিমাইনারায়ণের সহিত নৌকায় উঠিলেন,—উভয়ে নৌকায় উঠিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ালেন,—নৌকা রক্তে রঞ্জিত,—স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া গিয়াছে,—অনেক রক্ত গড়াইয়া নৌকার খোলে গিয়া জলে মিশ্রিত হইয়াছে।

নৌকার ভিতর অনেক ফুল ও বিল্বপত্র ছড়ান রহিয়াছে,—এই ফুলের মধ্যে সিন্দুর রঞ্জিত একখানি পুঁথী পড়িয়া আছে,—দেখিলেই বোধ হয় কেহ নৌকার উপর এই চণ্ডির বা শ্যামার পূজা করিয়াছে?

নিমাইনারায়ণ এই অভূতপূর্ব্ব বিষয় দেখিয়া বিস্মিতভাবে রামরূপ শর্ম্মার মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন তিনিও বিস্মিত ও স্তম্ভিতপ্রায় নৌকার এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

নিমাইনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

তাঁহার স্বরে চমকিত হইয়া রামরূপ শর্ম্মা তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। নিমাইনারায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিছুই জানি না।"

"বেয়াই তুমি কি পূজা করিয়াছিলে?"

"না—না আমি পূজা করিব কেন?"

"তবে এ সকল আসিল কিরূপে?"

"কি রকমে বলিব। এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিতেছে,—তাহার আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,—সবই রহস্য,—ঘোর রহস্য।"

"দেখিতেছি বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক—এই নৌকায় বেয়াই আসিয়াছিলে এ বিষয়টাতো ঠিক?"

"হাঁ,—আমার চণ্ডির পুঁথি কে নামাইয়া পূজা করিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ নৌকার ভিতর গিয়া—পুঁথী খানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ,—এই আমার পুঁথী,—হাঁ,—এই নৌকায় আমি এসেছিলাম,—তবে নৌকার চারটা দাঁড় ছিল,—দেখিতেছি এখন দুইটা মাত্র আছে।"

নিমাইনারায়ণ বলিলেন, "এখন এই পর্য্যন্ত থাক,—বেলা হইয়াছে,—আহারাদির পর এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করা যাইবে। এস বেয়াই—"

এই বলিয়া তিনি নৌকা হইতে নাবিলেন। রামরূপ শর্ম্মাও নৌকা হইতে নাবিলেন। রাজা বলিলেন, "ভিড় জমাইও না,—যাও—সকলে এখন যাওগে। বৈকালে কাছারি করিব।"

ক্রমে বহুলোক সেখানে সমাগত হইয়াছিল। সকলই কি ঘটিয়াছে, কি হইয়াছে জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—রাজার হুকুম পাইয়া পাইক সরদারগণ সকলকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিল।

সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিলে রামরূপ শর্ম্মা বলিলেন, "আপনি যথার্থই যদি আমার বেয়াই হন, তবে আমার উপর একটু দয়া করুন।"

নিমাইনারায়ণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দয়া! কিসের দয়া?"

রামরূপ বলিলেন, "আমার ব্রাহ্মণী একাকী বাড়ী আছেন,—আমি আমার ব্যাগ ফেরত পাইয়াছি,—সঙ্গে টাকাও প্রচুর আছে, দেখিতেছি, আপনি এখানকার জমিদার। অনুগ্রহ করিয়া আমায় একখানি নৌকা স্থির করিয়া দিন,—আমি বাড়ী চলিয়া যাই।"

নিমাইনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "বেয়াই, আর এ সব কি ঘটিয়াছে, তাহা আদৌ কিছু জানিতে ইচ্ছা নাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাশয়,—আমার কিছুই জানিবার ইচ্ছা নাই,—যথেষ্ট হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, আমায় শনিতে ঘেরিয়াছে,—এখানে আর থাকিলে আরও বিপদে পড়িব,—হয়তো আমি পাগল হইয়া যাইব।"

নিমাইনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "এস বেয়াই,—আহার করিতে করিতে সকল কথা বলিতেছি——"

ব্রাহ্মণ সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "তবে এ সমস্তই তোমার কাণ্ড! ওঃ— বুঝিয়াছি?"

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধন দশা।

ব্রাহ্মণের এই কথায় নিমাইনারায়ণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—আর এখানে থাকিলে তিনি উন্মাদ হইয়া যাইবেন ভাবিয়া রামরূপ শর্ম্মা সত্বর তাহার ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে নদী তীরে ছুটিলেন।

তাঁহার এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া নিমাইনারায়ণ মুহূর্তের জন্য বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন, তাহার পর উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "পাকড়াও।"

তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতে দশ পনের জন পাইক বরকন্দাজ ও অন্যলোক ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য ছুটিল। তখন প্রকৃতই এক হাস্যজনক ব্যাপারে পরিণত হইল,—তাহাদের "পাকড়াও—পাকড়াও" চিৎকার ধ্বনি শুনিয়া হাটের লোক কেনাবেচা বন্ধ করিয়া রামরূপ শর্ম্মাকে ধরিতে ছুটিল। হাট ভাঙ্গিয়া গেল, চারি দিকে একটা মহা গোল উঠিল। রামরূপ শর্ম্মাও প্রাণপণে ছুটিতেছিলেন। এত লোকের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভাবনা ছিল না। তবে তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে তিনি বরবাইশয়ের হস্তে পড়িয়াছেন, এখানে থাকিলে আরও বিপদের আশঙ্কা আছে। তিনি তাই দিক্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া প্রাণভয়ে ছুটিতেছিলেন, সহজে তাঁহাকে পাইক বরকন্দাজ ও হাটুরেগণ ধরিতে পারিল না। তিনি বহুদূর ছুটিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার দম ফুরাইয়া গেল,—আর এই সময় সহসা একখানা নৌকার দাঁড়ি মাঝিগণ নৌকা লাগাইয়া তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন রামরূপ শর্ম্মার কথা কহিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত পাইক বরকন্দাজ হাটুরে লোক পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িল। তাহারা কাপড় চাদর দড়ি যাহা নিকটে পাইল, তাহাতেই তাঁহাকে সুদৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল,—নিমাইনারায়ণ তাহাদের এ হুকুম দেন নাই। তবে তাহারা চিরকালই জানে যে ধরিয়া লইবার হুকুম হইলে বাঁধিয়া লওয়াই নিয়ম। তাহার পর তাহারা নিকটস্থ নৌকা হইতে এক বাঁস সংগ্রহ করিয়া মৃত দেহের ন্যায় তাঁহাকে সেই বাঁশে বাঁধিয়া আট দশজনে সেই বাঁশ কাঁদে করিয়া হাটের দিকে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক চলিল,—এ দৃশ্যে সকলেই আমোদ অনুভব করিয়া নানা রসিকতার কথা কহিয়া হাসিতেছিল।

রামরূপ শর্ম্মার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না,—তিনি কোন কথা কহিলেন না। এই লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশায় তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি তাঁহার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "কি কুক্ষণেই এমন কন্যার জন্ম দিয়াছিলাম। কন্যা হইতে দেশত্যাগী হইলাম, কন্যা হইতে এই এত অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছি। কন্যা হইতে এত বিপদে

পড়িয়াছি। এমন কত্তা জন্মিয়া মরিল না কেন। বোম্বাই করিয়াছে, প্রকৃত বোম্বাই কিনা ভগবান্ জানেন, হয়তো ডাকাতের সর্দার,—এক রকম তাহা স্বীকারও করিল। আমি তাহার এমন কি করিয়াছি যে সে আমাকে বিনা কারণে এমন কষ্ট দিতেছে। আরও না জানি কত লাঞ্ছনা করিবে?"

বংশে আবদ্ধ পাইক বরকন্দাজ স্কন্ধে সজল নেত্রে পবিত্র ব্রাহ্মণ মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন। এরূপ দুর্দ্দশায় বোধ হয় আর কেহ কখনও পড়ে নাই।

নিমাইনারায়ণ অতি চিন্তিত ভাবে নদী তীরস্থ বৃক্ষ তলে দণ্ডায়মান ছিলেন। অসংখ্য লোক কি একটা লইয়া আসিতেছে, দূর হইতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি আনিতেছে?"

নায়েব মহাশয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন,—বলিলেন, "হজুর, কিছু বুঝিতে পাচ্ছি না।"

রাজা বলিলেন, "এগিয়ে দেখ?"

"হজুর,—এরা এই দিকেই আস্‌বে।" এই কথা বলিয়া নায়েব মহাশয় দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেই ব্রাহ্মণকে এরা বেঁধে আন্‌চে।"

নিমাইনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন, "কি—কি?"

নায়েব বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে ধরে আন্‌তে হজুর হুকুম দিয়েছিলেন,—তাকেই দেখ্‌চি ধরে আন্‌চে।"

"ধরে আনবে—বাঁশে বাধা কি?"

"বোধ হচ্চে তাঁকেই বেঁধে আন্‌চে?"

"কি সর্ব্বনাশ,—বেটারা করেছে কি?—যাও ছোট,—এখনই খুলে দেও।"

নায়েব মহাশয়ের পক্ষে ধাবমান হওয়া প্রায় অসম্ভব হলেও তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িলেন,—চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বে—বে—বে—টারা,—ক—ক—রেছিস্ কি? করেছিস কি?"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী।

তাঁহার ধাবমান অবস্থায় অস্ফুট বাক্য পাইক বরকন্দাজগণ কিছু মাত্র বুঝিতে পারিল না। তাহারা কেবল এক অব্যক্ত চিৎকার ধ্বনি মাত্র শুনিতে

পাইল, তাঁহাকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারা ভাবিল যে হয়তো হুজুর কয়েদীকে শীঘ্র হুজুরের সম্মুখে হাজির করিবার জন্য নায়েব মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন। তাই তাহারা হাত দোলাইয়া "হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ—হা হা—হুঁ হুঁ" শব্দ করিতে করিতে রামরূপ শর্ম্মাকে লইয়া নিমাইনারায়ণের দিকে ছুটিল। নায়েব মহাশয় আবার তাহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু তাহার বৃহৎ গলা হইতে গড় গড় শব্দ ব্যতীত আর কিছুই বাহির হইল না।

পাইকগণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া রাজার সম্মুখে বংশে আবদ্ধ রামরূপ শর্ম্মাকে নামাইল।

রাজা ক্রোধে কম্পিত লোচনে বলিলেন, "বেটারা করেছিস কি? শীঘ্র খুলে দে,—বদমাইশদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিব।"

কোথায় প্রশংসিত হইবে,—না মহারাজা এত রাগান্বিত হইয়াছেন দেখিয়া পাইক বরকন্দাজগণ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, হাটুরেগণ সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা আবার সক্রোধে বলিলেন, "হাঁ করে দাড়িয়ে আছে— খোল শীঘ্র।"

তখন তাহারা সত্বর রামরূপ শর্ম্মার হস্ত পদ খুলিয়া দিল,—তিনি মুক্তি পাইয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নিমাই নারায়ণ সাদরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বেয়াই,—আমায় ক্ষমা কর,—ইহারা মূর্খ লোক,—জানে না,—কি করিতে কি করিয়াছে,—আমি ইহাদের উপযুক্ত সাজা দিব— বেয়াই আমায় ক্ষমা কর।"

রামরূপ শর্ম্মা দুই হাত জোড় করিয়া কাতরে বলিলেন, "দোহাই আপনার, —আমি আপনার কি করিয়াছি,—তাই আমায় এত লাঞ্ছনা করিতেছেন।"

নিমাই নারায়ণ অতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বেয়াই, আমায় ক্ষমা কর, আমি এদের উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।"

রামরূপ শর্ম্মা কাতরে বলিলেন, "কাহাকেও দণ্ড দিবার প্রয়োজন নাই,— যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই আমার অদৃষ্টের দোষে—কাহারও দোষ নাই,— এখন দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন,—আমি বাড়ী ফিরে যাই।"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন,—যথার্থ ই বলিতেছি যে বেয়াই,—তোমার কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। তোমার কষ্ট দিব কেন,—তুমি আমার লক্ষ্মীসমা পুত্রবধূর পিতা—"

"আর উপহাস করিবেন না,—দোহাই আপনার।"

"আমি উপহাস করিতেছি না।"

"এ উপহাস ভিন্ন আর কি?"

"যথার্থই বলিতেছি যে আমি আপনার বেয়াই—আপনি এ দেশের লোক,—আপনি কি রাজা নিমাই নারায়ণের নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই?"

"কেন শুনিব না?"

"আপনি কি জানেন না যে রাজা নিমাই নারায়ণ আপনার বেয়াই।"

"তাহাও জানি।"

"তবে উপহাস ভাবিতেছেন কেন?"

"তুমি যে রাজা নিমাই নারায়ণ তাহা কিরূপে জানিব।"

"ও—এই নায়েব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর,—এই সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা কর।"

"আর জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই—বিশ্বাস করিলাম।—তোমার ছেলের সঙ্গে আমার দুহিতার বিবাহ হইয়াছে,—এই মাত্র শুনিয়াছিলাম—তাহার পর তোমরা আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ নাই,—আমিও দেশ ছাড়িয়া গিয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে ছিলাম।—কি কুক্ষণে আমার বড় মেয়ে আমার বাড়ী আবার গিয়াছিল,—কি কুক্ষণে সে আমায় আবার এ দেশে আনিয়াছিল?"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "বেয়াই,—দেখিতেছি—এই সকল ব্যাপারের মধ্যে কোন ঘোরতর রহস্য জড়িত রহিয়াছে,—এ রহস্য কি, আমার অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ আমি বুঝিতেছি যে আমিও কোন না কোন রূপে ইহার ভিতর জড়িত রহিয়াছি,—এই জন্য বেয়াই ইহার একটা শেষ নিশ্চিত না করিয়া আমি তোমায় ছাড়িতে পারিতেছি না।"

ব্রাহ্মণ হতাশ ভাবে বলিলেন, "তবে যাহা হয় কর।"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "এই শাওতালনী আমার লোক।"

ব্রাহ্মণ সবেগে বলিলেন, "তা আমি জানি।"

নিমাইনারায়ণ গম্ভির হইয়া বলিলেন, "বেয়াই, তুমি ভুল বুঝিতেছ,—সে যাহা করিয়াছে,—তাহা কেবল তোমার কাছে শুনিলাম, আমি তাহার কিছুই জানি না। কেন সে তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছে,—তাহাও আমি জানি না—তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার এ সকল জানিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই—আমায় ছাড়িয়া দেও—"

নিমাই নারায়ণ তাঁহার কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "এই শাওতালনীর মাথার ঠিক নাই—অনেক দিন হইতে এ আমার কাছে আছে,—একবার মধুপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম,—এ আমার নিকট দাসী থাকে;—তাহার পর আমাদের সঙ্গে আমার বাড়ী আসিয়াছিল,—সম্প্রতি তাহার পাগলামী আরও বাড়িয়াছে,—মধ্যে মধ্যে সে আবার বাড়ী হইতে কোথায় যায়, আবার দুই চার দশ দিন পরে ফিরিয়া আইসে—লোকে বলে সে ডাইনী।"

———

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন রহস্য।

রামরূপ শর্ম্মার মস্তক নানা বিপদে ও গোলযোগে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল,—এই লোক যথার্থই তাহার বেয়াই কিনা তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না,—তবে এই টুকু ধ্রুব বুঝিলেন যে, এই লোক যেই হউক, সে তাহাকে অনুমতি না দিলে তিনি এখান হইতে কিছুতেই যাইতে পারিবেন না, সুতরাং আর ইহার সহিত তর্ক বিতর্ক করা বৃথা ভাবিয়া তিনি হতাশ ভাবে বলিলেন, "আমি আর কিছুই বলিব না,—যাহা হয় করুন।"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "উপস্থিত বোধ হয় যথেষ্ট হইয়াছে,—বেলা প্রায় অবসান,—এস আহারাদি করা যাক।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যাহা হয় কর,—আমি আর কিছুই বলিব না।"

নিমাই নারায়ণ মৃদু হাসিয়া আম্র কাননস্থ পট-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন। রামরূপ শর্ম্মা এ সম্বন্ধে অথবা কোন সম্বন্ধে এই লোকের কথায় আপত্তি করা বৃথা ভাবিয়া তিনিও তাহার পশ্চাত পশ্চাত চলিলেন।—

দেখিলেন আহারের বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। রাজ ভোগ,—রৌপ্য-পাত্রে প্রস্তুত,—এ জীবনে এ রূপ ভোগ তাহার অদৃষ্টে আর ঘটে নাই,—দুই খানি মকমল বিনির্ম্মিত আসন,—দুইজন ভৃত্য পশ্চাতে বৃহৎ পাখা ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "বসুন বেয়াই"

রামরূপ শর্ম্মা নীরবে আসনে উপবেশন করিলেন,—পার্শ্বে নিমাই নারায়ণ বসিলেন,—ভৃত্যদ্বয় পাখা চালাইতে আরম্ভ করিল।—

"আরম্ভ হউক,—আর কেন।"

এই বলিয়া রাজা আহার আরম্ভ করিলেন, রামরূপ শর্ম্মা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তিনিও আহার আরম্ভ করিলেন, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি আর কোন কথা কহিবেন না, কোন বিষয়ে আপত্তি করিবেন না,—অদৃষ্টে যাহা আছে,—তাহাই হউক,—নিয়তি কে খণ্ডায়।

আহার করিতে করিতে নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "বেয়াই,—এখন বোধ হয় আর তোমার সন্দেহ নাই।"

রামরূপ শর্ম্মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কথা কহিবেন না,—তিনি বলের সহিত ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেশিত করিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "দেখিতেছি বেয়াই, তুমি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না,—যাক,—আহারাদির পরই আমি নৌকা চড়িয়া বাড়ী যাইব,—সেখানে গিয়া নিজের মেয়েকে দেখিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।"

ব্রাহ্মণ ইহাতেও কোন কথা কহিলেন না। তখন নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "বেয়াই,—তুমি কোন কথাই জান না দেখিতেছি,—সুতরাং তোমার সব কথা জানা উচিত।"

এবার রামরূপ শর্ম্মা আর নীরব থাকিতে পারিলেন না,—বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না,—শুনিবার আর ইচ্ছাও নাই। তবে তুমি যদি আমার মেয়েদের সম্বন্ধে কোন কথা জান,—তাহা বলিলে বাধিত হইব। আমার জন্ত নয়,—ব্রাহ্মণী ব্যাকুলা আছেন,—তাঁহাকে গিয়া বুঝাইতে পারি।"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "বেয়াই,—নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভারি বদ লোক স্থির করিয়া বসিয়া আছ,—আমি আমোদ প্রিয় লোক হইতে পারি,—কিন্তু আমি বদ লোক নই;—যদি তোমার প্রতি কেহ অত্যাচার করিয়া থাকে,—তবে সে বনমালী রায় করিয়াছে,—আমার তাহাতে কোন দোষ নাই,—বোধ হয় তোমার আমার কথা বিশ্বাস হইতেছে না,—কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি,—সত্য কথাই বলিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি কাহারই দোষ দিনা,—দোষ আমার অদৃষ্টের।"

নিমাই নারায়ণ ব্রাহ্মণের এ কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "সুন্দরপুরের বনমালী রায় আমার জায়রা ভাই,—তাহার স্ত্রী ও আমার স্ত্রী দুই সহোদরা ভগিনী তাহা বেয়াই বোধ হয় তুমি জান।"

"হাঁ,—তাহা জানি,—তবে আপনাকে আগে কখনও দেখি নাই।"

"লক্ষ কর নাই,—এই মাত্র,—আমি দুই একবার সুন্দরপুরে গিয়াছিলাম। যাহাই হউক বনমালি রায় তোমার এক মেয়ে নিজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিল। আর এক মেয়ে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয়।"

"এ সব জানি,—তবে গরিব ব্রাহ্মণের উপর তোমাদের এরূপ অত্যাচার করা কি ভাল?"

"আমি অত্যাচার করি নাই,—হয়তো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে না,—কোন কারণে আমি বনমালি রায়ের করতলস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে কি আমার তাহার হুকুম অমান্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোঁসাইবাবু।

এই কথায় রামরূপ শর্ম্মা বিস্মিতভাবে নিমাই নারায়ণের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "বেয়াই তুমি এ কথা শুনিয়া যে বিস্মিত হইবে তাহাতে, আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই;—আমি বনমালি রায় হইতে বড় জমিদার, আমি রাজা, তবে আমি কেন তাহার পদানত হইয়াছিলাম,—এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, কিন্তু আমার বলিবার উপায় নাই,—অন্ততঃ এখন নয়, হয়তো সময়ে তুমি সকল কথাই জানিতে পারিবে।"

রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে বলিলেন, "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমি এই রহস্য জালে জড়িত হইলাম কেন,—দেখিতেছি আবার একটা রহস্য,—যাক্ কথা কহিয়া কাজ নাই,—কেবল সোনাই ভাল।"

নিমাইনারায়ণ বলিলেন, "বনমালি রায়ের হুকুমে তোমার কন্যার সঙ্গে আবার ছেলের বিবাহ দি। কিন্তু এ কথাও বলি তোমার কন্যা সুন্দরী গুণবতী. আমি নিজেও তাহার সঙ্গে আমার ছেলের আনন্দে বিবাহ দিতাম, তবে পরের হুকুমে বাধ্য হইয়া বিবাহ দেওয়ায়ও আমি বড় সন্তুষ্ট হই নাই,—তাহারই হুকুমে তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখি নাই। রাখিতে পারি নাই,—এমন কি তোমার পত্রেরও উত্তর তাহার ভয়ে দিতে সাহস করি নাই।"

ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "এত ভয় কিসের।"

নিমাই নারায়ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখন সে কথা বলিবার উপায় নাই,—বোধ হয় সময়ে সকলই জানিতে পারিবে,—তবে এই পর্য্যন্ত জান বেয়াই যে আমি তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি,—সে আর এখন আমার কিছুই করিতে পারে না,—তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ এখানে দেখা না হইলে আমি তোমায় আনিতে লোক পাঠাইতাম।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বনমালি আমার কন্যাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল কেন ?"

রাজা বলিলেন, "তাড়াইয়া দিয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না।—তবে শুনিয়াছিলাম,—না সে কথা থাক।"

"যদি গরিব ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিতে না চাহেন,—তবে সব কথা বলুন।"

"বেয়াই,—ইহাতে তোমার মনে কষ্ট হইবে মাত্র।"

"তা হ'ক,—আমি শুনিতে চাহি।"

"আমি শুনিয়াছিলাম,—সত্য মিথ্যা জানি না,— বনমালি রায় মিথ্যা কথা রটাইবে,—তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—"

"সে কি বলিয়াছিল,—তাহাই আমি শুনিতে চাই।"

"তোমার মেয়ে নাকি কুচরিত্রা হইয়া বাড়ী হইতে স্বইচ্ছায় বাহির হইয়া গিয়াছিল।"

নিমাই নারায়ণ মনে করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ, কন্যা সম্বন্ধে এই ভয়াবহ কথা শুনিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু রামরূপ শর্ম্মা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।—মনে মনে তিনি স্বয়ংই অনেক সময়ে এ সন্দেহ করিয়াছেন,—অনেক বার এ ভয়াবহ সন্দেহ হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন,—তবে তাহার কন্যা উষার জীবন যে কোন গূঢ়রহস্যে জড়িত হইয়াছে, সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না,—তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "তার পর।"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "আমি এ—সম্বন্ধে আর অধিক কিছু শুনি নাই,—কুটুম্ব সাক্ষাতের কলঙ্কের কথা আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

"তার পর ?"

"এই আজ প্রথম তোমার নিকট শুনিলাম যে তোমার কন্যা কলিকাতায় তোমার বাড়ী ছিল—তার পর কোথায় গিয়াছে—"

"আর কিছু শুনিয়াছ ?"

"এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে তোমার কন্যা লইয়া বনমালি রায় ও তাহার পুত্রের ভয়ানক ঝগড়া হয়,—এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত ছিল না,—ছেলে বাপের উপর রাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছে,—শুনিতেছি নাকি বনমালি রায় তাহাকে ত্যজ্য পুত্র করিয়া আর এক পুষ্য পুত্র গ্রহণ করিতেছে,—সে ইহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া তাহার বিবাহ দিবার আয়োজন করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এত বড় পুষ্য পুত্রটী কে ?"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "যখন এত কথা বলিলাম,—তখন সব কথাই বলা ভাল। বনমালি যত দূর বদলোক হউক আর না হউক,—ইহার সঙ্গে একটী ঝড়ি বদ লোক জুটিয়াছে। সেই বনমালি রায়ের মন্ত্রদাতা গুরু হইয়াছে,—বনমালি রায় তাহার কথায় বাঁচে মরে,—সে তাহাকে যেমন নাচাইতেছে,—বনমালি রায় তেমনই নাচিতেছে। এখন তাহার সর্ব্বস্ব লইবার জন্য নিজের বাইস তেইস বৎসরের বুড়ো ছেলে তাহাকে পুষ্য পুত্ররূপে দিতেছে।"

"তাহার নাম কি ?"

"গোঁসাই বাবু।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোজন।

রামরূপ শর্ম্মার মুখ হইতে তাহার অনিচ্ছা সত্বেও বাহির হইল, "গোঁসাই বাবু।"

নিমাই নারায়ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বেয়াই,—তোমায় আমি একটু আগে নিজেকে গোঁসাই বাবু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম,—তাই তুমি আমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ। হইবার কথা,—আমাদের উপাধি যে গোঁসাই তাহা বোধ হয় তুমি নিশ্চয়ই জান,—এই জন্য যেখানে আমি আত্ম-গোপন করিতে চাহি, সেখানে গোঁসাই বাবু বলিয়া আপনাকে পরিচয় দি,—এ কথা সকলেই জানে। এই লোকটা ইচ্ছা করিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক গোঁসাই বাবু নাম লইয়াছে—"

"ইহার আসল নাম কি ?"

"তাহা জানি না,—বোধ হয় কখনও নিজের আসল নাম কাহাকে বলিয়াছে কিনা সন্দেহ।"

"আমি যখন দেশে ছিলাম,—তখন এই লোককে দেখি নাই।"

"না—তখন সে আসে নাই,—তবে শুনিয়াছি,—বনমালি রায় যখন পশ্চিমে বেড়াইতে যায়,—তখন কোথায় ইহার সহিত বন্ধুত্ব জন্মে,—তোমার মেয়ের বিবাহের পরই বনমালি রায়ের বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে।"

"তাহার স্ত্রী পরিবার নাই।"

"আছে স্ত্রী—সেও সুন্দরপুরে আসিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে লোক অনেক কথা বলে—যাক সে সব কথায়—"

"আমিও পরের কথা শুনিতে চাহি না।" আমার মেয়ের সম্বন্ধে এই দুর্ব্বৃত্ত কি করিয়াছে,—তাহাই শুনিতে চাই।"

"শুনিয়াছি তোমার মেয়েকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার এই লোকই কারণ,—সেই বনমালির ছেলে বরেন্দ্রভূষণকে ত্যজ্য পুত্র করিয়াছে,—এখন নিজের ছেলেকে পুষ্য পুত্র করাইয়া বনমালি রায়ের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে আর এই ছেলে তাহার নিজের ছেলে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ।"

"কেন—কেন ?"

"যাহারা এই গোঁসাই বাবুর স্ত্রীকে দেখিয়াছে,—তাহারা বলে তাহাকে দেখিলে ২৫।২৬ বৎসর বয়স্কা যুবতী বলিয়া বোধ হয়,—ইহার ২২।২৩ বৎসরের ছেলে হয় কি রূপে ?"

"বনমালি রায় কি এ সব কিছুই দেখিতেছে না।"

"মানুষ সময় সময় অন্ধ হইয়া পড়ে—বনমালি রায়ের ও ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে ?"

"এমন কতক কতক বুঝিতেছি।"

"হা,—এই লোকটাই যত অনিষ্টের মূল।"

রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে বলিলেন, "তুমিই যে সেই লোক নয়,—তাহার বিশ্বাস কি ? যদি বনমালি রায় যথার্থই এই গোঁসাই বাবুর দাসানুদাস হইয়া থাকে, তবে তাহার এইরূপ জাক জমকে থাকা আশ্চর্য্য নয় ?"

ব্রাহ্মণ কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "এই গোঁসাই বাবু নানা রকম অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি সম্বাদ পাইয়াছি যে কোন কোন স্থানে আমার নাম লইয়া পরিচয় দিয়াছে,—তাহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা এখনও জানিতে পারি নাই,—তবে

তাহার উদ্দেশ্য যে ভাল নহে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—তার পর—এই বলিয়া নিমাই নারায়ণ সহসা নীরব হইলেন,—ব্রাহ্মণ আহার করিতে করিতে শুনিতেছিলেন,—সহসা নিমাই নারায়ণ নীরব হইলে তিনি আহার বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন,—বলিলেন, "আমায় নীশার কোন অনিষ্ট করিবার কোন চেষ্টা করিতেছে না তো—উঁহার যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে।"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "না,—তা নয়। বোধ হয় বেয়াই তুমি জান যে আমার স্ত্রীর তিন ভগিনী,—জ্যেষ্ঠা বনমালি রায়ের স্ত্রী,—মধ্যমা আমার স্ত্রী,—আর কনিষ্ঠার মহেশপুরের রাজার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। রাণী বিন্দেশ্বরী সম্প্রতি বিধবা হইয়াছেন—তাহার একটীমাত্র অবিবাহিতা কন্যা আছে,—নাম লক্ষ্মীদেবী।"

"এই গোঁসাই ইহাদের অনিষ্ট করিবার ও চেষ্টা করিতেছে ?"

"কতকটা তাহাই।—সে তাহার এই ছেলেকে বনমালি রায়ের পুষ্য পুত্র করিয়া রাণী বিন্দেশ্বরীর কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ দিবার চেষ্টা পাইতেছে। তাহা হইলে সে বনমালির সমস্ত সম্পত্তি পাইল,—তাহার উপর মহেশপুরের জমিদারি ও লাভ হইল—"

ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র বলিলেন, "দুর্ব্বৃত্ত !

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই,—বেয়াই এখন ওটা যেতে পারে ?"

এই বলিয়া নিমাই নারায়ণ আহার স্থান হইতে উঠিলেন,—রামরূপ শর্ম্মাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। দুই জন ভৃত্য রৌপ্য গাড়ু ও সুন্দর গামছা লইয়া ছুটিয়া আসিল।

রমণীর প্রতি শেফালিকার উক্তি।

বারেক নেহার মোরে ওগো সুহাসিনি !
হৃদয়ের সেল সম, শুনহ বারতা মম,
আমিও ছিলাম সুখি, পূর্ব্ব রজনীতে ;
নিজের সৌন্দর্য্যে ভূলি আজ গরবেতে।
কাঁদিতেছি পরি এবে, ত্যজি সে সব বিভবে,
কাঁদয়ে নিরবে যথা পতিহীনা ধনী।

(২)

মনের আবেগে যুটি সান্ধ্য সমীরণে ;
দিয়াছি গৌরবে যত, গন্ধ বহে অবিরত,
পাঠাইতে সে সকলে দুর দূরান্ত রে ;
মোহের আবেগে ভুলি আজ অহংকারে,
ক'রেছিনু কত গর্ব্ব কিন্তু হ'ল সব খর্ব্ব
দহিছে পরাণ মম সে সব বর্ণনে।

(৩)

আজ গরিমায় ভুলি কত নিন্দা করে ;
কহিনু বিধিরে আমি, বড় অবিচারি তুমি,
ফুটাও আমারে, তুমি কাল নিশীথে ;
কাজ নাহি এ জীবনে, কি কাজ মধুতে,
যতেক ভ্রমরগণ তোষে অন্যে অনুক্ষণ
আমারে ভজেনা কেহ তব অবিচারে।

(৪)

সুধানু তারকাদলে সুমধুর স্বনে ;
কেনবা হাসিস্ তোরা, হ'য়ে সবে আত্মহারা,
কি আনন্দে এবে তোরা আছিস্ মগন ?
অথবা কি দেখি মোদের এরূপ ভবন ?
দেখিয়া এ ফুল্ল প্রাণ, ঈর্ষায় হ'তেছ ম্লান,
আছে কিরে এত শোভা কভুও গগনে ?

(৫)

এখনি উদিলে রবি পলাইবে সবে ;
তবে কেন কর গর্ব্ব, ক্রমে সব হবে খর্ব্ব,
আপনি হইবে ম্লান আপন হেতুতে।
যতেক ভ্রমরগণ আসিয়া প্রভাতে,
তুষিবে মোদের হিয়া, দিব সবে সমর্পিয়া,
কাটাব যাবজ্জীবন আনন্দিত ভাবে।

(৬)

কিন্তু বিধিলিপি কে করে খণ্ডন ;
আপন ভারেতে হায়, এবে পড়িনু ধরায়,
বিধির বিধানে দিতে গর্ব্ব বিসর্জ্জন।
তায় বলি ও সুন্দরি করহ শ্রবণ,
রেখো মনে মোর কথা, কখন পাবেনা ব্যথা,
আপন গর্ব্বেতে যদি নাহ ও মগন।

শ্রীশশধর সান্যাল।

কোকিলের প্রতি।

শুন অনুরোধ মোর, ওহে পিকবর।
এসোনা বসন্তে আর এদেশেতে তুমি,
অথবা সুখের আসে, যদি আ'স এই দেশে,
করো না তোমার সেই কুহু কুহু ধ্বনি।
নিরবে আসিয়া হেতা যেয়ো দেশান্তরে।

(২)

বল দেখি পিকবর কি আনন্দে তুমি,
শুনাও তোমার স্বর যত জীব গণে,
কি আনন্দ হয় তায় বল সুধাই তোমায়,
লও হে কি সুখ তুমি গাহি বনে বনে ?
দুঃখোদ্দীপক স্বর তব মনে গণি আমি।

(৩)

বসন্ত মলয়ানিলে জুরালে জীবন ;
কে না ইচ্ছে তব স্বর শুনিবার তরে,
তৃষ্ণার্ত্ত পথিক দল, হেরিলে নির্ম্মল জল,
ছুটে আসে সে উদক পান করিবারে।
কিন্তু মগ্ন হলে জলে, কে চাহে জীবন।

(৪)

শুনি তব স্বর যুবক যুবতীগণ,
স্মরিয়া মন্মথে হয় আনন্দে মগন,
ভুলে যায় আত্মপর, হয় সুখে জর জর,
মোহের আবেগে ভুলে কর্ত্তব্য যখন ;
বড় সুখি হও কি তুমিহে তখন।

(৫)

ওহে উচিত কি তব এ দুঃখের দিনে,
যুবক যুবতীগণে কর রে মগন,
কোথায় দুঃখেতে তারা, হবে সবে আত্মহারা
পর দুঃখে দুঃখী হতে করিবে যতন ;
কিন্তু ভুলি মগ্ন হয় তোমার স্বননে।

(৬)

তায় বলি পিকবর এসোনা এখানে,
অথবা আসিয়া আর কোরনাক গান ;
শুনিলে তোমার স্বর, হয় লোকে জর জর,
নিরাশ্রয় পতিহীনা অবলার প্রাণ ;
দুঃখকরে নিরবে তারা, মনে মনে।

(৭)

বন-ফুলদল হায় তব আগমনে,
খুলি রাখে হৃদি দ্বার প্রাণনাথ আসে
শেষ হয় মধু মাস, নাহি মিটে প্রাণ আস,
শুষ্ক হয়ে যায় তারা গীষ্ম পরকাশে
জন্মিয়া গহনে পুনঃ কর শূন্য মনে।

(৮)

গাও দূরে গিয়া ওহে পিককুল পতি,
যেথায় গাহিলে তুমি সুখি ভ্রাতৃগণ।

এসনা এ মরু তটে, ভূতলে কি তারা উঠে,
নিদ্রায় স্বপ্নাবেগে দেখেছ কি কথন ?
এসনা হেতায় আর ওহে পিকপতি।

শ্রীশশধর সান্যাল।

ভীতা।

(১)
বেদনায় রুদ্ধ হিয়া
নত ম্রিয়মাণ,
তাই ভয়ে ভয়ে আসিয়াছি
গাহিবারে গান।

(২)
ভয়ে ভীতা মুখ পানে
কেমনে চাহিব।
জানিনা বাজাতে বীনা
কি গান গাহিব—

(৩)
আমার বিষাদ গানে
ঝরিবে মুকুল,
মরমে মরিয়া যাবে
আধ ফোটা ফুল।

(৪)
বিহগের কলকণ্ঠ
যাইবে থামিয়া,
নিরাশার ঘোর বায়ু
আসিবে নামিয়া।

(৫)
শিহরি প্রকৃতিরাণী
ঢাকিবে আনন,
মুরছি পড়িবে ভয়ে
আশার কানন।

(৬)
বিমল জ্যোছনা রেখা
যাবে মিলাইয়া,
স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর
উঠিবে কাঁপিয়া।

(৭)
মানব চমকি উঠি
কবে "দূর ছাই
সুখময় ধরামাঝে
কেন এ বালাই।"

(৮)
আমার বিষাদ গীতি
চাহ শুনিবারে,
বল আমি শুনাইব
কোন্ অধিকারে ?

শ্রীমতী বিজনবালা বসু।

জীবনের পরপার।

মৃত্যুতে পরিবর্ত্তন।

মানুষ ত মরিয়া গেল। কিন্তু জগতের কর্ম্মস্রোতে বহুদিন ভাসমান থাকিয়া, কত স্নেহশীল বন্ধুবান্ধবের সংসর্গে কালযাপন করিয়া, পৃথিবীর সহিত কত সূত্রে কতরাগে জড়িত হইয়া, তারপর সে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার দেহ এই পৃথিবীতেই শেষ সম্বন্ধ সূত্র স্বরূপ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল, কেবল আত্মা, অপর লোকে প্রস্থান করিল।

সেই যে, অপর লোক, তাহা অজানিত, পৃথিবীবাসী তাহার অস্তিত্বমাত্র অবগত আছে। কেহ কেহ আবার তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান। তাঁহারা বলেন, মানুষ মরিলেই তাহার সমস্ত ফুরাইল। কিন্তু এই অপ্রত্যক্ষ বাদীগণের কথা, কেহ প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না।

ডি ফোর (Defoe) মত আলোচনা কর। তিনি লুথারের (Luther) ছাত্র। লুথারের জ্ঞান, লুথারের বুদ্ধি, লুথারের বিদ্যা, অনেক পরিমাণে তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। ডি ফো বলেন, মৃত আর ফিরিয়া আসে না। মানুষ পুণ্যবান হইলে, স্বর্গে যায়, পাপী হইলে নরকে যায়। হয় স্বর্গ, নয় নরক দু'এর একটীতে সে মৃত্যুর পরে থাকে; কিন্তু পৃথিবীর সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ যায়। সে এমন অবসর পায় না,—যে পৃথিবীতে আবার আসিবে।

কিন্তু, আমরা আগেই বলিয়াছি, মানুষ অনেকদিন পৃথিবীতে থাকিয়া তবে মরে। এখন, বিবেচ্য এই, মৃত্যু হঠাৎ হয়। সুতরাং সহসা মৃত্যুতে তাহার কত আশা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। অতএব, নিরাশ চিত্তে সে অপর লোকে, গমন করে না। বরং আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে, সে স্বর্গ বা নরক যেখানে হোক যায়। এখন এই অপূর্ণ আশার জন্য বা মর্ত্তের প্রতি মায়ার জন্য সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে কি না? ফিরিয়া যে আসে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বিলাতে, একবার একটী পরিচারিকা কন্যা মৃত্যুর পর, তাহার প্রিয়তমের ছবি দেখিবার জন্য পৃথিবীতে আসিত। *

* Foot Talls on the Boundary of another world, P. P, 356,

এইরূপ অনেক আত্মিক কাহিনী শুনা গিয়াছে। তাহার সকল গুলি মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, মানুষ যে আবার মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে পৃথিবীতে আসে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ।

মৃত্যুর পর আত্মা কবরে তাহার গলিতাবশিষ্ট কঙ্কাল সমষ্টিতে বাস করে না; সে তখন এক নূতন জগতে যায়,—কিন্তু নির্ব্বিকারচিত্তে সেখানে বাস করিতে পারে না। মায়াবশে, কখনও বা ক্রোধবশে, আবার কখনও বা অন্যান্য বৃত্তিবশে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। কিন্তু স্থূল শরীরে নয়।

মৃত্যুর পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র দেহকে স্পর্শ করে, কিন্তু আত্মা বিকারমুক্ত থাকে। কিন্তু দেহমুক্ত হইয়া, আত্মা একেবারে স্বর্গ বা নরকে চলিয়া যায় না। স্বর্গ ও মর্ত্ত—এই দু'এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে কিছুদিন অবস্থান করে। এই স্থিতি—কতকাল স্থায়ী, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ যতদিন আত্মা, মর্ত্তমায়া মুক্ত হইতে পারে না, ততদিন এইরূপ মধ্যপথে অবস্থান করে।

আমাদের বাড়ীর পাশে, একটী রমণী বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। ঐ রমণীর স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন। সেই বিবাহের পর হইতে, গভীর রাত্রে, এখনও শুনা যায়, কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া অতি আকুলস্বরে, তীব্র আর্ত্তনাদ—করিতেছে। ঐ আর্ত্তনাদও রমণী স্বর-সম্ভব। এই প্রবন্ধ লিখিবার তিনদিন আগে ঐরূপ আর্ত্তধ্বনি শুনিয়াছিলাম। ইহা পরীক্ষিত ঘটনা। আমাদের প্রতিবাসীবর্গ সকলেই তাহা শুনিয়াছেন, কেহ কেহ আর্ত্তনাদকারিনীকে দেখিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লবকালে, যখন নরনারী ভগবানের সত্বার প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সকলে বলিত "মৃত্যু চিরনিদ্রা।" (Death is an eternal sleep") তাহারা বলিত "ঈশ্বর নাই, মরণের পর স্বর্গ নরক নাই। মানুষ মরিলে চিরস্থায়ী নিদ্রাভোগ করে।" এই অবিশ্বাস, সেই ভীষণ বিপ্লব বহ্নির ইন্ধন স্বরূপ হইয়াছিল। যাহা অন্যায়, তাহা অন্যায়ই আনয়ন করে। তাহা কদাপি ধ্রুব হইতে পারে না। এই মত অন্যায়, তাই অন্যায়ই অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার ফল বিপ্লব। সুতরাং মৃত্যুই সমাপ্তি নহে। বরং বলা যায়, জীবন উপক্রমণিকা, মরণ সূচনা, মরণের পরে, যে কাল তাহা মধ্য, কিন্তু সমাপ্তি কোথায়? আত্মার সমাপ্তি নাই। সমাপ্তি যদি নাই, তবে আছে কেবল সূচনা, তদ্ভিন্ন আর সকলই পরিমাণ শূন্য। অনন্তের ধারণা হয় না,

অসীমের সীমানিরূপণ করা যায় না। আত্মায় কেবল ব্যাপ্ত সাধন (Gneralizti0n) হয়।

মৃত্যুকালে মানুষ অন্তরে কোনরূপ যাতনা বোধ করে না। ঋষিরা যে জ্ঞান চক্ষুর কথা বলিয়াছেন, মৃত্যুকালে মানুষ তাহা লাভ করে। লোকে কথায় বলে "অমুক লোকটা মরিবার সময়ে সজ্ঞানে মরিয়াছিল।" ইহার অর্থ এই, "অমুক সজ্ঞানে মরিয়াছে, কিন্তু সকলে সজ্ঞানে মরে না।" কিন্তু, ইহা ঠিক নহে। মানুষ মাত্রেই মরণকালে সজ্ঞান থাকে। অধিকন্তু, সেই সময়ে তাহার জ্ঞান, অধিকতর তীক্ষ্ণ হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় বটে, পরলোক যাত্রী অজ্ঞান। বস্তুত তাহা নহে।

মৃত্যুকালে মানুষের মনে তাহার সারা জীবনব্যাপী সু ও কুকর্ম্মাবলীর কথা উদিত হইয়া থাকে। হৃদয়ের ভিতরে তখন সমালোচনার তুমুল ঝটিকা বহিতে থাকে। স্বকৃত কুকর্ম্ম আলোচনা কালে, তাহার আননে যন্ত্রনা সূচক চিহ্ন প্রকটিত হয়, সেই সময়ে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মুখ বিকৃত থাকে। নচেৎ গতপ্রাণ দেহের মুখ প্রশান্ত ভাবাপন্ন থাকে।

উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল মহাসিন্ধুর উপরিভাগ দেখিয়া, যেমন তাহার অভ্যন্তরভাগ সাধারণের নয়নগোচর হয় না, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান মানবের বাহ্য অবয়ব দেখিয়া, তাহার হৃদয়নিহিত ভাবাবলীর পরিচয় গ্রহণে সাধারণ মানব অসমর্থ।

ভাস্কোডি গামা এক জন প্রসিদ্ধ নাবিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু স্বাভাবিক রূপে হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর অনেক দিবস পরে মহাসাগরবক্ষে ভাসমান অনেক জাহাজের নাবিকেরা ভীতচিত্তে দেখিয়াছে, মুক্ত অনাদি শূন্যমার্গে এক জ্যোতির্ম্ময় বিপুলদেহ পুরুষ মূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছে। যাঁহারা ভাস্কোডামাকে জীবিতাবস্থায় দেখিয়া ছিলেন, তাঁহারা বলেন উহা ভাস্কোডি গামার প্রেতাত্মা।

এই আত্মিক কাহিনী হইতে অবগত হওয়া যায়, মৃত্যুর পরিবর্ত্তনে মানুষের প্রকৃতিগত ও আকারগত বিভেদ খুব অল্পই হয়। ভাস্কোডি গামা জীবনের অধিক ভাগ সাগরের উপরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাই দেহত্যাগ করিয়াও সমুদ্রের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই।

কিন্তু আত্মা মাত্রই দেহবিমুক্ত হইয়া আবার পৃথিবীতে বিচরণ করে না। যে মানুষ পৃথিবীতে দৃঢ়চেতা ধার্ম্মিক ও নির্ব্বিকার চিত্ত থাকেন যেমন তৈলিঙ্গ স্বামী ভাস্করানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি, তাঁহারা জাগতিক

মায়া পাশে বদ্ধ হইয়া তুচ্ছকারণে আর পৃথিবীর ভারবহ বায়ুমণ্ডলে আসিয়া আপনাদিগের সূক্ষ্ম অবয়বকে নিপীড়িত করেন না। পুনরায় জন্মান্তর গ্রহণ করাও তাঁহাদের স্বইচ্ছাবশে হয়। মানসিক বলহীন তরল প্রকৃতি ব্যক্তির আত্মাই দেহ বিমুক্ত হইয়াও পৃথিবীর মায়াপাশ ছেদন করিতে পারে না।

মরণের পরে, সুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণের, আত্মা মধ্যমণ্ডলে, অল্পদিনমাত্র অবস্থান করিয়া, জাগতিক বায়ুমণ্ডলের অগম্যস্থানে, প্রস্থান করে, কিন্তু দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণের আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া,—ভীষণ অনুতাপাগ্নি দাহনে, যৎপরোনাস্তি যাতনা ভোগ করে, ইহা, যে মহান্ সত্য,—বহু আত্মিক কাহিনীতে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

"Tite anCeato"—নামধেয় পুস্তকে এ সম্বন্ধে, একটী গল্প আছে, আমরা এইখানে, তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"কুমারী" "সি—"(Misa "C—") আমেরিকার কোন সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চের (Theatre) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন মধুর ছিল, শারীরিক লাবণ্যও তেমনি অনিন্দ্যনীয় ছিল। অতএব, অনেক লুব্ধপ্রকৃতি ধনবান মহাত্মা, তাঁহার উপর অযাচিত করুনা প্রকাশ করিতেন। প্রতিদানস্বরূপ, কুমারী "সি—" কিছু দান করিয়া, বদান্যতা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিতা ছিলেম, কিনা, সাধারণে তাহা অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু লোকরসনা নীরব থাকিবার নয়। লোকরসনায় সকৌতুহলে উচ্চারিত হইত, যে কুমারী অতিরিক্ত কোন কাঙ্ক্ষনীয় পদার্থ দান করিয়া, সমাগত ধনীজনের মনঃতুষ্টি সাধন করিতেন। কুমারীর সহযোগিনী অভিনেত্রী কুমারী "ভি—" এইজন্য অনেকবার তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যৌবনমদগর্ব্বিতা কুমারী "সি—" তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না।

"জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জলবিম্বপ্রায়।" এ কথা কঠোর সত্য গহ্বর; এবং জগতে বহুজন কর্ত্তৃক বহুবার উচ্চারিত হইয়াছে। "বিজ্ঞান, হেথায় পরাস্ত; কদাপি জয়ী হইবে, কিনা, তাহা ভবিষ্যতের তিমির কক্ষে নিহিত। বিশ্বের অনতিক্রমনীয় নিয়মের বশে, হঠাৎ একদিন "কুমারী সি—"অনন্ত পথে যাত্রা করিলেন। অনেকে এ কথা শুনিয়া হৃদয় ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, আবার অনেকে সুখী হইল।

অনেকে বলিল "আহা, কুমারীর গলা বড় ভাল ছিল।" আবার অনেকে

বলিল, "বাঁচা গেল, একটা পাপ গেল।" কিছুদিন খুব আলোচনা চলিল। ক্রমে, তাহা থামিয়া গেল।

এক বৎসর, দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কুমারী "সি"র নাম সকলে ভুলিয়া গেল।

এই সময়ে একদিন কুমারী "ভি",—যাঁহার কথা উপরে বলিয়াছি—তিনি, রজনীকালে, রঙ্গালয়ের অভিনয় শেষ করিয়া, আবাসাভিমুখে, শকটারোহণে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। গাড়ী ক্রমে, রাজপথ পার হইয়া, একটী উন্মুখ প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। এই প্রান্তর পার হইলেই, কুমারীর বাড়ী। প্রান্তরের উপর দিয়া গাড়ী চলে না। সেইজন্য, কুমারী "ভি—" সেইখান হইতে, চালককে বিদায় দিয়া,—একাকিনী পদব্রজে, প্রান্তরের উপর দিয়া, বাড়ীর দিকে চলিলেন। ইহা তাঁহার কাছে, প্রাত্যহিক ব্যাপার—সুতরাং, তিনি ইহাতে অভ্যস্তা। অতএব, তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে চলিতে লাগিলেন।

মধ্যযামের অর্দ্ধশশাঙ্ক ক্ষীণোজ্জ্বল প্রভা বিতরণ করিতেছিলেন। অসীম নিবীড় নীলগগন তারাহার পরিয়া, শোভা পাইতেছিল।

আশে পাশে ছায়ালোকবিচিত্র পাদপদল পবনকরতাড়নে শাখান্দোলন করিতে ছিল।

কুমারী "ভি"—ক্রমে এক বৃক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এত রাত্রে, এমন স্থানে লোকজন থাকে না। কিন্তু, কুমারী "ভি" অভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখিলেন, বৃক্ষের তলদেশে, কেহ আচরণ শিরঃপর্য্যন্ত বসনাবরিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছে। গাছের ছায়া পড়াতে তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। কুমারী "ভি"—ভাবিলেন, কেহ হয়ত অসদভিপ্রায়ে ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিয়া, তিনি, অন্য পথ ধরিলেন। কিছুদূর গিয়া, পিছন ফিরিয়া দেখিলেন। বৃক্ষতল হইতে মনুষ্যমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে। চক্ষুর ভ্রম ভাবিয়া, তিনি সম্মুখ দিকে চলিলেন। তন্মুহূর্ত্তে তিনি দেখিলেন, সেই বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি মুক্তস্থানে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! "ভি"—সচকিতে মূর্ত্তির মুখের দিকে চাহিলেন। কি সর্ব্বনাশ!—এ মূর্ত্তি পরলোকগতা, কুমারী "সি—"র।

এমন স্থানে, এমন সময়ে, এমন অবস্থায়, এমন ভাবে, কেহ কোন প্রেতাত্মা দেখিলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া, নাচিতে থাকে না। তাহার বিপরীত যাহা করিয়া থাকে, তাহা অবস্থাভিজ্ঞ অবগত আছেন। হিন্দু হইলে, "রাম নাম" করে, মুসলমান কি করে, জানি না, কিন্তু কুমারী "ভি"—উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের

নাম করিয়া উঠিলেন। মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে বলিল "কুমারী ভি" ! আগে তোমার উপদেশ শুনি নাই। রূপের গর্ব্বে তাহা হেলায় উপেক্ষা করিয়া নিত্য নূতন পাপ কাজ করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, যৌবনের কিছু থাকে না,—কিন্তু পাপের ফল বাকি থাকে। আজ আমার বুকে আগুণের আগুন জ্বলিতেছে,—হায় এই বুক ! এই বুকে,,— কত আদরে, কত সুখে, কত লোককে আবেগভরে চাপিয়া ধরিতাম ! সেই বুক এখন কি হইয়াছে দেখ ! সে বুক আর উন্নত নাই, আর মাংসল নাই, আর তা'তে রক্তিমাভা নাই ! দেখ দেখ,—কি হইয়াছে,—দেখ ওগো দেখ!" বলিতে বলিতে কুমারী "সি" র সেই কায়া বা ছায়া, আপনার বুকের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল! ভীতিবিস্ময়স্তম্ভিত নেত্রে কুমারী "ভি" দেখিলেন, মূর্ত্তির বক্ষস্থলে প্রকটকঙ্কালমালা—কি ভয়ানক ! কুমারী "ভি" যে তদ্দণ্ডে মূর্চ্ছিতা হইলেন না ইহাই আশ্চর্য্য !—ছায়ামূর্ত্তি আবার বলিতে লাগিল, "কুমারী ভি !" তুমি আমার চিরশুভাভিলাষিনী। তাই তোমার কাছে একটা কথা বলিতে আসিলাম। কাল সকালে তুমি গীর্জ্জাঘরে গিয়া আমার পাপ মোচনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিও। আগে আমি ভগবান মানিতাম না। আর এখন ? সে কথা বলিয়া দরকার নাই। তুমি পুণ্যবতী—তোমার হৃদয় পবিত্র ! তোমার প্রার্থনায়, বিশ্বপতি এই পাপিষ্ঠার প্রতি দয়া করিতে পারেন। ও হো হোঃ ! জ্বলিয়া মরিলাম ! জ্বলিয়া মরিলাম !! আর সহ্য হয় না কায়া গেল ত, যাতনা রহিল কেন ? হে বিভু ! জগৎপতি ! দয়া কর, দয়া কর নাথ ! আঃ !—"ক্রন্দনস্বর থামিয়া গেল,—নভোবক্ষে বিজলী প্রতিম ছায়া মূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ঊষা।

অয়ি ঊষে ! স্নেহময়ী জননী আমার !
প্রতি দিন নিশা শেষে মেলি" আঁখি দুটী,
হিরণ্য অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ব নির্ব্বিকার—
হেরি কি সৌন্দর্য্যে মাগো রহিয়াছে ফুটি !'
কি সুন্দর ! কি মোহন ! মধুময়ী ছবি
কি মঞ্জু সঙ্গীত রাজে চরণ মঞ্জীরে ;

মৌন, মূক, জ্ঞানহীন কত দীন কবি
ডুবে থাকে সীমা হীন সুষমা সায়রে!
সৃষ্টির প্রথম হ'তে র'য়েছ ফুটিয়া,
তবু নিত্য নব শোভা চরণে লুণ্ঠিত।
মুগ্ধ আমি—মুগ্ধ বিশ্ব তোমারে চাহিয়া,
মধুরাতে মঞ্জরিত মাধবীর মত!
অয়ি মাতঃ! বিশ্বময়ি নিত্য মনোরমে!
জগৎ ফুটিয়া আছে তব মহা প্রেমে!

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

কেন দেব! মোরে মোহের আধারে
সতত ডুবায়ে রাখ,
মলিন পঙ্কিল সংসার সাগরে
স্নেহের নয়নে চাহ।
দুর বল মন সতত চঞ্চল
পানে তাপে অনুক্ষণ,
ওহে কৃপাসিন্ধু করুণার বিন্দু
দেও, মোরে শ্রীচরণ।
সহস্র সাধন বিফলে আমার
চ'লে যায় নিমিষেতে,
প্রাণের উজ্জ্বল মানষ দীপিকা
নিবে যায় হায়! রাতেথ
জীবন মধ্যাহ্ন সূর্য্য অস্ত প্রায়
ফুরায়ে যেতেছে বেলা,
কিছু নাই সাথে সম্বল আমার
পার যে হইব, ভেলা!
ভীষণ তরঙ্গ পারকুল নাই—
গর্জ্জিছে ভীষণ সিন্ধু.
এ সঙ্কুলে দেব! কেহ নাহি আর
তুমি বিনে মোর বন্ধু।

* * * * *

অপরাহ্ন বেলা আসিতেছে ধীরে
বাজিবে আহ্বান ভেরী,
থাকিতে সময় ওহে দয়াময়
যেন তব নাম স্মরি।
যবে ধীরে ধীরে মরণ আমার
গ্রাসিবে জীবন ইন্দু,
শত অপরাধ, ক্ষমা করি মোর
দিও মোরে স্নেহবিন্দু।

বঙ্গ মহিলা।

"প্রেমের স্বপন"

আজ ও কোন দাগে প্রাণে প্রেমের
স্বপন
ভাঙ্গা প্রাণে কেন বাজে
প্রেমের বাঁসরি
কল্পনায় জাগে কোন মধুর মিলন
কেন গো! পরাণে বহে সুধার লহরি
ঐ যে বকুল গাছে, ম্লান জ্যোছনার মাঝে
কি যেন আবেশে মাখা পাপিয়ার তান
ও যেন আমারি গাছে, পরাণের গান
নীল আকাশের কোলে
দু একটী তারা খেলে
মুখ ভরা হাসি লয়ে লুকাচুরি খেলা
মিলিয়া ওদের সাথে,
খেলিবারে সাদ যায় ও প্রেমের খেলা
ঐ যেন কোন দূরে
কে যেন বাজালে ধীরে
প্রেমের বাঁসরি
সারা মন সারা প্রাণে
ধাইছে উহার পানে
সারাটী জীবন গেছে
কি আবেশে ভরি

সুশীলাবালা দে।

মন্দাকিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উমিচাঁদের প্রাসাদ।

যে কলিকাতা আজি ইংরাজের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত। যাহার শোভা সৌন্দর্য্য অমরাবতীকে পরাস্ত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সুরম্য হর্ম্ম্য, সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম, মনোহর উদ্যান, সুশোভন তড়াগ, বিবিধ কলাদি এক্ষণে যে কলিকাতায় ইংরেজের মহিমাকীর্ত্তন করিতেছে—দামিনী দাসী হইয়া যে কলিকাতা উজ্জ্বলীকৃত করিতেছে, সেই কলিকাতায়, আমাদিগের আখ্যায়িকা বর্ণনার সময়, কয়েকটী অট্টালিকা মাত্র পরিলক্ষিত হইত, ইংরেজের কুঠী, গির্জ্জা, উমিচাঁদের বাসভবন প্রভৃতি অট্টালিকা কলিকাতার শোভাবর্দ্ধন করিত। সে সময়ে কলিকাতার নানা স্থান অরণ্যানি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল।

উমিচাঁদের অন্তঃপুরে মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত একটী প্রকোষ্ঠে রজত-দীপাধারে কর্পূর জ্বলিতেছে। দ্বিরদদন্ত নির্ম্মিত পর্য্যাঙ্ক পার্শ্বে একখানি বহুমূল্যবান কার্পেটের উপরে দুইটি রমণী উপবেশন করিয়া আছেন। উভয়েরই পরিচ্ছদাদি রত্নখচিত—উভয়েরই শিরীষ-কোমল দেহলতা নানাবিধ আভরণে অলঙ্কৃতা—উভয়েই পূর্ণ যুবতী—অপরূপ সুন্দরী। একটী দীপচাঁদের স্ত্রী অপরটী কৃষ্ণদাসের ভামিনী। দীপচাঁদের স্ত্রীর নাম মুরলা, কৃষ্ণদাসের ভার্য্যার নাম লক্ষ্মী। মুরলা বীণা হস্তে কোকিল কণ্ঠে গাহিলেন,—

সঁইয়া! তুয়া লাগি নিধ নেহি গেই।
গলি গলি চূঁড়া তবহিঁ মিলা নেহি॥
তুঁ বড় নিঠুর,
বরজ কঠোর।
তুহারি তুলনা আওর নেহি কোই॥
যৌবন গোঁয়াছু
পরাণ সঁপিছু
সবহি ছোড়িছু তুয়ে মিল্লি নেহি।

সেই ফুল্ল কৌমুদী নিশিতে নীরবতা ভেদ করিয়া সঙ্গীত লহরীতে গৃহ পূর্ণ হইল। উভয়েই ভাবাবেশে মগ্ন হইলেন।

এই সময়ে এক শ্বেত রমণী পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইঁহার নাম বিবি মেরি। ইঁহার স্বামী কণিংউড সাহেব সেই সময়ে কলিকাতার ইংরেজ কুঠীর একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কণিংউড সাহেব কুঠিতে সস্ত্রীক বাস করিতেন। সে সময়ে কলিকাতার কুঠিতে যে কয়েকটী মেম ছিলেন, তন্মধ্যে মেরীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মেরীর বিশেষ চেষ্টা ছিল। তিনি দেশীয়দিগের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতেন।

উমিচাঁদের পরিবারের মধ্যে মেরীর পরিচিত হইবার আর এক কারণ ছিল। মেরী যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ও তদ্রূপ কদর্য্য ছিল। মেরীর ন্যায় ক্রূরমতি রমণী তখন কলিকাতার কুঠিতে আর কেহ ছিল না। হ্যারিংটন সাহেব সে সময়ে কলিকাতায় ইংরেজ কুঠির অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। এই হ্যারিংটনের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার মেরীর প্রবলা চেষ্টা ছিল। এদিকে হ্যারিংটন সাহেবের উমিচাঁদের উপর পূর্ব্বাপর প্রখর দৃষ্টি ছিল। উমিচাঁদের ধনৈশ্বর্য্য গ্রাস করিবার জন্য, উমিচাঁদকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিবার জন্য হ্যারিংটন সাহেব বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। আবার উমিচাঁদের বাটীতে কৃষ্ণদাস বহু ধনরত্নাদি লইয়া উপস্থিত হওয়ায় হ্যারিংটনের লোভের আর পরিসীমা রহিল না। উমিচাঁদের সমস্ত সংবাদ পাইবার জন্য তিনি চতুরা মেরীর ন্যায় আর কোন যোগ্যপাত্র পান নাই। কাজেই মেরীকে তিনি আন্তরিক না ভাল বাসিলেও বাহিক প্রণয়চিহ্ন প্রকাশ করিতে ক্রটি করিতেন না।

শাস্ত্রে বলে প্রণয় অন্ধ, প্রণয়ে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। মেরীর তাহাই হইয়াছিল। মেরী বিশেষ চতুরা হইলেও হ্যারিংটনের চাতুরী-জাল ভেদ করিতে সমর্থা হন নাই। তিনি অবলীলাক্রমে হ্যারিংটনের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়াছিলেন। হ্যারিংটন সাহেব উমিচাঁদের সমস্ত সন্ধান পাইবার আশায় মেরীকে উমীচাঁদের অন্তঃপুরে প্রায়ই গমন করিতে বলিতেন। মেরী এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ উমিচাঁদের বাটীতে প্রায়শঃ গমন করিতেন। মেরী বাঙ্গালা ভাষাতেও কথা কহিতে পারিতেন।

মেরী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র সুরশায় সঙ্গীত থামিল। উভয়ে

সসম্ভ্রমে মেরীকে সম্ভাষণ করিলেন। মেরীও প্রত্যভিবাদন করিলেন। মুরলা কহিলেন—"বড়ই সৌভাগ্য যে বিবির দর্শন পাওয়া গেল।"

মেরী। এত বিদ্রূপ কেন? সৌভাগ্য তোমাদের না আমার।

লক্ষ্মী। সৌভাগ্য আমাদের—কারণ এমন জ্যোৎস্না-পূর্ণ রাত্রিতে সাহেব তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আবার শুদ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া নহে—কালা আদ্‌মীদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মেরী। আমাদের সাহেবেরা তোমাদের পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের আঁচল ধরা নহে। আমরা যখন ইচ্ছা যেথায় সেথায় যাইতে পারি। তোমাদের মতন আমরা বাটীর ভিতর আবদ্ধ থাকি না।

মু। আচ্ছা বিবি, তোমরা এই যে, যে সে লোকের সঙ্গে যেখানে সেখানে যাও, যা'র তা'র সঙ্গে আলাপ কর, ইহাতে তোমাদের স্বামীদের মনে কি কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় না?

মে। তা কেন হ'বে। আমরা স্বাধীন প্রেমের পক্ষপাতী। আমরা স্বামীর দাসী নহি। আমাদিগের বিবাহ চুক্তি মাত্র। যতদিন স্বামী সুখে রাখিবে, যতদিন স্ত্রীর স্বামীর নিকট থাকিবার ইচ্ছা হইবে, ততদিন স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ। স্বামী বা স্ত্রী অন্যের প্রণয়-পাত্র হইলে—অথবা উভয়ের একত্রে বাস অসুবিধাজনক বা ক্লেশকর হইলে পরস্পরে পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে।

লক্ষ্মী। এ চুক্তি মন্দ নহে। তোমাদের বিবাহ একটা ব্যবসা মাত্র! আমাদিগের তাহা নহে। আমাদের বিবাহ শুদ্ধ যে আ-মরণ সম্বন্ধ করিয়া দেয়, তা' নয়, পরলোকেও সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ও অটুট থাকে। আমরা জানি স্বামী আমাদিগের প্রত্যক্ষ পরম দেবতা। স্বামীর সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, স্ত্রী তাঁহার সহচরী।

মে। তাই বুঝি তুমি ঢাকা থেকে স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় এসেছ। তা বেশ! আচ্ছা! তোমার স্বামী এই যে অতুল ধনরাশি সঙ্গে করে এনেছেন, ইহার পরিমাণ কত, তাহা তুমি জান কি? তুমি স্বামীর দাসী-স্বরূপিণী হইয়া থাক, অথচ তিনি কি সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের সকল কথা তোমাকে বলিয়া থাকেন?

লক্ষ্মী। আমরা শুদ্ধ স্বামীর দাসী নহি। হিন্দু রমণী পতির সেবা নানারূপে করিয়া থাকে। কখনও জননীর ন্যায়, কখনও ভগিনীর ন্যায়, কখনও

সহচরীর ন্যায় কখনও দাসীর ন্যায় ভর্ত্তার পরিতোষ বিধান ও পরিচর্য্যা করিতে হয়। স্বামীও অকপটচিত্তে সকল কথা ব্যক্ত করেন। স্বামী যদি কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করেন, তাহা হইলে পত্নীকেও যে তাহার জন্য কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। আমার স্বামী যে অর্থ আনিয়াছেন—তাহা কি আমি জানি না ?

মে। তোমরা কিন্তু অর্থের সদ্ব্যবহার কর না। আমাদের দেশে টাকা কেহ ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখে না। টাকার সুদ যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার একটা না একটা উপায় করা হইয়া থাকে। যদি ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা না খাটে, তাহা হইলে আমাদের টাকা জমা রাখিবার একটা করিয়া কুঠি আছে, তথায় জমা রাখে। তাহাকে ব্যাঙ্ক বলে। এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে সুদ পাওয়া যায়। আচ্ছা! তোমার স্বামী যে টাকা আনিয়াছেন, আমাদের কুঠিতে তাহা জমা রাখেন না কেন? তাহা হইলে টাকার ত সুদ পাইতে পারেন।

লক্ষ্মী। আমি তাহা জানি না। ঐ সকল আমার ভাবিবার কথা নহে। আমি উহা তাঁহাকে বলিতেও পারি না, কারণ আমরা তাঁহার অধিকারিণী নহি। বৈষয়িক কর্ম্ম কিরূপে নির্ব্বাহ করা উচিত, আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা তাহা বেশী বুঝেন।

সু। ঐ সকল কথা যাউক—বিবি তুমি গান গাহিতে জান ?

মে। না। আর আমাদের গানও তোমাদের ভাল লাগিবে না। একেই ত তোমরা আমাদের ভাষা বুঝ না, তাহাতে আবার তোমাদের সুরের ন্যায় আমাদিগের সুর নহে। আচ্ছা বহিন্! তুমি একটা গাও।

সুরলা তখন বীণা হস্তে লইয়া মধুর স্বরে গাহিলেন ;—

সে যে প্রণয় আধার !
সর্ব্বস্ব দিয়াও সাধ মিটে না আমার ॥
আমি তার,
সে আমার,
সে বিনা জগৎ হেরি শূণ্যাকার।
অমিয় নিছনি
সে রতনে জানি,
এঁকেছি যতনে হৃদয় মাঝার ॥

সঙ্গীত সমাপনান্তে বিবি মেরী গাত্রোত্থান করিলেন। মেরী কৌশলে জানিয়া গেলেন কৃষ্ণদাসের আনীত ধনসম্পত্তির কথা অলীক নহে। বলা বাহুল্য, যথাসময়ে প্রণয়াস্পদকে, এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে মেরী বিস্মৃতা হন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মঠ।

রাজমহলের গিরিকন্দরে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীর মঠ। রাজমহলের পার্ব্বত্য শোভা অতীব রমণীয়। অদ্রির উপর অদ্রি মস্তকোত্তলন করিয়া গগনভেদ করিবার উপক্রম করিয়াছে। দূর হইতে হঠাৎ দর্শন করিলে মনে হয়, মেঘমালা ব্যোমপথ ঘিরিয়াছে। গিরিশ্রেণীর যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই দৃষ্টির বিভ্রম ঘুরিয়া যায়। ক্রমশই পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হৃদয় মন হরণ করিতে থাকে। নির্জ্জন প্রদেশে প্রকৃতির সেই মহান্ চিত্র দর্শন না করিলে বর্ণনা দ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুসাধ্য নহে। কোথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপী-শ্রেণী পর্ব্বতের গাত্র আচ্ছাদন করিয়া আছে—কোথাও চিত্তহারী বনফুলের মধুর সৌরভভার বহন করিয়া মারুত সংসারমত্ত মানব হৃদয়ে নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের প্রেমে হৃদয় মনঃ মুগ্ধ করিতেছে, কোথাও ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ক্ষীণধারায় পর্ব্বত গাত্রে বহিয়া যাইতেছে—কোথাও সুন্দর ফল দ্বারা পর্ব্বত পৃষ্ঠ পরিশোভিত হইয়াছে,—কোথাও শ্বাপদাদি বিচরণ করিতেছে,—কোথাও পক্ষীর কলরবে সেই জনশূন্য স্থান মুখরিত হইতেছে। এহেন রমণীয় স্থানে পর্ব্বতাভ্যন্তরে জনৈক ব্রহ্মচারী একাকী গমন করিতেছেন। পাঠক বোধ হয়, ইহাঁকে চিনিয়াছেন। ইনিই দুর্গাদাস রায়কে আত্ম-হত্যা সাধনে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক স্থানে একখানি প্রস্তর অপসৃত করিলেন। প্রস্তর অপসারিত হইলে দেখা গেল পর্ব্বতের পৃষ্ঠায় একটী প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। গহ্বরের মধ্যে ব্রহ্মচারী প্রবেশ করিলেন। অমনই ব্রহ্মচারীর কৌশলে প্রস্তরখণ্ড পুনরায় গহ্বর মুখ আবৃত করিল। ব্রহ্মচারী গহ্বরের ভিতরে অন্ধকার ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অল্পদূর গিয়া এক দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল, ব্রহ্মচারীর করাঘাতে ভিতর হইতে জনৈক নবীন সন্ন্যাসী দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। তিনি

ব্রহ্মচারীকে সন্দর্শন করিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার পুনরায় অর্গলবদ্ধ হইল। ব্রহ্মচারী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর একে একে প্রায় ২৫ জন যুবক সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মচারী ইহাদিগের সকলেরই গুরু। এই কক্ষের পর সুন্দর প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের চারিদিক নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ ও মধ্যে একটী কূপ আছে। এই প্রাঙ্গনের চতুঃপার্শ্বে কক্ষ আছে। এই সকল কক্ষ রন্ধন ও শয়নাগার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। একটী কক্ষে মাতৃকারূপিণী মহাকালী বিরাজিতা।

ব্রহ্মচারীর নাম দেবানন্দ স্বামী। শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া দেবানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন—"বৎসগণ! পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই যে এত দিবস ধরিয়া তোমরা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ, এই জননী জন্মভূমির সেবায় দেহ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ—সেই সাধনার সিদ্ধিলাভের সময় সমুপস্থিত। যে যেরূপ যোগ্যতা প্রকাশ করিবে, সে তদ্রূপ ফললাভ করিতে পারিবে—"

ব্রহ্মচারীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে বিমলানন্দ নামক জনৈক শিষ্য বলিলেন, "প্রভো! যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমরা তৎপালনে সতত প্রস্তুত। আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতেও পশ্চাৎপদ নহি। প্রভুর তিন শত শিষ্যের মধ্যে মঠে এক্ষণে আমরা পঁচিশ জন মাত্র উপস্থিত আছি। আপনার আদেশ মত, অন্যান্য শিষ্যেরা ২।১ দিবসের মধ্যেই মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।" আমরা পরীক্ষা প্রদানে সততই প্রস্তুত।

দেবানন্দ স্বামী শিষ্যের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি যে কর্ম্মে তোমাদিগকে নিয়োজিত করিতেছি, তাহা তোমাদিগের ন্যায় ২৫ জনের দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। তোমাদিগকে মুর্শিদাবাদে অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে। সিরাজদ্দৌলার পাপিষ্ঠ পারিষদ করিম খাঁ, ধর্ম্ম-প্রাণ দুর্গাদাস রায়ের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। দুর্গাদাস রায়ের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও পাপিষ্ঠের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই, অবশেষে তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া নিজের বাটীতে রাখিয়াছে। করিমের যেরূপ প্রকৃতি, তাহার যেরূপ মনোভাব, তাহাতে দুর্গাদাস রায়ের কন্যার প্রতি অত্যাচার করিতেও পাপিষ্ঠ ক্ষান্ত হইবে না। তোমাদিগকে করিমের বাটী আক্রমণ করিয়া

দুর্গাদাসের পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, ইহাই পরীক্ষার সূচনা। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ভাবিতে হইবে।"

দেবানন্দের শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়ঃক্রম সপ্তাদশ বৎসর হইবে। ইহার নাম সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ বলিয়া উঠিলেন—আপনার প্রদত্ত শিক্ষার ফল ব্যর্থ হইবার নহে। ক্ষেত্র যতই অনুর্ব্বর হউক না কেন, কৃষকের কৌশলে ও চেষ্টাতে তাহাতেও ফলোৎপাদন হইয়া থাকে। আমরা অযোগ্য পাত্র হইলেও আপনার উপদেশাবলী বীজ আপনারই আশীর্ব্বাদের গুণে আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে। আপনিইত শিক্ষা দিয়াছেন—যে মাটীতে এই নশ্বর দেহ গঠিত, সেই মাটীর কল্যাণার্থ এই দেহপাত হইলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। আমরা বুঝি, যিনি অত্যাচারী, অবিচারক, তিনি মানবকুলের শত্রু। আপনার আশীর্ব্বাদে এ শিক্ষা আমাদিগের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হইয়াছে। করিম খাঁ রাজার জাতি হইলেও প্রজাপীড়ক—ভ্রাতৃদ্রোহী। তাহার শাসন করা, সুনিয়মে বিরাট মানব সমাজের কল্যাণে রত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

সচ্চিদানন্দের কথায় দেবানন্দের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হইল—তিনি সানন্দে সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—তোমরা এখনই প্রস্তুত হও। দুর্গাদাস রায়ের পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়া এই মঠে আনয়ন করিবে। আমি যদি এখানে না থাকি, তাহা হইলেও তাহাদিগের যেন যত্নাদির ক্রটী না হয়।"

দেবানন্দ স্বামীর বাক্যাবশানে শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ স্বামী সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলেই তখন মুর্শীদাবাদ যাত্রার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিরহাবসানে।

কত, যুগযুগান্ত বিচ্ছেদ পরে
আবার হয়েছে দেখা,
কত হিমানি চলিয়া গিয়াছে
রাখিয়া মলিন রেখা,—

কত বসন্ত আইল যাইল
কত ফুল গেল ঝ'রে;
কত যে কোকিল কুহরি কুহরি
মরমে যাইল ম'রে।

অতৃপ্ত হৃদয় লইয়া গিয়াছ
পৃথিবী ঘুরিয়া শেষে,—
লোহিত আকাশে নদীর উপরি
মিলিলে আজিকে এসে।
এবে মুখোমুখি বসিয়ে দুজনে
জুড়ায়ে হৃদয় ঘায়,

অতীত যুগের বিরহকাহিনী
কহিতেছ অনিবার।
একটী নীরব চোকের চাহনি
কহিতেছে কথা শত।
এইরূপে ওগো বিহগ দম্পতি
চিরকাল থাক রত।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

মাসিক সংবাদ।

নূতন রেল। পঞ্জাবের শিয়ালকোট সহর হইতে অমৃতসর সহর পর্য্যন্ত রেল লাইন বসিতেছে।

ত্রিপুরা-সচিব। শ্রীযুক্ত আনন্দচরণ গুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি ত্রিপুরা মহারাজের সচিব হইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় ডেপুটি মাজিষ্টর ছিলেন।

ভূমিকম্প। ২৯ অগ্রহায়ণ সোমবার পঞ্জাবের ডেরাঅঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ সেকেণ্ডকাল কম্পনবেগ ছিল। বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের সদস্য। মৌলবী সৈয়দ সাম্সুল হুদা পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশের লাটসভার সদস্য পদ পাইয়াছেন।

পাঁচখুন। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার এক মাসের মধ্যে পাঁচটি খুন হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি পোষ্ট-মাষ্টার এ সহরে গৃহস্থের ইচ্ছামত ঘরে ঘরে ডাকঘর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গৃহস্থেরা ইচ্ছামত বাড়ীতে দো-কুটারি একটী ডাকবাক্স রাখিতে পারিবেন। এককুঠারির চাবি পিয়নের নিকট থাকিবে। উহাতে গৃহস্থ ডাকে দিবার জন্ত প্রত্যহ চিঠী পত্রাদি রাখিতে পারিবেন। দ্বিতীয় কুঠারির চাবি গৃহস্থের নিকট থাকিবে। উহাতে পিয়ন প্রত্যহ গৃহস্থের নামের চিঠি পত্র রাখিয়া যাইবেন। বাক্স রাখিবার ফি বৎসরে বারো টাকা লাগিবে। বাক্সও পোষ্ট কর্ত্তৃপক্ষই যোগাইবেন। বাক্সের দাম চার টাকা বা ছয় টাকা।

ময়মনসিংহ সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গ আসাম গবরমেণ্টের ইচ্ছায় অস্ত্র আইনের বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ কুমার বাহাদুর এখন বিনাপাশে যে কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন।

কলিকাতা শোভাবজারের পরলোকগত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ একখানি মর্ম্মর ফলক প্রতিষ্ঠা করিতে গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গত মকর সংক্রান্তির দিন প্রয়াগে ত্রিবেণী স্নান উপলক্ষে আশীহাজার হইতে এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আবার সাগরসঙ্গমে কলিকাতা হইতে প্রায় পনর হাজার যাত্রী গিয়াছিল। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা-প্রমাণ পাইতেছে।

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য চড়িতেছে বই কমিতেছেনা। তাই বাঙ্গলা গবরমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগীয় অধস্তন কর্ম্মচারিরা জানুয়ারি মাস হইতে আরও তিন মাস ভাতা পাইবেন।

নির্ম্মাল্য।

সারাটী বছর পরে মাঘী-পঞ্চমীর দিন
এসেছেন বীণাপাণি কিন্তু মোরা অতি দীন।

কেবল পূজিবে আর নাহিক রতন রাজি—
ভারতের কবিকুল নীরব নিষ্পন্দ আজি।

বঞ্চিত রতনে যদি তবু মাতঃ আছে তাঁর,
তোমার চরণ দুটী পূজিবার অধিকার।

সযতনে দিতে অর্ঘ্য এস ভাই ফুল তুলি,
শ্বেত, স্নিগ্ধ পুষ্পদল রসাল মুকুল গুলি।

যে মাতা মহান্ মন্ত্র ঢালিয়া দিতেছে মনে
যাঁর প্রসাদের কণা পেয়ে বিশ্ববাসীগণে,

তুলিছে প্রাণের গীতি ঝঙ্কারিয়া বারে বারে
মরম মূর্চ্ছনা শত হৃদয়ের তারে তারে।

পূজিব আমরা আজি আরাধ্যা সে মহাদেবী
করিব সফল প্রাণ সে পদ যুগল সেবি।

বাণীর চরণ পদ্মে এস মধুকর যত,
মহানন্দে কর পান মকরন্দ অবিরত।

দেখ দেখ কিবা মার সৌর্য্য শান্ত প্রতিকৃতি;
শ্বেতরাণী শ্বেত পদ্মে বীণা করে অবস্থিতি।

কি ভাবে বীণার তন্ত্রী ক'রে উঠে গুঞ্জরণ;
আবেশে বিভোর হৃদি হ'য়ে থাকে অচেতন।

জ্ঞানের বিমল জ্যোতি দীপ্ত করে চরাচর,
ডুবে তাহে শত রবি কত শত শশধর।

এসেছ করুণাময়ী সারাটী বছর পরে,
কি দিয়ে পূজিব মাগো—কিছু যে মা নাই ঘরে।

কানন কুসুম রাজি সচন্দন পত্র দল
আমার এ দীন অর্ঘ্য; নয়নের অশ্রুজল।

অধম সন্তান তব যাচিতেছে এই বর
হৃদয় নীরব ভাষা যেন ফুটে নিরন্তর।

বীণা সনে সমতানে গেতে যেন পাই বল
জীবনে তোমারে সেবি পাই সুখ নিরমল।

শ্রীজগদীশচন্দ্র তরফদার।

সে কই?

আমার সে কই? তোমরা কেহ কি বলিবে না গো,—আমার সে কই? যে আমার অতীত-স্মৃতির নির্ভর-কেন্দ্র,—যে আমার সাগর-সেচা-মাণিক,—নন্দনের পারিজাত,—নয়নের মণি,—পিপাসার জল,—যে আমার হৃদয়ের আশা,—সাধনার বল,—তোমরা কেহ কি বলিবে না. সে আমার কোথায় গেল? যাহার অভাবে সংসার-উদ্যানে এমন হু হু দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কেহ যে বল না গো,—সে কই আমার?

সংসার-উদ্যানে হু হু দাবানল,—কথা শুনিয়া তোমরা এ উহার পানে চাহিয়া বড় যে বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছ? তোমরা ভাব,—'যেমন সংসার ঠিক তেমনই যে আছে, দাবানল কই?' তোমরা বল,—'নিত্য যেমন চাঁদ উঠে,—ফুল ফুটে,—কোকিল কুহরে,—ভ্রমর ঝঙ্কারে,—আজও তাই! তবে সংসারে আগুন ধরিল কই?'—হায় আমার পোড়া কপাল! তুমি লইয়া,—তোমাদের সঙ্গে ঘর পাতিয়া ত আমার সংসার নহে; আমার যাহারে লইয়া ঘর-কন্না, যাহারে লইয়া সংসার,—এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে—এ অনন্ত সৌর-জগতে মাত্র যে আমার, আমি যার,—তার অভাবে আমি কে?—কোথায় সংসার?

প্রভাতে উষা হাসিতে না হাসিতে, দয়েল ডাকিতে না ডাকিতে, যাহার সুষুপ্ত বদন-কমলের অপূর্ব্ব মাধুরী প্রথমে দেখিয়া তারপর জগৎ দেখিতাম, সে যদি আমার কাছে নাই,—তবে আমার আবার সংসার রহিল কোথায়? আমার সংসারে যে গো সেই সর্ব্বময়-সর্ব্ব! তারই নিশ্বাস—মলয় পবন, তারই হাসি—পূর্ণিমার রজত-কৌমুদী, তারই মুখ,—সুধাময় সুধাকর, তারই গান—পাপিয়ার তান,—সে নাই, আমার সংসার কোথায়? তাহার অভাবে সংসার যে আমার জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইল!

সংসার থাকিল না,—আমি যদি না থাকিতাম, কোনও দুঃখ ছিল না। কিন্তু সংসার নাই, তবু কালানল কেন, সে নাই তবু স্মৃতি কেন? হায় হায়, আমার সে কই?

ভাল, আগুনে সব ভস্ম হয়,—উদ্যানে আগুন লাগিয়া উদ্যান ভস্ম হইলে, দেখি—ছাই—অনন্তে মিশিতে পায়, কিন্তু এই যে আমি স্মৃতির তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছি,—তবু আমি অনন্তে মিশি না কেন? আমার

বেলাই এ ব্যতিক্রম কেন? ওগো, নিশিদিন ধিকি ধিকি পুড়িতেছি,—রাবণের চিতা বুকে ধরিয়া আছি,—আর যে সহিতে পারি না।

তুমি গম্ভীর-বাদী—হিতবাদী, যে ই হও, তোমার কথা আমি মানিয়া লইতে পারি না। তুমি মুখভার করিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিতেছ,—'তোমার হইলে সে পালাইত না, সে তোমার নয়,'—ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলিও না গো, অমন কথা বলিও না। সে আমার নয়?—আমার হাসিতে যার সুখ-রাশি উছলিয়া উঠিত, যে হাসিয়া হাসিয়া কতই নাচিত; আমার মুখ ভার দেখিলে যে নয়নাসারে বুক ভাসাইত,—সে আমার নয়? আমার বুকে বুক চাপিয়া,—আমার মুখে মুখ রাখিয়া,—যে, নিমিষে নিমিষে চখের ভাষায় জানাইয়া দিত,—'আমি তোমারই, আর কারো নই—শুধু তোমারই'—সে আমার নয়?

আমার অশনে যাহার অশন, আমার শয়নে যাহার শয়ন ছিল; যে আমার বিপদে সহায়, সম্পদে সহচর, রোগে চিকিৎসক, স্নেহে জননী ছিল—যে শুশ্রূষায় ভগিনী, পরিচর্য্যায় দাসী, সর্ব্বকার্য্যে সহধর্ম্মিনী ছিল, সে আমার নয় তো, অপরের? হরি বোল হরি, তবে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সকলই মিছা! এ অখণ্ড-মণ্ডলাকার—অনন্ত-সৌর জগৎ—কিছুই—কিছু নয়!

ওগো, না,—না, হয় হউক, সকলই মিছা—হয় হউক কিছুই কিছু নয়, তথাপি সে আমার আমি তার। আমি এই মিছারই ভিতরে, অনন্তকাল ডুবিয়া থাকিব,—আমি বরং মিছাকে লইয়াই সংসার খাড়া করিব, তথাপি ভাবিব,—সে আমার,—আমি তার। সে ছাড়া আমি—কায়া ছাড়া ছায়া—অস্তিত্ব সম্ভবে কিসে?

না, গো, না, আবার আবার—শতবার, সহস্রবার, বলিব,—সে আমার আমি তার, আমি তার—সে আমার। কিন্তু যা—আমি যে খুঁজিতে ছিলাম—আমার সে কই? যাহার অভাবে—আমি নাই,—নাই গো, তবু জলিয়া পুড়িয়া মরি,—আমার সে কোথায়? তোমরা কেহ বলিবে না? হায় হায়, স্বর্গ মর্ত্ত্য স্থান বিনিময় করিলে,—কোটি প্রলয় ঘটিয়া গেলে ও যাহাকে ছাড়া আমার মুহূর্ত্ত চলে না,—যাহাকে ছাড়া আমার আমিত্ব নাই, স্বামীত্ব নাই, অস্তিত্ব নাই—বলনা গো তোমরা আমার সে কই?

ওগো, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ—এই না তোমাদের আশার বাণী? হরি—হরি, সব ফাঁকি—ভুয়ো ফাঁকি। তোমরা বলিয়া থাক,—

'সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর আবার সুখ আসে,'—তোমাদের মতে—পূর্ণিমা গেলে অমাবস্যা—অমাবস্যা গেলে পূর্ণিমা আছে,—মিছা কথা। নইলে আমার সে যে গেল, সে কই? তোমরা বুঝাও—'রাহুগ্রাসের মুক্তি আছে,—রজনীর প্রকাশ আছে'—কিন্তু আমি যে দেখিতে পাই না গো—আমার সে কই?

শ্রীরজনীচন্দ্র কাব্যরঞ্জন।

ভিক্ষা।

১

প্রভো,
এ দীনা দাসীর আকুল প্রাণের
ভিক্ষা তোমার চরণে,
হোক নিয়োজিত কায় মনঃ মম,
তোমারি কর্ম্ম সাধনে।
দূর ক'রে দাও বিষাদ বেদনা,
দূর ক'রে দাও অসার ভাবনা,
আঁধার হৃদয় করহে দীপ্ত
তোমার দীপ্ত কিরণে,
দাও প্রেমময় করুণা করিয়া
নির্ভয় বল জীবনে।

২

মম হৃদয়ের মলিনতা দাও
নির্ম্মূল করে মুছি'য়া,
দাও প্রভো, মম স্বার্থ—মলিন
অন্ধ মমতা কাড়িয়া।
দাও এ দাসীরে করুণানিলয়,
শিশুর মতন মুক্ত হৃদয়
অনাবিল প্রীতি, স্নেহ সরলতা
পুণ্য আলোক ভরিয়া;
দাও শিরে মম শুভ আশীর্ব্বাদ
শান্তি-প্রবাহ ঢালিয়া।

৩

দাও প্রিয়তম! সরল বিশ্বাস,
নির্ভয় কর মরণে;
মানস মধুপে রাখ নিশিদিন
তোমার পদ্ম চরণে।
ভুলিয়া বিপথে যাই যদি চ'লে;
সুপথের কথা দিয়ো তুমি ব'লে,
ল'য়ে মোর তরে কর্ম্ম শকতি
প্রেমের দীপ্তি আননে
জাগ্রত থে'ক সদাই আমার
হৃদয় সরোজ আসনে

প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি রচয়িত্রী।

শেষ কথা।

আজি তুমি কোথা যাও,
কাড়িয়া মায়ের সুখ,
তোমার বিচ্ছেদ সহি,
কেমনে বাঁধিব বুক ?
কিসের অভাব তব,
কার স্নেহ পাও নাই ?
মায়ের স্নেহের ধন,
কোথায় চলিলে ভাই !

কেন বোন্ শুভদিনে,
ফেলিতেছ আঁখিজল ?
মধুর মরণ ডাকে,
"আগে চল্ আগে চল্।"
জাননা কি এ জগতে,
জীবন মরণময়।
আমার ভগিনী তুমি,
মরণে কিসের ভয়।

বুঝেনা হৃদয় ভাই,
মানেনা আদেশ হায় !
অভাগী মায়ের তরে,
ফাটে হিয়া বেদনায়।
যেওনা যেওনা তুমি,
কেমনে বিদায় দিব ?
কেমনে মায়ের কাছে,
এ দারুণ কথা কব ?

আকুল হ'য়োনা বোন্।
ক'টি কথা ব'লে যাই,
বলো ভাই বোন্ গণে,
মায়েরে বলিও তাই,
বলিও "কুমার তব,
তোমারে স্মরণ করি,
ছেড়ে গেছে ধরাধাম,
সাধের মরণে বরি।"

কি আর বলিব ভাই,
জাগে প্রাণে হাহাকার,
হতাশে হৃদয় ফাটে,
ঝরে অশ্রু অনিবার।
মনেরেখো ফিরে এস,
শুভাশীষ ঝরে অই,
সার্থক জীবন তব,
তুমি ভাই চিরজয়ী।

তবে বোন্ চলিলাম,
মুছে ফেল আঁখিজল
আমারে স্মরণ করি,
হৃদয়ে বাঁধিও বল।
আমার স্নেহের বাণী,
ভুলে যাও হাহাকার,
চিরদিন মনে রেখো,
অভাগিনী মা আমার !

শ্রীমতী বিজনবালা বসু।

পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব।

পুনর্জ্জন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ও সংশয় থাকিতে পারে না। জীবের জন্মের পর যেমন মৃত্যু আছে, মৃত্যুর পর ও তেমন পুনর্জ্জন্ম আছে। এই জনন মরণ অপবর্গান্ত। যেমন জনন থাকিলেই মরণ আছে, তেমনি মরণ থাকিলেই অমরণ ও আছে। অমরণের অপর নাম অপবর্গ। মরণান্তে এই অপবর্গ বা মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যুর পর, জীবের জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

কারণ কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা এবং কার্য্য তাহার ব্যক্তাবস্থা। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্ভবে না। জীবের জনন মরণরূপ কার্য্যেরও একটা কারণ আছে। সে কারণ কর্ম্মসংস্কার। এই কারণের নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যুর পর জন্ম ধ্রুব সত্য। যেখানে প্রাণ বায়ু সেই খানেই মন—যেখানে মন সেই খানেই কর্ম্ম—যেখানে কর্ম্ম সেই খানেই ভোগ। জীব ও কর্ম্ম জীবাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি।

জীবের দেহাদিতে আতমবুদ্ধি হইতে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয়, এই অবিদ্যা হইতে রাগ, দ্বেষাদির আবির্ভাব হয় এবং এই রাগ, দ্বেষাদি হইতে জীবের কর্ম্মকরণের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাই জীব স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইলে ও আপনাকে কর্ত্তাজ্ঞানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই কর্ম্মবলে জনন মরণ রূপ বিবিধ দুঃখ উপভোগ করে। কর্ম্ম=পাপ+পুণ্য। পাপপুণ্যই কর্ম্মশরীর অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের কারণ কর্ম্ম; কর্ম্মের কারণ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দূর হইলেই পুরুষ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয় ইহাই মোক্ষ।

আত্মার এই পাপ পুণ্যরূপ সংস্কার বা কর্ম্মাশয় ক্রিয়াযোগাদি দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়। এই কর্ম্মাশয়ের নাশ না হইলে তাহার ফলে জীবকে অবশ্যই বাধ্য হইয়া বারম্বার জন্ম, বারম্বার মরণ ও বারম্বার সুর, নর, তির্য্যগ যোনিতে পতন এবং অল্পকাল বা বহুকাল জীবণধারণ এবং সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

পাপপুণ্য কায়িক, বাচিক ও মানসিক। কায়িক পাপ যথা প্রাণীহত্যা, চৌর্য্য এবং পরদার গমনাদি। বাচিক পাপ যথা—অসৎ প্রলাপ, পারুষ্য এবং মিথ্যা কথনাদি। মানসিক পাপ—পরধনে চিন্তা, সর্ব্বজীবে দয়াশূন্যতা এবং কর্ম্মের ফল হউক এই রূপ চিন্তা ইত্যাদি। ইহাদের বিপরীত কার্য্যগুলিই পুণ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে

মনুষ্য কায়িক পাপদ্বারা স্থাবর যোনি, বাচিক পাপদ্বারা তির্য্যক্ যোনি এবং মানসিক পাপদ্বারা অন্ত্যজাতি প্রাপ্ত হয়। অপিচ "পূর্ব্বজন্মে যিনি প্রভু ছিলেন, বর্ত্তমান জন্মে হয়ত তিনি ভৃত্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মে যাহারা ভ্রাতা ভগিনী ছিল, বর্ত্তমান জন্মে হয়ত তাহারা স্বামি স্ত্রী হইয়াছে। আবার যে সকল জীব আছে তাহাদের মধ্যে আমার কোনকালে কোনও সম্বন্ধ ছিল না এ কথাও সত্য নহে।" তাই বলি অপবর্গ বা মোক্ষই জীবলীলার চরম পর্ব্ব। মরণান্তে এই অমরণ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন জীবের ত্রিলোক মধ্যে জন্ম বা পুনরাবর্ত্ত অবশ্যম্ভাবী। দেহ ত্যাগ রূপ মৃত্যু দ্বারা এই জনন মরণের পূর্ণ উপরাম হয় না—কারণ "যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তিঃ—শুনিশূকরে"। ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। "চিত্ত নিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ"। জীবের চিত্ত নিবৃত্তি হইলে বাসনা ক্ষয়ে মোক্ষ হয়। "ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ"। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির নামই মোক্ষ। জীবিত জনের অপরিতৃপ্ত বাসনার আকর্ষণ হেতু—অথবা জীবাত্মার অভুক্ত সংস্কার রাশির আবেগ বশতঃ—দেহান্তে জীবের মোক্ষলাভ না হইয়া পুনরায় দেহলাভ অবশ্য ঘটিয়া থাকে।

মরণান্তে পুনর্জ্জন্মলাভ অতি সত্বর ঘটিয়া থাকে। শ্রুতি এ বিষয়ে তৃণ জলৌকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আতিবাহিক দেহে জীব অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। মৃত্যুর পর কৃত কর্ম্মের ফল ভোগার্থে জীবের তদযোগ্য স্থূল দেহ লাভ অনতি বিলম্বেই সঙ্ঘটিত হয়,—কেন না আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম দেহে কোন প্রকার ভোগাদি সম্ভবে না। "না শরীর স্যাতমনো ভোগঃ—কশ্চিদস্তীতি"। স্থূলের সংযোগ ব্যতীত ভোগ অসম্ভব। জীবের কৃত কর্ম্মাদির ফল স্বরূপ—স্বর্গ নরক বা সুখ দুঃখাদি ভোগ পুনঃ দেহ লাভ হইলেই ঘটিয়া থাকে।

মুক্ত পুরুষের আপ্তকাম হেতু বহিরাকর্ষণ না থাকায় দেহান্ত সময়ে তাঁহার প্রাণাদি ইন্দ্রিয় ছিদ্রপথে উৎক্রমণ করে না; কিন্তু বদ্ধজীবের অতৃপ্ত বাসনার আতিশয্যে বহিরাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দেহান্তকালে তাহার অধিভাসিত লিঙ্গদেহ কোন এক ইন্দ্রিয় ছিদ্রপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যমালয়ে গমন করে এবং তথায় ঈশ্বরাধীনে বায়াদিক্রমে অধিরোহণ বা অবরোহণ করিয়া ত্রিলোকে বিবিধ প্রকার ভাবনাময় শরীরের অনুরূপ ষাটকৌষিক দেহ ধারণ করিয়া থাকে।

অতএব স্থির হইল যে যাবৎ লিঙ্গদেহের বাসনা বা সংস্কাররূপ অন্তরায় যোগানুষ্ঠানাদি দ্বারা দূরীকৃত না হয়, ততদিন সূক্ষ্মদেহ স্বকারণে লীন হইতে

পারে না—অর্থাৎ জীব যতকাল পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। পুনর্জ্জন্ম না মানিলে আর গত্যান্তর নাই।

এক্ষণে এই পুনর্জ্জন্মরূপ অতীন্দ্রিয় বা অপ্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের প্রমাণ কি? প্রমাণ আপ্তোপদেশ। যিনি তপ এবং জ্ঞানবলে রজো এবং তমোগুণের অতীত, যিনি ত্রিকালজ্ঞ, যাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদা অব্যাহত তিনিই আপ্ত, শিষ্ট বা বিবুদ্ধ নামে খ্যাত। তিনি সংশয়শূন্য এবং সত্যবাক। এবম্বিধ মহাপুরুষের উপদেশকে আপ্তোপদেশ বলে। সকল দেশে আপ্তোপদেশই সকল শিক্ষার নিদান। জীবের মঙ্গলার্থে সকল দেশে সকল সময়ে এই প্রকার অলৌকিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

নিম্নে আপ্তোপদেশ বা শাস্ত্রাদিতে জন্ম মৃত্যু তত্ত্ব কি ভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

মৃতাশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ।
নানা যোনি সহস্রাণি ময়োষিতানি যানি বৈ॥
আহারো বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাস্তনাঃ।
মাতরা বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা॥

(নিরুক্ত)

আশা-পাশ-শতা-বদ্ধা বাসনা ভবধারিণঃ।
কায়াৎ কায়মুপযন্তি বৃক্ষাদ্ বৃক্ষমিবাণ্ডজঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

ইচ্ছা দ্বেষ পূর্ব্বিকা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তিঃ।
তৎ সংযোগো বিভাগঃ॥

(বৈশেষিক দর্শন)

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ।

(গীতা)

বহুনি মে ব্যতীথানি জন্মানি তব চা অর্জ্জুন।

(গীতা)

পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য
হর্ষ, ভয় শোক সম্প্রতিনত্তেঃ। (ন্যায়দর্শন)
প্রেত্যাহারাভ্যাস কৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ। (ন্যায়দর্শন)

তাহার পর তোমরা বালক ভক্ত প্রহ্লাদ ও ধ্রুব, বালক যোগীশঙ্কর এবং বালক ব্রহ্মবিদ্ অষ্টাবক্রের বিষয় পাঠ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই শিশু সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিশু চিত্রকরের অভ্যুত্থানের কথা শুনিয়া থাকিবে, কেহ কেহ হয়ত এবম্বিধ জ্ঞান সম্পন্ন শিশুকে দেখিয়াও থাকিবে। অপরিণত বয়সে এরূপ পরিপক্ক বুদ্ধিমত্তার কারণ কি? জন্মান্তরীণ সঞ্চিত সংস্কারই ইহার প্রকৃত কারণ।

এই আপ্ত পুরুষ বা জতিস্মরের কথা যে কেবল আর্য্যশাস্ত্রে আছে তাহা নহে, গ্রীক ইতিহাসেও ইহার যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিল্টন্, টেনিসন্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ কবিদিগের কাব্যাদিতেও পুনর্জ্জন্মবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল আপ্তোপদেশ দ্বারা জীবের পুনর্জ্জন্মের ধ্রুবত্ব সুস্পষ্ট প্রমানীত হইতেছে। ইহাতে আস্তিক্য বুদ্ধি স্থাপন কর, অশেষ কল্যাণ লাভ হইবে।

শ্রীদুর্গাচরণ দাস বি, এ।

আমি।

আমি আমি করিয়া কে বেড়াইবে ভবে;
আমি ব'লে কোন বস্তু চির দিন রবে!
কে আমি কি আমি
কোথাকার আমি
আমি ব'লে ধর যদি অস্থি চর্ম্ম সার;
তাওত দুদিন পরে হবে ছারখার।
আমি ব'লে নাহি কিছু সংসার ভিতর;
আমি' যাহা দেখ তুমি মাংস পিণ্ড সার।
তাও এক দিন
মাটীতে হইবে লীন
তবে কেন আমি ব'লে বৃথা অহঙ্কার;
আমাতে না দেখি কিছু আমিত্ব আমার।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

আর্য্য-স্থাপত্য।

চিত্র বিষয়ে ভারত যত না প্রসিদ্ধ, স্থাপত্য বিষয়ে ততোধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় স্থাপত্যের সামান্য নিদর্শনও যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত কৌশলপূর্ণ কার্য্য ভূতলের আর কোন জাতি করিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে ভারত অপ্রতিদ্বন্দ্বী

ভারতীয় শিল্পীগণ স্থাপত্যের স্থান নির্ব্বাচনেও যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহাও প্রশংসা যোগ্য। এই স্থান নির্ব্বাচনে উভয় জাতির প্রকৃতিগত বৈষম্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ইউরোপখণ্ডের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট মন্দির ও প্রাসাদাদি মুক্ত-জনতা নগরের কলকোলাহলের মধ্যে স্থাপিত। কিন্তু ভারতীয় পৌরাণিক সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরাদি নিস্বর্গের মুক্ত অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, লোকলোচনের অন্তরালে আপনাদিগকে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই সকল মন্দিরাদি হয়, বিপুলবিস্তার ভীমাগর্জ্জী সাগরের ক্ষুদ্র ও জনবিরল দ্বীপ-মধ্যে স্থাপিত, নয় দুরাধিগম্য গিরি কণ্টকিত প্রদেশে অবস্থিত, অথবা বনপাদপ-বেষ্টিত একান্ত বিজন স্থানে সংস্থাপিত। *

তাজমহল যমুনা-বারি বিধৌত মুক্তস্থানে অবস্থিত, তাই তার শোভা পরম উপভোগ্য। ভাবুকের হৃদয়হারি, কবির মানসানন্দ প্রদায়ক। কিন্তু তুমি তাজমহলকে কলিকাতার জনতাবিক্ষুব্ধ, প্রাসাদ-কণ্টকিত কোন স্থানে আনিয়া বসাইয়া দাও; দেখিবে তাজমহলের সৌন্দর্য্য কোন নিপুণ কুহকীর কুহকদণ্ডস্পর্শে স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইয়া যাইবে। স্থাপত্যের শোভাবর্দ্ধনার্থ উপযুক্ত স্থাননির্ব্বাচন শক্তির যেমন আবশ্যক, এমন আর কিছুরই নহে।

এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, "এলিফান্টা, ইলোরা প্রভৃতি গুহাভ্যন্তরে যে সকল শিল্পকার্য্য দেখা যায়, সে সকলের নিমিত্ত আর্য্যগণ প্রশংসাভাজন হইতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা গ্রীকগণের কাছ হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গ্রীক শিল্পীর হস্ত-প্রসূত অনেক কারু-কার্য্য ঐ সকল শিল্প-প্রধান গিরিগুহায় দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে জানা যায়, খৃষ্টাগমনের

---

* Style of Indian Architecture.

তিন শত সাতাস বৎসর * আগে গ্রীক বীর আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতেই ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকগণের সম্বন্ধ সুদৃঢ়তর হয়। কিন্তু ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্কর্য্য বিদ্যা তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিণতাবয়ব ছিল।

সফেন-সাগরাম্বু-ধৌত-চরণ এলিফান্তা বা হস্তিগুম্ফা সুপ্রাচীনকালে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই গুহা-ক্ষোদনকাল প্রায় পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যবাসকালে কিছুদিন এই হস্তিগুম্ফায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মিঃ আর এ হ্যারিশ সাহেবের মতানুসারে এলিফান্তা গিরি-মন্দির চারি সহস্রাধিক বৎসর প্রাচীন। এলিফান্তার প্রাচীনতার আর এক নিদর্শনও বর্ত্তমান আছে। মগধাধিপতি মহাবীর অশোকের এক পালিভাষায় লিখিত অনুশাসন লিপি এই গুহাভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছে। যথা,—

"দেবানাম্ পিয়ো প্রিয়দর্শিরাজা সবত ইচ্ছতি
সবে পাষণ্ডবংশেষু সবেতে ভাবসিদ্ধিম্ চ ইচ্ছতি।"

অর্থাৎ রাজা প্রিয়দর্শীর ইচ্ছা "বিধর্ম্মীরাও সুখে রহুক।" এখানে পাষণ্ড অর্থে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী।

ইলোরার গিরিগুহার কার্য্য ইলু নামধেয় কোন রাজা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। আর্য্যগণের মতে ইলোরার গুহা আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ক্ষোদিত-চিত্রিত হইয়াছিল। উইলসনের মতানুসারে চলিতে গেলেও এই গুহার কার্য্য ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়। অপর পক্ষে Guide to the cave temples of Ellora নামধেয় পুস্তকের মতে এই গুহা ৩৫০ ও ৫০০ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত। কিন্তু এই মত কেহ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, গ্রীকাগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই আর্য্য-শিল্প-সুপ্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিল। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে গ্রীকগণের নিকট হইতে পরিপুষ্ট আর্য্য-শিল্প কোনরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও, সেই সাহায্য আর্য্যগণের একান্ত উপেক্ষাযোগ্য ছিল, সন্দেহ নাই। ‡

---

* রজনীকান্ত গুপ্ত।

‡ ফার্গুসন ভিন্নমতবাদী।

এখন আর্য্যগণের এই সকল গুহা কীর্ত্তির কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

এলিফান্তা বা হস্তিগুম্ফার নাম বোধ করি অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, এবং অনেকেই দেখিয়াও থাকিবেন। বাষ্পীয়-যানের কল্যানে এখন তিন মাসের পথ তিন দিনে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য অর্থব্যয় ও পথকষ্টও একেবারে কমিয়া গিয়াছে। সেই জন্য এলিফান্তা পুর্ব্বের ন্যায় আর দুরধিগম্য নাই।

এলিফান্তা গিরিগুহা বোম্বায়ের অনতিদূরে সাগর মধ্যে অবস্থিত। ইহার দ্বারদেশে এক বিশাল হস্তী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তাহা হইতেই পর্ত্তুগীজেরা এইরূপ নামকরণ করিয়াছে। হস্তি মূর্ত্তিটী এখন বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১

এলিফাণ্ডার প্রধান গুহা চৌত্রিশটী চারি শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভোপরি স্থাপিত। মন্দিরাবস্থান দীর্ঘে ১৩০ ও প্রস্থে ১৩০ ফিট। মন্দিরের কাল-পরিদর্শক একখানি শিলালিপি পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বনে প্রেরিত হইয়াছে। কালপ্রভাবে, বিশেষতঃ মোগল ও পাশ্চাত্যগণের অত্যাচারে মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত সকল মুরতই বর্ত্তমানকালে ভগ্নদশা প্রাপ্ত। মন্দিরের অধিকাংশ প্রধান মূর্ত্তি শিবদুর্গার লীলা-প্রদর্শক। ইহা হইতে বুঝা যায় এই মন্দির শৈবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২ মন্দিরাভ্যন্তরে কোথাও দক্ষ-যজ্ঞ, কোথাও শিব-পরিণয়োৎসব, কোথাও হর-পার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি, কোথাও সিদ্ধিদাতা গণপতির জন্ম, কোথাও ভৈরব ও মহাযোগী।

এই অধুনা ভগ্নদশাপন্ন মন্দির দর্শন করিলে, মন যেরূপ চমৎকৃত হয়, তাহাতে পূর্ব্বকালে এই মন্দিরের অপরূপ সৌন্দর্য্য কিরূপ মনোহারি ছিল, তাহা কল্পনার অতীত।

ভারতবর্ষের মধ্যে ইলোরার মত সুবৃহৎ গুহা আর দ্বিতীয় নাই। এই গুহায় শোভন সোপান শ্রেণী; অধুনালুপ্ত অপূর্ব্ব গঠন অলঙ্কার, সুপ্রসারিত প্রকোষ্ঠ, সুনির্ম্মিত প্রস্তর-পুত্তল, সুমিষ্ট অনবদ্ধর সলিল কুপ, কারুকার্য্যময় স্তম্ভ, সুদৃঢ় সেতু, দুরবিস্তারিত চাঁদনী প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই।

---

১ Cave temples of India By J, Furgusson,

২ বোম্বাই চিত্র।

ইলোরা গুহান্তর্গত "ইন্দ্র-সভা"ই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই গুহা কেবল ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য কালেই সম্পূর্ণ হয় নাই। পরন্তু, বৌদ্ধ ও জৈনগণের হস্ত-প্রসূত নানাবিধ শিল্প-কার্য্য ইহাতে নয়নগোচর হয়।

ভিত্তির অভ্যন্তরে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্ত্তি সকল স্থাপিত। ইলোরার "কৈলাশ গুহা"কে কেহ কেহ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলেন। পর্ব্বতের মধ্য ও বহির্ভাগ ক্ষোদিত করিয়া গুহা-মন্দির সম্পাদিত হইয়াছে। ১ গুহাভ্যন্তর দীর্ঘে ৩৪৭ ও প্রস্থে ১৫০ ফিট। উচ্চতা, স্থানে স্থানে ১০০ শত ফিট। বালফোরে বলেন, রাজা ইলু এই স্থানের উৎসের জলে পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাই এখানে নানারূপ শিল্পানুষ্ঠান করেন। ২ গুহার অভ্যন্তরে পৌরাণিক দেবদেবীর নানারূপ মূর্ত্তি সকলেরও কোন অভাব নাই। ৩

পুণার পথে কারলী নামক গুহাও বড় কম প্রসিদ্ধ নহে। কারলী নামক গ্রাম হইতেই গুহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ১৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই গুহা ক্ষোদিত হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন। এই গুহার চারিদিকে সুউচ্চ পর্ব্বতমালা, গিরি-বক্ষ-বিচ্যুতা, উপলব্যথিতাগতি তরঙ্গিনী, প্রকৃতিরম্য-কর-বিন্যস্ত ঘনপত্রশ্যাম বনস্পতিদল এবং উপরে গগনের অনন্ত নীলিমা ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। বনস্পতির শাখান্দোলন-ধ্বনি, পত্রান্তরালসুপ্ত বিগহেরবিরাব, নির্ঝরিনীর মৃদু কলনাদ ও অবিরামগতি পবনের আর্ত্তনাদ ভিন্ন পার্থিব আর কোন কোলাহল এখানে শ্রবণে পশে না।

কারলীর প্রধান গুহা ৮৪ হস্ত দীর্ঘে ও ৩০ হস্ত প্রস্থে। গুহাটী অর্দ্ধ গোলাকার। গৃহতল হইতে ছাদ প্রায় ৩০ হস্ত উর্দ্ধে স্থাপিত। ছাদটী খিলান করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। গৃহের মধ্যে অষ্টকোণ ও বিচিত্র কারুকার্য্যময় দুই শ্রেণী স্তম্ভ আছে। গৃহের সম্মুখে বারান্দা। সেটি পঞ্চ ত্রিংশত হস্ত প্রশস্ত। ভিত্তিগাত্র কারুকার্য্য খোদিত ও গজমুণ্ড বিরাজিত। বারান্দার সম্মুখে কেশরী চতুষ্টয় শোভিত একটী সিংহ-স্তম্ভ আছে। তৎপরে সোপানারোহনে আর একটী সুপ্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হওয়া যায়। তাহার পর আরও একটী সুবৃহৎ কক্ষ আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র

---

১ J. Furgusson.
Balfour's Ciclopoadia of India,
Buddist Art, By J. Burgess,

ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ছোট ঘর, বারান্দা, প্রস্তর-পুত্তল ও কূপাদি আছে। * অধিকাংশ স্থানই শিল্পসৌকার্য্য-পূর্ণ।

বাস্তবিক, প্রকৃতি মাতার নিকুঞ্জবনাবস্থিত এই মন্দিরের পাদদেশে সমাগত হইলে সংসারচিন্তা আপনার অজ্ঞাতসারে দূরে চলিয়া যায় এবং হৃদয় স্বতঃই সেই পরম পুরুষের শ্রীচরণচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। কণারক পর্ব্বতের রাণী গুা ও প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। গুহা-খোদিত লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ নন্দ ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। এখানেও অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। † সালসিত গুহাও অনেকাংশে অজন্তার ন্যায়। সেইরূপ অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ, সেইরূপ নির্ম্মাণ প্রণালী।

ক্যানেরী, কেরিভেলী প্রভৃতি গুহার নাম অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। কানেরী গুহাভ্যন্তরে একটী বিশাল খিলান আছে। ঐ খিলানের তলদেশে এককালে দুই হাজার লোক বসিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইলোরা ও কারলী, সালসীত ও অজন্তা, আঁধেরী ও ত্রীলঙ্কাস্তা প্রভৃতি গুহাতেও অনেক খিলান দেখিতে পাওয়া যায়। ১

ফারগুসান সাহেব বলেন "ভারতবর্ষই খিলানের আদি উৎপত্তি স্থান। ভারতবর্ষ হইতেই খিলানের নির্ম্মাণ-কৌশল অন্যান্য দেশবাসীগণ জানিয়া লন।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কহেন যে মিসর দেশীয় ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষে গতায়াত করিতেন। বহুকালরুদ্ধ একটী পীরামিডের মধ্যে কয়েকটী বহু প্রাচীন চৈনিক পাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতেই এই মতোৎপত্তি।

হিন্দুগণের নির্ম্মাণ প্রণালীর আর একটী বিশেষত্ব আছে। তাঁহাদের ক্ষোদিত গুহা মধ্যে এমন অনেক খিলান আছে, যে সকলের নিচে দাঁড়াইয়া গলা ছাড়িয়া চেঁচাইলেও তাহার প্রতিধ্বনি হয় না। ২ অধিকন্তু ঐ সকল গুহার বিপুলভার ছাদ সকল এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর উপরে স্থাপিত, যে দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্রকুমার রায়।

---

* History of Architecture,

† Raja Rajendro Lall Mitra.

১ N0tes on Buddlist Art, By Oldenburg,

২ আর্য্যজাতির শিল্প চাতুর্য্য। (শ্যামাচরণ শ্রীমানী)

রমণী।

রমণী সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই একটী সাধারণ ধারণা আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; আজও পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিলাম না। ইহার ফলে কত মনুষ্য নৈতিক চরিত্র হারাইয়া জনসমাজে ঘৃণ্য হইতেছে,—কত লোক ব্যাধির তীব্র তাড়নায় ক্ষত মস্তক কুক্কুরের ন্যায় ধরার ভার হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—কেহবা অকালে কাল কবলিত হইতেছে। ইহা স্ত্রীলোকের রূপ। কত মোহান্ধ মানব—মনুষ্য জীবনে পতঙ্গ বৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সাধ করিয়া এইরূপ বহ্নিতে—ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক পরিনামে অপাত মধুর ফল স্বরূপ আপনাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিতে এতটুকু দ্বিধাও করিতেছে না।

এই রমণী রূপের তুলনা লইয়া মাঝে মাঝে কবি মহলে বড়ই গোলযোগ বাধে। অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁহাদের করতলগত থাকিয়াও মাঝে মাঝে 'খেই' হারাইয়া ফেলেন। আকাশের চাদ তাঁহাদের আহ্বানে যদিবা ধরাতলে আইসে, রূপসীর মুখের তুলনায় পরক্ষণেই তাহাকে কলঙ্ক কালিমালিপ্ত মলীমালিন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হয়, নতুবা বড়ই বিপদ—রমণীর পদ সমরে স্থান লাভ করিয়া ভাবিতে হয়, 'কৃতার্থোস্মি'। গোলাপ কলিকায় নারী সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে না, যেহেতু কলিকা-কোরকে কীট বাস করে; সুতরাং প্রভাতে বাতাহত হইয়া শিশিরাশ্রুসিক্ত নয়নে অভিমান ভরে ঝরিয়া পড়া ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। উষার রক্তোজ্জ্বল লোহিৎচ্ছটা সীমন্তিনীর সিন্দুর বিন্দুতে পরাজিত। প্রফুল্ল কুমুদে কৌমদীর লহরীলীলা সুন্দরীর সহাস্য আস্যের নিকট চির অবজ্ঞাত। মরালগামিনীগণের গতিতে হংসরাজ সন্ত্রস্ত—গজেন্দ্র ভীত। কেহ কখন আপন অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সৌন্দর্য্য-হীনা দেখেন না; নচেৎ বিগত যৌবনাশ্রীতে রূপান্ধ বৃদ্ধ কখন যৌবনের প্রথমোন্মেষ দেখিত না! তাই কোন কবি উপমা অভাবে কাব্যোক্ত নায়কের মানসী প্রতিমাকে পাঠকের চির যৌবনশ্রী ভূষিতা স্ত্রীর সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্যাভিমানিনী—পাঠিকাকে দর্পণে প্রতিফলিত স্বীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিতে বসিয়াছেন। এক কথায় যোষিদ্বর্গ কবি কল্পনা মাধুর্য্যে তুলনা রহিত। তাঁহাদিগের উপন্যাসের বহিরাবরণ এই রমণীরূপেই সমপুষ্ট।

কোন কবি নারিকেলের সহিত নারীকুলের সৌসাদৃশ্য দেখিয়াছেন।

কমলাকান্তের উক্তিতে রূপের অস্থায়িত্ব প্রমাণের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা কমলাকান্তের নাম শুনিয়া তাহাকে হাস্যরসের নায়ক বিবেচনা করি, কিন্তু তাহার কথার প্রতি অক্ষর দর্শনের কত গভীর তত্ত্বমাখা—কত তত্ত্বোপদেশ পূর্ণ, তাহা কয়জন বুঝিতে পারে,—কয়জন তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধিতে সক্ষম?

চারিটী পদার্থ লইয়া নারিকেল;—জল, শস্য, মালা এবং সিটি। নারিকেলের প্রথমাবস্থা ডাবের ন্যায়,—স্ত্রীলোকের যৌবন প্রারম্ভের সৌন্দর্য্য। উভয়ই লোক মনোমোহন। কবির ভাষায় ব্যক্ত, নারিকেল-খোলস নির্ম্মিত রজ্জুতে ভারতের উৎকল প্রদেশস্থ জগন্নাথ দেবের রথ টানে,—আর ভুবনমোহিনী রমণীর রূপরজ্জুতে ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র বিশ্বের পুরুষের মনোরথ আকর্ষণ করে। নারিকেল জলে নারীস্নেহের পীযূষ ধারা। দাস জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক অবসন্ন দেহ লইয়া সারা দিবসের পরিশ্রান্তির পর যখন গৃহে উপস্থিত হয়, তখন ডাবের সুপেয় জলে কেমন ক্লান্তি অপনোদিত হয়,—সকল অবসন্নতা দূর হয়! সেইরূপে 'দারিদ্র্য চৈত্রে', 'বন্ধু বিয়োগ বৈশাখে' অথবা 'রোগতপ্ত বৈকালে' মাতৃস্নেহের ক্ষীরধারা—পত্নীপ্রেমের অমিয় নিষেক—আত্মজা ও অনুজার ভক্তি বাতাস ভিন্ন কিসে চিত্ত বিনোদন হয়, কিসে সন্তাপ দিগ্ধ হৃদয়ে শান্তি মায়ার অমল হিল্লোল প্রবাহিত হয়। নারিকেলের শস্য স্ত্রী-বুদ্ধি। কবি বলিয়াছেন, 'করকচি বেলায় বড় থাকে না। ডাবের অবস্থা বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল। ঝুনর বেলায় কিন্তু বড় কঠিন। ইহাকে গৃহিণী পনা বলে।' অবশেষে মালা; ইহা নারীর বিদ্যা। নারিকেলের শস্য আহরণ করিতে হইলে মালাটী দ্বিখণ্ডিত করিতে হয়, সেকারণ খণ্ডিতাবস্থায়ই ইহার পূর্ণাবয়ব। সেইরূপ স্ত্রীলোকের বিদ্যা কখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না; কখন দ্বিমুখগামী হয় না। কেহ বেথুন কলেজে শিক্ষিতা হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটী উপাধি লাভ করিয়াছেন, কেহ দুই এক খানি গ্রন্থ প্রণেত্রী হইয়া বিদ্যার গতি সেই দিকে প্রধাবিতা করিয়াছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির সহিত সাংসারিকা বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে নাই,—সে বিষয়ে প্রায়সই উচ্চ শিক্ষিতা নারী অনভিজ্ঞা থাকেন। পক্ষান্তরে পল্লীবাসিনী রূপসা সাংসারিক কার্য্যে সিদ্ধহস্তা, পরন্তু বর্ণজ্ঞান বিরহিতা—ক অক্ষর বর্জ্জিতা। তাঁহারা দা'লের হাঁড়ীতে কাটা দিতে যেরূপ পটু, দোয়াতে কলম দিতে সেরূপ নহেন। বিবাহের বরাসন

পিঁড়িতে আলিপনা সহায্যে লতা-পাতা আঁকিতে গ্রাম্যবধূ বেশ হস্ত কুশলা, কিন্তু কার্পেটে ফুল তুলিতে গেলেই হাতের কাঁটা ঘুরিয়া চোখে যাইতে চায়। তাহা হউক, তথাপি আমরা সহরবাসিনী অপেক্ষা পল্লীবাসিনীকে আদর করিব, যেহেতু তাহার শঙ্খ পরিহিত হস্তের ঘনান্দোলনে চুল্লীস্থ স্ফীতোদর পিত্তলের হাঁড়ীতে যে অমিয়ার সৃজন হয়, এমন বুঝি সহরবাসিনীর স্বর্ণ চুড়ী বলয়ের ঝন্‌ঝনানিতে কস্মিন্ কালেও হইবে না।

আমরা অবসর মুহূর্ত্তে উপন্যাস নাটকাদি পড়িতে ব্যগ্র হই, এমন কি, পণ্য ব্যবসায়ীগণও দ্বিপ্রহরের গ্রাহক বিরল সময়ে বটতলার ছাপা 'এলোকেশী' 'মোহন্তের কাহিনী' পাঠ করিতে বসে, কিন্তু কয় জন উপন্যাস বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবনের চেষ্টা করে?

কাহারও মনে কখন কি উদিত হইয়াছে যে, রমণীর রূপ সঞ্চরণশীল লঘু মেঘের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী? এই আছে পরক্ষণেই বয়োবায়ুবেগে কোন আকাশের তপদেশে—কোথায় যাইয়া বিলীন হইবে। আমরা জ্যোৎস্না ধবলিত রজনীতে সিন্ধুর মৃদুল তরঙ্গ ভঙ্গে মন্থর গামিনীর গমন ভঙ্গি দেখি,—পূর্ণ চন্দ্রের সুবিমল কিরণে কামিনীর কমনীয় কান্তি নিরীক্ষণ করি,—স্বচ্ছ সরোবরে ভাসমান নীল নলিনীকে সুন্দরীর নয়নেন্দীবর ভাবি, বালারুণ কিরণ বিসর্পিত নব চ্যুত পল্লবে নারী রূপের লহরী লীলা দেখি। যখন আমাদের 'একমেবদ্বিতীয়ং নাস্তি'—এক ভিন্ন ধারণান্তর নাই, তখন আর চিন্তা কি! চিন্তাও নাই, উন্নতিও নাই। "পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বেহ মাতরঃ। পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে॥" আমাদের ক্ষীণ মস্তিষ্কে ইহার প্রকৃত অর্থ বোধ কিরূপে হইবে! 'যাহ'তে তোর ধরা দেখা, আমি রে তোর সেই জননী', সেই সৃষ্টি প্রকরণের প্রধান অবলম্বন প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহাদের এই দুর্ভ্রান্তি, সে জাতির উন্নতি কোথায়! মোহান্ধ আমরা ভ্রমেও দেখি না, এই সহস্র জীব সমাকুল জগতে একাধারে এত সহিষ্ণুতা পর হিতৈষিণার সমাবেশ আর কোথায় আছে! রুগ্ন সন্তানের শয্যা পার্শ্বে রমণী মাতৃ মূর্ত্তিতে সঞ্জীবনী-শান্তি প্রদান করিতেছে, আত্মীয় স্বজনের পীড়ায় স্নেহরূপিণী প্রাণ পাত করিয়া শুশ্রূষা করিতেছে, পতির মৃত্যুতে-হাসিতে হাসিতে সহমরণের জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ হইতে পাবক শিখা শত বাহু বিস্তার করিয়া তেজোমাধুর্য্যময়ী পতিব্রতাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আর সতী পতিপদ বক্ষে ধরিয়া ধ্যানৈকতান স্তিমিত

নয়নে বসিয়া আছে। আহা কি সুন্দর অথচ লোমহর্ষণ দৃশ্য! তা'ই কবি মুগ্ধ হইয়া প্রাণের গানে জগজ্জন বিমোহিত করিতে গাহিয়াছেন,—

"পরমা প্রকৃতি তুমি, সতী তুমি সার।
তুমি চির মধুময় সোণার স্বপন সুধা চির পিপাসার।
তুমিই সংসার—তুমিই প্রাণ,
অনাদি জীবনে আপন গান,
তুমি স্নেহ মায়া, পতি সুতজায়া, তুমিই জননী তার,
তুমি আপন অঙ্গে, জড়িত রঙ্গে, জলদে বিজলীহার।"

শ্রীমনোমোহন মজুমদার।

কেন এলে ?

কি দেখিতে এলে সখা এতদিন পরে আর ?
আছে শুধু ছল ছল দুটী আঁখি জলভার।
থেমে গেছে যত গান,
ফুল ফোটা অবসান,—
অভিমানে শেফালিকা চুমিয়াছে ধরাতল ;
করবী টগর বেলা,
মল্লিকা মালতী মেলা
শুখায়েছে কেঁদে কেঁদে, ম্লান আঁখি-শত দল!
উপবনে কুহু কুহু,
গেয়েছিল মুহু মুহু,—
এখন নীরব সেই বিরহিণী পিকবধূ ;—
চকিতে হাসিয়া উঠি
গোলাপ প'ড়েছে লুটি,
মলয় পলায়ে গেছে চুরি ক'রে যত মধু!!
মেঘের আড়ালে থেকে,
আপন সুষমা মেখে,
কতদিন উঁকি মেরে হেসে চ'লে গেছে চাঁদ,

তোমার আসার আশে,
বসি এ বিজন-বাসে,
আমার (ও) মনের মাঝে জেগেছিল কত সাধ!।
কেন সখা পেতেছিলে মোহন পিরীতি ফাঁদ?॥

দয়া ক'রে আজি যদি এসেছ হে পথ ভুলে;।
ব'সো সখা, তনুখানি লুটাইব পদমূলে!—।
আকুলি বিকুলি হিয়া,
দেখাইব বিদারিয়া,
নিয়ে যেও ম্লান হাসি, শুষ্ক অধর-সুধা;
এখনো যা কিছু আছে,
ল'য়ে যাও পাছে পাছে,
কি জানি তাহাতে যদি মেটে নিমিষের ক্ষুধা!॥
তা না হয় ঘৃণাভরে,
পদাঘাতে দূর ক'রে,
ছিন্ন ফুলদল সম, ফেলে দাও ম্লান-কায়া;
অনাদর, অযতন,—
সেত মোর আভরণ!—
তাহে না পড়িবে প্রাণে তিল বিষাদের ছায়া!॥
যাহারে বেসেছ ভাল,
বাস' তারে চিরকাল,
তোমার সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে থাকিব না;
ভুলে কভু দরশন,
করিব না আকিঞ্চন,
নিমেষের দেখা সখা,—তাও কভু যাচিব না;
পায়ে ধরি চ'লে যাও, আর তোমা সাধিব না।

জানিতে বাসনা শুধু, কি দেখিতে এলে আজ,
নীরব বিজন মাঝে পাছে রেখে সব কাজ?॥
শুধু কি যাতনা দিতে
বেদনা-ব্যথিত চিতে,

পায় পায় এত দূর আসিয়া প'ড়েছো প্রিয় ?
আকুল মলিন বেশ,
দেখা তো হ'য়েছে শেষ !—
মানে মানে ঘরে গিয়ে অভিশাপ বরষিও।
ওই যে গগন কোলে,
ধীরে ধীরে যায় চলে,
সুনীল জলদখানি, হাসি হাসি প্রিয়তম।
ইঙ্গিতে ডাকিছে যেন,
বলে—ওগো, আর কেন ?—
চ'লে এস ধরা ছেড়ে, নিরদয় নিরমম॥
তবে যাই, এস তুমি
ফুল কলি চুমি চুমি,
মধুর পবন স্রোতে ভাসিয়া যাইব চ'লে ;—
জগতের পরপারে,
প্রাণ সখা অভিসারে,
আর ফিরিব না বঁধু, তোমাদের কলরোলে।
কেন এসেছিলে আজি, তাই শুধু যাও ব'লে॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার নাগ।

শতদল।*

১

নয়নের প্রীতিকর শতদল মূরতি,
নিরখিলে দূরে যায় মানসের আরতি।
উদিত হইলে হরি,
কি মাধুরি আহা মরি,
কত হাসি ভরা মুখ কিবা তার সুষমা
লিখনীর শক্তি নাই দিতে তার উপমা॥

---

* শ্লেষাত্মক কবিতা।

২

মধুপান তরে দেখ মধুপ যে ছুটিছে,
গুঞ্জরি সুরাগ রাগে যত মধু লুটিছে।
কত তোষামোদ করি,
বিনয়েতে পায়ে ধরি,
মন ভোলাবার তরে কত কি যে করিছে।
প্রাণেশ্বর মানিনীর যেন পায়ে ধরিছে॥

৩

রমণীর পায়ে ধরা কোথা ভৃঙ্গ শিখিলে?
পুরুষের ভারি ভুরি তুমি সব দেখালে।
ঘৃণাতে মরিবে জ্বলে
শান্তি লাভ কারে বলে?
স্বার্থেতে হইয়ে অন্ধ নরকুলে মজালে।
অবোধ মানব ভাবি ফলে অন্ধ জানালে!

৪

ছি ছি শতদল রূপে কেন ভৃঙ্গ! ভুলিলি
কেন বা কলঙ্ক ডালি নিজ শিরে তুলিলি?
তোর গুণ গুণ স্বরে
বিরহীর প্রাণ জ্বরে
কেন তবে হৃদয়ের দেখাইছ ন্যূনতা!
কেন জগজন জানে তোমার যে জড়তা॥

৫

অহো! বুঝিয়াছি এবে প্রেমের যে পোষণ।
নাহি মান অপমান কেবল যে তোষণ!॥
ধন্য দিই প্রেম তোরে
পশু পক্ষী দেব নরে
তোমার মোহন ছাঁদে কেবা আছে অবশ।
দারু ভেদে শক্ত ভৃঙ্গ, পদ্মে রুদ্ধ বিবশ!

৬

তোরে বলি শতদল! কোথা মান শিখিলে।
নাহি যায় কিগো মান, পায়ে নাহি ধরালে॥
সাধিলে না যায় মান
সাধিলে বাড়ে যে মান
বলিহারি হেন মানে কেবা ইহা শিখালে।
যে শিখালে হেন মান সেত আছে দুকূলে॥

৭

শতদল! চাহি দেখ তোমার যে তরণি। *
মন ভুলাবার তরে লইছে যে শরণী॥
পরশিতে তব অঙ্গ
নিজকরে করে রঙ্গ
প্রিয়জন স্পর্শ সুখ † এমন কি মননে।
অমরাবতীর সুখ নাহি তার তুলনে॥

৮

হরি ভাগ্য হেরি বিধু অশ্রুনীরে ভাসিছে।
অভাগার ভাগ্য হেরি হরি তাই হাসিছে॥
কত আশা করেছিল
কে হৃদয়ে দাগা দিল
কোথা প্রিয় মনোরমা সেই চারুহাসিনী।
কেন হরি নিল মোর শতদল হাসিনী॥

---

* বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি দুঃখ মিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষ বিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমীলয়তি চ॥

উত্তর চরিতে ১ অঙ্কে।

† সূর্য্য বা হরি।

শ্রী বিধুভূষণ শাস্ত্রী।

রমণী-রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

নিমাই নারায়ণ যাহা বলিলেন, রামরূপ শর্ম্মা তাহার কিছুই জানিতেন না। এ সকল কথা পূর্ব্বে তিনি কিছুই শুনেন নাই,—তাহার জামাতা যে কলিকাতায় বাস করিতেছেন,—পিতার সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছে,—তাহাও তিনি এই প্রথম শুনিলেন।

এই গোসাই বাবু কোথা হইতে বনমালির স্কন্ধে চাপিয়াছে,—তাহারও তিনি কিছুই জানেন না ;—কিন্তু নিমাই নারায়ণের কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিল না,—তাহার মন হইতে সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হইল না,—তিনি মনে মনে বলিলেন, "হয়তো এই লোকই গোসাই বাবু,—আমাকে গরিব পাইয়া আমার সঙ্গে এই সকল কথা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। যাহাই হউক,—যখন এ আমায় লইয়া নিজের বাড়ীতে যাইতেছে,—তখন সত্য মিথ্যা সকলই শীঘ্র জানিতে পারা যাইবে। নীশার সহিত দেখা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে।"

নিমাই নারায়ণের বজরা রায়গ্রামের হাঠ হইতে ছাড়িয়া ধীর মন্থর গতিতে চিত্রা নদীর উপর দিয়া চলিল,—চিত্রাও নবগঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্র নদী,—দুই তীরেই ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রাম,—বৃক্ষ পুঞ্জ, মধ্য হইতে যেন উকি মারিতেছে,—ঘাটের পর ঘাট প্রতি ঘাটেই গ্রাম্য সুন্দরীগণ স্নান অবগাহন,—বাসন প্রক্ষালন,—কলসিতে জল পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত,—মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘাটে হংস পাল আহার অন্বেষনে নিযুক্ত,—মধ্যে মধ্যে মাছরাঙ্গা বৃক্ষ শাখা হইতে অকস্মাৎ জলে পড়িয়া ক্ষুদ্র মৎস্য মুখে করিয়া পলাইতেছে,—রামরূপ শর্ম্মা বজরার মধ্যে বসিয়া এই সকল গ্রাম্য সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন—নিমাই নারায়ণ বজরায় উঠিয়া বহুতর কাগজ পত্র বাহির করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত সেগুলি দেখিতেছিলেন,—মধ্যে মধ্যে কাগজে কি লিখিতেছিলেন,—কাহারও সহিত কোন কথা কহিতেছিলেন না। রামরূপ

শর্ম্মারও কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল না.—তাহার জীবনে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তিনি মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন।

তাহার নিকট সকলই রহস্য,—তবে পূর্ব্বে যে সকল কথার কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না,—এক্ষণে নিমাই নারায়ণের নিকট যাহা যাহা শুনিলেন,—তাহাতে তিনি কতকটা কতকটা অনেক বিষয় বুঝিতে পারিলেন নিমাই নারায়ণ যাহা বলিলেন,—তাহা যদি সত্য হয়,—তবে অনেক বিষয়েরই রহস্য ভেদ হয়।

খুব সম্ভব ঊষা তাহার স্বামীর সহিতই কলিকাতায় গিয়াছিল,—খুব সম্ভব সে মধ্যে মধ্যে স্বামীর সহিত দেখা করিত;—নিশ্চয়ই সে তাহার স্বামীর নিকট হইতে টাকা পাইয়াছিল, হয়তো সে নৌকা হইতে স্বামীর সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু কেন তাহার স্বামী তাহাকে এইরূপ ভাবে তাহার বাড়ী রাখিয়াছিল,—কেনই বা তাহাকে এইরূপ অলক্ষিত লুকাইত ভাবে লইয়া গেল, রামরূপ শর্ম্মা অনেক ভাবিয়াও তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না।

ঊষা তাহার তেমন মেয়ে নহে যে, সে কোন দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য কোন দুর্ব্বৃত্তের সহিত মিলিত হইয়া এরূপ করিবে; হয়তো নিমাই নারায়ণ এই গোসাই বাবু সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা ঠিক। নিশ্চয়ই সে বনমালি রায়ের সহিত ছেলের ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া ছেলেকে দেশত্যাগী ও ত্যজ্যপুত্র করাইয়াছে,—এখন তাহাকে তাড়াইয়া নিজের ছেলে বা অন্য কাহাকে ছেলে সাজাইয়া বনমালি রায়কে দিয়া তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাইতেছে,—তাহার পর বিষ প্রভৃতির দ্বারা তাহাকে লোকান্তরিত করিতে আদৌ কঠিন হইবে না! স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ইহার স্ত্রী ও ইহার ছেলে এবিষয়ে তাহার সাহায্য করিতেছে,—নিশ্চয়ই তাহার দলে লোক আছে। সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়া সত্বেও রামরূপ শর্ম্মা এ কথাগুলি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখনও তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই,—তিনি মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমনেত্রে নিমাই নারায়ণের দিকে চাহিতেছিলেন। নিমাই নারায়ণ কাগজ পত্রে গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন,—ব্রাহ্মণ যে নৌকায় আছেন,—তাহা বোধ হয় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

রামরূপ শর্ম্মা ভাবিলেন, "ঊষা ও তাহার স্বামী বোধ হয় এই দুর্ব্বৃত্ত গোসাই বাবুর হস্ত হইতে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য কি একটা করি-

তেছে তাই তাহাদের কার্য্য সবই রহস্যময়, সবই গোপন করিতেছে,—নতুবা প্রকাশ হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার কোন উপায় নাই!"

সহসা নিমাই নারায়ণ কাগজ পত্র হইতে মুখ তুলিলেন,—কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেয়াই কি বল?"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

বহুকাল পরে।

সহসা এই অভূতপূর্ব্ব প্রশ্ন শুনিয়া রামরূপ শর্ম্মা বিস্মিত ভাবে নিমাই নারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেয়াই কি বল!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—বুঝিতে পারিতেছি না।"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "এই সব বিষয়ে।"

"কোন সব বিষয়ে!"

"এই আপনার বেয়াই সম্বন্ধে।"

"আমি যখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,—তখন কি বলিব।"

"একটা বদমাইশ পশ্চিম হইতে আসিয়া বনমালি রায়ের সর্ব্বনাশ করিতেছে,—আপনার মেয়ে জামাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—বিষয় সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে,—রাণী বিন্দেশ্বরীর মেয়ের সহিত ইহার জাল ছেলের বিবাহ দিয়া তাহারও বিষয় ফাকি দিয়া লইবার চেষ্টায় আছে,—এ সম্বন্ধে তুমি কি বল।"

"আমি গরিব ব্রাহ্মণ,—আমি কি বলিব!"

"এই বদমাইসকে দমন করা কি বেয়াই তোমার কর্ত্তব্য নয়?"

"আমি কি করিতে পারি!",

"ইচ্ছা থাকিলে সকলেই সব করিতে পারে।"

"আমি গরিব লোক।"

"আমরা থাকিতে বেয়াই তুমি গরিব লোক কিসের।"

"তা ভগবানই দেখিতেছেন,—তোমরা এ পর্য্যন্ত একবারও আমার সংবাদ লইয়াছ—আমার প্রাণের মেয়ে দুইটাকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে,—তাহাদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে দেও নাই—"

নিমাই নারায়ণ বলিলেন, "বেয়াই,—যাহা হইয়া গিয়াছে,—তাহার আলোচনা করিয়া আর লাভ কি? কেন আমি তোমার সংবাদ লইতে পারি নাই, তাহাত তোমায় বলিয়াছি।"

"তুমি যাহা যাহা বলিলে,—তাহাই যে সত্য তাহা কিরূপে বলিব? আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে,—তাহাতে আমার সহজে কিছুই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

নিমাই নারায়ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাতে বেহাই তোমার দোষ দি না। তোমার মেয়েকে দেখিলে তো বিশ্বাস হইবে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তাহার কাছে সকল শুনিলে তখন অবশ্যই বিশ্বাস হইবে।"

"তবে ঐ দেখ তোমার কন্যা আসিতেছে।"

এই বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া নিমাই নারায়ণ বহুদূরস্থ এক খানি নৌকা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বজরা আমাদের বাড়ী পৌছিতে দুই দিন লাগিবে,—বিশেষতঃ কোন বিশেষ কারণে আমি এখন বাড়ী যাইতে পারিব না,—সেই জন্য আমি বধূমাতাকে আনিবার জন্য এক জন লোক ঘোড়ায় করিয়া পাঠাইয়াছিলাম,—সে রায় গ্রাম থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ী পহুছিয়াছে, তাহার পর কন্যাকে সিপ নৌকায় লইয়া আসিতেছে,—আমার সিপ নৌকার ন্যায় সিপ এদেশে আর কাহারও নাই—কলের জাহাজও ইহার সহিত ছুটিতে পারে না।"

রামরূপ শর্ম্মা দেখিলেন প্রকৃতই নৌকাখানি তীরবেগে ছুটিতেছে,—তখনও অনেক দূরে রহিয়াছে,—ভাল দেখা যায় না,—ব্রাহ্মণ কেবল দেখিতে পাইলেন যে নৌকা খানি ছুটিয়া আসিতেছে, নৌকা হইতে দুইদিকে অবিরত ধারে বাট পরিতেছে,—নৌকার মধ্যস্থলে কে বসিয়া আছে,—তাহার মস্তকের উপর এক বৃহৎ লাল ছত্র কে ধরিয়া আছে।

নৌকা নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে,—দেখিতে দেখিতে নৌকা বজরার সমীপবর্ত্তী হইল;—তখন ব্রাহ্মণ দেখিলেন প্রায় এক শত লোক দুই তিন শত হাত লম্বা এক সিপ নৌকায় বাট চালাইতেছে,—নৌকার মধ্যস্থলে উপবিষ্ট দুইটি স্ত্রীলোক,—এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে এক বৃহৎ লাল রৌপ্যছত্র তাহাদের মস্তকে ধারণ করিয়া আছে।

নিমিষে নৌকা আরও নিকটস্থ হইল, তখন ব্রাহ্মণ দেখিলেন প্রকৃতই

নীষা নৌকায় বসিয়া আছে,—আর্শ্বস্থ স্ত্রীলোক বোধ হয় কোন পুরাতন দাসী,—তাহার পরিধান তসর,—নীশার সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত—তাহার পরিধান সুন্দর বারানসী সাড়ী। বহুকাল পরে প্রাণের দুহিতাকে দেখিয়া রামরূপ শর্ম্মার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল।

সিপ নৌকা বজরার নিকটস্থ হইবামাত্র সেই প্রায় এক শত বাটওয়ালা নদীর জল কাঁপাইয়া "বদর—বদর" ধ্বনি করিয়া উঠিল,—বজরার দাঁড়িগণ দাঁড় বন্ধ করিল,—সিপ আসিয়া বজরার গায় লাগিল,—নিমাইনারায়ণ বাহিরে আসিয়া নীশার হাত ধরিয়া তাহাকে বজরায় তুলিলেন, "শুনেছ বোধ হয় তোমার বাবা আসিয়াছেন।"

নীশা আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। রাম-রূপ শর্ম্মা চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতা ও কন্যা।

আর সন্দেহের কারণ নাই,—ইনি তাহা হইলে প্রকৃতই রাজা নিমাই-নারায়ণ,—তাঁহার কন্যার শশুর,—তাঁহার জামাতা কুমার সত্যনারায়নের পিতা। ভগবান্ তাহার উপর সদয় হইয়া—রায় গ্রামের হাটে তাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাত করাইয়া দিয়াছিলেন। যতদূর দেখা যায় নিমাইনারায়ণ অতি ভাল লোক,—তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক,—কোন কারণে নিমাইনারায়ণ বনমালি রায়ের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাই তিনি তাহার অমতে কোন কাজই করিতে পারেন নাই,—এই জন্যই এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ লন নাই,—যাহা হউক,—বোধ হয় এতদিনে তাঁহাদের যতদূর বোঝা যায় তাঁহার কন্যা রাজরাণী হইয়া সুখেও আছে।

নীশা নৌকার ভিতর আসিলে নিমাইনারায়ণ নৌকা সেইখানে লঙ্গড় করিতে বলিলেন,—তাহার পর নীশার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কও,—আমি একটু কাজ সারিয়া আসি।"

এই বলিয়া তিনি সিপে গিয়া বসিলেন,—যে ছাতি ধরিয়াছিল তাহাকে কি বলিলেন,—সে মাঝিকে কি বলিল, অমনই একশত বাট জলে পড়িল, সিপ তীর বেগে ছুটিল—দশ মিনিটে সিপ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

বৃদ্ধা দাসী নৌকার বাহিরে ছিল,—রামরূপ শর্ম্মা কন্যার সহিত নৌকা-মধ্যে একাকী রহিলেন। এতদিন পরে হারাধন পাইয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি কিয়ৎক্ষণ কোনই কথা কহিতে পারিলেন না।

নীশা বলিল, "বাবা,—আমি ভালই আছি—কোন কষ্ট নাই;—কেন তোমায় পত্র পর্য্যন্ত লিখিতে পারি নাই,—তাহা বোধ হয় তোমায় বলিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাঁ,—সব শুনিয়াছি,—সবই বনমালি রায়ের কাজ।"

"বোধ হয় তাহারও দোষ নাই। গোঁসাই বাবু বলে কোথা হইতে একটা লোক এসে তাঁকে এই রকম করেছে।"

তাহার কথাও তোমার শশুর আমায় বলিয়াছেন—সে সব কি সত্যি।"

"যা যা বলেছেন সব ঠিক,—তোমার জামাতার সঙ্গে ঊষার স্বামীর বিশেষ বন্ধুত্ব,—তাহারা দুই জনে, যাহাতে এই বদমাইস গোঁসাই, আর কোন বদমাইসী করিতে না পারে,—তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন।"

"তাহা হইলে তুমি ঊষার খবর জান।"

"কেন সে তোমার কাছে কলিকাতায় আছে,—তোমার জামাইয়ের কাছে আমি একথা শুনিয়াছিলাম।"

"কে তাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়াছিল,—তা কিছু শুনিয়াছিলে।"

"না,—আমি শুনেছিলাম—শশুর ঊষাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় সে তোমার কাছে আছে। আর কিছু শুনি নাই।"

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কন্যাকে বলিলেন, শুনিয়া নীশা নিতান্ত বিস্মিত হইল। বলিল, "ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জঙ্গলি শাওতালনী আমাদের দাসী বটে,—তবে সে পাগল,—মধ্যে মধ্যে কোথায় চলে যায়,—আবার আপনি ফিরে আসে,—সে মধুপুর থেকে আমাদের সঙ্গে এসেছিল, আমরা তাকে কোন কাজ করিতে বলি না,—সে খায় দায় থাকে। কদিন থেকে কোথায় গেছে জানি না,—তোমার সঙ্গে কেন এমন করেছে,—তাও বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিছুই জান না,—সে কি তাহার স্বামির সঙ্গে গেছে বলিয়া বোধ হয়?"

"কেমন করিয়া বলিব জানি না।"

"সে তোমাদের ঐ রকম একখানা সিপ নৌকায় গিয়াছিল,—মাঝি বলিয়াছিল—"

নীশা চিন্তিত ভাবে বলিল, "তোমার জামাতা কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের সিপ হইতে বাহির হইয়াছিলেন,—অনেক রাত্রে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন,—সকলেই বিশেষ কাজ আছে বলিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সময় পাই নাই। তাইতো,—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

"তোমার কি মনে হয় জামাই এই ভাবে উষাকে লইয়া গিয়াছে।"

"এমন করিয়া লইবার মানে কি—না—তা নয়,—কিছুই বুঝতে পারিতেছি না।"

"উষার স্বামী কোথায় জান?"

"শুনিয়াছিলাম তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন,—তাহার পর সে দিন তোমার জামাই বলিলেন শরীর খারাপ হওয়ায় বরেন্দ্র বাবু মধুপুরে বাস করিতেছেন।"

"তিনি এখানে ফিরিয়া আসেন নাই।"

"আসিলে নিশ্চয়ই শুনিতে পাইতাম।"

"তোমার শ্বশুর সিপ নৌকায় কোথায় গেলেন?"

"কেমন করিয়া বলিব,—বোধ হয় কোন কাজ আছে।"

সহসা একটা ভয়াবহ গোল উঠিল,—ব্রাহ্মণ ও নীশা উভয়েই ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বজরার বাহিরে আসিল,—তাহারা দেখিল অসংখ্য লাঠিয়াল ভয়াবহ চীৎকার শব্দে "রে রে" বলিতে বলিতে নদীর দুই তীরে নৌকার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণের রাগ।

এই সকল লাঠিয়ালকে নৌকার দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া বজরার উপরস্থ পাইকগণ নিজ নিজ লাঠি, সড়কি, বন্দুক,—তলোয়ার তুলিয়া লইয়া বজরা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল,—কিন্তু মাঝি বলিয়া উঠিল, "এ যে আমাদের লোক।"

লাঠিয়ালগণ নৌকার নিকটস্থ হইলে সকলেই দেখিল যে তাহারা রাজা নিমাইনারায়ণের লোকই বটে,—তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা—করিবার পূর্ব্বেই সকলে দেখিল সিপ নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে,—রাজা নৌকায় বসিয়া আছেন।

দুই মিনিট অতীত হইতে না হইতে সিপ আসিয়া বজরার পার্শ্বে লাগিল। রাজা বজরায় উঠিয়া আসিলেন। তিনি রামরূপ শর্ম্মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেয়াই,—তুমি বৌমার সঙ্গে বাড়ী যাও,—দিন কতক সেখানে থাকিয়া কলিকাতায় যাইও।—আমি বিশেষ কাজে ব্যস্ত না থাকিলে সঙ্গে যাইতাম,—কিন্তু উপায় নাই,—বৌমা সিপে উঠ।"

কাজেই নীশা দাসীর সঙ্গে সিপ নৌকায় উঠিল,—রামরূপ শর্ম্মা কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু রাজা নিমাইনারায়ণ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে দিলেন না,—হাত ধরিয়া সিপে তুলিয়া দিলেন,—অমনি জলে একশত বাট পড়িল,—নৌকা তীর বেগে ছুটিল। ব্রাহ্মণ সহসা বসিয়া না পড়িলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন।

রামরূপ শর্ম্মা আর কখনও এরূপ নৌকায় উঠেন নাই,—তিনি প্রকৃতই ভীত হইয়া উঠিলেন। নৌকা তালে তালে বাটের আঘাতে প্রবলবেগে নদীর জল ভাঙ্গিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে—দুই পার্শ্বের জল ফুলিয়া উঠিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে কূলের দিকে ধাবিত হইয়াছে,—তীরস্থ বৃক্ষরাজি নৌকার পশ্চাৎদিকে সন্ সন্ শব্দে যেন নিমেষে নিমিষে সরিয়া যাইতেছে,—রামরূপ শর্ম্মার মুখে প্রবল বেগে বায়ু লাগিতেছে, চাহিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল,—কাজেই কিয়ৎক্ষণ তিনি কোনই কথা কহিতে পারিলেন না।

কিন্তু ক্রমে সকলই অভ্যস্থ হইয়া যায়,—অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে রামরূপ শর্ম্মার সিপ নৌকা চড়াও অনেক অভ্যাস হইল,—তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কন্যা যে তীরস্থ নানা দ্রব্য দেখাইতেছিল,—তাহা তিনি কতক কতক শুনিতেছিলেন,—নীরবে বসিয়াছিলেন। এক্ষনে প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, "নীশা এ সকল কি,—আমি আগাগোড়া শুনিতে চাহি।"

নীশা বলিল, কি শুনিতে চাও, বাবা?

"এ সব কি?"

"কোন সব কি?"

"কেন ইহারা আমার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে,—কেন আমার কন্যার

সঙ্গে দেখা করিতে দেয় নাই,—আর এ সবই বা কি করিতেছে,—তোমার শশুর এত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে কেন?"

"বাবা,—জমিদারদের সকলকেই লাঠিয়াল রাখিতে হয়।"

"তাহা জানি,—এখন উহারা সত্বর কাহার সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে যাইতেছে।"

"তাহা জানি না,—আমি কেমন করিয়া জানিব?"

"ইহার সঙ্গে আমার উষার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহাই আমি শুনিতে চাই।"

"বাবা,—তাহা আমি কি রকম করে জানিব।"

"তাহার বিষয় কি শুনিয়াছ,—তাহা আমায় বল।"

"বনমালি রায় আমাদের আনিয়া বিবাহ দেয়,—আমি খুব সুখে আছি কেবল একটু দুঃখ ছিল যে তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই,—তা এখন আমার সে দুঃখও নাই।"

"উষার বিষয় শুন্‌তে চাই।"

"কেন বাবা, সে কি তোমায় কিছু বলে নাই।"

"কিছুমাত্র না,—বড় অবাধ্য মেয়ে—কোথায় সে এত টাকা পেলে,—কেনই বা সে এমন করে তার শশুর বাড়ী আমায় এনে এত অপমান করে শেষে আমাকে কিছু না বলে চোরের মত পালাইল,—আমি এই সব শুনিতে চাই।"

"বাবা, আমি ইহার কিছুই জানি না—কেবল মাত্র শুনিয়াছিলাম যে বনমালি রায় তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে,—সে তোমার কাছে গিয়া আছে।

ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি তুমিও আমায় কোন কথা বলিবে না—ভাল তাই হোক। যথেষ্ট হইয়াছে,—এখন আমায় কলিকাতায় যাইতে দেও,—ব্রাহ্মণী সেখানে একলা আছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জামাই বাড়ী।

নীশা বিষাদ স্বরে বলিল,—"বাবা, তুমি অন্যায় রাগ করিতেছ—যথার্থই আমি কিছুই জানি না,—কি রকমে জানিব।"

ব্রাহ্মণ কথা কহিলেন না,—নীশা কাতর স্বরে বলিল, "বাবা,—এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার কত আহ্লাদ হয়েছে,—এমন করে আমায় কষ্ট দেওয়া কি উচিত?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তোমরা হয়ে আমার কষ্ট ভিন্ন সুখ কখনও হয় নি। আমি দেশ ছাড়িয়া বিদেশে কলিকাতায় লোকের বাড়ী পূজা আচ্চা করিয়া দুই দশ টাকা যাহা পাইতাম তাহাতেই এক রকম সুখে সচ্ছন্দে ছিলাম,—উষা গিয়াই এই সকল অনর্থ ঘটাইল,—আমি গরিব ব্রাহ্মণ, এত গোলযোগ বুঝি না বাপু,—বাড়ী পৌছিয়াই আমায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেও।"

"বাবা—"

"আমি কোন কথা শুনিতে চাই না।"

"বাবা এতদিন পরে দেখা হলো—"

"না—আমি কোন কথা শুনিতে চাহি না।"

অগত্যা নীশা বিষন্ন ভাবে নীরবে নৌকায় বসিয়া রহিল,—ব্রাহ্মণও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

নিমাই নারায়ণ যে জাল নহে,—যথার্থই তাহার বেয়াই, তাহা তিনি এখন কন্যাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন,—কিন্তু এই নিমাই নারায়ণ যাহা করিতেছেন, তাহাও সমস্ত রহস্যময়। তাহার পর উষার বিষয়,—তাহা আরও রহস্য জড়িত;—তাহার ন্যায় সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাহার দুই কন্যাকেই চিরজীবনের জন্য হারাইয়াছেন ভাবিয়া তাহাদের কথা একরূপ মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তবে আবার কেন তাহাদের সহিত জড়িত হইয়া এইরূপ সন্দেহে কষ্টে কালাতিপাত করিবেন? তিনি বেশ বুঝিয়াছেন তাহার মেয়ে হইতে কষ্ট ব্যতিত সুখ হইবে না,—না আমি আর একদিনও এখানে থাকিব না,—কোন কথা শুনিব না,—এখনই এখান হইতে চলিয়া যাইব—বিশেষতঃ কলিকাতায় ব্রাহ্মণীকে একলা রাখিয়া আসিয়াছি।

মনে মনে এই সকল ভাবিয়া ব্রাহ্মণ জামাই বাড়ী উপস্থিত হইয়াই কলিকাতার রওনা হইবেন,—মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন সহসা তাহার ব্যাগের কথা মনে হইল। কে তাঁহার ব্যাগ রায় গ্রামের কাচারিতে রাখিয়া গিয়াছিল,—একজন পাইক সেই ব্যাগ রাজার নিকট লইয়া আইসে,—তাহার পর তাহার ব্যাগ কি হইয়াছে,—তাহার তিনি কিছুই জানেন

না। সেই ব্যাগেই তাহার টাকা আছে,—নিঃসম্বল কিরূপে কলিকাতায় যাইবেন?

ভাবিলেন রায়গ্রামে লোক পাঠাইলে নিশ্চয়ই ব্যাগ পাওয়া যাইবে,—কিন্তু তাহা হইলে ব্যাগের জন্য তাহাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে,—না,—তিনি এক দিনও অপেক্ষা করিবেন না,—ব্যাগ পাওয়া যায় নীশা নিশ্চয়ই তাহা পরে পাঠাইয়া দিবে,—এখন কে তাহার পথ খরচের জন্য কিছু টাকা দিবে না,—নিশ্চয়ই দিবে।"

তিনি কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি আজই কলিকাতায় যাইব,—কিছুতেই থাকিব না,—থাকিবার জন্য অনুরোধ করিও না। আমার ব্যাগ হয় রাজার বজরায় না হয় রায়গ্রামে আছে। ঊষা যে ৫০০৲ টাকার নোট রাখিয়া গিয়াছিল,—তাহাও ঐ ব্যাগে ছিল;—যদি ব্যাগ পাও পরে কলিকাতায় আমায় পাঠাইয়া দিও,—এখন কিছু পথ খরচের জন্য টাকা দরকার—"

নিশা বলিল, "বাবা, আপনি যদি নিতান্ত না থাকেন,—আপনার কলিকাতা যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। টাকার ভাবনা কি?"

"তাহা হইলেই হইল।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

নৌকা তীরবেগে ছুটিতেছিল,—দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজা নিমাই নারায়ণের বৃহৎ অট্টালিকার ঘাটে আসিয়া লাগিল। লোক জন পাল্কি লইয়া ঘাটে ছিল,—নীশা পাল্কীতে উঠিতে উদ্যত হইলে রামরূপ শর্ম্মা বলিলেন, "আমার কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত কর।"

নীশা অবগুণ্ঠন টানিয়া ঘাড় নাড়িয়া পাল্কীতে প্রবেশ করিল,—বেহারাগণ পাল্কি লইয়া অন্দরের দিকে ছুটিল,—তখন একটী স্থূলকায় নাতি দীর্ঘ ভদ্র লোক তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "সে বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছে—নৌকা প্রস্তুত,—ইচ্ছা করেন তো এখনই রওনা হইতে পারেন।"

এ আবার কি? ব্রাহ্মণ বিস্মিতভাবে ভদ্র লোকের মুখের দিকে চাহিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

রামরূপ শর্ম্মা কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—মনে করিয়াছিলেন এখানে থাকিবার জন্য ইহারা তাহাকে জেদাজেদি করিবে,—তাহা না

হইয়া তিনি বেহাই বাড়ী উপস্থিত হইতে না হইতে বলে নৌকা প্রস্তুত। এইরূপ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে চায়! আর অপমানের বাকি কি? এক বেয়াই জুতা মারিতে হুকুম দিয়াছিল,—আর এক বেয়াই বাড়ীতে না প্রবেশ করিতেই হুকুম দিয়াছে নৌকা করিয়া বিদায় করিয়া দিতে;—অথচ এ কথা আমায় একবার আগে বলে নাই,—কত আদর যত্ন,—বেয়াই বেয়াই করা,—কি দুর্ব্বৃত্ত বদমাইস! আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকা নয়।

ক্রোধে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল;—তিনি সেই লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকা কোথায় বাপু।"

"এই যে ঘাটে বাঁধা আছে—আসুন।"

"চল,—আর এক তিলার্দ্ধও আমি এখানে থাকিব না।"

"থাকিতে দিবারও হুকুম নাই।"

"বটে! কোন বেটা এমন হুকুম দেয়।"

"যার হুকুম দিবার অধিকার আছে।" ক্রোধে ব্রাহ্মণের বাকরোধ হইল,—কাঁছা খুলিয়া গেল,—তিনি বাম হস্তে কাঁছা গুঁজিতে গুঁজিতে নৌকায় উঠিয়া বলিলেন, "নৌকা খোল।"

মাজি নৌকা ছাড়িয়া দিল। বহুক্ষণ তিনি নৌকার বাহিরে বসিয়া রহিলেন,—তিনি এতই রাগত হইয়াছিলেন যে তাহার কোন বিষয় চিন্তা করিবার শক্তিও ছিল না। নদীর সুশীতল হাওয়া তাহার মস্তকে লাগায় তিনি অনেকটা প্রকৃতস্থ হইলেন,—তখন তাহার প্রথমেই মনে হইল তিনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল,—কলিকাতায় পৌঁছিতে অন্ততঃ ৫।৬ দিন লাগিবে,—এই কয় দিন আহারের কি,—না হয় নৌকা ভাড়া কলিকাতায় গিয়া কষ্টে স্রষ্টে ধারধোর করিয়া দেওয়া যাইবে,—কি কুক্ষণেই ব্রাহ্মণীকে ছাড়িয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম! এত বড় পানসি,—আট জন দাড়ি মাঝি,—না জানি কত টাকাই ভাড়া হইবে! এত কষ্ট দিয়াও ইহারা নিশ্চিন্ত নয়,—এত ভাড়া দিতে পারিব না,—নেড়ের হাতে অপমান হইব,—হা ভগবান!

ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ নৌকার বাহিরে নীরবে বসিয়া রহিলেন,—আট দাঁড়ি নৌকা কলিকাতার দিকে চলিয়াছে,—তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়,—চারি দিক ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে—নদী তীরস্থ বৃক্ষ শাখায় শত শত পাখি কলরব করিতেছে।

সহসা রামরূপ শর্ম্মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাজি ভাড়া কত ঠিক করে দিয়েছে।"

মাজি বিস্মিত ভাবে বলিল ভাড়া কিসের।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাপু,—তোমরা কি আমায় মাগনা নিয়ে যাচ্ছ।"

"কর্ত্তা এ রাজবাড়ীর নৌকা—এর আবার ভাড়া কি! আমরা রাজবাড়ীর চাকর—সরকার হতে মাইনে পাই।"

"বটে—ভাল—তারপর তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"কেন কর্ত্তা,—আপনাকে খুব হুসিয়ারে যত্নে কলকাতায় পৌছে দিতে আমাদের ওপর হুকুম আছে।"

"নৌকা যেন হ'ল,—বুঝলেম,—আমার খাবার,—আমার কাছে যে এক পয়সাও নেই।"

"কি বলেন কর্ত্তা,—নৌকাতেতো চাল ডাল ঘি তেল নানা জিনিষে বোঝাই। কর্ত্তাতো এক বৎসরেও তা খেয়ে শেষ কর্ত্তে পার্ব্বেন না। হুকুম আছে কর্ত্তার বাড়ী সব পৌঁছে দিতে,—এখন পাক কর্ত্তে চান তো একটা ভাল ঘাট দেখে নৌকা ভিড়িয়ে দি।"

"আমি বোধ হয় পাগল হব," মনে মনে বলিয়া ব্রাহ্মণ আবার বসিলেন। মাঝি বলিল, "কর্ত্তা এদিক দিয়ে ভেতরে লণ্ঠন জ্বেলে দিয়েছি,—ভিতরে যান,—কর্ত্তার জন্যে একটা বাক্স দিয়েছেন, বলে দিয়েছেন তাহাতে জরুরি কি আছে।"

ব্রাহ্মণ নৌকার ভিতর আসিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—এক পার্শ্বে সুন্দর বিছানা,—অন্য দিকে একটা বড় টিনের বাক্স,—বাক্সের পার্শ্বে এক জোড়া হাতির দাঁতের মূল্যবান খরম,—একটা সুন্দর ছাতি,—এক পার্শ্বে নানা পিতল কাঁসার তৈজস পত্র,—অন্যদিকে পূজার সমস্ত সরঞ্জম, কোসা, কুসি, শাক, পঞ্চ প্রদীপ, তাম্রপাত্র, ঘণ্টা প্রভৃতি! বাক্সে চাবি লাগান ছিল, খুলিয়া দেখিলেন বাক্স নানা তসর, গরদ ধুতি উত্তরীয়েতে পূর্ণ,—আরও রহিয়াছে—তাহার সেই ব্যাগ—তাহার পার্শ্বে দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র ক্যাস বাক্স,—তাহাতেও চাবি লাগান, খুলিয়া দেখিলেন বাক্স টাকায় পূর্ণ—উপরে একখানি কাগজ তাহাতে লিখিত আছে—"বাবা, যাহা সামান্য কিছু দিলাম লইবেন—নীশা।" ক্রমশ।

বিকচ নলিনী।

ফুল্ল নীরে ফুল্ল কমল
ফুটে সোহাগ ভরে—
ছড়িয়ে আপন রূপের ছটা
আছে আলো করে॥
ভানু পতি অস্ত গেল
দূর গগণের গায়,—
অভিমানে বিরহিণী
ঘোমটা টেনে দেয়।
পতির সনে আজকার মত
ফুরিয়ে গেল সুখ

তাইতে যেন অভিমানে
ঢাকছে কমল মুখ॥
বিরহিনীর বেশ গো ধনি
ধর তুমি চুলে,—
নিশাশেষে পতি এসে
দেবে বেণী খুলে।
আসবে পতি হাসবে সতী
উষা এলে পর—
ফুটবে কমল ছুটবে সুবাস
পতি দিলে কর॥

শ্রীফণিভূষণ মুস্তৌফী বি, এ।

প্রবাসে।

ফুল্ল সাঁজের বেলা,
সেই লুকোচুরি খেলা,
ধীর সমীরণ সনে কুসুম কলির;
লইয়া অমিয় ধারা,
চাঁদ যেন দিশেহারা,
সেইত অস্ফুট হাসি মুখে নলিনীর।
সেই বেহাগের তানে,
সুখাবেশ কোথা প্রাণে,—
শুধু শোকাভাবময় করুণ-ক্রন্দন;

মর্ম্মভেদী হাহুতাশ
বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস
হাসির লহরে যেন প্রকাশে বেদন।
একি বিপরীত রীতি,
কেন বা এ পরিণতি,
বিয়োগের ব্যাকুলতা বড়ই ভীষণ;
জগতের শোক যত,
সকলি যে পরাজিত,
প্রকাশিতে প্রবাসের ব্যথা নিদারুণ।

শ্রীমনোমোহন মজুমদার।

ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা।

(সমালোচনা)

জ্ঞানপিপাসুর হৃদয়ের আশা পরিপূর্ণ হইল,—রস-পিপাসুর রসের সাধনার দ্বার উন্মুক্ত হইল,—হীনবীর্য্য, অপহৃত শক্তি মানবের বীর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার স্বর্গদ্বার খুলিয়া গেল,—ভগ্ন-স্বাস্থ্য মানবের পুনঃ স্বাস্থ্য সংস্থাপনের বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হইল। দার্শনিক পণ্ডিত সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কঠোর সাধনার ধন,—বিপুল গবেষণার মহান্ পদার্থ "ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা" নামক অভিনব গ্রন্থ এতদিনে প্রকাশিত হইয়াছে।

এ মহা গ্রন্থের প্রকাশক—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এ গ্রন্থের সমালোচনা করা সাধারণের কার্য্য নহে। ইহা আধুনিক উপন্যাস-নাটক নহে,—ইহাতে দর্শনের গভীরতত্ত্ব সরল উপদেশে পূর্ণ হইয়াছে। যোগের কঠিন ও জটিল উপদেশ সাধারণ গৃহীর সহজসাধ্য ব্যাপার পূর্ণ হইয়াছে। তুমি-আমি—সংসারী জীব,—যোগসাধনাদিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞলোক এই গ্রন্থের সরল ও সহজ উপদেশ মতে কার্য্য করিয়া ভূতলে স্বর্গীয় রসের আস্বাদন করিতে পারিব। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা।

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।"—বীর্য্য ধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্য শব্দে শুক্র, শৌর্য্য, উৎসাহ, সামর্থ্য প্রভৃতি বুঝায়।

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"—ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্য-নিরোধ সামর্থ্য সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। শরীরে যদি চরম ধাতু বা শুক্র প্রতিষ্ঠিত থাকে,—বিকৃত না হয়,—স্খলিত না হয়, বিচলিত না হয়,—অটল, অচল বা স্থির থাকে; তাহা হইলে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। চিত্তের প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া যায়। রাগ-দ্বেষাদি অন্তর্হিত হয়,—কাম-ক্রোধাদি হ্রাস হইয়া পড়ে।

কিন্তু বীর্য্য নিরুদ্ধ করিবার শক্তি কি প্রকারে লাভ করিতে হয়, তাহার কৌশল, তাহার গুপ্ত ক্রিয়া, তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় কেহ জানেন না—জানাইবার জন্যই এই মহাগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। সকলে যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে,—কাম-কলুষিত চিত্ত মানব যাহাতে কাম বশীভূত করিতে পারে,—তাহারই সহস্র উপায় এই মহাগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। সে গুপ্ত সাধনা—সে উপায় সকল না বলিয়া দিলে, আর উপায় নাই। যুবকগণ

এখন যৌবনে বৃদ্ধ, শক্তিহীন, উদ্যম-অধ্যবসায় বিহীন—জীর্ণ দীর্ণ শক্তিহারা—উদর প্লীহা-যকৃত-অম্ল-ক্লেদে পরিপূর্ণ। প্রৌঢ় জরা-জীর্ণ—স্থবির ও অকর্ম্মণ্য। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত আর বড় কেহ জীবিতই থাকে না।

এ সকলের কারণ গৌণভাবে আর কিছু থাকিলেও যে একমাত্র মুখ্য কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য,—আমাদের দুর্ভাগ্য, বর্ত্তমানে দেশের সমস্ত বিষয়েরই উন্নতি হইয়াছে,—কেবল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না। ব্রহ্মচারী না হইলে আত্মোন্নতি লাভ হয় না। ব্রহ্মচারী না হইলে যোগী বা ভোগী হইতে পারে না। ব্রহ্মচারী না হইলে দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রহ্মচারী না হইলে স্মরণশক্তি,—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শান্তি ও সুখলাভ করিতে পারে না।

পারে না,—কিন্তু তাহার শিক্ষা-দীক্ষা কোথায়?

তাই বলিতেছিলাম, এবার সাধনার স্বর্গদ্বার খুলিয়াছে,—সাধকগণ অগ্রসর হউন।

আগে আমাদের ধারণা ছিল,—ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ,—বুঝি অবিবাহিত জীবনে শুক্রধারণই ব্রহ্মচর্য্য। এবার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে,—এই মহাগ্রন্থ পাঠে বুঝিতেছি—গার্হস্থ্য-যজ্ঞে ব্রহ্মচারী, স্বামী-স্ত্রীতে আচার্য্য ও হোতারূপে অবস্থিত;—প্রেমের বহ্নি জ্বালিয়া তাহাতে কর্ম্মের আহুতি দিতে পারিলে, তবে জীবন সার্থক হইবে। এই যজ্ঞফলে যে সন্তান জন্মিবে, সে সমাজের কল্যাণকর রত্ন হইবে। যে সন্তান জন্মিবে, সে যদি জ্ঞানের প্রখর বাতি জ্বালিয়া দেশের ও দশের উপকার না করিল, দশজনকে সৎপথে না আনিল, তবে তেমন সন্তান লইয়া কি হইবে? „

এই মহাগ্রন্থ মানবের পরম সহচর। আজকা'ল যুবকগণ অত্যাচারে অনাচারে ভগ্নস্বাস্থ্য, নষ্ট শুক্র ও অপহৃত সামর্থ্য। এই মহা গ্রন্থে তাহাদের উদ্ধারের জন্য অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠানের কথা, অনেক প্রতিষেধক ব্যবস্থা, অনেক সরল সহজ বৈজ্ঞানিক উপায়, অনেক তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র সম্মত ঔষধ লিখিত হইয়াছে। কেহই নিরাশ হইবেন না,—যাঁহারা ভাবিতেছেন,—আমরা মহাপাতকের ভীষণ অনলে ঝাঁপ দিয়া আত্মকৃত অনাচারে চরম ধাতু শুক্র পদার্থ হারাইয়া ফেলিয়াছি,—এখন আর কি দিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিব? ভয় নাই,—ঐ শুন মধুর ওজস্বিনী ভাষায়, মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হইতেছে—"মাভৈঃ!" যাহাতে নষ্ট শুক্র পুনঃ সংস্থাপন হয়, স্বপ্নবিকার, ধাতুদৌর্ব্বল্য,

ধারণাশক্তি হীনতা এবং নিকৃষ্ট কাম-ক্ষুধা দূরে যায়, তাহার জন্য যোগশিক্ষা, মুদ্রা বন্ধন ও বহুল ঔষধ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এবং এমন সকল গুপ্তক্রিয়া লিখিত হইয়াছে,—যাহা করিলে আশার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমরা আশা করি, এই মহান্, উজ্জ্বল, পবিত্র গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে সুশোভিত হইবে। ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকের এবং পুরুষানুক্রমিক।

রাধার সাধ।

নিকুঞ্জ কাননে ওই বাজিছে মুরলীরে—
শুনলো স্বজনি!
চল সখি নেহারিয়া কুঞ্জে বনমালীরে—
জুড়াব পরাণী।
কে আর আমার সখি আছে এ গোকুলেরে—
বিনা সে কালিয়া!
সে কুল-নায়ক বিনা রহিব গোকুলেরে—
কাহার লাগিয়া।
বড় ভালবাসি সখি সে মন মোহনে রে—
এ ব্রজ মণ্ডলে!
বিনা মূল্যে বিকাইয়েছে এ মন পরাণেরে—
সে পদ কমলে।
যত দিন রব সখি এ মহীমণ্ডলেরে—
তারে ধেয়াইব!
সে নীলরতনে রাখি হৃদয় কমলেরে—
যতনে সাধিব।
হেরিতে হেরিতে তারে, যবে এ নয়নেরে—
হবে জ্যোতিহীন;
মিটিবে সকল আশা, সে নীলরতনেরে—
হইব বিলীন॥

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার।

পতি-ভক্তি।

কথাটা কেমনই যেন অমৃতপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিকই স্বামী, নারী-জাতির দেবতা, সেই দেবতাকে যিনি অশ্রদ্ধা অনাদর ও অযত্ন করেন; পর-কালে তাঁহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। যত দেব, দেবী পূজা, ধর্ম্ম ইত্যাদি আছে, তাহা পার আর না পার যদি এক মনে পতি-ভক্তি করিতে পার তাহা হইলেই মুক্তি হইবেক। মাতা, পিতা অথবা দীক্ষা কিম্বা শিক্ষাদাতা গুরুরা পতিভক্তিরূপ মহামন্ত্র নারী জাতির কর্ণে প্রদান করেন—যে, সেই মন্ত্রকে মার্জ্জিত করিয়া লইতে পারিল, সেই মুক্তি লাভ করিল, আর যে ব্যক্তি তাহা না করিয়া কদর্য্য কার্য্যে মন নিয়োজিত করিল সে আজীবন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিল। রোগ অপেক্ষা ভোগটাই বেশী। কারণ রোগ চিরস্থায়ী কখন হয় না, ভোগ চিরস্থায়ী; সেই জন্যই বলিতেছি রোগ অপেক্ষা ভোগই বেশী। প্রকৃত পতিব্রতার স্বামীই জীবন। অনেকে ইহা উপহাস বলিয়া মনে করিবেন। কারণ এখনকার নব্য কর্ত্তারা কথায় কথায় ঠাট্টা বিদ্রুপটা বেশী করেন—সেই জন্যই বলিতেছি, কথায় বলে,—‘স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী’ যে নারী হয় সেই আদত পতিব্রতা বা পতি-ভক্ত স্ত্রী। তাহা বলিয়া আমি বৃদ্ধ, বুড়া, বুড়ীর যেমন একত্র শোয়া, খাওয়া দাওয়া তাহা বলিতেছি না। মহা পণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন;—

"সা ভার্য্যা য শুচির্দক্ষা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা॥"

চাণক্যশ্লোক। ৮॥

এই কয়টী গুণ থাকিলে তবে ভার্য্যা নামের উপযুক্ত হওয়া যায়, নতুবা স্ত্রী সকলকারই আছে বা হয়। এখানে আর বৃথা টীকা দেওয়া গেল না। আমি প্রকৃত পতি-ভক্তির দৃষ্টান্ত কয়েক স্থলে দেখাইতেছি, একবার পাঠিকা-গণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন। রামের যখন চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, তখন রাম সীতার নিকটে আসিয়া বলিলেন;— "প্রিয়ে! পিতার আদেশে আমাকে বিজনবনে যাইতে হইবে, ভ্রাতা ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। তুমি প্রতিদিন পিতার পাদবন্দনা ও মাতার সেবা করিবে। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের পর তোমার সন্নিধানে

প্রত্যাগমন করিব।" সীতা রামের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "নাথ! ভার্য্যা-স্বামীর ভাগ্যভোগ করিতে অধিকারিণী। যখন আপনার বনবাসের আদেশ হইয়াছে, তখন তৎসহ আমারও প্রতি সেই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আপনার বিচ্ছেদে আমার স্বর্গসুখ ও স্পৃহনীয় নহে? আমি সঙ্গে না থাকিলে, কে আপনার পরিচর্য্যা করিবে, স্বামী স্ত্রী-জাতির দেবতা, সেই দেব সবায় আমার কখনই বঞ্চিত করিতে পারিবেন না," এই বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কেন তিনি বলিলেই ত পারিতেন আমি যাইব না, রাম ত আর বাধিয়া লইয়া যাইত না, তবে কেন ওরূপ ভাবে বলিলেন, আর কিছুই নয় শুধু ভারতবাসীকে পতিভক্তি দেখাইবার এবং অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছিলেন। রাম কত বাধা দিয়াছিলেন, ভয় ইত্যাদি দেখাইয়া ছিলেন কিন্তু পতি ভক্তের মন অটল অচলা।

আবার পুনরায় রাম সীতাকে বনবাস দিলেন কিন্তু সীতা তখনও রামকে ভুলেন নাই, তখনও "হা রাম! হা রাম! রোদন সম্বল ছিল।"

আনন্দ মঠেতে মহেন্দ্র সিংহের স্ত্রী স্বীয় সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বামির সহবাসী হইয়া এক কৌটা বিষ খাইয়াছিলেন। জগতে কেহ সতীত্ব নষ্ট করে এই ভয়! নল দময়ন্তি পাশাক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। নলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সাবিত্রী সত্যবানের মৃতদেহ ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে সঞ্জীবীত করিয়া লইয়া ছিলেন। আজও তাঁহাদিগের জলন্ত কীর্ত্তি বিদ্যমান। আজও ভারতে যথার্থ সতীদিগের নামের স্থানে, তাঁহারা স্থানাধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সৌরভ ছড়াইতেছেন। বেহুলার নাম ও একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

দেবতাদিগের নিকট বেহুলার পরিচয়।

দেবতা সভায় বলে বেহুলা নাচনী।
শুনহে দেবতা সব আমার কাহিনী॥
যদি মোরে জিজ্ঞাসিলে ত্রিদেব ঠাকুর।
চাঁদ সওদাগর বটে আমার শ্বশুর॥
সনকা শাশুড়ী মোর নখির বন্দপতি।
তাহাসনে বিভা হইল পূর্ণিমার রাত্রি॥
মনসা সহিত বাদ করে তা'র বাপ।
বিভাদিনে প্রাণনাথে খাইল কাল সাপ॥

তখনি মরিল প্রভু কালীনীর বিষে।
জলে ভাস্যা আইনু তার জীবনের আশে॥
যতেক দেবতা যদি করহ কল্যাণ।
পুনরপি মোর পতি পায় প্রাণদান॥
যার সনে বিষহরী করেন বিবাদ।
কেবা তারে দিতে পারে অভয় প্রসাদ॥
মনসা বিহনে আর নাহি প্রতিকার।
মনে মনে মন্ত্র গুণি জপ মনসার॥
হরের বচনে বলে দেবগণে যত।
মনসারে আনিবারে তুমি যাও নেত॥
বেহুলার পূর্ণ কর মন অভিলাষ।
জগতির পূজা হউক জগতে প্রকাশ॥
এতেক শুনিয়া সখি করিল গমন।
সিজুয়া শিখরে গিয়া দিল দরশন॥
অমর নগর তুল্য সিজুয়া অচল।
নির্জন আছিল যথা জগতি মঙ্গল॥
সেইখানে যাইয়া নেত করি নিবেদন।
দেবতা সভায় তোমায় ডাকে দেবগণ॥

* * * *

ক্ষেমানন্দ কেতক দাসের মনসার ভাসান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে কথিত আছে যে, নেত বা নেতা নামে কোন ধোপানী দেবতা-দিগের কাপড়াদি পরিষ্কার করিত, বেহুলা কলার ভেলা * ভাসাইয়া নেতা

---

* বেহুলা যে নদী দিয়া কলার ভেলা করিয়া নেতার ঘাটে উপস্থিত হন, সেই ঢাকে লোকে এখন বেহুলা নদী বলে। বর্ত্তমান, বর্দ্ধমান জেলায় গোবিন্দ বাটীর নিকট দিয়া পূর্ব্বে একটী নদী ছিল, উহা এখন ক্রমে ক্রমে বুজিয়া গিয়াছে, সামান্য আদরা মাত্র আছে, এখানের লোকেরা ও অন্যান্য লোকেরা ইহাকেই 'বেহুলানদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মাহানাড় ঘোষেদের বাটীর কিছু দূর দিয়া গিয়াছে। সকল সময় শুষ্ক থাকে, কেবল বর্ষাকালে ইহা প্রায় নদীর ন্যায় ধারণ করে। ক্ষেমানন্দ ও লিখিয়াছেন, আগের ডিঙ্গায় তার ছয়টী ভাণ্ডার। তারা নিত্য বাহি ডিঙ্গা পাইল বৈদ্যপুর॥ প্রত্যক্ষ উজান চল নারিকেল ডাঙ্গায়। মৃন্ময়ী বিষহরী ঠাকুরাণী তায়॥ অতএব বুঝা যায় যে এই নদী দিয়া বেহুলা যাইয়া ছিলেন, কারণ নারিকেল ডাঙ্গা ঐ গ্রামের কিছু দূরে অবস্থিত।

ধোপনীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নেতাকে মাসী বলিয়া সমস্ত দুঃখ জানায় ও তথায় কার্য করে। একদিন বেহুলা বলিল মাসী! আজ তোমার কাপড় কাচিব। নেতা কিছুতেই দিবেনা, অবশেষে বহু পীড়াপীড়ি করায় নেত, দু' এক খানি কাপড় কাছিতে দেয়।

অতঃপর বেহুলা কাপড় সমুদয় শুধু গঙ্গাজলে কাচিতে লাগিল, তাহাতে তাহার কাপড় সূর্য্য সদৃশ প্রভাব শালী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আর নেতা, রোল, খারে কাপড় কাচিল ও আঁচড়াইল কিন্তু বেহুলার মত চাক চিক্যশালী হইলনা। নেতা দেবতাদিগের কাপড় দিতে যাইলেন, সকলকেই কাপড়াদি দিলেন কিন্তু সকলেই সে দিনের কাপড়ের চাকচিক্য দেখিয়া মোহিত হইল। মহাদেব বলিলেন, নেতা! তুমিত রোজ আমাদের কাপড় কাচ কিন্তু এরূপত কোন দিন হয় নাই, আজ এত পরিষ্কার হইল কিসে?

নেতা। আমি আর কি নিবেদন করিব, আমার বাড়ী আমার এক বন্‌ঝি আসিয়াছে সেই কাপড় পরিষ্কার করিয়াছে।

মহাদেব। তবে তোমার বন্‌ঝি আমার নাতনি হইল, তা তাকে আন্, আজ সভায় দেখিব। নেতা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বেহুলার কাছে গিয়া সমুদয় বলিল। বেহুলা নৃত্যবিদ্যায় বড় সুপটু ছিল, নেতা তাহাকে দেব-সভায় নাচিতে হইবে বলিল ও অনেক বুঝাইল, খুব সাবধানে এবং তালমান রাখিয়া নাচিবে ইত্যাদি বুঝাইল। বেহুলা বলিল, আমাকে আর বেশী বলিতে হইবে না বলিয়া নেতার সহিত সুরপুরে গমন করিল। তৎপরে বেহুলা দেবতা-দিগের সভায় যাইয়া মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজাইয়া সুন্দর নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার হাতের কায়দা ও তাল,মান রাখা ও সঙ্গে সঙ্গে গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, দেবতাগণ পরম প্রীত হইয়া বেহুলার পরিচয়াদি শুধাইলেন। বেহুলার স্বীয় জীবনী সমুদয় বলিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে মনসা দেবী নেতার প্রমুখাৎ দেবতাদিগের আহ্বান বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবতাদিগের সভায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, বরং শুধাইলেন কেন ডাকিতেছেন?

দেবতার সভায় মনসার গমন।

দেবতা সভায় নাচে গায় রজকিনী!
কি কারণে নাচে গায় আমি নাহি জানি॥
দেবতা সভায় গিয়া শুনিবে আপনি।
এই নিবেদন করি শুন গো ব্রাহ্মণী॥

মনসা মনেতে জানে বেহুলার কথা ।
মনসা বলেন আমি নাহি যাব তথা ॥
ধোপানী ধরিয়া কান্দে মনসার পায় ।
অবশ্য যাইবে মাতা দেবতা সভায় ॥
সখীর বচন দেবী এড়াইতে নারি ।
দেবতা সভায় গেলা জয় বিষহরি ॥

* * * *

হেনকালে বেহুলা * দেবীর ধরে পায় ।
ছয় মাস ভাস্যা আইলাম তোমার কৃপায় ॥
বেহুলা দেখিয়া দেবী হেঁট করে মাথা ।
হাসিতে লাগিল দেখি যতেক দেবতা ॥
মহেশ তাহার তরে কারণ জিজ্ঞাসা ।
কি কারণে নখিন্দরে (লক্ষীন্দর বা লখীন্দর, গ্রন্থকর্ত্তা
নখিন্দর বলিয়া পরিচয় করিয়াছে) খাইয়াছে মনসা ॥
চান্দের § সহিত তোমার কিসের বিবাদ ।
বিভাদিনে পুত্র মরে এ বড় প্রমাদ ॥
পরম দারুণ শোক দিতে যুক্ত নয় ।
তুমি যদি বাম হইলে কে হ'বে সদয় ॥
নখিন্দরে জিয়াইয়া দেহ পুনর্ব্বার ।
জগতে তোমার পূজা হইবে প্রচার ॥

মনসার উত্তর ও বেহুলার প্রত্যুত্তর ।

কি কারণে দেব সভায় বল এতগুলা ।
কেবা জানে চাঁদবণ্যাকে জানে বেহুলা ॥
কোনকালে কার সঙ্গে নাহি করি হট ।
বেহুলা বলেন মাতা না কর কপট ॥
মঙ্গল বিভার রাত্রি লোহার বাসরে * ।
কাল সাপ খাইল মোর নখিন্দরে ॥

---

* চাঁদ সওদাগরের বাস চম্পক নগর, ইহার ছয় পুত্র, ছয় পুত্রই মনসা কর্ত্তৃক নিহত হয় ।

§ নিচনী নগরে বেহুলার পিত্রালয়, পিতার নাম শায় সওদাগর, মাতার নাম অমলা, বেহুলার ছয় ভ্রাতা ছিল ।

* সাতালি পর্ব্বতে লোহার বাসর ঘরে বেহুলার বিবাহ হয় ।

সাপের সাপুড়া হাতে সুবর্ণের ঝাড়ী।
তিননাগ বন্দি কৈলাম তিনপ্রহর রাত্রি॥
এক্কাল নাগিনী দেবী তোমার আদেশে।
মোর প্রাণনাথে খাইল নিশি অবশেষে॥
সাপিনী পলাইতে মারি সুবর্ণের জাতী।
কালীর পুচ্ছটী আছে আমার সংহতি॥
সাপের সাপুড়া রামা দেবতা সভায়।
আচল ঘুরাইয়া বেহুলা দেখায় সবায়॥
কঙ্করাজ উদয় কাল আর কাল দণ্ড।
এ তিন ভুজঙ্গ তাহে বিষম প্রচণ্ড॥
সাপের সাপুড়ে দেখি দেবগণ কয়।
মনসা যে খাইয়াছে তার কি নিশ্চয়॥
মনসা বলেন ভাল আমি নাহি জানি।
সুন্দর লখাইরে তবে খাইল কোন ফণী॥ ক্রমশঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য জ্যোতিঃরত্ন।

অভিমান।

অভিমান স্ত্রীলোকদিগের স্বকার্য্য সাধনের একটী প্রধান অস্ত্র। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে অভিমান বড়ই মুখ রোচক বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ প্রিয়ার অভিমান যেন অম্ল মধুর। কিন্তু এমন মুখরোচক অভিমান ও সময়ে সময়ে বড়ই অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অভিমান ও মান স্থুল ভাবে একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে উহাদের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, সকলেই দেখিবেন যে, মান ও অভিমান স্বতন্ত্র জিনিষ।

বালক বালিকাদের অভিমান হইলে নিম্নরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়,—

(ক) মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ.

(খ) গোলাপের পাপড়ির মত রক্তাভ ঠোঁট দুখানি, আরও রক্তবর্ণ ধারণ, ঈষৎ ফুলান, ভঙ্গী।

(গ) শেষে ক্রন্দনে পরিণত।

যুবতীগণের অভিমানে শেষোক্ত লক্ষণের পরিবর্ত্তে মৌনভাব প্রকাশ পায়।

এখন অভিমানের প্রতিকারের উপায় স্থির করা যাউক। বালক বালিকাদের অভিমান হইলে বা হইবার উপক্রম হইলে, আদর, সোহাগ ও বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলে অভিমানের নিবৃত্তি হয়; কিন্তু যুবতীগণের অভিমান বড় বিষম, তাহার কাছে আদর সোহাগ প্রয়োগ করিলে, না থামিয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব সুবুদ্ধি পাঠকগণ, সাবধান, এরূপ বিপদে পড়িলে, প্রিয়তমার চিবুক ধরিয়া আদর সোহাগ প্রয়োগ করিওনা করিলে ফল পাইবেনা। এরূপ ক্ষেত্রে মৌনাবলম্বন থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

তারপর মান ও অভিমানের স্বতন্ত্রতার বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করি। মান অভিমান অপেক্ষাও বড়ই ভীষণ। মানের কথা মনে হইলে, সেই শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মানের কথা মনে পড়ে; সে বড় বিষম মান শ্রীকৃষ্ণ রাধার চরণ যুগল ধারণ অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। তাই বলি মান অভিমান অপেক্ষাও শক্ত। প্রিয় পাঠকবর্গ, যদি মানরূপ বিপদে পড়েন তবে কি উপায়ে তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন, তাহা আজিও আমি স্থির করিতে পারি নাই। এক্ষেত্রে সে উপদেশও দিতে পারিলাম না। তবে আশা আছে বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিলে, মানের একটা ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষে মানের ঔষধ বাহির হইলে অনেক হতভাগ্য পুরুষ এমন কি স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত উপকৃত হইতে পারিবেন আমার বিশ্বাস।

অভিমান শেষে ক্রোধেও পরিণত হয়। ক্রোধ হইলে সাধারণ বিবেচনায় বড়ই বিপদ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আমরা অনেকস্থলে পরীক্ষা করিয়াছি যে, অভিমান হইতে ক্রোধে পরিণত হওয়া সুমঙ্গলের পরিচায়ক। বিশেষ প্রিয়ার অভিমানের পর যদি ক্রোধে পরিণত হয়, তবে পাঠকবর্গ শীঘ্রই অভিমানরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন জানিবেন। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করি। অভিমান একই অবস্থায় ২।৩ দিন যাবৎ থাকিতে দেখা গিয়াছে।* কিন্তু অভিমান যখনই ক্রোধে পরিণত হয় তাহার কিছুক্ষণ পরেই ক্রোধেরও শান্তি হয় জানিবেন। তাহা হইলেই বুঝিবেন যে অভিমান ক্রোধে পরিণত করানও একটা অভিমানের ঔষধ স্বরূপ।

অতএব অভিমান হইতে শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার হইবার ইচ্ছা থাকিলে বিজ্ঞ

---

* এখানে অভিমান শুধু নিখুঁত অভিমান অবস্থাতেই ২।৩ দিন থাকে তাহা মান বা ক্রোধে পরিণত হয় নাই—লেখক।

ব্যক্তিগণ সেই অভিমানটা ক্রোধে পরিণত করান যে ঔষধ, ইহা একটী বিজ্ঞান সম্মত হোমিওপ্যাথির মৃত 'যাতে উৎপত্তি তাতেই নিবৃত্তি'রূপ প্রিয়ার অভিমান ক্রোধে আনয়ন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, ইহাই—এক মান অনুরোধ।

অতএব বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, রমণীগণের প্রধান অস্ত্র অভিমান হইতে উদ্ধার হইবার এই হতভাগ্য পুরুষগণের দুটি মাত্র ঔষধ আছে। ওটি পুনরায় পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—

(১) প্রিয়ার অভিমান কালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হয় মৌনাবলম্বন নয়,

(২) অভিমানকে ক্রোধে পরিণত করাইয়া শীঘ্র দুর্জ্জয় অভিমানের হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বলা বাহুল্য যে হোমিওপ্যাথির মত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উপস্থিত অভিমানের লক্ষণ গুলি (symptom) স্থির করিয়া উক্ত ঔষধ দুটী প্রয়োগ করেন ইহাই একমাত্র নিবেদন।

যদিও এই প্রবন্ধে মানের কোন উপায় করিতে পারিলাম না, তথাপি পাঠকগণকে একটী উপদেশ দিতে বিস্মৃত হইব না, মানের আজি ও এই জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত ভারতবর্ষে ঔষধের আবিষ্কার হইল না, যে সেই মানকে সদাই ভয় করিয়া চলিতে ও যাহাতে সেই দুর্জ্জয় মান প্রিয়ার সন্নিকটে না আসিতে পারে, সে বিষয়ে পাঠকগণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

মাসিক সংবাদ।

মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ফিলিপাইনবাসীদিগকে সাধারণ তন্ত্র দান করিয়াছেন। সম্প্রতি কিউবা রাজ্যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের আয়োজন হইতেছে। সেনর পেমেস্ সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডস জর্ম্মাণ সম্রাট কৈসরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ,—সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডস ও জর্ম্মাণীর কৈসর উভয় জাতির মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।—ভগবান উভয় নরপতির চেষ্টা সফল করুন।

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

পারস্যের গোলযোগ ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। সম্রাট শাহের কিছুতেই চৈতন্য হইতেছে না। পারস্য এখন অশান্তি ও অরাজকতার লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। বেতনাভাবে সৈন্যগণ বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হইয়াছে। সম্প্রতি বক্তিয়ারী সর্দ্দারগণ ইস্পাহন নগর আক্রমণ করে; অসন্তুষ্ট সৈন্যগণ তাহাদিগকে বিশেষ কোন বাধা দেয় নাই; ফলে বক্তিয়ারী সর্দ্দারগণ সহজেই নগরী অধিকার করিয়াছে। অসন্তুষ্ট সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা দস্যুর অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেনানীগণ কোনক্রমে তাহাদিগকে সংযত রাখিতে পারিতেছেন না। পারস্যের পতন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মনোমালিন্য এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সন্ধির বাবদ প্রাপ্ত অর্থের জন্য তুরস্ক বুলগেরিয়াকে পীড়াপীড়ি করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই। সম্প্রতি তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে গোলযোগ মীমাংসার জন্য বুলগেরিয়া গবর্ণমেণ্টকে তীব্র ভাষায় একখানি পত্র লেখেন; তাহার ফলে বুলগেরিয়া গবর্ণমেণ্ট সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বুলগেরিয়ার এই স্পর্দ্ধায় সভ্যজগত বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। রুষ ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আপোষে এই গোলযোগ নিষ্পত্তি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার বড় লাটের প্রাসাদে এক দরবার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিগত নববর্ষ ও মহারাণীর রাজ্য গ্রহণের পঞ্চাশ বার্ষিক উপলক্ষে যাহারা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, বড় লাট স্বহস্তে এই দরবারে তাহাদিগকে উপাধি ভূষণ বিতরণ করিয়াছেন।

আফ্রিকার মরক্কো রাজ্য সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জার্ম্মানির মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা হইয়াছে। মরক্কো রাজ্যে রাজনীতি বিষয়ে ফরাসীদিগেরই প্রাধান্য থাকিবে স্থির হইল, কিন্তু বাণিজ্যাদি বিষয়ে জার্ম্মানি ফ্রান্সের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। উভয়েই ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আর্য্য-স্থাপত্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উড়িষ্যার কণারক মন্দিরের কারুকার্য্য পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যাধিপতি নরসিংহ দেব কর্ত্তৃক ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বিশ বৎসর লাগিয়াছিল এবং দ্বাদশ বৎসরের রাজস্বে ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় সংকুলান হইয়াছিল। *

কণারক মন্দিরের উৎকৃষ্ট ভাগ এখন ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ধ্বংশাবশেষের মধ্যে এখনও যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব্ব এবং বিস্ময়োদ্দীপক। এখনও যাহা আছে, তাহা ভাষার বর্ণনাযোগ্য নহে এবং তাহা উপভোগ করিতে হইলে কবির চক্ষু আবশ্যক। মন্দির ধ্বংশমুখে পড়াতে মন্দিরাধিষ্ঠিত তপন-মূর্ত্তি পুরীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মুক্তি-প্রেপ্সু ভক্ত-যাত্রীগণও সেই হইতে আর পুণ্যসঞ্চয় কামনায় যুক্ত-করে, নম্রশিরে এবং গদগদশ্রুলোচনে মন্দির চত্বরে বসিয়া প্রার্থনা করিতে আসে না।

মন্দিরের কতকাংশ এখন বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সাগর,—পূর্ব্বে মন্দির-পাদ-মূলে ফেনকিরীটমালা পরিয়া, সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া, তরঙ্গ-নির্ঘোষে চারিদিক কাঁপাইয়া, নিস্ফল আক্রোশে আছড়াইয়া পড়িত—এখন কতিপয় মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ধূ ধূ বিজন প্রান্তরের মধ্যস্থলে ধ্বংশ-প্রায় আর্য্য-কীর্ত্তি-স্তম্ভ কণারক মন্দির মৌন-স্তব্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া, এখন পূর্ব্ব-চক্রবালে ভোরের রক্তিমাভা এবং সাঁঝের আকাশে মৃত্যু-মলিণ অস্ত-রবির চিতা-শয্যা দেখিতেছে। স্তব্ধ নিশাতে মাত্র নৈশবায়ু আর্ত্ত-রবে, অতীতের উদাস রহস্য গীতি গাহিতে গাহিতে বহিয়া যায়। প্রভাতে, সন্ধ্যাতে আর মঙ্গল উপাসনা-আরতি হয় না, মন্দিরকক্ষে আর কেহ সুগন্ধি-তৈল-পূর্ণ রত্ন-দীপ জ্বালিয়া দেয় না, চত্বরে বসিয়া কেহ আর ভক্তি-উচ্ছসিত-কণ্ঠে উদাত্তস্বরে, ভূমানন্দে মাতিয়া পবিত্র বন্দনা-স্তোত্র আবৃত্তি করে না। †

মিঃ এ ষ্টালিং বলেন, The workmanship remains too as perfect as it had just come from the chisel of the sculptor owing to the extreme hardness and durability of the stone."

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। (জন্মভূমি).

† সাধনা। ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

না জানি সে কিরূপ কারুকর্ম্ম, যাহা অদ্যাপি নূতনবৎ প্রতীয়মান হয়!

নবগ্রহশিলা নামধেয় একখানি বৃহৎ প্রস্তর মন্দিরের সাম্‌নে প্রোথিত ছিল। একজন পুরাতত্ত্বজ্ঞ সাহেব ঐ প্রস্তরখানি এসিয়াটিক সোসাইটীতে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন। শেষে নিরুপায় হইয়া ঐ কারুকার্য্য শোভিত প্রস্তরখানি দুই খণ্ড করিয়া হস্তীর সাহায্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। যে মন্দিরের এক খণ্ড প্রস্তর এমন বিশালায়তন, মনে করিয়া দেখুন, সে মন্দির কিরূপ ছিল। *

মন্দিরের সম্মুখে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, কারুকুশলতাপূর্ণ একটী অরুণ স্তম্ভ ছিল। সেটি এখন পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। হরিৎবর্ণ আর একখানি সুন্দর প্রস্তর আর একজন সাহেব আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুদূর আনিয়াই প্রস্তরবাহী শকটখানা, বিপুল ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। প্রস্তরখানি আজ পর্য্যন্ত সেইখানে পড়িয়া আছে।

ইউরোপীয়গণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, কণারক মন্দিরের মত সূক্ষ্ম শিল্প আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। হাণ্টার সাহেব কণারক মন্দির দেখিয়া লিখিয়াছেন,

"The ruins now lie heaped upon the flour, a gigantic chaces; and the contrast between their unwieldly bulk, and the laborious sculpture, which covers at almost every square inch out side, forces of the memory Bishop Heber's criticism that the Indians built like Titans and finished like jewellers"

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও শিল্প কার্য্যের জন্য বিখ্যাত। মাদ্‌লাপঞ্জীর মতানুসারে এই মন্দির ৩১৬ শকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণকর্ত্তা উড়িষ্যাধিপতি যযাতিকেশরী। পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, ভুবনেশ্বর, সপ্তম খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির গাত্রস্থ শিল্প কার্য্য সকল দর্শন করিলে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। মন্দিরের অবস্থানও অতি সুন্দর। পূতঃ-অমলনীর স্ফটিকোপম বিন্দু হ্রদের তীরদেশে মন্দিরটী অবস্থিত। চারিদিক সুনির্জ্জন। বিপুল-জনতা পৃথ্বীর সংসারিক কোলাহল এই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

* Journal of Asiatic Society.

লক সাহেব ভুবনেশ্বরের একটী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "আহা! ঠিক যেন রক্ত মাংসের শরীর!"

মন্দিরের উচ্চতার পরিমাণ ১২০ হস্ত। প্রস্তর মৃত্তিকার মত কোমল। প্রত্যেক অলিন্দে কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত এক একটী অতি সুদর্শন পুত্তল স্থাপিত আছে। সেগুলি এমন মনোহারি ও কোমলতাপূর্ণ যে, না দেখিলে বর্ণনায় বোঝা যায় না। *

কাশ্মীরের অবন্তীপুরেও একটী আর্য্য-কীর্ত্তি আছে। উহার নাম অবন্তী-স্বামীর দেবালয়। রাজা অবন্তীবর্ম্মার রাজত্বাধীনে ইহা নির্ম্মিত হয়। উইলসন বলেন, ৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। মন্দির এখন অনেক স্থলে ভগ্ন-চূর্ণ হইয়াছে। সুবৃহৎ দেবালয় এখনও ধ্বংশ-ধর্ম্মী কালকে উপহাস করিয়া দণ্ডায়মান আছে। †

ইহার সূক্ষ্ম শিল্প মানস হরণ করে। জনৈক ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী বলেন, "রাজপুরাবস্থিত সূর্য্য মন্দিরই কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। এই মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী এতদূর সুন্দর যে দেখিলে ইহাকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুদের কোন দেবালয় এই মন্দিরের অপেক্ষা উঁচু নয়। হিন্দুদের মন্দির-নির্ম্মাণার্থ স্থান নির্ব্বাচনও প্রশংসাযোগ্য। সূর্য্যদেবের মন্দিরের পশ্চাতে দূরবিস্তৃত গিরিমালা, সম্মুখে সুদূর প্রসারি শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত সমতল ক্ষেত্র; উভয় পার্শ্বে অসমোচ্চ শৈলদল। মন্দিরের গাম্ভীর্য্য হৃদয়-স্তম্ভনকারী আর লীলারম্য প্রকৃতির দৃশ্য মাধুর্য্য নয়ন তৃপ্তকর, এই ভীষণে মধুরে বিমিশ্রিত শোভা মানব মাত্রেরই হৃদয়হারিনী।"

উল্লিখিত ভ্রমণকারী তৎপরে বলিয়াছেন, "দেবতা বিদ্বেষী যবনেরা আর এই সকল মন্দিরকে ধ্বংশের অতল তলে নিক্ষেপ করিবার জন্য ধাইয়া আসে না বটে; কিন্তু প্রাকৃতিক বিপ্লবে ও মানবের উপেক্ষায় এই সকল দেবালয় ক্রমেই কালের করাল বদনে প্রবেশ করিতেছে।"

আবু পর্ব্বতস্থ সুপ্রসিদ্ধ জৈন-মন্দিরের কথা বলা যাইতেছে। এই মন্দির গুর্জ্জর-বণিক বিমলা সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ১০৩২ খ্রীঃ অব্দে নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। নির্ম্মাণ ব্যয় আঠারো কোটি টাকা। এবং নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইতে চৌদ্দ বৎসর লাগিয়াছিল। মিঃ ফারগুসন বলেন,

---

* Cunningham, and Art Treasure of ORISSA. P, P. 195.

† History of Indian and Eastern Architectures,

"এমন বিশুদ্ধ রুচি-পরিচায়ক মন্দির পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। ইহার চাঁদনী এত সুন্দর যে আমাদের ধর্ম্মমন্দির সকল এই আদর্শে নির্ম্মিত হইলে মনোহর হইত।"

পর্ব্বত কাটিয়া একটী সমচতুষ্কোণ স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহার উপরে সুবৃহৎ স্তম্ভ সমূহ। তদুপরি মণ্ডলের ছাদ। ছাদের উপরে কয়েকটী গুম্বজ আছে। তাহার উপরে আবার বারান্দা। বারান্দার উপরেও আর এক তল আছে। তাহার পর প্রধান কারুকার্য্যময় গুম্বজ। মন্দিরের চারিদিকে পাদপ-বহুল প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা।

মন্দিরের বহির্দ্দৃশ্যে বিশেষ লোভনীয় কিছুই নাই। কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অতি চমৎকার। দালান, খিলান-করা ছাদ, সমস্তই শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত। মণ্ডপে যে সকল স্তম্ভ আছে, সেগুলির কারুকার্য্য, অদ্ভুত নিপুণতার পরিচায়ক।

ছাদে খোদিত গহ্বর সকল নানারূপ প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। মন্দিরের সর্ব্বত্র পুষ্পলতা খোদিত। শিল্প-কার্য্য শূন্য এক ইঞ্চ পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত দেখা যায় না। *

আবু পর্ব্বতে আর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহা তেজপাল ও তদীয় ভ্রাতা দ্বারা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে নির্ম্মিত। এই মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিমলসাহ নির্ম্মিত মন্দিরাপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয়।

মন্দিরে দুইটী তাক আছে। উহার খোদন শিল্প এত পরিশ্রমসাপেক্ষ যে, ঐ দুইটী তাকের কারুকার্য্য করাইতে প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার শিল্পকরগণের বেতনও বড় অল্প ছিল না। খোদনাতিরিক্ত যে চূর্ণ পাওয়া যাইত, তাহার সহিত ওজন করিলে যত রৌপ্য লাগিত তাহাই শিল্পীগণের বেতনরূপে নির্দ্ধারিত ছিল।

আগামীবারে ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। *

---

* J. Furgusson.

* সন ১৩১৫ সালের ৫ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয় সাধনা সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ বি এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে চিত্র ও স্থাপত্য বিষয়ক প্রবন্ধ দুইটী ভারতীয় পৌরাণিক শিল্প নামে একত্রে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। এখানে কেবল স্থাপত্য সম্বন্ধীয় বিবরণটী দেওয়া গেল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পতি-ভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অতঃপর বেহুলা মনসার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, যত শাপ আছে তাদের সকলকে ডাক, যে সাপিনীর কাটা পুচ্ছ জোড়া লাগিবে, সেই নিশ্চয় আমার পতিকে খাইয়াছে, তাহা আমি আগে নিবেদন করিতেছি। মনসা যতেক ফণিদের ডাকিলেন বটে কিন্তু কালিনী আসিল না। তখন বেহুলা বলিল মা! কপটতা ছাড়িয়া সদয় হও, এবং দেবি! সাধের তনয়কে জিয়াইয়া দেহ।" তৎপরে কালিনীকে মনসাদেবী ডাকিলেন, কালিনী আসিল ও তাহার কাটা পুচ্ছ জোড়া লাগিল। তখন বেহুলা, দেবতাদিগকে বলিল, হে দেবতাগণ! এই খল সর্পই আমার প্রাণপতির জীবন নাশ করিয়াছে।

"চণ্ডিকা দেখিল এত মনসার কাজ।
ঈশ্বর সাক্ষাৎ দেয় মনসাকে লাজ॥
তেই বল বিশ্বনাথ মোর কন্যা সতী।
বিবাহের রাত্রে কেন খাইল উহার পতি॥
তোমার সেবক হয় চাঁদ সওদাগর।
লোহার বাসরে তার পুত্র নখিন্দর॥
তার মধ্যে খায় গিয়া মনসার নাগে
হেট মুণ্ড করে আছ কোন অনুরাগে॥

মনসা দেবী চণ্ডীর এরূপ অপমান শুনিয়া বলিলেন;—

"শুনহ বেনীয়া বেটী বেহুলা নাচনী।
তোর শ্বশুর বলে মোরে চেঙ্গমুড়ীকানী॥
আমা সনে বাদ করি রাখিয়াছে দাড়ি।
হাতে করি লইয়া বেড়ায় হেতালের বাড়ী॥ *
শাক রাখা, ঢেরা পালা দনাহীরা আর।
মনসার পূজা নানা প্রতি ঘরেঘর॥

---

* বাড়ী—লাঠী।

না করে আমার পূজা চাঁদ সওদাগরে।
সদাই দুর্ব্বাক্য কহে প্রাণে যত পারে॥
ছয় পুত্র খাইনু তার ছয় বধু রাঁড়ী।
কালীদহে করিলাম তার সাত ডিঙ্গী বুড়ি॥
তবু নাহি মোর পূজা করে সওদাগর।
অবশেষে খাইলাম তোর নখীন্দর॥

* * * *

এই কথা শুনিয়া তখন অন্যান্য দেবতারা বলিলেন, মাতা! আর চাতুরি করিতেছ কেন? যার সনে বিবাদ তাহাকে না মারিয়া অসহায়া অবলা জাতির পতিকে হরণ করিলে কেন? তৎপরে দেবী বেহুলার আগমন বৃত্তান্ত ও দেবতাদিগের আয়ান অনুরোধ শ্রবণ করিয়া মনসা দেবী তখন নখীন্দরকে বাঁচাইতে বসিলেন।

যতেক দেবতাগণ দেখে চারি ভিতে।
মনসা বসিল মধ্যে নখাই বাঁচাতে॥
নখিন্দরে বেড়ী দিল কাপড়ের কাণ্ডার।
সম্মুখে রাখিল দেবী অস্থির ভাণ্ডার॥
যেখানে যে লাগে তার অস্থি খানি খানি।
পাদ হস্ত দিয়া দেবী যোড়েন আপনি॥
মুখমণ্ডল নয়ন হইল দুই শ্রুতি।
হস্ত পদ হইল তার সুগঠন মূর্ত্তি॥
ছয় মাসের পচা মড়া জলে ভেসে গেছে।
কালিনী শাপের বিষ তবু তাতে আছে॥
ধড়ে প্রাণ নাহি যেন চিত্তের পুতলী।
মনসা ঝাড়েন তারে মহামন্ত্র বলি॥
কিকর শিমুল ডালে ধুকড়ি কঙ্ক।
মোর পুত্রে হইয়াছে সাপিনীর ডঙ্ক॥
সাপিনী ধরিয়া খাও বিষহরি বলে।
কঙ্ক স্মরণে বিষ ধিকি ধিকি উলে॥
হাড় মাংস রক্তো বিষ হাড়ে কর বাসা।
খেদাড়িয়া দেহ বিষ বলেন মনসা॥

বিষের বিষম ডাক দিল নত্ত্য শিখী।
ময়ূর স্মরণে বিষ উলে ধিকি ধিকি ॥
বেজী বলে ওরে বিষ আয় তোরে কাটি।
কালিনীর কালন্দটী মোরে দেহ ভেটী ॥
পাতিয়া যুগল কর মাগেন গরল।
মনসার মন্ত্রে বিষ ফুকে হৈল জল ॥
নখাই নির্ব্বিষ হৈল মনে হেন জানি।
তবে মন্ত্র মনে কৈল মৃত্যু সঞ্চারিণী ॥
মৃত্যু সঞ্চারিণী মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিল।
নিদ্রা ভঙ্গ হইল যেন নখিন্দর জীল ॥
জীব দান পাইয়া বৈসে মনসার কোলে।
কাপড় কাণ্ডার দেবী দূরে টানি ফেলে ॥
নখিন্দর বাঁচে দেখি যত দেবগণ।
মনসার মহিমা বাড়ান সর্ব্বজন ॥

অতঃপর বেহুলা প্রাণনাথ জীবন্ত হইয়াছে দেখিয়া মনসার স্তব আরম্ভ করিল। তখন সকলে নখাইয়ের রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও দেবতাগণ মনসার স্তব ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; মৃদঙ্গাদি বাজিতে লাগিল ও এক রমণীয় শোভা ধারণ করিল। অতঃপর বেহুলা নখিন্দর দাঁড়াইতে পারিতেছে না দেখিয়া বলিল, "প্রভুর মালাইচাকী বোয়ালমাছে খাইয়াছে। সেই জন্য প্রভু দাঁরাইতে পারিতে-ছেন না। বিষহরি তখন জ্যালা মালা দুই ভাইকে ডাকিলেন ও বলিলেন, "অদ্য শোণ গাছ গিয়া বন, শোণ গাছ সদ্য হইবে তাহার সুতা বাহির করিয়া জাল বুনিয়া রাঘব বোঁয়াল ধরিয়া আমার কাছে আন। তাহারা তখন শোণ গাছ বুনিয়া জাল ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া রাঘব বোয়াল ধরিয়া সুরপুরী আসিয়া হাজির হইল। মনসাদেবী তখন সুবর্ণের বঁটি দিয়া মৎস্যের পেট চিরিয়া "মালুইচাকী" বাহির করিলেন এবং মৎস্যের পেট সিয়াইয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন ও লক্ষীন্দরের মালাইচাকী বসাইয়া যোড়াইয়া দিলেন।

"লইয়া মালাইচাকী যোড়া দিল তায়।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নখাই উঠিয়া দাঁড়ায় ॥"

পাঠিকাগণ! দেখুন কিরূপ স্বামী ভক্তি, বেহুলা কি কষ্ট না করিয়া মৃত নখিন্দরের দেহ আজ সুরপুরে লইয়া উপস্থিত হইতে পারিয়াছে। যদি সে এইরূপ কষ্ট সহ্য না করিত, তাহা হইলে মনসার ভাষাণ অন্য আকার ধারণ করিত সন্দেহ নাই। সুরপুরে আসা কি আর তার ভাগ্যে ঘটে? না কেহ সেরূপ চেষ্টা বা যত্ন করেন!

তৎপরে বেহুলার ভক্তিতে মনসা কর্তৃক, চাঁদের সমস্ত হারাণ ধন প্রাপ্ত হইল। ছয় পুত্র ডুবা নৌকা ও স্বর্ণাট্টালিকা পাইয়া সুখভোগ করিল ও আজন্মকাল পর্য্যন্ত মনসার পূজায় জীবন অতিবাহিত করিল। সেই হইতেই মনসা পূজার সৃষ্টি হইল। এখন ইহা নিত্য কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেবল মাত্র শিক্ষা করিলেই হইবে না, কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। পাঠক পাঠিকাগণ! অনুগ্রহ করিয়া এই চিত্রটি মন মধ্যে কল্পিত করিয়া দেখিবেন, কিরূপ অপরিসীম পতিভক্তি। কালকেতু ও ফুল্লরার বৃত্তান্ত কি ভীষণ! ফুল্লরা কালকেতুর কিরূপ জীবন অতিবাহিত করিয়া ছিল তাহা সেই বারমাস বর্ণনা শ্রবণ করিলেই হৃদয় বিগলিত হয়। আমি তাহার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ফুল্লরার বারমাস বর্ণনা।

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়ার ঘর তালপাতার ছাওনী॥
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাস নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে ফসল-সমান বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি খাটে খুঁঙার বসন।
বৈশাখ হ'ল বিষ গো বৈশাখ হল বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বেঙ চের জলোপরে করি উপবাস॥

* * * *

আষাঢ় পূরিল মহী নব মেঘ দল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুড়া পাই উদর না পুরে॥

*　　　　*　　　　*

দুঃখ কর অবধানে, দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুড়া ভাস্যা যায় বান॥

*　　　　*　　　　*

মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটী।
অন্ধকারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী॥

*　　　　*　　　　*

যুবতী পুরুষ আদি পোড়ায় মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে॥

*　　　　*　　　　*

অনল সমান পোড়ে চইতের ঘরা।
চালুফেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥

উঃ! কি ভীষণ দুঃখ যন্ত্রণা, তথাপি ফুল্লরা কোন কষ্টই গ্রাহ্য করিত না। একে ঐ সমস্ত দুঃখ আবার তাতে রাজার পীড়ন, সমস্তই সহ্য করিয়া পতি-ভক্তি করিয়াছিল। সতী স্বামির জন্য কিরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিল, শ্রবণ করুন ;—

ফুল্লরা বলেন মাসি মাংস না বিকায়।
আজি মহাবীর বল সম্বল উপায়॥
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
লইয়া সে ভাতি ভেট যাও তুমি তথা॥
ক্ষুদ কিছু ধার লইও সইয়ের ভবনে।
কাঁকড়া ক্ষুদের জাউ রান্ধিহ যতনে॥"

দেখুন নিজের একমাত্র কিছু উপায় না রাখিয়া কেবল স্বামির তরে অন্য স্থানে পাঠাইলেন। এরূপ যে ফুল্লরার কতদিন উপবাস ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এরূপ উদাহরণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা আর বৃথা সময়ক্ষেপ মনে করিয়া উল্লিখিত হইল না। যার মনে ভক্তির উদ্রেক হয়, তার সামান্যতেই হয়, আর যা'র না হয়, তার কিছুতেই হয় না, যেমন মূর্খের নিকট রামায়ণের কথা, আর হনুমানের নিকট মণি, মাণিক্য শোভা পায় না—না বুঝাইলেও বুঝে না, তেমনি অবিজ্ঞ লোকের নিকট বহুবার বকাও বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক ইহাতেই পাঠক পাঠিকাগণ সন্তুষ্ট হইবেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়। বারান্তে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। এখন ক্ষুদ্র অবসরের স্থান অল্প, সেই জন্য আজ এই অবধি হইয়াই রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য, জ্যোতীরত্ন।

জীবনের পরপার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

"I have no humour nor delight in telling stories, and do not publish these for the gratification of those that have; but I record them as arguments for the confirmation of a truth which hath indeed, been attested by multitudes of the like evidences in all places and times." Rev. J, GLANVIL.

ভূতের ভয় লোকের মনে চিরকাল প্রবল। আদিম যুগে কি মধ্য যুগে, অথবা আধুনিক যুগে,—যে যুগেই বল, ভূতের ভয় ছিল বা আছে। জননী

দুষ্ট ছেলেকে শাসন করিবার জন্ত, ছেলেবেলা থেকেই তাকে 'ওই জুজু' বলিয়া ভয় দেখান। গ্রাম্য জনরব এখানে নীরব নয়। জনরবে, কত তালগাছ প্রমাণ, দীর্ঘোদর, বৃহদ্দন্ত, ঘূর্ণিতচক্ষু ভূতের অস্তিত্বের কথা উচ্চারিত হয়। পিতা বা মাতা জীবিতাবস্থায় পুত্রের কাছে কত ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে দেখিলে অতি প্রিয় ও সুবোধ পুত্রও তাঁহাদের কাছে এক দণ্ড অপেক্ষা করিতে চায় না।

আসল কথা, মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জন্ত আত্মীয়গণ, "ওগো এস গো,—একবার দেখা দাও গো" বলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কত কাঁদিবে, কিন্তু আর প্রাণান্তেও তাহাকে দেখিতে চাহিবে না। দেখিলে সে মুল্লুক ছাড়িয়া চম্পট দিবে এবং পরে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দিবে। তাহাদের মনোগত ভাবখানা এইরূপ, "তুমি মরিয়াছ, আমরা তোমার জন্ত শোক করিব, কাঁদিব,—কিন্তু তোমাকে আর দেখিতে চাই না! দূর হইতে তোমার পদধূলি লইতেছি, তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট হও, এবং যেখানে তুমি গিয়াছ, সেইখানেই এখন তোমার পক্ষে সন্তুষ্টমনে থাকা উচিত, পৃথিবীরপ্রতি,—দোহাই তোমার,—আর লোভ করিও না।"

কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করিলে, প্রেতের যে আমাদের উপরে কোন শক্তি থাকে না, এ কথা আমরা ভাবিয়া দেখি না।" ভূত অর্থে একটা ভয়ানক পদার্থ নয়,—'ভূত' অর্থে গত। যে গিয়াছে। সে অশরীরী। শরীরির উপরে তাহার কোন শক্তি নাই। দেখা দিলে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। তাহার আকার ভয়ানক নয়। মস্ত বড় একটা দৈত্যের মতও নয়। সে আমাদেরই মত রূপধারী।

অনেকে বলেন, প্রেতেরা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সকল কথা বলিতে পারে। মিথ্যা কথা। ভবিষ্যৎ একেবারেই তার আয়ত্তের মধ্যে নাই। আমরা যেমন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ,—তাহারাও তাই। তবে অতীত ও বর্ত্তমান তার আয়ত্তের ভিতরে বটে। এই জন্তই প্লানচেট ও ত্রিপায়ার সাহায্যে যে উপায়ে ভূত নামানো হয়, তাহাদের নিকটে ভবিষ্যতের প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশস্থলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, প্রেতগণের মধ্যে দলাদলি আছে। পৃথিবীর জীবিতগণের মধ্যে যেমন কেহ খৃষ্টান ধর্ম্মে আস্থাবান, আবার কেহ বা হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসবান্, প্রেতদের মধ্যেও তাই। তাহারা

সকলেই এক ঈশ্বরকে মানে না। কিন্তু কেহ হিন্দু ঈশ্বর মানে, আবার কেহ বা ক্রীশ্চানমতীয় ভগবানে বিশ্বাস করে। এ রহস্য বাস্তবিকই অদ্ভুত।

প্রেতের কথা প্রাচীন সাহিত্যেও বহুল পরিমাণে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। রোমক সভ্যতাকালে, রোম প্রভৃতি দেশে অনেক ভূতের বাড়ী ছিল, তৎসাময়িক সাহিত্যে তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে।

ছোট প্লিনী (Pliny the younger) প্রমাণ দিয়াছেন যে, পণ্ডিত এথেনোডোরাসের (Philosoper Athenodorus) বাড়ীতে প্রেতভয় ছিল।

মহা নাস্তিক ও সন্দিগ্ধচেতা লুসিয়ান (The sceptical Lucian) তাঁহার এক পুস্তকে অন্য একজন লোক সম্বন্ধে আর একটী কাহিনী বলিয়াছেন। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে এণ্টনিও টরকুইমেডো (Antonio Torquemoda) তাঁহার স্বলিখিত গ্রন্থে ভ্যাসকুয়েষ ডি এইওলা (Vasquez de Ayola) সম্বন্ধে একটী গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত তিনটী গল্পেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, একজন প্রেত আবির্ভূত হইয়া একটী স্থান দেখাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। পরে সেই স্থান খনন করিয়া কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের একজন নেপলিটান (Neopliton) প্রসিদ্ধ আইনজীবি—আলেকজান্দার অ্যাব আলেকজ্যানড্রো Alxander ab Alexander) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে,—সেই সময়ে রোমনগরে এমন কতকগুলি বাড়ী ছিল, যেখানে কোন লোক ভূতের ভয়ে বাস করিতে পারিত না। আমি, আমার বন্ধু টুবাকে (Tuba) এবং আর কয়েক জনের সহিত ঐ সকল বাটীর ভিতরে একটী বাটীতে এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু নানারূপ বিকট চীৎকার, উপদ্রবে এবং একটী ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম।

এ সকল ব্যতীত প্রাচীন খৃষ্টান সাধু অগস্তিন, গ্রিগরী (St, Augustin, St. Gregory) প্রভৃতির রচনাতেও বহু আত্মিক কাহিণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আবার ঐ সকল কাহিণী এমন বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ ও সত্যবাদী লোকের হস্ত প্রসূত, যে সেগুলি পড়িয়া অবিশ্বাস করিবার কোন উপায় নাই।

মহাকবি শেক্সপীয়রও প্রেততত্বে খুব আস্থাবান ছিলেন। যদিও কল্পনা

লইয়াই তাঁহার কারবার, তথাপি কল্পনাবলে তিনি যে সকল প্রেত দেখিয়াছেন ও তাঁহাদের কথা কাব্যভুক্ত করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অবিশ্বাসীর প্রতি 'হ্যামলেট' নাটকে তাঁহার দুইটী প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, "Truth is stranger than fiction" "There one more things in Heaven ahd Faith,"

এখন, সে সকল কথা যাক। এখানে একটী আত্মিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। "The Phantom on Earth" নামক পুস্তকে এই ঘটনাটী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মিঃ কুপার আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরের একজন প্রসিদ্ধ জমীদার। তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র। স্ত্রীর বহুদিন মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি নগরের বাহিরে, তিনি একটী বাগানবাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে বড় একটা যাওয়া ঘটে না বলিয়া, সেই বাড়ীর দ্বার তালাবদ্ধ থাকে।

এক দিবস তাঁহার পুত্র ও কন্যাদ্বয় আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে গমন করিল। মিঃ কুপার শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সন্ধ্যার মুখেই ফিরিবার কথা ছিল।

ক্রমে দিনের আলোক নিবিয়া গেল, সন্ধ্যা গেল, রাত্রি আসিল। তথাপি কাহারও দেখা নাই। মিঃ কুপার তখন তাঁহার একজন ভৃত্যকে বাগান-বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, "ছেলে মেয়েরা যেন শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। ক্রমে বহুক্ষণ হইয়া গেল,—রজনী গভীরা হইয়া উঠিল, তথাপি কি পুত্রকন্যাগণ, কি ভৃত্য কেহই ফিরিয়া আসিল না। তখন মহা ভাবিত হইয়া মিঃ কুপার লোকজন সঙ্গে লইয়া নিজেই সেই বাগান বাড়ীর দিকে চলিলেন। বাড়ীখানি নগর হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নয়,—দুই ক্রোশ হইবে। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উদ্যানবাটীর দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, যে, বাড়ীর ভিতর একেবারে অন্ধকার। এবং সেখানে কাহারও সাড়াশব্দ নাই।

সুদেক্ষ ভৃত্যগণ আলোক আনিল। তাহার পর, সকলে বাড়ীর ভিতরে

প্রবেশ করিলেন। দুই তিনটী ঘর অন্বেষণ করিবার পর, সকলে যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে একেবারে চমৎকৃত ও ভীত হইলেন।

কক্ষতলে রক্তের ঢেউ বহিতেছে। সেই রক্তের উপরে একখানা ছোরা ও একটী টুপী পড়িয়া রহিয়াছে। টুপীটী দেখিবামাত্র সকলে চিনিতে পারিলেন, তাহা মিঃ কুপারের পুত্রের। মিঃ কুপার তখনই হতচেতন হইয়া, সেই রক্তরাশির উপরে পড়িয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে পুনরায় তাঁহার দেহে জ্ঞান সঞ্চার করিলেন। কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, মিঃ কুপারের পুত্রকন্যাগণ দস্যু হস্তে নিহত হইয়াছেন।

* * * * *

তাহার পর দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কুপারের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথায় লোকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে মিঃ কুপারেরও মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার অতুল সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম জন উইনার্ড। এই অল্পকালের মধ্যেই উইনার্ড একজন দাতা ও দয়ালু ব্যক্তি বলিয়া লোক সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। লোকে ভক্তিভরে উইনার্ডের নাম করে। মিঃ উইনার্ড খৃষ্টমাসের দিন এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। নগরের বাটীতে স্থান সংকুলান হইবে না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত উদ্যান বাটীকায় এই ভোজের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সন্ধ্যার সময়ে আলোকমালা বিভাসিত হইয়া সেই বহুদিন পরিত্যক্ত বিজন উদ্যান বাটীকা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি সস্ত্রীক আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন। তানলয়সঙ্গত সুনৃত্য-সঙ্গীতে শ্রবণারাম মুরলীগুঞ্জনে চারিদিক ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। চয়িত কুসুম সৌরভে পরিমলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সকলেই সহাস্য বদন, সংসারে যে দুঃখ বলিয়া একটা পদার্থের অস্তিত্ব আছে তখনকার মত সকলেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল। সকলে আহারের স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উইনার্ডও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন।

সম্মুখের উন্মুক্ত গবাক্ষ পথ দিয়া শীতল সমীরণ আসিতেছিল, রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। নিবিড় নীল আকাশে তারাসনাথ চন্দ্র হাসিতেছিলেন।

দূরে প্রান্তরের শ্যামদূর্বাদলের উপরে জ্যোৎস্না নিসুপ্তা হইয়া চলিয়া পড়িয়াছে। প্রান্তরবাহিণী চন্দ্রকিরণধৌত তরঙ্গিণী ললিত রাগিনী কণ্ঠে লইয়া বহিয়া যাইতেছিল। ঝাউ গাছগুলি পবনতানে মর্ম্মরায়মান হইয়া, সুদূর অতীতের স্বপ্ন দৃশ্য মনে জাগাইয়া তুলিতেছিল। সহসা উইনার্ডের হৃদয়ে, এই উদ্যান বাটীকার সংঘটিত অতীতের সেই শোণিত বিভীষিকার মর্ম্মান্তিক দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বশরীর একটা অজানিত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয়ে একটা অস্বাভাবিক ছায়া পতিত হইল। আহারে বিরত হইয়া, তিনি গবাক্ষ পথ দিয়া বাহিরে চাহিলেন।

চাঁদ তখন একটা ভাঙ্গামেঘে ঢাকিয়া অর্দ্ধস্ফুট। ধরণীর বুকে তখন যেন একটা স্বপ্নাবরণ পড়িয়াছে। তরঙ্গিণী তখন আধা অন্ধকারের মধ্যে রহিয়া রহিয়া রত্ন খণ্ডবৎ জ্বলিয়া উঠিতেছিল। একটা নাইটিঙ্গিল পক্ষী সুস্বর তরঙ্গে বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছিল। হঠাৎ এক ব্যক্তি আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিঃ উইনার্ড! আপনার ভ্রাতা ভগিনীর মৃত্যুর পরে, সেই চাকরটার কোন সন্ধান পাইয়াছিলেন?"

উইনার্ড শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কোন চাকরটা?"

"যাকে আপনার খুল্লতাত সকলের আগে বাগানে পাঠাইয়াছিলেন?"

উইনার্ড কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ ঐ ঝাউগাছগুলার নীচে তার গলিত দেহ পাওয়া গিয়াছিল।" সকলে সেইদিকে চাহিলেন, হঠাৎ একটা দমকা বাতাস সেই ঝাউগাছ গুলির পাতার ভিতরে একটা শিহরণের সঞ্চার করিয়া বহিয়া গেল। উইনার্ড বিকৃত শ্রবণে শুনিলেন, যেন একটা শতবাহু প্রেত তাহার অস্থি কঙ্কালসার কর সঞ্চালনে ঝাউগাছ শ্রেণী মহাবলে আলোড়িত ও মথিত করিয়া তীব্র অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল কে যেন হা হা করিয়া হাসিতেছে, কে যেন বুকের অস্থি কঙ্কালগুলা মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, কে যেন নভোবিদারি আর্ত্তরব তুলিয়াছে! উইনার্ডের বুকের রক্ত জল হইয়া গেল, সেই কৌমুদী প্রফুল্লা, তরঙ্গিণী গীতিঝঙ্কৃতা কুন্দধবলা, শশীসিমন্তিনী পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির বক্ষে আবেশময়, হর্ষ কোলাহল মুখরিত, পুষ্পসুরভিসুবাসিত উৎসববাসর যেন কোন পরলোক যাত্রীর মৃত্যুশয্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ কি রে! ঘরময় এত রক্ত কেন? উইনার্ড একলম্ফে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। পলক মধ্যে সেই দীপালোকিত কক্ষে নরকের অন্ধতামস

বিস্তৃত হইল। তিনটী ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে যেন ভূমিভেদ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সকলে সভয়ে দেখিল, মূর্ত্তিত্রয় পরলোকগত মিঃ কুপারের নিহত পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের। এক স্বরে সেই ছায়ামূর্ত্তি বলিল, "উইনার্ড! উইনার্ড! উইনার্ড! বিনাদোষে তুমি আমাদের তোমার লোক দিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছ! তাহার প্রতিফল এখনই পাইবে।"

মূর্ত্তিত্রয় অদৃশ্য হইল। চক্ষের নিমিষে কক্ষস্থ আলোকমালা আবার জ্বলিয়া উঠিল! তাহার পর, হঠাৎ ভিত্তিশীর্ষ হইতে একখানা বৃহৎ লৌহকড়ি আসিয়া সবেগে, সশব্দে দণ্ডায়মান উইনার্ডকে ভূতলশায়ী করিল। সেই আঘাতেই তদ্দণ্ডে উইনার্ডের মৃত্যু হইল।

নিমন্ত্রিতগণ আর তথায় অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বিদায়।

অজানা অচেনা দেশে,
তুমি ত গিয়েছ চলি।
কেমনে কোথায় আছ,
মোরে ত গেলেনা বলি!
সেথায় কি মধুমাসে
কোকিল পাপিয়া গায়,
এমনি মধুর বায়ু
সেথায় কি বহি যায়।
মাতাইয়া বনভূমি
সেথায় কি ফুটে ফুল,
নাচিয়া লহর তুলি
নদী বহে কুলুকুলু।

পায় পায় ছয় ঋতু,
সেথায় কি যায় আসে,
শুধাংশু জ্যোছনা রেখা,
সেথা কি এমনি হাসে।
সেথা কি বালক রবি,
পূরবে নীরবে চায়!
চপলা নীরদ সনে,
খেলে কি নীলিমা গায়।
হেথাকার দুখ গান,
সেথা কি পশিতে পারে?
আছ তুমি কত সুখে,
ব'লে যাও দয়া ক'রে।

শ্রীমতী বিজনবালা বসু।

রমণী-রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাঝি না ডাকাত।

রামরূপ শর্ম্মা কিয়ৎক্ষণ সেই ক্ষুদ্র কাগজ খানির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে মনে মনে বলিলেন, "অনেক দিন নীশার হাতের লেখা দেখি নাই, তবে এটা স্ত্রীলোকের হাতের লেখা তাহা ঠিক। মেয়ে বড় লোকের ঘরণী হইয়াছে,—সে যে এই সকল বাপ মাকে দিবে,—তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই ;—তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই এ কথা একবারও আমায় বলে নাই ;—বেয়াইত কোন কথা বলে নাই ;—আর যখন এত মাল পত্র টাকা কড়ি দিল,—তবে আমি তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছিবা মাত্র তাহারা আমাকে এ ভাবে তাড়াইল কেন? সকলই রহস্যময়,—আমি গরিব ব্রাহ্মণ, এ সকল ভাবিয়া মাথা খারাপ করি কেন! ভগবান যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন,—মেয়ে দুটো সুখে থাকিলেই হইল,—তবু মাঝিকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।"

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ব্রাহ্মণ মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাঝি, এ সকল জিনিষ কি রাজা দিয়াছেন?"

মাঝি বলিল, "কর্ত্তা,—তা কবার পারি না,—এ সকল কুমার বাহাদুরের বৈঠকখানা বাড়ী থেকে নায় বোঝাই হয়েছিল।"

"সে কোথায়?"

"কুমার বাহাদুরের বৈঠকখানা বাড়ী রাজ বাড়ী থেকে তিন ক্রোশ আন্দাজ দূরে,—আমরা সেই খানেই ছিলাম।"

"তা হলে কুমার বাহাদুরের নৌকা?"

"হয় কর্ত্তা,—কুমার বাহাদুরই এ নায় চলা ফেরা করেন।"

রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে বলিলেন, "হয়তো জামাই বাবাজীই এই সব বন্দোবস্ত করিয়াছেন,—রাজা বা নীশা ইহার কিছুই জানে না,—অথচ নীশা

বলিল জরুরি কাজ আছে বলিয়া জামাই কলিকাতায় গিয়াছে ;—এ পর্য্যন্ত জামাইয়ের চেহারা দেখিলাম না,—সকলই নিয়তি !

তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার বাহাদুর কি তাহার বৈঠকখানা বাড়ীতে আছেন ?"

মাজি বলিল, না,—তিনি শুনেছি কলিকাতায় গেছেন।"

"তবে এ সব জিনিষ পত্র দিলে কে ?"

"কুমার বাহাদুরেব কারপরদার,—ঐযে যে বাবু আপনাকে নায় তুলে দিলেন, উনিই কুমার বাহাদুরের সব কাজ কর্ম্ম দেখেন।"

এখন ব্রাহ্মণ স্পষ্ট বুঝিলেন যে রাজা বা নীশা ইহার কিছুই জানে না,—তাহার জামাতাই এ সব করিয়াছে—তাহার এরূপ করিবার অর্থ কি ?"

তখন রামরূপ শর্ম্মা ভাবিলেন, "কিছুই না জানিয়া না শুনিয়া এরূপ ভাবে রাগিয়া চলিয়া আশা ভাল হয় নাই। বেয়াই বা কি মনে করিবে,—মেয়েই বা কি মনে করিবে ? হয়তো তাহাদের কোন মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত দোষই তাহার স্কন্ধে চাপাইবে,—এখনও অনেক দূর আসি নাই,—অনায়াসেই ফিরিয়া যাইতে পারি ;—কিন্তু ফিরিয়া যাওয়া উচিত কি না তাহাই বিবেচ্য ;—এই সকল ব্যাপারের ভিতর যে একটা কোন ঘোর গুঢ় রহস্য আছে,—তাহাতে সন্দেহ নাই—গরিব ব্রাহ্মণের এই সকল বড় লোকের গোলযোগের ভিতর থাকা উচিত নহে, তবুও একবার মেয়ের সঙ্গে, বেয়াইয়ের সঙ্গে, জামাইয়ের সঙ্গে দেখা না করিয়া যাওয়া উচিত নহে।"

রামরূপ শর্ম্মা মাজিকে বলিলেন, "নৌকা ফিরাও।"

"কি কন কর্ত্তা।"

"নৌকা ফিরাও—আমি রাজার সঙ্গে দেখা না করে যাইব না।"

"হুকুম নাই কর্ত্তা।"

"আমি বলচি বেটা——"

"কি করব—কর্ত্তা—"

"বেটা নৌকা ভেড়া।"

"হুকুম নাই কর্ত্তা।"

"তোরা আমায় জোর করে নিয়ে যাবি।"

"তাই হুকুম কর্ত্তা।"

"আমি এখনুই চেঁচিয়ে লোক ডাকিব—তখন——

"চেঁচালে কর্ত্তা মুখ বেঁধে রাখতে হবে—হুকুম কর্ত্তা।"

"তোরা সালারা সব ডাকাত!"

"যা কন কর্ত্তা।"

নয় জন বলবান মুশলমান,—আর তিনি একাকী,—রামরূপ শর্ম্মা নিরুপায় দেখিয়া নৌকায় বসিয়া পড়িলেন। যথা সময়ে তাহার নৌকা বেলেঘাটায় পৌঁছিল।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশের পত্র।

রামরূপ শর্ম্মা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর দুই বৎসর অতিত হইয়া গিয়াছে, সময় কাহারও প্রতিক্ষায় থাকে না,—দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুই কন্যার নিকট হইতে ব্রাহ্মণ প্রায় দুই হাজার টাকা পাইয়াছিলেন,—তাহার উপর জামাই বাড়ী হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া যে সকল জিনিষ পত্র আনিয়াছিলেন,—তাহাতে তাহার প্রায় এক বৎসর আর কিছুই কিনিতে হয় নাই। তাহার এই দুই বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়া গিয়াছে,—কেবল দুঃখ যে এই দুই বৎসরের মধ্যে তিনি দুই কন্যার কোন সংবাদই পান নাই। পত্র লিখিয়াছিলেন,—কিন্তু কোন পত্রেরই উত্তর পান নাই। ব্রাহ্মণী তাহাকে কন্যার সম্বাদ লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—কিন্তু পত্রের উত্তর না পাইয়া অযাজিত ভাবে যাওয়া ব্রাহ্মণ কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই।

বনমালী রায়ের বাড়ী যাওয়া অসম্ভব,—সেখানে গেলে প্রকৃতই জুতা খাইতে হইবে,—তবে রাজা নিমাই নারায়ণের বাড়ী তিনি যাইতে পারেন,—তিনি তাহাকে কোনরূপ অযত্ন করেন নাই,—বরং বিশেষ আদর সম্ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন,—তাহাতে তাহার সেখানে যাইতেও সাহস নাই। সংসারে অন্ধকারে পা ফেলিতে সকলেই ভীত হয়,—রামরূপ শর্ম্মা রায়গ্রামে ও বেহাই বাড়ী যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন—শুনিয়াছিলেন,—তাহার বিন্দু বিসর্গ অর্থ বুঝিতে পারেন

নাই,—তাহার নিকট সমস্তই অন্ধকার,—তাই ব্রাহ্মণী এত উত্তক্ত করা সত্বেও তিনি বেয়াই বাড়ী যাইতে সাহস করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক,—সাংসারিক জ্ঞান কমই ধরিতেন,—সংসারের গোলযোগ ঘোরপেচ কিছুই বুঝিতেন না,—সামান্য গোলযোগে ভয় পাইতেন,—যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন,—তাহাতে সেখানে আবার যাইতে তাহার সাহস হয় নাই,—বিশেষত পত্রের উত্তর না পাওয়ায় আরও যাইতে সাহসী হন নাই। আজ যাইব কাল যাইব করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অন্য লোক হইলে কখনই নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিত না,—কোন না কোন সন্ধান লইতে বাধ্য হইত,—রামরূপ শর্ম্মা এই দুই বৎসর যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন তাহা নহে, তিনি দেশে পত্র লিখিয়াছিলেন,—সে পত্রের উত্তর পাইয়াছিলেন,—তাহাতে বিশেষ কিছু না জানিতে পারিলেও অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। দেশ হইতে যে পত্র পাইয়াছিলেন,—তাহার সার মর্ম্ম এই :—

বনমালী রায় তাহার একমাত্র পুত্র বরেন্দ্র কুমারকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া গোঁসাই বাবুর পুত্রকে পুষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন,—রাণী বিন্দেশ্বরীর মেয়ে লক্ষ্মী দেবীর সহিত এই পৌষ্যপুত্রের বিবাহ স্থির হইয়াছে। রাণী বিন্ধেশ্বরী হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গিয়াছেন,—তিনি ফিরিলেই বিবাহ হইবে।

রাজা নিমাই নারায়ণের সহিত বনমালী রায়ের বিশেষ বিবাদ বাধিয়াছে, লাঠালাঠি হইয়া উভয় পক্ষই ফৌজদারীতে মোকদ্দমা চালাইতেছেন। রাজা নিমাই নারায়ণ দেশে আছেন বটে,—কিন্তু তাহার পুত্র কুমার গুণেন্দ্র নারায়ণ সস্ত্রীক কোথায় পশ্চিমে বাস করিতেছেন,—বহু দিন হইতে দেশে আসেন নাই।

তোমার কন্যা উষার কোন সংবাদই এখানে কেহ জানে না। বনমালী রায় তাহাকে তাড়াইয়া দিলে লোকে শুনিয়াছিল যে সে তোমার বাড়ী গিয়াছে,—সকলেই জানে সে তোমার কাছেই আছে। ইহা ব্যতীত এ সকল সম্বন্ধে আমরা আর কেহ কিছুই জানি না।

এই গোঁসাই বাবু বনমালী রায়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছে,—বনমালী রায় চব্বিশ প্রহর তাহার বাড়ী পড়িয়া থাকে,—কাজ কর্ম্ম কিছুই দেখে না—সত্য মিথ্যা জানি না,—লোকে কানাকানি করিয়া বলে যে এই গোঁসাই বাবুর সুন্দরী স্ত্রী বনমলী রায়কে যাদু করিয়াছে। বুড়ো বয়সে মানুষের এত অধঃপতন হয়, ইহাই আশ্চর্য্য!

তুমি এখান হইতে গিয়া ভালই করিয়াছ,—এই গোসাই বাবুর রাজত্বে বনমালী রায়ের অত্যাচার শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—সকলেই দেশ ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টায় আছে। আর কিছু লিখিবার নাই;—আশা করি তুমি সস্ত্রীক ভাল আছ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুশীল বাবু।

"ঠাকুর মশায়—ঠাকুর মশায়—বাড়ী আছেন?"

বাহিরে এই রূপ চিৎকার শুনিয়া রামরূপ শর্ম্মা সত্বর বাহিরের দিকে চলিলেন। "অসময়ে কে আমায় ডাকিতেছে, বোধ হয় কাহারও পূজা আচ্ছা আছে।" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিলেন।

দেখিলেন দ্বার সম্মুখে একটী ভদ্র লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—যুবক, বলিষ্ঠ, সুপুরুষ,—পোষাক পরিচ্ছদও ভাল,—হাতে একটী আংটী, হীরা খানা রৌদ্রে ঝক ঝক করিতেছে।

ইহাকে পূর্ব্বে কখনও যে দেখিয়াছেন, তাহা বলিয়া বোধ হইল না,—তাহাই ব্রাহ্মণ অপরিচিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোকটী বলিলেন, "ঠাকুর মশায়, প্রণাম! আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, চলুন বসিবেন চলুন।"

ব্রাহ্মণ তাহার ক্ষুদ্র বসিবার ঘরের তক্তপোষের উপর তাহাকে আনিয়া বসাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে পুর্ব্বে আমার আলাপ ছিল না—আমার নাম সুশীল,—পুলিশে কাজ করি।"

ব্রাহ্মণ পুলিশের নাম শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "পু—লি—স—আমার কাছে কেন?"

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার স্যায় পুণ্যবান লোকের কাছে আমাদের মত পাপীর আগমন অন্যায় নিশ্চয়ই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ এ কথায়ও বড় আশ্বস্ত হইলেন না, কম্পিত স্বরে বলিলেন "আমার —আমার কাছে কি প্রয়োজন।"

সুশীল বাবু বলিলেন, "একটু আছে—সম্প্রতি একটা,—একটা বলি কেন দুইটা খুন হইয়াছে—"

ব্রাহ্মণ সভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"খুন—কোথায়?"

"মধুপুরে—"

"মধুপুরে? তা হলে—"

"সব শুনুন আগে।"

"বলুন"

"বনমালী রায় ও রাজা নিমাইনারায়নের পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যা-দ্বয়ের বিবাহ হইয়াছে।"

"হা—কিন্তু—"

"তাহাও আমরা জানি,—আপনার সঙ্গে তাহারা বড় একটা সম্বন্ধ রাখেন নাই।"

"তাহারা বড় লোক—"

"ঠিক্ তাহা নহে,—সবই বনমালী রায়ের কার্য্য। যাক সে কথা,—বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন যে বনমালীরায়ের সঙ্গে নিমাই নারায়নের নানা মোকদ্দমা মামলা চলিতেছে, দুই জনে মুখ দেখা দেখি নাই।"

"এ কথা শুনিয়াছি।"

"বোধ হয় ইহাও শুনিয়াছেন যে বনমালী এক গোসাই বাবুর স্ত্রীর প্রেমে পড়িয়া গোসাই বাবুকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়াছেন, নিজের ছেলেকে তাড়াইয়া দিয়া এই গোসাই বাবুর ছেলেকে পুষ্যপুত্র করিয়াছেন।"

"ইহাও কতকটা শুনিয়াছি।"

"বোধ হয় আপনি জানেন যে আপনার জামাই বাবুর নামে নালিশ করিয়াছেন।"

"এ কথা শুনি নাই।"

"তবে এখন শুনুন।"

"আমার জামাই কোথায় আছে জানেন কি।"

"এই খুনের ব্যাপারে সকলই সন্ধান লইতে হইয়াছে।"

"খুনের ব্যাপার—"

"হা,—আপনার দুই জামাই এখন যত দূর দেখা যাইতেছে,—এই খুনের ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল,—তাহার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্ট ভাবে কেবল মাত্র বাহির হইল, "খুন—জামাতা!"

সুশীল বাবু বলিলেন, "আপনার জামাই যে খুন করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি না, সুতরাং আপনি ভীত হইবেন না। বরং আপনার জামাইরা যদি কোন রূপে বিপদে পড়েন, তাহা হইলে আপনিই তাহাদের রক্ষা করিতে পারিবেন।"

ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন। "আমি!"

"হাঁ—আপনি শুনুন সব, বিনা কারণে আপনার সময় নষ্ট করিতে আসি নাই।"

"বলুন কি?"

"তাইতো বলিতেছিলাম,—আপনার জামাই,—বনমালী রায়ের ছেলে,—অনেক দিন হইতে বদ্দিনাথে বাস করিতেছেন,—"

"তা আমি জানিতাম না,—এই শুনিলাম।"

"আপনার কোন পত্রই তিনি পান নাই—বনমালী রায় তাহা সব ছিড়িয়া ফেলিয়াছে!

"তাহার আমার উপর এত রাগ কেন?"

সুশীল বাবু বলিলেন, "এত আক্রোষ কেন তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই,—আশা করি সময়ে জানিতে পারিব। তার পর যাহা বলিতেছিলাম,—আপনার জামাতা, অর্থাৎ বনমালী রায়ের পুত্র বরেন্দ্র বাবু অনেক দিন হতে বদ্দিনাথে বাস করিতেছিলেন,—অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তাহার সমস্ত খরচ পত্র রাজা নিমাইনারয়ণ দেন,—তিনিই বরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার সমস্ত খরচ যোগাইতেছেন,—আর কয়েক মাস হইতে রাজা নিমাই নরায়নের পুত্র,—আপনার জামাই গুনেন্দ্র নারায়নও সস্ত্রীক বদ্দিনাথে বাস করিতেছেন।"

"ইহাও আমি জানিতাম না। আমি কোন পত্রেরই উত্তর পাই নাই।"

"তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে ইহার ভিতর কি একটা গুঢ় রহস্ত আছে।"

ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "তা আমি অনেক আগে হইতে জানি।"

সুশীল বাবু গম্ভির হইয়া বলিলেন, "দেখুন—আপনাকে সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল হঠাৎ কিছু বলিবেন না. ইহাতে আপনার জামাতা দুজনের অনিষ্ট হইতে পারে।"

ব্রাহ্মণ ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিয়াছি।"

"এমন কিছু নয়,—তবে সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল—তারপর যা বলিতেছিলাম,—বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন যে বনমালী রায় তাহার পুষ্য-পুত্র এই গোসাই বাবুর ছেলে লালচাঁদের সঙ্গে রাণী বিন্দেশ্বরীর মেয়ের সহিত বিবাহ দিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতেছে?"

"বিবাহ স্থির হইয়াছে শুনিয়াছি।"

"তাহা হইলে সে ভুল শুনিয়াছেন? বিবাহ স্থির হয় নাই,—রাণী বিন্দেশ্বরী তাহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।"

"তাহা জানিতাম না।"

"যাক—এখন খুনের কথা শুনুন।" এই বলিয়া নন্দপুরে যাহা ঘটিয়া ছিল, যাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সুশীল বাবু তাহা সমস্তই বলিলেন। ব্রাহ্মণ [illegible] কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুশীল বাবু বলিলেন, "এ সব শুনিয়া আপনি যে বিস্মিত হইবেন,—তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অনেকেই এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমার জামাই" সুশীল বাবু তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "আপনার জামাইদের উপর সন্দেহ হইয়াছে, এই মাত্র, আপনার নিকট কোন কথা লুকাইব না,—তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।"

"তবে সন্দেহ করেন কেন?"

"কারণ আছে।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু পকেট হইতে একখানি ছবি বাহির করিয়া বলিলেন, "এ কে চিনিতে পারেন?"

ব্রাহ্মণ ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "না—ইহাকে কখনও দেখি নাই।"

"সম্ভব, এই লোকই খুন হইয়াছে।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু আর এক খানা ছবি বাহির করিয়া বলিলেন, "ইহাকে চিনিতে পারেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না,—ইহাকেও চিনিতে পারিতেছি না।"

"সম্ভব ইনি গোসাই বাবু। দেখুন ইহাকে চিনিতে পারেন কি না।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু পকেট হইতে আরও—একখানি ছবি বাহির করিয়া

ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন। এবার ছবিখানি দেখিয়া রামরূপ শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ ইহাকে খুব চিনি,—ইনি রাজা নিমাই নারায়ণ,—আমার বেয়াই,—আগে ইহাকে চিনিতাম না বটে,—দেশে গিয়া ইহাকে দেখিয়াছিলাম।"

সুশীল বাবু বলিলেন, "বোধ হয় আপনি জানেন যে রাজা নিমাই নারায়ণের উপাধি গোস্বামী,—তাই অনেক সময়ে তিনি নিজেকে গোঁসাই বাবু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।"

"তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন বটে!"

"একজন মধুপুরের থানার দারোগাকে একখানা জাল ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া গোঁসাই মহাশয় বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিল—এখন কথা হইতেছে যে দুই গোঁসাইয়ের মধ্যে কোন গোঁসাই মধুপুরে গিয়াছিল।"

"নিশ্চয়ই থানায় অনেক লোক ছিল"—

"হাঁ সে কথা সত্য। থানায় যে গোঁসাই গিয়াছিল তাহার লম্বা দাড়ী ছিল,—এই দুই গোঁসাইয়ের—কাহারও দাড়ী নাই। তবে থানার মুন্সি বলিতেছে যে, বোধ হয় দাড়া কামাইলে লোকটা ইহার মত দেখিতে হয়।"

এই বলিয়া সুশীল বাবু রাজা নিমাই নারায়নের ছবি দেখাইলেন। ব্রাহ্মণ সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "আমার বেয়াই! বলেন কি?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রহস্ত ভেদ।

সুশীল বাবু বলিলেন, "ইহারও প্রমান নাই,—একজন কনেষ্টবল বলে দাড়ী কামাইলে লোকটা এই গোঁসাই বাবুর মত দেখিতে হয়। তবে দাড়ীটা যে জাল দাড়ী তাহা প্রমান হইয়াছে। আগেই বলিয়াছি, ইহারা দারোগাকে লইয়া রেলে উঠিয়াছিল, কারমাটর ও মধুপুরের মধ্যে একটা বড় লম্বা দাড়ী পাওয়া গিয়াছে,—নিশ্চয়ই লোকটা দাড়ী গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল।

সরল ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ সব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সুশীল বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমরাই বুঝিতে পারিতেছি না,—আপনার কাছে—ইহা দুর্ব্বোধ্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?"

"আমার জামাই—"

"তাহাই বলিতেছিলাম, যে লোকটী খুন হইয়াছে এখন প্রমান হইয়াছে, তাহার নাম অখিল—

"সে কে ?"

"কে যে সে তাহা বলা সহজ নহে,—সে সম্পূর্ণ ভবঘুরে,—বাপ মা কখনও ছিল কিনা সন্দেহ,—রেলে চুরিই তাহার ব্যবসা ছিল,—দুই তিনবার শ্রীঘর বাসও হইয়াছে।"

"সে খুন হইল কেন ?"

তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। প্রমান হইয়াছে এই অখিল গোঁসাই বাবুর ছেলে লালচাঁদের সঙ্গে খুনের দুই দিন আগে বাজারে একটা ঘরে বাসা লয়,—লালচাঁদ অখিলকে রাখিয়া সেই দিনের গাড়ীতেই পশ্চিমে কোথায় চলিয়া যায়,—তাহার এখনও প্রমান হয় নাই,—আরও প্রমান হইয়াছে খুনের রাত্রে রাত্রির গাড়ীতে গোঁসাই বাবু মধুপুরে নাবিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার পর তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না,—অনেক অনুসন্ধানেও আমরা তাহার গতিবিধি জানিতে পারি নাই।"

"তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।"

"তাহাতে কি ত্রুটী হইয়াছে মনে করেন।"

"তিনি কি বলেন।"

"বদমাইশ মাত্রেই যা বলে,—সেও তাই বলে—সম্পূর্ণ অস্বীকার। সে বা তাহার ছেলে কোন জন্মে মধুপুরে আসে নাই।"

"সে যে বদমাইশ কিসে জানিলেন।"

"ইহা কি জানা বড় কঠিন। যে লোক নিজের যুবতী সুন্দরী স্ত্রী বা উপপত্নী—"

ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি ?" সুশীল বাবু বলিলেন "তবে ঢাক ঢাক গুড় গুড়ে কাজ কি,—স্পষ্টই বলি, "এটী এই গোঁসাইয়ের আদৌ স্ত্রী নয়,—ইহার উপপত্নী—জাতিতেও বাঙ্গালি নয়, হিন্দুস্থানি।"

"এ সকল আপনারা কিসে জানিলেন।"

"পুলিশের কাজই সকল বিষয় জানা—নয় কি ? এই খুনের সন্ধান করিতে করিতেই আমরা গোঁসাই বাবুকে পাইয়াছি—তখন দেখিলাম' এই গোঁসাই বাবু কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া বনমালী রায়ের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াছে,—বনমালী রায়ের পুত্রকে দূর করিয়া—নিজের দলের একজনকে পুষ্যপুত্র করিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "নিজের ছেলে কে ?"

"না—ছেলে নয়। গোঁসাইয়ের কোন জন্মে বিবাহ হয় নাই—এই ছেলের যে বয়স গোঁসাই যাহাকে স্ত্রী বলে তাহার বয়স তাহাপেক্ষা কম ব্যতীত বেশী নয়।"

"বলেন কি? কি ভয়ানক লোক।"

"গোঁসাই ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আরও দুইটী বড় জমিদারী হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিন্দেশ্বরীর কন্যাকে এই জাল ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিলে সে জমিদারীটা হস্তগত হয়,—আর নিমাই নারায়ণের বিষয়ও লইবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতেছে,—এ কল চালাইতেছে সেই সখিনা।"

ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "সে কে?"

সুশীল বাবু বলিলেন, "গোঁসাই যাহাকে স্ত্রী বলে তাহার নাম সখিনা,—আগেই বলিয়াছি সে আদৌ বাঙ্গালী নয়। এমন গোঁসাই বাবুকে আবিষ্কার করিয়া আমরা কখনও নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারি না,—কাজেই তাহার একটু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

"কি জানিয়াছেন।"

"অনেক,—এই গোঁসাই পূর্ব্ব বঙ্গের এক জমিদারের সহিত রাঁধুনে বামন হইয়া কাশী আইসে,—তবে এমন রত্ন যে সে কখনও চিরজীবন রাঁধুনে বামন থাকিতে পারে না। তাহার বাবু দেশে ফিরিলেন, কিন্তু গোঁসাই কাশিতে থাকিয়া গেল,—ক্রমে সে কাশীর বদমাইশ দলের একজন প্রধান হইল,—করে নাই দোষ হয় এমন কাজ কিছু নাই, দুঃখের বিষয় তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই,—নতুবা অনেক আগেই গোঁসাইয়ের লীলাখেলা শেষ হইত,—শেষ সে এই সখিনাকে স্ত্রী বানাইয়া বনমালী রায়ের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে,—কাশিতেই তার বনমালী রায়ের মেয়ে। বলা বাহুল্য সখিনা—"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামার মা।

ব্রাহ্মণ দুই হস্ত কর্ণে দিয়া বলিলেন, "না—না—কিছু আর শুনিতে চাহি না,—যথেষ্ট শুনিয়াছি। সংসারে এমন লোকও সব আছে?"

সুশীল বাবু বলিলেন, "যথেষ্ট,—আর অধিক কিছু বলিবারও নাই।

"ইহাতে আমার জামাইদের উপর সন্দেহ করিতেছেন কেন?"

"হাঁ—সে টুকু এখনও জানা হয় নাই। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি

যে, আপনার দুই জামাই গোঁসাইকে দণ্ড দিবার জন্য দুই বৎসর হইতে চেষ্টা পাইতেছেন—কিন্তু গোঁসাই বড় শক্ত ছেলে,—ইহারা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। গোঁসাই ও তাহার ছেলে বিন্দেশ্বরীর মেয়েকে লইবার জন্য আসিয়াছে,—এ সম্বাদ লইয়া ইহারা দুই জনই খুনের রাত্রে মধুপুরে আসেন। মিথ্যা নাম লিখিয়া ডাক বাঙ্গলায় থাকেন,—পর দিন চলিয়া যান,—ডাক বাঙ্গালার খানসামা—ইহাদের ছবি দেখিয়া চিনিয়াছে।"

ব্রাহ্মণের মুখ বিশুষ্ক হইল,—তিনি কোন কথা কহিলেন না,—সুশীল বাবু বলিলেন, "দুই লাসের দেহ হইতে ডাক্তার গুলি বাহির করিয়াছেন,—অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এইরূপ গুলি ও পিস্তল আপনার জামাই বরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় ম্যানটসের বাড়ী কিনিয়াছিলেন——"

"তা—তা——"

"এই পর্য্যন্ত আর কোন প্রমাণ নাই,—এই দুই প্রমাণে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা যায় না,—তাহাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ অতি বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "আমার কাছে?"

"হাঁ—আপনাকে এখন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

"আমি কি জানি?"

"তাহা আমরাও জানি—সে কথা নয়,—আপনার জামাতা যখন আপনার কন্যাকে রাখিয়া——"

"তাহা হইলে আমার জামাতাই আমার কন্যাকে——"

"ঠিক জানি না,—অনুমান এইরূপ করিয়াছি,—যাক—তিনি আপনার কন্যাকে রাখিয়া পশ্চিমে গোঁসাইয়ের সন্ধানে গেলে——"

"তাহাই মেয়েকে আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছিল,—এখন বুঝিতেছি—"

"ইহাও আমার অনুমান মাত্র,—এখন কথা,—এই সময়ে একটী স্ত্রীলোক মধ্যে মধ্যে আপনাদের বাড়ী আসিত কিনা।"

"কোন স্ত্রীলোক।"

"লোকে তাকে রামার মা বলে।"

"হা—সে এখনও আসে,—সে এই পাড়ায় থাকে।"

"আগে ছিল না।"

"দু বছরের উপর আছে।"

"হা—আপনার কন্যার আপনার বাড়ী আসিবার পরেইএসেছে।"

"তা হবে। ঠিক বলিতে পারি না।"

"বলিলেন, রামার মা এখনও আসে,—কতদিন আসে নাই ?"

"কই অনেক দিন তাকে দেখি নাই ?"

"অনেক দিন থেকেই সে আর এ পাড়ায় নেই।"

"তা তো জানি না,—সে কি করিয়াছে,—"

"বেশী কিছু নয়,—আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি সে গোঁসাইয়ের দলের লোক। সে এখানে কিছু কীর্ত্তি করিয়াছে কিনা তাহাই অনুসন্ধান করিতেছি।"

"কই—আমার এখানে সে কোন কিছু করে নাই—আমরা তাকে খুব ভাল মানুষ বলিয়া জানিতাম।"

"জামাইদের কোন সন্ধান রাখেন।"

"না,—এই যাহা আপনার কাছে শুনিলাম ?"

"তাহারা যাহা যাহা করেন বা করিয়াছেন—তাহাতে কি আশ্চর্য্যান্বিত হন নি।"

"মিথ্যা কথা বলিব না—আশ্চর্য্যান্বিত নিশ্চিতই হইয়াছিলাম।"

"আপনার কন্যার অন্তর্ধ্যানে ———"

"আপনি তাহাও জানেন ?"

"পুলিশে কাজ করিতে হইলে অনেক বিষয়ই জানিতে হয়। এখন আপনার কন্যা যে বদ্রিনাথে আছেন,—তাহা কি জানেন ?"

"সম্প্রতি দেশ হইতে একখানা পত্র পাইয়া জানিয়াছিলাম যে আমার দুই মেয়েই বদ্রিনাথে আছে———"

"সেটাও ভুল শুনিয়াছেন——"

"আপনিই তো বলিলেন ?"

"আমি ঠিক তাহা বলি নাই—যতদূর জানিতে পারিয়াছি উপস্থিত তাহারা কেহ বদ্রিনাথে নাই,—এখন প্রণাম—আবশ্যক মত আবার আসিব।"

এই বলিয়া সুশীলবাবু উঠিলেন,—ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনার দারোগাদের কোন সন্ধান হয়েছে।"

সুশীলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "রাম অক্ষয় বাবুর সন্ধান হইয়াছে,—সেই হতভাগ্যই আপনার সম্মুখে এক্ষণে দণ্ডায়মান !"

———

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুমার বাহাদুরের কথা।

রাম অক্ষয় বাবু দ্বারবানের নিকট যাহা শুনিলেন, তাহার মাথা মুণ্ডু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—তবে এইটুকু বুঝিলেন যে অন্ততঃ ঠিকানা সম্বন্ধে সখিনা তাহাকে মিথ্যা কথা বলে নাই,—যদি তাঁহাকে ঠকাইতে তাহার অভিপ্রায় থাকিত,—তাহা হইলে সে স্ব ইচ্ছায় এত সহজে তাহাকে তাহার ঠিকানা বলিত না। ইহাতেই কতকটা বোধ হয়,—সে যাহা যাহা বলিয়াছে,—তাহা খুব সম্ভব মিথ্যা নহে। তিনি আরও ভাবিলেন দ্বারবানের কথা ঠিক, সে আমার ওখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয়ই সুন্দরপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছিল,—তাহাই সে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়াছে। নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে,—নতুবা এরূপ ভাবে যাইত না। তবে কথা হইতেছে, বনমালী রায় এখানে থাকিল না,—হয় তো সত্য সত্যই সে পীড়িত, শয্যাগত, তাহার যাইবার ক্ষমতা নাই। গোঁসাই অথম হইয়াছে কিসে? এত কষ্টে এতদূর আসিয়া বেটা যদি ফাঁকি দেয়, তবে বড়ই আপশোষ রহিয়া যাইবে। এত বড় মামলায় একটাও জেলে না গেলে কি হইল?"

রাম অক্ষয় বাবু এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ১২ নম্বর পটলডাঙ্গায় আসিলেন, দেখিলেন বড় বাড়ী, অনেক লোকজন, দেখিলেই জানিতে পারা যায় কোন পাড়াগেঁয়ে জমিদার এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ইহারা যে বাড়ীতে থাকেন, সে বাড়ীর ধরণই স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়!

পথে দাঁড়াইয়া রাম অক্ষয় বাবু ভাবিতে লাগিলেন, "কি ভাবে যাওয়া উচিত? যেরূপ ভাব দেখিতেছি, বাবুরা উপস্থিত আছেন,—এখন সহজে দেখা করিলে হয়। ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধীয়তে।"

তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে একজন প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "বাবু, কাকে খুঁজ চেন।"

রাম অক্ষয় বাবু গম্ভীর ভাবে তাহার পুলিশ ভাব মুখে আনিয়া বলিলেন, "কুমার বাহাদুরকে ?"

সে তাহার ভাবে একটু থতমত খাইয়া গেল,—সসম্মানে বলিল, "বাবু, একটু এই ঘরে বসুন, আমি খবর দি।"

সম্মুখের একটী ঘরে একখানা টেবিল ও খান কয়েক চেয়ার ছিল,—দ্বারবান তাহাকে সেই ঘরে বসাইয়া ভিতরে সম্বাদ দিতে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে সেই ঘরে একটী ভদ্র লোক আসিয়া রাম অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথা হইতে আসা হইতেছে ?"

রাম অক্ষয় বাবু বলিলেন, "সে কথা কুমার বাহাদুরকেই বলিব।"

"তিনিই আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন।"

"তাহা হইলে বলুন যে লালবাজার পুলিশ থেকে।"

লোকটী আর কোন কথা না কহিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন,—কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে আসুন।"

নানা সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ মধ্য দিয়া সেই লোক তাহাকে একটী দ্বারের মকমল নির্ম্মিত পর্দ্দার সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, "যান—এই ঘরে।"

রাম অক্ষয়বাবু পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কে বলিল, "আসুন, রাম অক্ষয় বাবু,—আসুন,—আমরা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

এই কথায় রাম অক্ষয় বাবু নিতান্ত বিস্মিত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, ঘরটী অতি সুন্দর সুসজ্জিত, প্রাচীরে বড় বড় ছুরি ও অসি, ভূমে অতি কোমল কারপেট,—উপর হইতে সুন্দর সুন্দর ঝাড় ঝুলিতেছে,—ভাল ভাল চেয়ার বেঞ্চ মেজে রহিয়াছে।

আরও দেখিলেন,—দুইটি অতি সুন্দর সুপুরুষ যুবক একখানা কৌচ হইতে উঠিয়া হস্ত বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। এক জন সাদরে তাহার হাত আলোড়িত করিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ নাই,—তবে আপনার নাম অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছি। ইনিই বরেন্দ্র বাবু,—আসুন—বসুন, আপনার সহিত আলাপ হইয়া বড়ই আনন্দ হইল।",

বরেন্দ্র বাবুও হস্ত আলোড়ন করিলেন,—তখন সকলে আসিয়া একখানা কৌচে বসিলেন। রাম অক্ষয় বাবু বলিলেন, "আমিই যে রাম অক্ষয়, তাহা চিনিলেন কিরূপে ?"

কুমার গুনেন্দ্র বলিলেন,—"ঘটনাচক্রে পড়িয়া আপনাকে দূর হইতে চিনিয়া রাখিতে হইয়াছে,—তবে জানিতাম একদিন না একদিন সাক্ষাৎ পরিচয় হইবে।"

রামঅক্ষয় বাবু মনে মনে বলিলেন, "তাহাতো জানাই উচিত,—খুন করিয়াছ যখন তখন একথাতো জানই, তবে বাবু আমি ঢের ঢের দেখিয়াছি,—দুই দুইটা খুন করিয়া যে এরূপ ব্যবহার কোন মানুষে করিতে পারে আমি জানিতাম না।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি যে আসিব, তাহা কিরূপে জানিলেন?"

কুমার হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমাদের রঙ্গিনী।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমারের কথা।

কাল রাত্রে সখিনার হাতে পড়িয়া রামঅক্ষয় বাবু পরাজিত হইয়া ছিলেন, আজ দেখিলেন আবার সেই ব্যাপার,—ইহাদের বয়স কম বটে,—বড় লোকের ছেলেও সত্য,—লেখা পড়া জানে মূর্খও নহে দেখিতেছি, ইহাদের সঙ্গে অতি সাবধানে কথা কওয়া আবশ্যক।"

তিনি উভয়ের মুখের দিকে ছল বিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন, "কুমার বাহাদুর আপনি কি বলিতেছেন তাহা যথার্থ বুঝিতে পারিতেছি না।"

কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা নহে দেখিতেছি,—প্রকৃতই এরূপ সাবধানতা কর্ত্তব্য, বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষা খোলা কথাই ভাল।"

"বলুন।"

"পশ্চিম হইতে কয়েক জন বদমাইশ আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে আমাদের তাহাদের সহিত এক বৎসর ধরিয়া প্রকৃত ভয়াবহ যুদ্ধ করিতে হইতেছে, অতি কষ্টে প্রাণ বাচাইয়া রাখিয়াছি মাত্র,—এ সকলই তো আপনি জানেন।"

রামঅক্ষয় বাবু কোন কথা কহিলেন না। কুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কাল সখিনার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর হইতে দেখিতেছি আপনি আরও সাবধান হইতে শিখিয়াছেন।"

আর রামঅক্ষয় বাবু নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "সে খবরও রাখেন।"

কুমার বলিলেন, "যাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। তাহারা সহজ লোক নহে,—এই জন্য আমাদের বিশেষ সাবধান থাকিতে হইয়াছে। কাজেই ইহাদের উপর দিন রাতি নজর রাখিতে হইয়াছে,—কখন কি করে? নজর না রাখিলে হয়তো এত দিন প্রাণ হারাইতাম।"

"পুলিশের উপর এ অনুগ্রহ কেন?"

"মধুপুরের খুন হইবার পূর্ব্বে পুলিশের উপর কোন নজরই রাখি নাই—কিছু মাত্র আবশ্যক হয় নাই। যখন দেখিলাম এই বদমাইশগণ এই খুন আমাদের উপর চাপাইতে চেষ্টা পাইতেছে,—আর যখন জানিতে পারিলাম যে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন, তখন হইতেই আত্ম রক্ষার জন্য পুলিশের উপর,—বিশেষতঃ আপনার উপর নজর রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—অন্যায় করিয়াছি কি?"

"আপনাদের হিসাবে অন্যায় বলিতে পারিনা,—খোলা কথাই হওয়া ভাল।"

"নিশ্চয়ই রামঅক্ষয় বাবু নিশ্চয়ই।"

তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞাস্য আপনাদের এত লুকাচুরি কেন?"

"আমরাও সকলে কথা খোলাখুলি বলিতেছি। গোসাইয়ের দলের সকল কথাই শুনিয়াছেন,—সুতরাং তাহার আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। বরেন্দ্র ভিটা ছাড়া হইলে সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া গোপনে কলিকাতায় চলিয়া আসে,—সে জানিত যে গোসাই ও সুখচাদ তাহাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাই তাহাকে সাবধানে লুকাইয়া আসিতে হইয়াছিল,—স্ত্রীকে শ্বশুরের বাড়ী এক বস্ত্রে একাকী পাঠাইয়া দিয়া, সে কলিকাতায় লুকাইয়া থাকে,—তাহার পর আমরা পরামর্শ করিয়া দেখিলাম যে, যদি উপ শ্বশুরের নিকট যায়, তাহা হইলে হয়তো ইহার পিতার মন ফিরিতে পারে, তাহাই পরামর্শ করিয়া আমরা তাহাকে দেশে বাপের সহিত যাইবে বলি, বলা বাহুল্য বরেন গোপনে মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া টাকা দিয়া আসিত—"

"আমি রামরূপ শর্ম্মার কাছে এ সকলই শুনিয়াছি।"

"তাহা হইলে সে সকল আর বলিবার আবশ্যক নাই। যদি বাবা স্থান না দেন তাহাই বরেন উপকে একস্থানে রাত্রে নৌকা বাঁধিয়া থাকিতে বলে,

তাহার সেইখানে যাইবার কথা থাকে,—কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে কলিকাতায় আটক হইয়া পড়ে,—গোসাইয়ের লোক তাহার পর লাঠি মারিয়া যখম করে, হত্যা করিবারই ইচ্ছা ছিল, বরেন প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া যায়, কিন্তু পনের দিন বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না। আমি তাহার টেলিগ্রাফ পাইয়া সেই রাত্রেই তাহাকে সিপ নৌকা করিয়া বাড়ী লইয়া যাই।

"ব্রাহ্মণকে না বলিবার অর্থ কি?"

"আমি উপকে সেই রাত্রে না আনিলে গোসাই তাহাকে লইয়া যাইত,—সে লোক জন লইয়া সেই চেষ্টায় বাহির হইয়াছিল, উপ আমায় চিনিতেন, ব্রাহ্মণ চিনিতেন না, তাহাকে তখন বুঝান কঠিন হইত। তিনি কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করিতেন না, ব্রাহ্মণকে আমাদের বাড়ী আনিবার জন্য আমি আমাদের সাঁওতাল দাসীকে সেইখানে রাখিয়া যাই;—সে পাগল, যাহা করিয়াছিল, সবই পাগলামি। যাহা হউক মোটের উপর কাজ সম্পন্ন করিয়াছিল, বরেনের শ্বশুর মহাশয়কে ঠিক রায় গ্রামের হাটে লইয়া গিয়াছিল,—জানিতাম বাপ সেই খানে আছেন, ব্রাহ্মণের আগমনের সম্বাদ তাঁহাকে দিয়া আমি বরেনকে দেখিবার জন্য তখনই উপকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হই।"

ক্রমশঃ।

শেফালির প্রতি।

(১)

নীহার মুকুতা গাঁথা শ্যাম শয্যাখানি,
পরশি মৃদুল বায়, মধুরে সহিয়ে যায়,
প্রকৃতি ডাকিছে হের সুষুপ্তি মগনে
প্রিয় সখী শেফালিকা তোমার মরণে।

(২)

মরণের মত বোন্ মরিতে সে জানে,
সে মরণে নাহি দুঃখ, অবিচ্ছিন্ন চিরসুখ
তুমি যে শিখেছ সখী তেমনি মরণ,
তাইত তোমার তরে করিনা রোদন।

(৩)

সায়াহ্নে বিকাশি রূপ প্রিয়পতি সনে,
সারা নিশি হাস তুমি, পতিকর চুমি চুমি,
প্রেমের পূর্ণ জোয়ারে দাওগো সাতার
প্রেমের প্রতিমা তুমি অবনি ভিতর।

(৪)

দিবসের তরে যবে প্রাণেশ তোমার
ম্লানমুখে তব কাছে, কাতরে বিদায় যাচে,
অমনি তুমিলো সখি! হাসিতে হাসিতে,
মরণে বরণ কর বিচ্ছেদ ভয়েতে।

(৫)

সতীরাণী শেফালিকা ঝরা ফুলতুমি,
তথাপি দেবতাপদে তোমারে সমর্পিতে
সযতনে নর নারী কুড়াইয়ে লয়
পুণ্যবতী তোর মত কে আছে ধরায়।

(৬)

জগতের জাগরণে মৃত্যু তোর কুল,
আমি বলি মৃত্যু নয়, ভুল স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়
আর না আসিতে হয় কাঁদিতে হেথায়
মিলনে বিচ্ছেদ আর কখনো না হয়।

(৭)

রে শেফালি! তোর মত সারাটি জনম—
প্রাণের দেবতা পানে, হাসি মুখে ফুল্ল প্রাণে
চেয়ে চেয়ে চেয়ে যেন যায় লো জীবন,
নারীজন্মে আর কিছু নাহি আকিঞ্চন।

—শরৎ—

শ্যামা পাখী।

কে তুমি স্বপ্ন সুন্দরীর মত, সুষুপ্তিময় গভীর রহস্যের অন্তরালে থাকিয়া আমারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি চুরি করিয়া, আবার আমাকেই নূতন করিয়া শুনাইতেছ? এ গীত যেন কত পুরাতন কত আগ্রহে একদিন শুনিয়াছিলাম আজ তাহা বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত প্রায়। আবার ঘুম ভাঙ্গিতেছ কেন? আমি আকাশে কুসুমোদ্যান রচনা করিতেছিলাম; অবশ্য আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, তা হউক—তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? যদি ভুলিয়া থাকি আমার এই ভুলই ভাল। তুমি ভুল ভাঙ্গিয়া কঠোর, নীরস সত্যের আবিষ্কার করিও না। আমি দিনেক দুই দিন সুখী হইয়া লইব, তোমার তাহা সহিল না কেন?

অমানিশার অন্ধকার। প্রগাঢ় নিরবচ্ছিন্ন—স্তরে স্তরে অন্ধকার। তিমিরা রাক্ষসী যেন প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়া অবাধে রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। জীবকুল সুষুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় কেবল একা আমিই সেই প্রকৃতির নৈশ মসীময় রাজ্যে নীরবে জাগ্রত রহিয়াছি। মনেও ঐরূপ কি যেন কেমন একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। প্রকৃতির সহিত এক হইয়া ঐ অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছি, এমন সময় সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমার প্রাণের ভিতর স্পন্দন তুলিয়া কে যেন সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করিল। স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় রহিলাম। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। আবার—আবার সেই প্রাণোন্মাদ কারিণী সঙ্গীত ধারায় বিশ্ব প্লাবিত হইল!

এক দিন আমিও সুখী ছিলাম, আমার একটী সাধের পাখী ছিল। বড় যত্নে পিঞ্জরে পুরিয়া রাখিয়াছিলাম। এক দিন সহসা পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উধাও হইয়া উড়িয়া গেল। তাই আজি আমি একা। আমার খেলা ফুরাইয়াছে হায়! আমিও ফুরাইলাম না কেন? কত আশা করিয়াছিলাম কল্পনায় কত সুখের ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলাম সহসা সকল ঘুচিল! তাই আজি প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে তীব্র বিষাদময় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। আজি আবার এই গান শুনিয়া তাহাকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিতে গেলাম,—চেতনা হইল, দেখিলাম ক্রোড় শূন্য; সেধন চলিয়া গিয়াছে!

ঐ গান একদিন ফুটন্ত জ্যোৎস্নারাতে এমনি সময়ে শুনিয়াছিলাম। আবার আজ শুনিলাম। একই সঙ্গীত দুই দিন দুই রকম শুনিলাম। এক সঙ্গীতের দুই ভাব—অদ্ভুত রহস্য! আজ আবার পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়ে কঠোর

দংশন করিতেছে। কে আমাকে জ্বালাইল? কে আমার এমন শত্রু, দেখিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, নীলাম্বুদমালাবিভূষিত নিস্তব্ধ নৈশাকাশ কোলে অন্ধকারে শরীর ঈষদাবৃত করিয়া, শ্যামা পাখী অসময়ে সঙ্গীত ধারা ঢালিতেছে। আহা! আমিও যদি ঐ শ্যামা পাখী হইতাম এজন্য কত সুখের হইত! মুক্ত প্রাণে আপন মনে আপন গীত গাহিয়া আবার উধাও হইয়া চলিয়া যাইতাম। কত দুঃখী, কত প্রেমিক, কত বিরহী এক তান মনে এই বিশ্বপ্লাবিণী সঙ্গীত সুধা শ্রবণ করিত। কোন দিকে লক্ষ্য করিতাম না। জীবনটা যেন কেবল একটা স্বপ্নময় হাসি খেলার মতন হইত।

যে আপন মনে আপন গীত গায় গাহিয়া তাহারই কেবল সুখ হয়। পরকে শুনাইবার জন্য যে গান তাহা আপন হৃদয়ের অন্তঃস্তলে প্রবেশ করিতে পারে না। গাইয়া যদি সুখ না হইল, তবে এমন গানে লাভ কি? শ্যামা জগতের প্রাণের সুর চুরি করিয়া গায়। শ্যামা সুখ চায় না. অথচ সুখের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যেই দুঃখের জগতে আসিয়াছে। আবার আমাদিগের জন্য দুঃখ রাখিয়া সুখটুকু চুরি করিয়া লইয়া যায়।

শ্যামা গায় কিসের জন্য? শ্যামার গান কে শোনে? বোধ হয় কাহারও উদ্দেশ্যে গায় না। এ গান উদ্দেশ্য বিহীন। কিন্তু আমরা ইহা শুনিবা মাত্র ইহা হইতে একটা উদ্দেশ্য গঠন করিয়া লই। শ্যামার গান অন্তর্জ্জগতের বস্তু, সকল হৃদয়ের প্রতিধ্বনি দিয়া এ গানের সুর বাধা হইয়াছে; তাই সকল হৃদয়ের সহিত এ গানের ঐক্য হয়।

আমি উহাকে তাড়াইতে চাহি কেন? উহা শুনিয়া আমার দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে, তাই তাড়াইতে চাহি। সাধ করিয়া কে দুঃখ ডাকিয়া আনে? এমন মানুষ অনেক আছে যাহারা ঐ গান শুনিয়া সুখী হইতেছিল। জগতের রীতিই এই এক জনের দুঃখের কান্না আর এক জনের পক্ষে কৌতুকের বিষয়। আমি কেন ঐ গান শুনিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। আগেই বলিয়াছি তাহা পারিব না। কারণ আমার খেলা ফুরাইয়াছে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া সাধের পাখী উড়িয়া গিয়াছে।

আর কি গাহিবে না? না শ্যামা আপনি গায়—কেহ ডাকিলে আসে না। তবে যাও পাখী, যাও অনন্ত শূন্যে উধাও হইয়া উড়িয়া যাও, মর জগতে আর আসিও না। পবিত্র কণ্ঠ কলুষিত করিও না। তোমার গান শুনিবার যোগ্য আমরা নহি। যেখানে এ সঙ্গীতের পূর্ণতা আছে সেই দেশে যাও; সেই অনন্ত অসীম রাজ্যে সুরের সহিত কায়মনে একীভূত হইয়া থাক।

প্রেম।

(১)

ওই যে অক্ষর দুটী, সুচারু ও পরিপাটী,
কিবা মনোহর আহা নয়ন রঞ্জন;
আসিল যে কোথা হতে, বিস্তৃত এ ভূমণ্ডলে,
গড়িল যে কেবা সেই রসিক রঞ্জন?

(২)

আছে কত সরলতা, আহা কিবা মধুমাখা,
কত যেন ভালবাসা রয়েছে মাখান;
সকলেই চায় যারে, নিয়তই লভিবারে,
কি হেন পদার্থ আছে প্রেমের সমান?

(৩)

প্রেম কি মদিরা ফল, আহা মরি কি সুন্দর,
সকলেই ইচ্ছা করে পিতে প্রাণভরে;
যতই করনা পান, নাহি আছে অবসান,
ততই বাড়িবে জ্বালা মরিবে পিয়াসে।

(৪)

দেখিলেই হয় মনে, কত কি যে লুপ্ত আছে,
ইচ্ছা হয় সদা প্রেমে ভাসি নিরন্তর;
খুঁজি কিন্তু নাহি পাই, খাঁটী প্রেম কোথাও নাই,
স্বর্গীয় দুর্লভ প্রেম মেলা বড় ভার।

(৫)

প্রেমে চলে ত্রিভুবন, নাহি কিছু প্রেম সমান,
চিরন্তন সুখ লভে প্রেমিক যে জনে;
প্রেম বড় গুরুতর, প্রেম সদা হৃদে ধর,
প্রেমময় ভগবান রয়েছেন প্রেমে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে অই মেঘের আড়ে।

(১)

কে অই মেঘের আড়ে উঁকি মারি চায়?
নীরব তামসী রাতি,
পরশে আলোক ভাতি,
নিবিড় আঁধার রাশি দ্বিগুণ বাড়ায়;
সুচিকণ চারু চিত্র চমকিয়া যায়।

(২)

তিলেক তোমার কিগো নাহি অবসর?
এই আস এই যাও,
এই পুনঃ দেখা দাও;
তোমার রূপেতে বুঝি বিভোর অমর!
বজ্র হস্তে দেবরাজ নিত্য সহচর!

(৩)

বিমল গগনে হাসে পূর্ণ শশধর;
প্রকৃতি গরবে ভরা,
সুধাকর সুধাধারা,
স্নিগ্ধ ধারে বরসিছে জগৎ উপর;
রাহু কিন্তু পিছে তার ভ্রমে নিরন্তর।—

(৪)

ত্রিদিব কুসুম দাম করি আহরণ,
জোছনা চাঁদনী রাতে,
তোমারে লইয়ে সাথে,
গুপ্ত কেলি গুপ্ত কক্ষে করে দেবগণ;
রাহু যেন ও মুরতি না করে স্পর্শন।

(৫)

রাখগো ঢাকিয়া অই বরবপু সাজ;
ও ক্ষুদ্র তারকা ভাল,
নাহি চাহি এত আলো;
মরুতে দেখালে মুখ দেবে পাবে লাজ;
ধরণী সহিতে নারে স্বরগের বাজ।

শ্রীবেণীমাধব মুখোটী।

ইতিহাস ও জীবনচরিত পাঠের উপকারিতা।

আজ কাল বঙ্গদেশে উপন্যাসের বড ছড়াছড়ি দেখা যায়। অসার উপন্যাসে বঙ্গ-সাহিত্যে আবর্জ্জনা জমিয়া গিয়াছে। সকল উপন্যাসেই অসার ও সুশিক্ষার পক্ষে প্রতিকূল—অবশ্য আমি এমত বলিতে চাহিনা,—তথাপি সারগর্ভ, সুশিক্ষাপ্রদ, উচ্চ আদর্শপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষা সমন্বিত উপন্যাস অতীব বিরল দৃষ্ট হয়। ইহা "শতেকে গোটেক"। অধিকাংশ উপন্যাসেই কুৎসিত প্রেমের হা হুতাশ, অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা, অবৈধ মিলন, পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রাপ্ত "বাবু" আখ্যাধারী জীবদের স্বেচ্ছাচারিতাময় অস্বাভাবিক কার্য্যকলাপ—প্রভৃতি অশ্লীলতায় পূর্ণ। এই সকল কুরুচি জনক গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক এক অলীক স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকেন। তাহার নয়ন-সমীপে প্রেমের একটা জ্বলন্ত-ছবি অনবরত ভাসমান থাকে—"ছুই ছুই ধরি ধরি তথাপি ধরিতে নারি"—এমনই একটা ভাব মাথার মধ্যে গজাইয়া উঠে। চরিত্রটা অসৎ পথে চালাইবার জন্য এই পুস্তকগুলি যত দূর সহায়তা করে,—আশা করি, একজন উৎকৃষ্ট বক্তার প্রাণোন্মাদকারী বক্তৃতা শুনিয়া বা সুগায়কের সুকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতের স্বর-ধারা পান করিয়া ততটা আবেগ না হইবার কথা। একটা কথা আছে, অসৎ পথে লোকের মন যত শীঘ্র অগ্রসর হয়, সৎপথে তত নহে। কাজেই পাঠক এই সকল কুরুচি পূর্ণ পুস্তকের জঘন্য বিলাসিতাময় রচনা পাঠ করিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে অধোগতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। যৌবনে পাঠকের প্রতি উপন্যাসের এই ক্ষমতাটুকু অপ্রতিহত ও অনিবার্য্য।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন মানবের চিত্তবৃত্তিনিচয় ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে,—যখন দৈহিক সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে—যখন প্রাণে নিত্য নবভাবের, নূতন কামনা-বাসনার সৃষ্টি হইতে থাকে,—এক কথায়, সর্ব্বথা নূতনত্বে মন ধাবিত হয়—তখন অনেকেরই প্রাণে উপন্যাস-পাঠের একটা দুর্দ্দমনীয়-আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে। ইহা স্বাভাবিক বলিলেও বোধ হয় এখানে সত্য-পদদলিত করা হয় না বা কথাটা অতি রঞ্জিত হয় না। তখন এই অদম্য-বাসনার উদ্দমে উত্তেজনায় অনেক সময়ই পাঠকের ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকেনা। পাঠক যেন তখন মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় এ পথে চলিতে থাকেন। এই কারণেই বস্তা পচা পুতিগন্ধময়—

বার বিলাসিনীদের জঘন্য ক্রিয়া-কলাপ-পূর্ণ কুৎসিত উপন্যাসগুলি ক্রমশঃ পাঠকের সরল প্রাণে একটা ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত করে—এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণতাই জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ, কাণে কাণে এ কথাটা বলিয়া দেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন সদসৎ বিবেচনা শক্তি তিরোহিত হয়। কারণ, একদিকে উপন্যাস পাঠের অদম্য আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে প্রবৃত্তির প্রবল-তাড়না। এমতাবস্থায় এমন কয়জন আছেন—যাহারা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাবলম্বনে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনে সমর্থ? অবশ্য সকলের সম্বন্ধেই আমার এ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য—এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে এ স্রোতে পড়িয়া অনেকেরই বিদ্যাবুদ্ধি, ধন-মান, যশঃ-প্রতিপত্তি ভাসিয়া গিয়াছে—এমনও দেখা গিয়াছে।

রুচিবাগীশগণ! অবশ্যই আমার এ কথাটায় আপনাদের নাসিকা কুঞ্চিত করিবার অনেকটা কারণ পড়িয়া রহিয়াছে। এমন কি, এজন্য আমার প্রতি আপনাদের প্রাণে যে বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক না হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহাই উহক, কথাটা একটু পর্য্যালোচনা করিয়া অন্তরের সহিত মিলাইয়া, দেখিলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন, ইহা 'অপ্রিয় সত্য'। সত্য-গোপন করিতে আমি ইচ্ছুক নহি—কোন দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোক ইহাতে ইচ্ছুক বা ভিন্ন মতাবলম্বী হইবেন—তাহা জানিনা। এ ধারণা আমার মনে কোন দিন উদিত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত অসার উপন্যাসগুলির কাল্পনিক বর্ণনায়—আপাত সুখকর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া এত দিন আমরা জীবন চরিত বা ইতিহাস পাঠের একটা আবশ্যকতা অনুভব করি নাই। গতিকেই আমরা স্বদেশের বা ভিন্ন দেশের অবস্থা বিষয়ে এখনও অনভিজ্ঞ। আমাদের জাতীয় ইতিহাস একটা নাই বলিলেও হয়। ইউরোপে সামান্য একজন লোকেরও জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া লওয়া হইতেছে—আর আমাদের ভারতাকাশের কত উজ্জল-নক্ষত্র যে অকালে কক্ষচ্যুত হইয়া কোন্ নিভৃত প্রদেশে অতল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন—তাহার হিসাব কয়জনে রাখে? বা তাঁহাদের বিষয় একটু জানিবার ইচ্ছা কয়জনের হয়? এই কারণেই আমাদের পরম শ্রদ্ধা ভাজন সাহিত্য-জগতে এক ছত্র সম্রাট, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎপ্রণীত "রাজসিংহ" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের শেষাংশে ব্যথিত হৃদয়ে লিখিয়া গিয়াছেন—"এ দেশে ইতিহাস নাই, তাই রাজ সিংহকে কেহ চেনে

না।" বাস্তবিকই কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরা এতদিন সে দিক্‌টার প্রতি একেবারে দৃষ্টিহীন ছিলাম, কিন্তু এখন সুবাতাস বহিয়াছে,—বাঙ্গলাদেশের প্রাণের মধ্য হইতে একটা একতার মহামন্ত্র উত্থিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে—তাই ইদানীং অনেক শিক্ষিত ভারত-বাসী ইতিহাসও জীবন চরিতের আবশ্যকতা ও উপকারিতা প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূলে সামান্য পরিমাণে সত্য নিহিত থাকে। বেশির ভাগই কাল্পনিক বর্ণনা পূর্ণ, কারণ উপন্যাস লেখকের ইহাতে একটা অপ্রতিহত অধিকার রহিয়াছে। যে উপন্যাসে ইতিহাসের নাম, গন্ধও নাই—তাহা জাগতিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কল্পনার সাহায্যে সৃজিত হয়। আর জীবন-চরিত বা ইতিহাস গঠিত হয়—সত্য ঘটনার সমষ্টি লইয়া। কাজেই এতদুভয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে যে পার্থক্য ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিদ্যাসুন্দরের মত বই পড়ার চেয়ে যে 'বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা অধিক, তাহা আর সুশিক্ষিত—সমাজ-তত্ত্ব-দর্শী লোকদিগকে বোধ হয় 'ভেঙ্গেচুরে' না বুঝাইলেও এ ক্ষেত্রে চলিবে। কেননা, বিদ্যাসুন্দরের ঐতিহাসিক ভিত্তি কত টুকু দৃঢ়, সে সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। অথচ ইহার রচনা-প্রণালীও বিষয়-নির্ব্বাচন ও চরিত্র-সৃষ্টি এত জঘন্যতায় পূর্ণ যে,—যিনি একবার তাহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি যদি প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু ও চরিত্রবান্ হন তাহা হইলে, ভ্রমেও আর এ পুস্তক হাতে লইবেন না—একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। বিদ্যাসুন্দরের অবৈধ প্রণয়, অস্বাভাবিক গুপ্ত বিহার যে তরলমতি যুবকের প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়া দিবেনা—কে বলিতে পারে? তেমন জিতেন্দ্রিয় কয় জন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাপের পথে লোকের মন যত শীঘ্র ধাবিত হয়—ক্ষণ ভঙ্গুর অস্থায়ী সুখ প্রাপ্তির জন্য মানব মন যে ভাবে লালায়িত হইয়া উঠে—সৎপথে অর্থাৎ প্রকৃত সুখের পথে তার শতাংশের একাংশও অগ্রসর হয় না। যদি এমন না হইত—তাহা হইলে পৃথিবীতে এত অপবিত্রতা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ, কখনই স্থান পাইত না। যতই এ বিষয়টা প্রাণের মধ্যে লইয়া গিয়া নিবিষ্ট মনে চিন্তা করা যায়—ততই যেন এবম্বিধ অসার উপন্যাসের প্রতি—উপন্যাস-লেখকদের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্ভূত হইয়া অন্তর অধিকার করে। ক্রমশঃ।

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

অপরাধী।

(১)

কলঙ্কিত করিয়াছি কর পরশিয়া
শ্রীঅঙ্গ তোমার,
তবু আছ সঙ্গীরূপে বিপদে সম্পদে মোর,
অনুতাপে বহে আজ—
রুদ্ধ যাতনার
বিন্দু অশ্রু-ধার!

(২)

বারণ করেছ কত,—তবুও দিয়েছি
বুকে আলিঙ্গন!
এ' চির কলঙ্কী তরে এত ব্যাকুলতা ভয়ে
এত দয়া—এত ক্ষমা
তোমার মতন
দেখিনি কখন!

(৩)

আমার কলঙ্ক ডালি স্বেচ্ছায় লইলে
করিয়া মাথায়,
আমার দোষের তরে তুমি কলঙ্কিত হলে,
আজো তবু ভালবাস!
দাওনি আমায়
ঠেলি উপেক্ষায়।

(৪)

আজ আমি অপরাধী ঘৃণিত নিন্দিত
——তুমি পুণ্যবাণ!
শুধু সঙ্গে আছ বলে' তোমায় কলঙ্কী বলে,
আমার লাগিয়া তুমি
হারালে সম্মান,
সহ অপমান!

(৫)

একদিন—একদিন তোমাতে আমাতে
মিলিব যখন :—
বন্দীভাবে রব আমি নীরবে দাঁড়ায়ে দূরে
তোমারে রচিয়া দিবে
স্বর্ণ সিংহাসন
পুণ্য দেবগণ।

(৬)

শান্তি লভি মুক্তি পরে ভিখারীর বেশে
ফিরিব যখন :—
তব সিংহাসন পাশে দাঁড়াইয়া রব ত্রাসে
সে'দিন আমারে দিও
বুকে আলিঙ্গন
নিবিড় চুম্বণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

চাঁদ।

বলি চাঁদ আজ আবার তর্‌তর্‌ শন্‌শন্‌ করে কোথায় যাচ্ছ? একটু দাঁড়াও না ভাই, তোমার সঙ্গে দুই একটী কথা আছে। শুনিবে কি? আজ আবার বড় দুঃখে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। গত পূর্ণিমার দিন ও আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি সেদিন ঘৃণা করিয়া হউক অথবা অভিমান বশতঃই হউক আমাকে দেখিয়া মেঘের আড়ালে মুখ লুকাইলে। আমি কি এখন এতই অধম হইয়াছি যে তোমার মুখ খানা একবার দেখিতে পাইব না? কথা কহা ত দূরের কথা, সেত অষ্টমীর দিন হইতেই বন্ধ করিয়াছ। অষ্টমীর আগে কথা কহিতে, কথা যেন তোমার ফুরাইত না। সময় পাইলে যেন আরও কিছু বলিতে, কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে আর দাঁড়াইতে পারিতে না, তাই চলিয়া যাইতে। কিন্তু এখন ত দাঁড়াইতে পার, এখন ত ন্যায় তোমাকে অনেক সময় দিয়াছে। কথা কও বা না কও, মুখ দেখাও বা না দেখাও, সে কথা যাক। এখন যে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম তাহা এক একটী করিয়া মন দিয়া শুন দেখি!

আচ্ছা ভাই আগে তোমার নামটী কি ঠিক করিয়া বল দেখি। লোকেত তোমায় রাহুগ্রস্থ মুক্ত, কলঙ্কস্পৃষ্ট নষ্ট চন্দ্র বলিয়া ডাকে, আমাকেও তাই বলিয়া ডাকিতে বলে, কিন্তু আমার তোমাকে তাহা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে না। তাহাই আমি লোকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তোমায় 'সুধেন্দু' বলিয়া ডাকি। তাহারা আমাকে বলে ও কখনও 'সুধেন্দু' নয় ও 'গরলেন্দু'। তাহারা আরও বলে তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ, অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হও, নচেৎ বিপদে পড়িবে। কিন্তু সত্য সত্যই কি আমাকে সাব-ধান হইতে হইবে? তোমার ঐ শুধামুখ নিঃসৃত বাক্যগুলি শুনিয়া আমার সাবধান হইতে ইচ্ছা করে না।

আচ্ছা এ কথাটা যাক,আর একটা কথা শুন, তুমি কুমুদকে অধিক ভাল বাস কি, চকোরকে অধিক ভাল বাস? লোকে ত বলে তুমি চকোর অপেক্ষা কুমুদকেই অধিক ভাল বাস, তাত বাসিবেই, কারণ কুমুদ যে বড় লোক। সে তোমার ভাল বাসা চায় না। তোমা অপেক্ষা তাহাকে ভাল বাসিবার অনেক লোক আছে, তবু তাহাতে ভালবাসার ভান দেখাইতেই হইবে। কারণ সে যে বড় লোক, আর চকোর বেটা তোমার দুটো মিষ্ট কথা শুনিবার জন্ত দিনান্তে তোমায় একবার দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া তোমার নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তুমি তাহার দিকে ফিরিয়াও চাও না। যখন সরোবরে কুমুদ না ফুটিয়াছিল, তখনই না তুমি চকোরকে সস্নেহে ডাকিয়া বলিয়াছিলে, 'চকোর, আমি যদি তোমার মত একটী বন্ধু পাইতাম তাহা হইলে কতই না সুখী হইতাম।' তখন যদি কুমুদের ধনীত্ব প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে চকোরের এত খোজ হইত না।

কথাটী বড়ই অশ্লীল হইয়া পড়িল, ভাই রাগ করিও না। আর একটী কথা শুনিয়া যাও, 'ভাই তোমার ক'টী রূপ' একবার ঠিক করিয়া বল দেখি, দ্বিতীয়ার দিন তোমাকে এক রকম দেখি, এইরূপ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এক এক দিন এক এক রূপ দেখি, কিন্তু এইরূপ গুলির মধ্যে তোমার কোনরূপটী ঠিক? এইরূপ বহুরূপীর বহুরূপ দেখাইয়া চকোরের ন্তায় ক'জনকে ভুলাই-য়াছ, বল দেখি? কতজনকে এরূপ হৃদয়বিদারক কষ্ট দিয়াছ? কিন্তু জানিয়া রাখ যে চকোরকে কষ্ট দাও, ঘৃণা কর, সে তোমায় করিবে না। সে মেঘাচ্ছন্ন যামিনীতে তোমার অস্ফুট আলোক দেখিয়াও কুমুদের ন্তায় ভান করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকিবে না। তুমি চকোরের পানে তাকাও,

আর না তাকাও, সে তোমার অলক্ষিতে তোমার মুখ দেখিয়া জীবিত থাকিবে, চিরকাল তোমায় ভাল বাসিবে, তোমা বই আর অন্য কাহাকেও জানিবে না। সে তোমায় ভালবাসিয়া ভালবাসার প্রতিদান চাহিবে না। তবে ভাই বিদায় কালে আর একটী কথা শুন, চকোরের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হয় সেইরূপ করিও তাহাতে সে একটুও দুঃখিত হইবে না। তবে পরকে না ভুলাইলেই কি নয়? তাহাদের কাছে পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় থাকিলে কি ভাল হয় না? রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে, বড় ঘুম পাচ্ছে তবে আজকার মত আসি।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস।

স্নেহ।

স্নেহের কোমল ডোরে
কে পারে ছিঁড়িতে রে।
বাঁধা আছে নিশি দিবা
হৃদয়ে হৃদয়ে কিবা
মুহূর্ত্তের মাঝে তারে
কেপারে টুটাতে রে।
পৃথিবীর ভাল বাসা
সুউচ্চ অনন্ত আশা
তাও ত ছাড়িতে পারে
চিরকাল তরে রে।
কিন্তু এ স্নেহের সুধা
যত খাবে তত ক্ষুধা
জীবনে মরণে তৃষা
না মিটাতে পার রে।
মায়ের মমতা স্নেহ
ভাঁধিতে কি পারে কেহ?
চিরকাল স্নেহডোরে
মাতৃ পদে বাঁধা রে।

মাও কি ভুলিতে পারে?
সন্তানে কি স্নেহ ছাড়ে?
আজীবন সে নয়নে
স্নেহ প্রার্থী শিশুরে।
স্নেহে(র) শিশু মা মা ব'লে
ধায় যবে মাতৃকোলে
স্নেহনীরে জননীর
দুই গণ্ড ভাসেরে।
স্নেহেতে জীবন বাঁধা
স্নেহে বাঁধা এ বসুধা
স্নেহ বিনা কোনকালে
কে বাঁচিতে পারেরে।
স্নেহের প্রতিমা ব'লে
জননী চরণ তলে
প্রণমি সহস্র বার
পদধূলি লইরে।
মা বিনা আর কে আছে কার
স্নেহের জননীরে।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রেম সাগরে ভাবাও।

আয়রে কানু, বাজিয়ে বেণু,
আমার হৃদয় মাঝে;
চরণে দিব, কুসুম দল,
বিল্বদল কিবা সাজে!
আয়রে নেচে, ও ভাই কানু,
হেরিব বদন খানি;
শুনিব সুধু, বাঁশীর গান,
চরণ নুপুর ধ্বনি।
শুনিব দুটো, প্রেমের কথা,
শুনিব রাধার মান;
দেখিব উঠে, উথলে প্রেম,
বহে কি হৃদয়ে বান!
যেমন ক'রে, উথলে উঠে,
যমুনা হৃদয় মাঝে;
তেমনি ক'রে উঠবে নারে,
আমার হৃদয় মাঝে।
আয়না নেচে, ও ভাই কানু,
মদন মোহন সাজে;
অথবা নেচে, রাখাল রাজে,
দ্বাদশ রাখাল মাঝে।
হৃদয় ব্রজে, এসনা শ্যাম,
ল'য়ে প্রেমময়ী রাধা;
হৃদি বিপিনে, বাজাও বাঁশী,
ব'লে রাধা-রাধা-রাধা।
কিম্বা ষোড়শ, গোপিনী ল'য়ে,
হৃদয় কদম্ব মূলে;
খেলত শ্যাম, খেলত হোলি,
লইয়ে গোপিনী দলে।
দাসের আশা, পুরাও শ্যাম,
সজোরে বাঁশী বাজাও;
ও মনচোরা, চুরি করি মন,
প্রেম সাগরে ভাবাও।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

মাসিক সংবাদ।

ইঃ ইঃ রেলের ব্যাণ্ডেল ষ্টেসন হইতে মিহিলি সিং নামক তার বিভাগের এক জন কর্ম্মচারি সরকারি তহবিলের ৫৫০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

এলাহাবাদে রায়-বেরিলি—বাণিপুর রেল-লাইন বৃদ্ধি করা হইবে। ভারত সচিব অনেক দিন এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বাণিপুরের এক ময়দার কলে বিস্তর লোক কাজ করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ কলবাড়ীর ছাদ ধ্বসিয়া পড়ে। ফলে ৫ জন লোক খুন ও ৮ জন জখম হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আউধ্ রোহিলখণ্ড রেলকোম্পানি শীঘ্রই পালামৌ-সীতাপুর লাইনে এবং রোসা—সীতাপুর লাইনে কাজ আরম্ভ করিবেন।

বিলাতের বিখ্যাত কবি সুইনবরণ গত ১০ই এপ্রিল তারিখে পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁর বয়স হইয়াছিল ৭২ বাহাত্তর বৎসর।

বড় বাজার কটন ষ্ট্রীটের একটী কাপড়ের দোকানে আগুন লাগিয়াছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার জিনিষ পুড়িয়া গিয়াছে।

আন্দামান পোর্ট ব্লেয়ারের দুই জন মগ কয়েদী পলাইয়াছে। সাগরে কন্দরে খোজ খোজ পড়িয়াছে।

আসাম-বেঙ্গল রেলপথে লাঙ্গটিং এবং হাতিখালি ষ্টেশনের মাঝে রেললাইনের উপর মাল গাড়ীতে এক বুনো হাতী কাটা গিয়াছে। গাড়ীর ইঞ্জিনকেও কাত হইতে হইয়াছিল। প্রায় এক দিন এ পথে রেল চলাচল বন্ধ ছিল।

ই-আই রেলের মোকামা ষ্টেশন হইতে সিমেরিয়া ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গায় এখন ষ্টিমার যোগেই পারাপার হইয়া থাকে! ই-আই রেল কোম্পানী পুল তৈয়ার করিবেন। রেলবাণিজ্যেরই বিশেষ সুবিধা।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে। তভিন্ন মুসি নদীর জলপ্লাবনে নবগঠিত আফজলগঞ্জের অর্দ্ধেক আধার ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে জলপ্লাবনে এই নগরের কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পাঠক জানেন। এবার আবার তদ্রূপ দুরবস্থা হইয়াছে।

শ্মশান।

এই কি শ্মশান সেই পুণ্যময় স্থান!
ধন্য তুমি পুণ্য স্থান,
ধন্য তব নীতি জ্ঞান,
তব কাছে রাজা প্রজা সবাই-সমান;
উচ্চনীচ বলিয়ে না কর ভেদ জ্ঞান!

এই কি শ্মশান সেই পুণ্যময় স্থান!
এইখানে মহাযোগী করেন ভ্রমণ;
চিতা ভস্ম গায় মাখি,
কত তিনি হন সুখী,
গন্ধময় স্থান ব'লে নাহি অভিমান;
প্রিয়ভাবে তাই তিনি করেন ভ্রমণ।

এই কি শ্মশান সেই পুণ্যময় স্থান!
হয় যথা বধির মানবেন্দ্রিয়গণ;
ত্যজিয়া সংসার খেলা,
জীবনের শেষ বেলা,
মজিয়া অনন্ত প্রেমে-অনন্ত নির্ব্বাণ;
এই কি শ্মশান সেই—মহাতীর্থ স্থান?

এই কি শ্মশান সেই পুণ্যময় স্থান!
যেখানেতে নাহি রয় আত্ম-পর জ্ঞান;
যায় আশা মরীচিকা,
লুপ্ত মৃত্যু বিভীষিকা,
যায় ছুয়ে মানবের--সকল বন্ধন;—
মায়া-প্রেম, শোক-দুঃখ,—মরম-বেদন।

এই ত শ্মশান সেই পুণ্যময় স্থান!
শব ব'লে যথা লোকে করে হত-জ্ঞান;
কেবল মুদিত নেত্র,
এ জীবন কুরুক্ষেত্রে,

সংসার সমরে যথা হয় অবসান ;
এই সেই কুরুক্ষেত্র-তুমি ত শ্মশান !

পুণ্যস্থান বলি কেন? তোমারে শ্মশান !
মা-জাহ্নবী তবকাছে সদা অধিষ্ঠান ;
হিংসা দ্বেষ শূন্য নর,
কাম ক্রোধ নাহি কার,
কেবল সবে-অনন্ত যোগেতে মগন ;
তাই তোরে পুণ্যস্থান বলিরে শ্মশান !

শ্মশান ! ঘুচিবে মোর-সংসার বন্ধন
স্বজাতির স্কন্ধে আমি করি আরোহণ ;
যাইব তোমার কাছে,
তুমি বিনা কেবা আছে,
বন্ধু বন্ধু বলি আমি লইব শরণ ;
মা-গঙ্গাকে ব'লে দিও দিতে শ্রীচরণ।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

হেয় আমি।

হেয় আমি—তুচ্ছ আমি
হেয়-গুণ হীন জন।
হেয় দস্যু—হেয় চোর
হেয় অত্যাচারীগণ।
হেয় পশু—হেয় পক্ষী
হেয় ধর্ম্মহীন ব্যক্তি ;
মিথ্যা হেয়—ভিক্ষা হেয়
হেয়-যার নাই ভক্তি।
হেয় দীন'—হেয় তৃণ
হেয়, লঘুতুচ্ছ ক্ষীণ ;
হেয় আমি—কেন বল ?
(না) ধর্ম্মজ্ঞান-বিদ্যাহীন,

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

বাজবাহাদুর ও রূপমতী।

(ঐতিহাসিক সন্দর্ভ)।

যে পুণ্যভূমি, চম্বল এবং কালীসিন্ধুনদ দ্বারা পুরাকালে সতত ধৌত হইত। যেখানে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ও কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতীত কালের সকল পণ্ডিতগণই একবাক্যে যে পুণ্য ভূমির গুণ গাহিয়া গিয়াছিলেন,—সেই পুণ্যভূমি মালব রাজ্য, পৃথিরাজের মৃত্যুর পর আফগানগণ অধিকার করিয়া লয়; সেইদিন হইতে হিন্দু গৌরব-'কাগার' জলে চিরদিনের জন্য অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে মোগল কুল গৌরব ও প্রথম মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবরসাহ আফ-গান গণের নিকট হইতে বাহুবলে ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেন। এবং বাবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হুমায়ুণ সমগ্র ভারতের ভাগ্য বিধাতা পদে সমাসীন হয়েন। কিন্তু হুমায়ুণ তাঁহার পিতার ন্যায় ভাগ্যবান হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজত্বের ১০ বৎসর পরে সের সা ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেন।

এই সময়ে সুজাত খাঁ সের সাহের প্রধান সেনাপতি পদে কার্য্য করিতে ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে সুজাত খাঁ কাদের খাঁর নিকট হইতে মালব রাজ্য জয় করিয়া লয়েন ও সের সাহের নিকট হইতে মালবে শাসন ভার প্রাপ্ত হয়েন। কিছুদিন পরে অর্থাৎ সের সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সলিমের সঙ্গে সুজাতের মতান্তর ঘটায়, সলিম সুজাতের প্রতি অসন্তোষ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে এক বিপুল বাহিনী সৈন্য মালবে প্রেরণ করেন। সুজাত সেই বিপুল সৈন্যের বিরুদ্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ভাঙ্গরপুর রাজার আশ্রয়ে চলিয়া যান। কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরে সলিম পুনরায় সুজাতকে মালবে আনাইয়া পূর্ব্ব পদে অধিষ্ঠিত করেন। সেই হইতে সুজাত স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন; কিন্তু অসময়ে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে সে সৎ উদ্দেশ্য বিফল করাইয়া দেয়।

সুজাতের পুত্র বায়জিদ ৯৬২ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর মালবের সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। বায়জিদ অতঃপর বাজ বাহাদুর নাম গ্রহণ করেন। নবীন সুবাদার পিতার ন্যায় সাহসী ও পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বিপক্ষদল

মথিত করিয়া স্বপ্রধান হইতে লাগিলেন। বাজ বাহাদুর যতবার যুদ্ধার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন ততবার, তিনি সর্ব্বত্রই জয়ী হইয়াছিলেন; কেবল একবার—সেই—শেষবার—রাণী দুর্গাবতীর নিকট—বিষমরূপে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এবং সেই পরাজিততেই তাঁহার রাজ্যাভিলাষের অদম্য উৎসাহ সমস্ত লীন হইল। বাজবাহাদুর এতদিন কেবল কঠোর হৃদয় ও শাণিত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে বিপুল উৎসাহের সহিত রাজ্য জয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন,, আজ তাহা সুমেরুর আঘাতে গতিভঙ্গ হইল। ইহার পর তিনি সুকোমল শয্যার আশ্রয় প্রার্থী ও রমণী প্রেমে মত্ত হইলেন। যে রাজ প্রাসাদ এতদিন অস্ত্রের ঝণৎকারে ও কামানের আওয়াজে দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল, আজ হইতে সেই রাজপ্রাসাদ রমণীর বলয়, কঙ্কণ ও শিঞ্জিনীর শব্দে মুখরিত হইতে আরম্ভ হইল।

বাজ বাহাদুর নিজে সুন্দর গায়ক ও সঙ্গীত বিদ্যানুরাগী ছিলেন; এতদিন রাজ্য লিপ্সারূপ অদম্য বেগ তাহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল—আজ অবসর পাইয়া তাঁহার সঙ্গীতাভিমুখী ইচ্ছা বলবতী হইল। সমগ্র হিন্দুস্থান হইতে সুকণ্ঠ গায়ক গায়িকা আসিয়া মালব রাজ প্রাসাদ পূর্ণ করিতে লাগিল। এইরূপ কিছুদিন পরে বাজবাহাদুর শুনিলেন যে, মালব রাজ্য মধ্যে সরঙ্গপুরে রূপমতী নামক একজন সুবেশী সুকণ্ঠী আছেন।—রূপমতী তখন সর্ব্বত্র সুগায়িকা ও সেইরূপ নৃত্যাদিতেও সুপারগা ছিলেন ও কমনীয়া-বেশা ছিলেন—ইত্যাদি কারণে শীঘ্রই সে কথা বাজ বাহাদুরের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি অবিলম্বে রূপমতীকে মালবে আনাইলেন। রূপমতী সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে শুনা যায়, তিনি জাতিতে হিন্দু ও অত্যন্ত সুরূপা ছিলেন; পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি তিনি সুগায়িকা ও নৃত্যাদিতে সুপারগা *। ইহাছাড়া তাঁহার একটী অনন্য সাধারণ গুণের জন্য অদ্যাপি খ্যাত আছেন—তিনি বাল্যকাল হইতে কবি ছিলেন। প্রধানত রূপমতী কবি, গায়িকা ও নর্ত্তকী নামে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু যদিও রূপমতী গান বাদ্যের ব্যবসায়ী ছিলেন তথাপি তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল; তাঁহাকে কেহ সাধারণ গায়িকাদের ন্যায় কলঙ্কিত বলিয়া জানেন নাই। বাজবাহাদুর রূপমতীর এই সকল গুণের বিষয় অবগত হইয়া—তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইবার অভিলাষ করিলেন। বিশেষ যেমন তিনি গায়ক ও কবিতাপ্রিয় রূপমতীতে

* স্যার ম্যাকোম তাঁহাকে নর্ত্তকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সকল সদগুণ রাশি দেখিয়া বাজবাহাদুর একান্ত মোহিত হইলেন। সেই মোহ তাঁহাকে জাতি বা পদ কিছুতেই বাধাদিতে পারিল না। বলা বাহুল্য রূপমতীও সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দিলেন। দুটি মধুর অন্তঃকরণ দাম্পত্য প্রেমে বদ্ধ হইলেন। বলা বাহুল্য বাজবাহাদুর মুসলমান ও রূপমতী হিন্দু জাতীয়। হিন্দু মুসলমানে বিবাহ তখন কার ইতিহাসে বিরল নহে। যাহা হউক জাতি ভেদ হইলেও ঐ পবিত্র মিলনে উভয়ে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মর্ত্তে থাকিয়া দুটি প্রাণে বিমল স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তখনকার রাজ কবি খসরু সেই যুগল দম্পতীর পবিত্র প্রণয় বিষয়ক কয়েকটি সুন্দর গাথা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে উক্ত দম্পতী যুগল এক আত্মারূপে থাকিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গ সুখ অনুভব করিতেন।

অতঃপর বাজবাহাদুর মণ্ডুতে একটী সুদৃশ্য সুরম্য অট্টালিকা, রূপমতীকে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত করাইলেন। উক্ত অট্টালিকায় জগতের সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি আনাইয়া আরও সুন্দর করিলেন। অট্টালিকার পুরোভাগে একটি বিচিত্র পুষ্পোদ্যান রচিত করিলেম। নগরের কোলাহল হইতে নির্জনে নিভৃতে মণ্ডুর প্রমোদাগারে উভয় দম্পতীতে বাস করিবার অভিলাষ করিলেন। এইরূপে রূপমতীপ্রেমে মত্ত বাজবাহাদুর দিবা রাত্র প্রমোদাগারে পড়িয়া থাকিতেন, তিনি একটী বারও রাজ কার্য্য দেখিতেন না শুনিতেন না; কেবল মোহমুগ্ধ বাজবাহাদুর রূপমতীর কমনীয় রূপ তৃষিত চাতকের ন্যায় উপভোগ করিতেন।

তৎকালে তিনি রূপমতী প্রেমে বিভোর হইয়া এরূপ অধঃপতিত হইয়াছিলেম যে, শেষে তাঁহাকে সে জন্য হৃত-সর্ব্বস্ব হইতে হইয়াছিল, তাহা পরে জানাইতেছি। অদ্যাপি ঐ বিষয়ে অনেক গল্প ও গাথা প্রচলিত আছে।

এইরূপ প্রেমে মত্ত হইয়া বাজবাহাদুর কিছুদিন কাটাইলেন। একদা দিল্লি হইতে আগত রাজ্যলিপ্সু সেনাদলের গভীর গর্জ্জনে তাঁহার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি বিলাসের ক্রোড় হইতে উঠিয়াই দেখেন চারিদিকে আগুণ জলিয়াছে; মোগল সেনায় তাঁহার রাজ্য ঘিরিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই দিল্লির সম্রাট আকবর মালব আক্রমণ করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বাজবাহাদুরের বাহুবলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইতেছিল না। এতদিনে আকবর বাদশাহ শুনিলেন যে, বাজবাহাদুর বিলাস সাগরে মত্ত আছেন; এ কথা শুনিয়া চতুর

সম্রাট অবিলম্বে মালব আক্রমণের জন্য পীরমহম্মদ ও আদম খাঁকে সেনাপতি করিয়া এক বিপুলবাহিনী পাঠাইলেন। তাহারা বিপুল উৎসাহ সহকারে মালব সিংহদ্বারে আসিয়া গর্জ্জন করিল। বাজবাহাদুর হঠাৎ শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না। কারণ আজ কয় বৎসর যাবৎ তিনি বিলাসে মত্ত থাকায় রাজ্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে।

আদম খাঁ বিনা রক্তপাতে মালব রাজ্য অধিকার করিল। বিলাস প্রেমে মত্ত বাজবাহাদুর পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তাঁহার অসংখ্য ধন রত্নাদি ও শত সহস্র হয়-হস্তী সহ মণ্ডুরাজ-প্রাসাদ ও সেই সঙ্গে তাঁহার একমাত্র চির সঙ্গিনী রূপমতীও আদমের বন্দী হইল। হায়! যাহার ইঙ্গিতে মালবরাজ বাজবাহাদুর উঠিতেন বসিতেন, যাহার প্রেমে, হাবভাবে মত্ত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া বলিতেন, "প্রাণে যত ভালবাসা তত ভালবাসী তোরে।" আজ রূপসীর সেই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, নন্দন কাননের পারিজাত দানবে লুণ্ঠন করিল। রূপমতী অতঃপর আদম খাঁর হস্তোত্তলিত অর্থে তাহার সুখ পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আদম খাঁর পাপ নয়ন রূপমতীর প্রজ্বলিত রূপে ঝলসিয়া উঠিল, তাহার অন্তঃকরণে পাপের ছায়া উদিত হইল। ক্রমশঃ তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, আদম তাহার কামানল আর দমন করিতে না পারিয়া একদিন রূপমতীর নিকট তাহার পাপ বাসনা জ্ঞাপন করাইল। বাজবাহাদুর চলিয়া যাওয়ার পর হইতে রূপমতী মরমে মরিয়াছিলেন, এখন ঐ কথা শুনিয়া দীপ্তা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া আদমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

আদম খাঁ রূপমতীর নিকট হইতে সুখের আশায় বঞ্চিত হইয়াও বাসনা ত্যাগ করিতে পারিল না। রূপমতীকে কিরূপে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত করিয়া তাহার অঙ্কগত করিবে এই চিন্তাতেই আদম খাঁ দিবানিশি ব্যস্ত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রূপমতী দর্পভরে বলিলেন,—"যে দেহ ও প্রাণ একজনকে দিয়াছি, যাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছি, জীবনে ও মরণে এ দেহ, এ প্রাণ তাহারই; আমি জীবিত থাকিতে কাহাকেও আলিঙ্গন করিতে পারিব না।"

আদম খাঁ রূপমতীর নিকট সাধিয়াও যখন প্রেমের আশা পাইল না

তখন বিফল প্রেমে ব্যথিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আদম তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। সে গর্জ্জিয়া বলিল,— "যেরূপে পারি এ হেন রত্ন গলায় ধারণ করিবই করিব।" রূপমতী আদম খাঁর অভিলাষ বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল এখন সে আদমের হাতে, সে নিশ্চয় কোনদিন তাহার অমূল্য নিধি গ্রহণ করিবে। রূপমতী মনে মনে বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করিল, পরে কি ভাবিয়া আদম খাঁর বাসনায় সম্মতি দিল। তাহাদের উভয়ের মিলন সুখের একটা দিন স্থির হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

কাঙ্গাল।

যদিও অযোগ্য তব—তবু পরকরে
দিওনা আমায় সখা! তব স্নেহ-করে
একবার পরশিও ক্লিষ্ট হস্তখানি,
একবার নিও তব বুকে মোরে টানি।
তুমিত আমার নহ—নহ আপনার—
আপনার হতে যেন বেশী আপনার
সম্বন্ধ তোমার সনে;—শুধু মনে হয়
তোমাতেই মোর যেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়!
তোমারে আমার করা এযে অসম্ভব,
আমি যে কাঙ্গাল,—তুমি সম্পন্ন বিভব।
তথাপি মিনতি—তব কর পরশিয়া
আমারে মহার্ঘ্য-কাব্য তুলিও রচিয়া,—
তোমার সমান করি—তারপর মোরে
দিতে হয় দিও সখা! তব পর করে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

"প্রবাসীর পত্র।"

নিখিল জগতের মধ্যে, সুনীল গগনপটের নিম্নে, একটী মনোরম স্থান আছে, যাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। সে স্থানটী আমার জন্মভূমি। তথাকার সফেন কর্দ্দমাক্ত নদীজল আমি অমৃত বোধে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতাম। তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া আমার বোধ হইত, যেন আমি দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছি। পক্ষীগণের অস্ফুট কল কল-ধ্বনি আমার শ্রবণ বিবরে বীণাঝঙ্কারবৎ মধুর লাগিত। তথাকার চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ, না জানি, কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া আমার নয়নপথে পতিত হইত, আর আমি নিবিষ্টমনে উহাদিগের সেই মনোহর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতাম। কণ্টকময় পথে যখন আমি ভ্রমণ করিতাম, আমার বোধ হইত যেন আমি কুসুমাস্তৃত পথে বিচরণ করিতেছি। সেখানকার পশু পক্ষীগণকে দেখিলে আমার প্রাণ আনন্দে বিভোর হইত। বলিতে কি, তথাকার যাহা কিছু দেখিতাম, সকলই সুন্দর, সকলি মধুর। কিন্তু হায়! কালের ভীষণ পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া, বাঙ্গালী জীবনের একমাত্র গৌরব চাকুরী সম্বল করিয়া আমি আজ প্রবাসে আসিয়াছি। প্রথমতঃ এস্থানে আসিয়া আমার মনে অশান্তির অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে জ্বলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম বোধ হয়, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ইহার প্রধান কারণ, কিছু দিবস এস্থানে অবস্থান করিলে, হয়ত, আমার মানসিক যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমশঃই যাইতে লাগিল, তথাপি আমার মানসিক ক্লেশ বিদূরিত হইল না। বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এস্থানে আসিয়া কত নূতন নূতন বন্ধু পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত আলাপন করিয়া আমার সম্যক পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহাদিগের আলাপন আমি অনিচ্ছায় শ্রবণ করি। কত সুন্দর সুন্দর বস্তু নিশিদিন আমার নয়নপথের পথিক হয়, কিন্তু সে সকল আমার চিত্তাকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণরূপে পারক হয় কই? কেমন সুন্দর সুন্দর গ্যাসালোক শোভিত পথঘাট, কেমন সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যশ্রেণী কত সুন্দর সুন্দর বিবিধ জাতীয় ফলপুষ্প, কিন্তু এ সকল আমার চক্ষে বিষবৎ প্রতীয়মান হয় কেন? তবে কি, আমার রুচিবিকার

ঘটিয়াছে? সন্ধ্যাসমাগমে ধরণী যখন ধূসরবাস পরিধান করিয়া সমাধিমগ্না যোগিনীর ন্যায় বোধ হয়, নীল গগনপটে যখন উজ্জ্বল তারকাবলি দুটী, একটী করিয়া নীরবে ফুটিতে থাকে, চন্দ্রের মধুর কিরণে যখন ধরাতল সুশোভিত হয়, আমার মানসিক বিকার তখন অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হয় কেন? তখন আমার চিন্তা স্রোত দূরে—অতি দূরে পৃথিবীর একটী নগণ্য স্থানের উপর গিয়া পড়ে, আমি তখন ভক্তি গদ গদ চিত্তে তন্ময় হইয়া না জানি, তাহার বিষয় কতই চিন্তা করি। যখন আমি বন্ধুবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া, নদীতীরে উপবেশন করি এবং নদীবক্ষে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া মধুর নৃত্য করিতে থাকে, জলজ প্রাণীনিচয় যখন জলে কেলি করিতে থাকে, তখন ঐ সকলের শোভা দেখিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! একই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যহ একই আকাশপটে শোভাপায়, একই নয়নরঞ্জন, মনোহর, বিবিধ জাতীয় ফলপুষ্প পৃথিবীর সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়, একই স্বভাবের শোভা প্রত্যহ পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়, একই বন্য পক্ষীগণের কাকলী সর্ব্বদা সর্ব্বজনের প্রাণে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়, একই তরুছায়া তাপদগ্ধ পথিকের দগ্ধপ্রাণ শীতল করে, একই প্রকারের মনুষ্য পরস্পরের সহিত মধুর আলাপ করে, কিন্তু এ সকলের মধ্যে কি স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রভেদ! স্বদেশের যাহা কিছু সকলই সুন্দর, সকলই বর্ণনীয়। কিন্তু বিদেশের সকলই বিপরীত। হায়! মধুর স্বদেশস্মৃতি, আমি এক্ষণে পৃথিবীর একপ্রান্তে দূরে অতি দূরে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু তবুও তুমি সর্ব্বদা আমার মানস পটে অঙ্কিত আছ। তোমার মধুর কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা বিভোর। আমি মনরথে আরোহণ করিয়া নিমেষের মধ্যে তোমার সেই লতাগুল্ম সুশোভিত প্রতিমাখানি দেখিয়া, না জানি, কতই সুখ উপভোগ করি। পৃথিবীতে তোমার ন্যায় মনোরম স্থান আর কুত্রাপি নাই। না জানি, বিধাতা তোমার প্রত্যেক পরমাণুতে কতই মধুরতা প্রদান করিয়াছেন। নন্দন কাননের শোভাও তোমার তুলনায় অতিশয় কদর্য্য, অতিশয় নগণ্য। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন "জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

"একজন প্রবাসী"

ইতিহাস ও জীবনচরিত পাঠের উপকারিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একটা সত্য ঘটনা যে পরিমাণে লোকের চিত্তাকর্ষণ করে—যে ভাবে অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল হইয়া যায়—একটা অপ্রত্যক্ষ কল্পনা-প্রসূত মিথ্যা ঘটনা তেমন করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। বিষয়টা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণে ক্ষণিক হিল্লোল উঠিয়া অল্পক্ষণ পরেই তাহা আবার বিলীন হইয়া যায়। সত্য ঘটনার সমাবেশে—সত্য ঘটনার জাজ্বল্যমান চিত্রে—পাপীর নরক ভোগ—পুণ্যাত্মার বিমল শান্তিতে—ইতিহাস ও জীবন-চরিত শোভিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহা পাঠের উপকারিতা শত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না।

যে সকল মহাত্মগণ এই মলমাটিপূর্ণ পঙ্কিল সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ সৎকার্য্যের দ্বারা লোক-জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন—যাঁহাদের সৎকার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া অদ্যাপি জগতের লোক মুক্ত-কণ্ঠে ধন্য ধন্য করিতেছে—যাঁহাদের অমানুষী প্রতিভা, বিপুল উদ্যম, অদম্য সাহস, অজেয় অধ্যবসায় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে—তাঁহাদের জীবন-চরিত আলোচনা করা আর প্রকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করা একই কথা। একজন মহাপুরুষের জীবনের পবিত্র-কার্য্য-কলাপ আলোচনার অপেক্ষা শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় জগতে আর কিছু আছে কিনা—জানি না! ইঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সমালোচনা-প্রসঙ্গে যখন দেখিতে পাই—তাঁহারা পাপের সঙ্গে বীরপুরুষের ন্যায় অনবরত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন—যখন দেখিতে পাই, ঈশ্বর-চিন্তায় আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের নয়ন হইতে অজস্র প্রেমাশ্রু পতন হইতেছে—পাপীকে ঘৃণা না করিয়া সাগ্রহে ক্রোড়ে টানিয়া লইতেছেন ও নানা সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে সৎপথে আনয়নের চেষ্টা পাইতেছেন,—পাপের প্রতি তাহাদের ঘৃণা জন্মাইতে-ছেন- যখন দেখিতে পাই, জগতের হিংসা, দ্বেষ, লোভ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা হইতে তাঁহারা আপনাকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত—বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিয়াছেন—বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে সর্ব্ববিধ পাপানুষ্ঠানের—দেশের অহিত-জনক কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন—স্বাধীনতা-স্পৃহা যে সভ্য-জগতের স্বাভাবিক

অধিকার তাহা মুক্ত-কণ্ঠে বর্ণনা করিয়া সকলের প্রাণে স্বাধীনভাব জাগাইবার চেষ্টা পাইতেছেন—তখন মনে হয়, ইঁহারা মানুষ না দেবতা? তখন মনে হয়, যেন কোন ঈশ্বর-প্রেরিত দৈব-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ দৈববলে এ সমস্ত অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যাবলী নীরবে সমাধা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী ঘোর ইন্দ্রজালপূর্ণ ও রহস্যময়। মনে হয়, ইঁহারা যেন কার্য্য করিবার জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সংসারে আসিয়াছিলেন এবং সহস্র বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া—লোক নিন্দা, ভয় অগ্রাহ্য করিয়া আপন মনে নীরবে স্বকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল প্রতিভাবান্ দেবোপম পূত-চরিত্র মহাপুরুষগণের আদর্শকে লক্ষ্যস্থানীয় রাখিয়া তাহা হইতে সদাচার, প্রেম, ভক্তি, দয়া ও বীরত্ব শিক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। এ শিক্ষা মানবকে দেবতা করিয়া তুলে। মানব এ স্বার্থময়—পাপ-প্রবঞ্চনাময়—হিংসা-দ্বেষ-কলুষিত জগতে বাস করিয়াও অলৌকিক ক্রিয়া কলাপে জগদ্বাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন—বিমল আনন্দে সময়াতিপাত করিতে পারেন। ইতিহাস ও জীবন-চরিতে এ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই—আমরা পুনঃ পুনঃ তাহা পাঠের উপযোগিতা বর্ণন করিতেছি।

মানব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াই পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচয়ের একটা না একটার আদর্শের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। অবশ্য জীবনভরা এক আদর্শের ভিত্তির উপর তাহার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে না সত্য, তথাপি আদর্শের তারতম্য অনুসারে চরিত্রও তদনুযায়ী গঠিত হইতে থাকে। উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন পথে চলিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রটাও তদ্রূপ মহৎ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে। এটা নিশ্চয় যে, চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ পুস্তক পাঠের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এ সংসারে চরিত্র এক অমূল্য রত্ন। ইহা স্পর্শমণি। মানব ইহার গুণে ধরাতলে অবিনশ্বর যশোরাশি উপার্জ্জন করিয়া যাইতে পারেন—প্রত্যেক মানবের হৃদয়-রাজ্যের রাজা হইয়া নিরন্তর পূজা লাভ করিতে পারেন—আবার ইহার অপব্যবহারে নরকের দ্বারও উদ্ঘাটন করিতে পারেন। যেমন উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত বারিধি-গর্ভে অর্ণব-পোতাদি নিমগ্ন হইলে, নাবিক জীবন-বয়ার সাহায্যে ভাসিতে থাকেন, তদ্রূপ এ সংসার-সাগরের বিপদাপদ প লহরী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জীবনরূপতরী মগ্ন হওয়ার উপক্রম হইলে,

মানব এক মাত্র চরিত্ররূপ জীবনবন্যার সাহায্যে প্রাণধারণে সমর্থ হন। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব প্রভৃতি সাংসারিক বিপত্তি সমূহ সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে পথ-ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার হৃদয় এক অজেয় দুর্গ বিশেষ। অতএব দেখা যাইতেছে—"চরিত্র পরম মিত্র পবিত্র ভূষণ"। এখন চরিত্র কিসে উন্নত হয়? উচ্চ আদর্শের ধ্যানে। সে আদর্শলাভ ঘটে কোথায়? জীবন চরিত ও ইতিহাস অনুসন্ধানে।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্ম ধর্মের উদ্ভাবক রামমোহন রায়, ভারতীর বরপুত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহাঁদের চরিত্রে বর্ত্তমানে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার রচিত "আমার জীবন" গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'নর-নারায়ণ' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।* বাস্তবিক তিনি সে নামের যোগ্য। তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিলে এ নামের সার্থকতা প্রাণে প্রাণে বেশ উপলব্ধি করা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রকার নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে অকাতরে অকিঞ্চন ব্যক্তিদিগকে অর্থদান করিয়াছেন সামান্য গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া স্বোপার্জ্জিত অসীম ঐশ্বর্য্যের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া—আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার প্রদর্শন না করিয়া যেরূপ দানশীলতা, দয়াশীলতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অনন্য সাধারণ ও সর্ব্বাংশে অনুকরণীয়। পরের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করিয়া তাহা দূর করা হৃদয়বান্ ও ধার্ম্মিকের কর্ম্ম। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত থাকা পর্য্যন্ত এ দৃষ্টান্ত প্রোজ্জ্বলভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিলে নিতান্ত পাষণ্ড—নির্দ্দয়ের প্রাণেও একবার কোমলতা—দয়া আসিবে। রাস্তার ধারে পড়িয়া মুমূর্ষু অবস্থায় কোন পীড়িত ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার নাম, ধাম, জাতি ইত্যাদির বিষয় কিছুই না জানিয়া যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণপণে তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন—তাহা দেবতা ভিন্ন মানুষে কখনই সম্ভবে না। হায়! আমরা এই সকল কর্ম্মবীর মহাপুরুষদের পুণ্যময়—পবিত্রতাময় জীবন-বৃত্তের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে—জানি না কি আকর্ষণে—বাহ্য চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া কত সওদাগরের বস্তাপচা মালের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত! কাঞ্চনের আদর ত্যাগ করিয়া কাচখণ্ড আহরণে নিরত! তাইতে ত আমরা এত দিন কেবলই অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম—হীন আদর্শের উপরে আস্থা

স্থাপন করিয়া ঘোর নিরয়ের পথ পরিষ্কার করিতেছিলাম—কিন্তু ভাগ্যে দিন ফিরিয়াছে—জানি না কোন মঙ্গল-মুহূর্ত্তে বাঙ্গালীর মস্তকোপরি বিধাতার শুভ আশীষ্ বর্ষিত হইয়াছে—সমগ্র দেশের প্রাণের মাঝথেকে একটা স্পন্দন অনুভূত হইতেছে—সাত শত বৎসরের পরাধীন পদদলিত জাতি মাথা তুলিবার প্রয়াস পাইতেছে—বাঙ্গালীর অদৃষ্টাকাশে নবীন সূর্য্য নবীন আলোকে ধীরে ধীরে ফুটিতেছে—তাই স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মগণ এদিকে আর উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া কায়মনে ইতিহাসের অভাব পূরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এমন লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা নিজ দেশের বিষয় জানা দূরে থাকুক—নিজ গ্রামের এমন কি পিতামহ, প্রপিতামহাদির নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন। হায়রে বিড়ম্বনা! এই কারণেই এই দেশব্যাপী আন্দোলনের দিনেও অনেকে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"এ আন্দোলনটা কি? ইহাতে আমাদের স্বার্থ কি? কি জন্য আমরা এ আন্দোলনে যোগদান করিব?"—ইত্যাদি ইত্যাদি। হায়রে দেশ! ইতিহাসে অনভিজ্ঞতার ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থল নহে কি? জাতীয়-জীবন-সংগঠন বিষয়ে ইতিহাস এক প্রধান সাহায্যকারী। ইহা মানবকে অতীতের স্মৃতিতে মাতাইয়া তুলে—আপনার 'স্বত্ব' বাছিয়া লইতে শিক্ষা দেয়—'স্বাধীনতা' মহামন্ত্রে নিশ্চলপ্রাণে নব-উদ্দীপনের সঞ্চার করে। তখন জগতের সত্য ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আত্মসম্মান জ্ঞান জাগিয়া উঠে—অন্তরের মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া সেখানে নূতন আশার আলো ফুটিয়া উঠে!—জাতীয়-গৌরব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া নিতান্ত অসাড়-দেহেও নব-জীবনের সূচনা হইয়া থাকে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বর্ত্তমান আন্দোলনে মুসলমানকে হিন্দুর পক্ষে দেখা যাইতেছেনা কেন? মুসলমান ভ্রাতৃগণ কেন এ ক্ষেত্রে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন? শিক্ষার অপ্রসারণীয়তা নিবন্ধন ইতিহাসে অনভিজ্ঞতাই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? বাস্তবিক তাহাই। ভারতে হিন্দু মুসলমানের এক স্বার্থ! একের স্বার্থে আঘাত লাগিলে অন্যেরও তৎসঙ্গে ক্ষতি, ইহা স্থির নিশ্চয়। এমতাবস্থায়ও তাঁহারা নিজ ক্ষতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! আর আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা বলি কেন? ইহার কারণত হাতে হাতে—প্রমাণে ছিদ্র নাই।

সমাজে অল্প সংখ্যক লোকই সুশিক্ষিত, মার্জ্জিত-বুদ্ধি ও ন্যায় পরায়ণ হন। অধিকাংশই অশিক্ষিত—শ্রমজীবী। আমাদের দেশে এই সকল লোক ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক উদর পূর্ত্তিকরাটাকেই মানব-জীবনের মহান্ কর্ত্তব্য ও চরম-উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে। ইহারা ভাবে যে.—"তাহাদের জীবনের একটা মূল্য কি? তাহাদের দ্বারা সমাজের—দেশের কোনই উপকার হইবেনা।" এটা তাহাদের একটা মস্ত ভ্রম। ভ্রম হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। ইহারা স্বপ্নেও একদিন দেশের বিষয় ভাবেনা—দেশের অবস্থা জানিতে চাহে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক্ অবগত হওয়ার এবং জাতীয়-জীবন গঠনের এক প্রকৃষ্ট উপায় 'ইতিহাসাধ্যয়ন'। ইহারা সেই নানা তথ্য-পূর্ণ, ভূমণ্ডলের বৃত্তান্ত-সম্বলিত অতীতের সাক্ষীস্বরূপ ইতিহাসের ধারই ধারেনা। কাজেই দেশের বিষয় আমরণ অন্ধ থাকে। ইহাদিগকে প্রকৃত-পথে আনিবার জন্য ইহাদের নয়নের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য দেশের অবস্থা বিষয়ে চক্ষু ফুটাইবার জন্য—প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষীর যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। সে উদ্দেশ্য কিসে সিদ্ধ হয়? আমরা যতদূর সম্ভব বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই ধারণা জন্মিয়াছে যে,—'শিক্ষার বিস্তৃতিতে'। ইতিহাস ও জীবন চরিত ইত্যাদির সম্যক্ আলোচনায়।

বস্তুতঃ একাধারে বীরত্ব, সাহস, ন্যায় পরায়ণতা, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, দেশের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্মবলিদান, স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এক ইতিহাস ও জীবন চরিত ভিন্ন অন্যত্র পাইবার যো নাই। পাঠ করিতে করিতে প্রাণে কেমন একটা তেজস্বিতা—কেমন একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে! স্বাধীনতার দিকে প্রাণটা কেমন ভাবে ছুটিয়া যায়! ইতিহাস ও জীবন-বৃত্ত-বর্ণিত আদর্শ চরিত্র গুলির প্রতি প্রাণ মন একেবারে ঝুঁকিয়া পড়ে।

ভারত-বাসী-প্রভৃতিগণ! বর্ত্তমানে আমরা ভারতের প্রতি বিধাতার যে ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে আমাদের ইতিহাস-পাঠের আবশ্যকতা পদে পদে। পাশ্চাত্য-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়; কেবল ইতিহাস পাঠ করিয়া অনেকে শৌর্য্যে-বীর্য্যে, যশঃ প্রতিপত্তিতে ভূমণ্ডলে প্রথিতনামা হইয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা ফ্রান্সের সম্রাট বীর-কেশরী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, আমেরিকার স্বাধীনতা-পতাকা-স্থাপন কর্ত্তা জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া

মনে করি। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল মহাপুরুষ অনেক আছেন। তন্মধ্যে বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্য, বর্ত্তমান যুগে লেপ্টেনাণ্ট সুরেশ বিশ্বাসের নাম উল্লেখ-যোগ্য। রাজপুতদিগের মধ্যেও অনেকেই 'চারণ'গণের স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক সঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ ও প্রমত্ত হইয়া—চারণ-মুখে আপনার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের বীরত্ব কাহিনী অবগত হইয়া—স্বদেশের মঙ্গল-কামনায় আজীবন বহুবার শত্রু-সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎ-পদ হন নাই। প্রতাপ সিংহ, রাজসিংহ ইহার জাজ্জল্যমান উদাহরণ।

দেশের প্রতি—সমগ্র বাঙ্গালী-জাতির প্রতি আমার যে একটা কর্ত্তব্য আছে—যাহার অপূর্ণতায় আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রকাশ পায়—সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি আমার দেশবাসী ভাই সকলের নিকট কাতরে প্রার্থনা করিতেছি—"আপনারা দেশের এ দুর্দ্দিনে মঙ্গলময়ের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ইতিহাস ও জীবন-চরিতের আলোচনা করুন। বর্ত্তমানে বঙ্গ-সাহিত্যের সার্থকতা—এ মহান্ সাধনার সিদ্ধি সেই খানে।

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

তুমিই আমার।

ধীরে ধীরে ধীরে স্মৃতির কবাট,
খুলিয়ে কে তুমি ভুবন মোহিনী;
মানস নয়নে উদিলে আমার
জাগিল হৃদয়ে অতীত কাহিনী।
চিনি চিনি যেন হেন মনে পড়ে,
প্রীতি মাখা এযে চেনা মুখ খানি;
তুমি কি খেলিতে হেলিতে দুলিতে
বলিতে অহো কি সুধাময় বাণী!
হেরেছি অবধি কি যেন আবেগে
কি যেন আকাঙ্ক্ষা জাগিছে পরাণে;
কত কি যে মনে পড়িল আসিয়ে,
কি প্রেম-মাধুরী ও বিধুবয়ানে।

অন্তরের ভ্রম যবনিকা মোর,
ধীরে সরি এবে গেছে একধার;
এসো বসো অই হৃদয়-আসনে
জানিলাম আজ—"তুমিই আমার"।
তুমিই কাননে তুলি ফুল-দাম,
খেলিতে একাকী হাসিতে কখন
কি প্রেম-মিশ্রিত সে হাসিটী তব,
উজ্জ্বলে মধুরে অপূর্ব্ব-মিলন!
কত যে আনন্দে ভাসিত হৃদয়,
লেখনীর মুখে কি বলাব আর;
জানি আমি তাহা—জানে 'সেইজন'
এ জীবনে শুধু—'তুমিই আমার'।

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

আমার স্বপ্ন।

চিরদিনই আমি সুখের বড় ভিখারী। 'সুখ' 'সুখ' বলিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া বেড়াই, কিন্তু কি আমার অদৃষ্ট-দোষ, এ পর্য্যন্ত সুখের দেখা পাইলাম না। কি হইলে, কাহাকে পাইলে, কোথায় গেলে সুখী হওয়া যায়, আমাকে কেহ দয়া করিয়া এ কথাটা একদিন বলিয়া দিল না। বরং কাহারও কাছে এ বিষয়ে কথা পড়িলে, আমাকে তৎক্ষণাৎ উপহাসিত হইতে হয়। ভারি বিপদ! একদিন একজন বয়োবৃদ্ধের কাছে কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়টাও উত্থাপন করিলাম। বৃদ্ধটী আমার কথা শুনিয়া বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া নানা প্রকার মুখ-ভঙ্গী করতঃ উত্তর করিলেন,—"আরে ভাই, তোমাদেরত আশা উমেদ আছে, বাঁচিয়া থাকিলে জীবনে সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু আমরা দেখ এখন বুড়ো হ'য়ে গেছি—কোন্ দিন এ জীর্ণ দেহ ধ্বসিয়া যাইবে তাহার নিশ্চয় কি? বলিতে কি,—আমি এ বয়সে চারিটি বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু এক দিনের তরেও সুখী হইতে পারিলাম না। তিন স্ত্রী মারা গিয়াছে, শেষে যাহাকে গৃহলক্ষ্মী রূপে বরণ করিয়া গৃহে আনিলাম, তিনিত আমার ত্রিসীমানায়ও পদার্পণ করিতে রাজী নন—কাজেই এ বৃদ্ধ বয়সে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! কত মতে মন যোগাইবার চেষ্টা করিলাম,—আমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল"—ইত্যাদি ইত্যাদি।" এ ভাবে অনেক দিন অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কথা শুনিয়া কাহাকেও বড় সুখী বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। আমার বড় খেদ রহিয়া গেল! এ দিকে যৌবনও অস্তগামী দিবাকরের ন্যায় ধীরে ধীরে আমার এ দেহরূপ আকাশ হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিয়া দেখা দিতেছেন। আর ক'দিন পরে এ দেহ-রাজ্যে তাহারই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনারা পাঁচ জনে একবার বিচারটা করিয়াই দেখুন না কেন—এ আমার আক্ষেপের বিষয় কিনা? জীবনে সুখী হইতে পারিলাম না, এ আগুণ হৃদয়ে লইয়াই বোধ হয় আমাকে জীবন কালটা অতিবাহন করিতে হইবে,—ইহাপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। প্রাণের ভিতর তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল—কত ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া নাচিয়া খেলিয়া আবার লয় পাইতে লাগিল—কিন্তু আমার ঈপ্সিত বিষয়ের কোনই

মীমাংসা হইল না। অবশেষে গৃহত্যাগ করাই আমার বিবেচনায় শ্রেয়স্কর বোধ হইল। আমার যেই কথা সেই কাজ—বিশেষতঃ সুখের জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত! গৃহত ত্যাগ করিলাম,—কিন্তু যাই কোথায়? এ আবার বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। মনে মনে স্থির করিলাম যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইব, পোড়া মানুষের নিকট আর মুখ দেখাইব না—কোন নির্জ্জন অরণ্য-প্রদেশে যাইয়া একাকী সেখানে বাস করিব। মনে এইরূপ ভাবিয়াই ক্রমশঃ হিমালয়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পর্ব্বতের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এমন সময় একদিন একটি অতীত কালের সাক্ষী স্বরূপ—আজ কালকার বংশাভিমানী কুলীন-কুল-ধুরন্ধরের ন্যায় প্রাচীন বট-বৃক্ষের নীচে তৃণ-শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিয়া আছি। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। পশু, পক্ষী সমস্তই নীরব। কেবল প্রকৃতির এ গভীর নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণের পক্ষ-সঞ্চালন ও অস্ফুট-শব্দ শ্রুত হইতেছে। পথ-শ্রান্তি বশতঃ শয়ন করিবা মাত্রই নিদ্রাদেবী আমাকে তাঁহার সুকোমল ক্রোড়ে স্থানদান করিলেন। বোধ হয়, দুঃখীর প্রতি—শ্রান্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ-বাহুল্যটা কিছু অধিক। যাহাই হউক—আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রা গাঢ়তর হইলে, আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন কোন্ অজানা রাজ্যের এক সুবিশাল সুন্দর অট্টালিকাময় পুরীতে উপনীত হউয়াছি। সেখানের অনিন্দ্য-সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত চাকচিক্যময় অট্টালিকা সমূহ ও অন্যান্য পদার্থ দর্শনে আমার নয়ন ঝলসিয়া গেল। আমি প্রাণে প্রাণে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। আমার প্রাণের মধ্য দিয়া সুখের একটা লহরী বহিয়া গেল। হৃদয় কিয়ৎক্ষণের জন্য কি জানি কি নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় তখন আমার অতৃপ্ত সুখের নেশা কতটুকু বাড়িয়াছিল তাহা সহজেই অনু-মেয়। এ সকল অভাবনীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সংঘটন দর্শন করিয়া আমার হৃদয় নিহিত আশা উত্তরোত্তর বলবতী হইয়া উঠিল। ভাবিলাম এ আবার কোথায় আসিয়াছি? আমি সংশয়াকুল চিত্তে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের বর্ত্তমান অবস্থাটা পর্য্যালোচনা করিতেছি—এমন সময় দেখিতে পাইলাম, মনোহর সাজসজ্জা মণ্ডিত এক দল মানব সেই অপূর্ব্ব দর্শন পুরী হইতে আমার দিকে সহাস্য বদনে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে প্রথমে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না—বড় লোক—কি জানি কি ভাবে? তাই

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গলার সুরটা একটু নরম করিয়া অপেক্ষাকৃত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়গণ, অধীনের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আপনারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় গিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে সে সম্বন্ধে একটু জানিতে দেন—তাহা হইলে বড় কৃতার্থ হই। আপনাদের আকার প্রকার, চাল-চলন দেখিয়া মনে হইতেছে,—আপনারা বড় লোক হইবেন।" কিন্তু কেহই আমার এ কথাটার উত্তর দেওয়া একটা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না—ফিরিয়াও বারেক চাহিলেন না। বরং যে ভাবে হেলিয়া দুলিয়া গজেন্দ্র গমনে চলিতেছিলেন আমার কথা শুনিয়া গতিটা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বাড়াইয়া নিলেন। আমি হতভম্ব হইয়া চাতকের ন্যায় তাহাদের কৃপা-বিন্দু লাভাশায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। এবং পোড়া অদৃষ্টকে অন্তরে অন্তরে অসংখ্য তিরস্কার করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে এক জন অনেক দূর যাইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভিতরে যাও, সমস্তই জানিতে পারিবে।" আমি এবার এক বিষম-সমস্যায় পড়িলাম। এত বড় বাড়ীর ভিতরে একাকী কিরূপে প্রবেশ করি! যাহা হউক, অবশেষে কোনরূপ সাহসে বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবা মাত্র যাহা দেখিলাম,—তাহাতে আমার ভয়ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলাম,—পরমা রূপবতী সহাস্যবদনা এক যুবতী আমার প্রতি বিলোল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। তাঁহার দেহে যৌবনের পূর্ণ বিকাশ—ভাদ্রের নদী কূলে কূলে ভরা! মুহূর্ত্তের জন্য আমি আত্ম বিস্মৃত হইয়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরী প্রতিমার দিক্ হইতে নয়ন ফিরাইয়া লইলাম। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অনুভব করিলাম কে যেন আমার স্কন্ধে কুসুম-কোমল হস্তার্পণ করিল। ফিরিয়া চাহিলাম,—দেখিলাম আমার সম্মুখে সেই রূপ-লাবণ্যময়ী সর্ব্বাভরণ ভূষিতা দেবী মূর্ত্তি হাস্যমুখে আলুলায়িত কুন্তলে দাঁড়াইয়া। আমার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। রমণী বলিলেন,—"ভয় কি? এখানে ভয়ের কোনও কারণ নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, এখানে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

রমণীর কথা শুনিয়া আমার মৃতপ্রাণে যেন নূতন বল আসিল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে? আপনাকে দেখিয়া অবধি আমি যথার্থই ভীত হইয়া পড়িয়াছি।" রমণী ভুবন-ভুলান হাসি হাসিয়া আমার প্রতি একটী কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"হায়রে কপাল!

আমাকে তুমি চেন না। আমি 'বিলাসিতা'। আমি ইচ্ছা করিলে সকলকে নিত্য নূতন সুখে সুখী করিতে পারি। এখানে সুখ বিক্রয় হয়। এই যে এই মাত্র এক দল মনুষ্য ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছ—উহারা সুখ খরিদ্দার ও আমার উপাসক। আমিই ইহাদের সুখের বিধান করিয়া দিই। ইহারা সততই সুখী। আমার উপদেশ মতে চলিলে তুমিও সে সুখ-লাভে সমর্থ হইতে পার।" বরাবর আমি সুখের কাঙ্গাল—আমার সাক্ষাতে সুখের কথা—আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। রমণীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলাম—"দেবি, আমার প্রাণের আশা তাহাই। এবং সেই জন্যই আমি সংসার সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বিজন বনে আসিয়াছি। যদি অধীন জানিয়া কৃপা করিয়াছেন, তবে বলিয়া দেন, কোথায় গেলে আমি সে সুখের সাক্ষাৎ পাইতে পারিব।"

রমণী পূর্ব্বাপেক্ষা হাসির মাত্রা একটু চড়াইয়া—যেন হাসিতে অমৃত ছড়াইয়া দিয়া রমণী-সুলভ কোমল-কণ্ঠে বলিলেন,—"তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না, ঘরে বসিয়াই তুমি সুখলাভে সমর্থ হইবে। আমি আজ তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিব তাহা প্রাণান্তেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না এবং কাহারও কথা না শুনিয়া সর্ব্ববিধ বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তদনুসারে চলিবে। দেখিও যেন কাহারও কোন কুপরামর্শে পড়িয়া কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হও—তাহা হইলে তোমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। দেখিবে, কত কুলোক তোমাকে বিপথে চালাইবার জন্য কত ফাঁদ পাতিতেছে—কত আশার কথা বলিতেছে—সাবধান, তুমি তাহাতে কখনও ভুলিও না—সে সব চাটুকারের কথায় কর্ণপাতও করিও না।" এই বলিয়া রমণী আমাকে নিকটে ডাকিয়া নিয়া কাণে কাণে একটী কথা বলিয়া দিলেন। কথাটী শ্রবণ করিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর যেন পুলকে শিহরিয়া উঠিল। আমি স্থান-কাল-বিস্মৃত হইয়া কোন এক অজানা সুখের ভাবী আশায় আশ্বস্ত হইয়া উঠিলাম। কথাটী আমার কর্ণে তখন যেন অমৃত সিঞ্চন করিল নয়ন সমীপে যেন সুখের মধুময়ী ছবি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এতদিনে আমার আশা পূর্ণ হইল। সেই দিনেই দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক আমি আবার স্বীয় আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমি একজন নাতিক্ষুদ্র সম্পত্তিশালী। নূতন আশা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় পথশ্রান্তি আমাকে ব্যথিত করিতে সমর্থ হয় নাই।" হৃষ্টচিত্তে

বাড়ী ফিরিয়াই আমি সেই রমণীর উপদেশানুসারে চলিতে লাগিলাম। কত বয়োবৃদ্ধ লোক—আমার কত আত্মীয় সুহৃদ্—আমাকে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতে আসিতেন—কিন্তু আমি কারও কথা না মানিয়া অব্যাহত ভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নূতন রমণীয় গৃহ, নূতন নাট্যশালা, নূতন বাগানবাড়ী, নূতন সাজসজ্জা, পবন প্রতিযোগী অশ্ব সমস্তই নূতন করিয়া করিতে লাগিলাম। আমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আমি কিছু দিন প্রাণে বড় শান্তি লাভ করিতে লাগিলাম। কিন্তু এভাবে যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার অজ্ঞাতসারে ঋণ-ভার ততই বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি কিন্তু তখনও সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার এ মত্ততা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। সময় বুঝিয়া মহাজনগণ একে একে টাকার জন্য 'গরম তাগাদা' দিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাই এতদিনে আমার চমক ভাঙ্গিল। হায়রে কি করিয়াছি! নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়োল মারিয়াছি! ভাবিলাম,—অলীক সুখের জন্য অজ্ঞাতসারে ঘোর সন্তা-পের—দারুণ দুঃখের পথ পরিষ্কার করিতেছিলাম, প্রাণ প্রাণের মাঝে বসিয়া গেল—এখন উপায় কি? এদিকে প্রত্যহই মহাজনেরা আসিয়া টাকার জন্য আমাকে জ্বালাতন করিয়া ফেলে—আমার গৃহে থাকা দায় হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিলাম,—আর না—আর সুখ চাই না—কিছুই চাই না—এবার জীবনের মত গৃহত্যাগ করিলাম। আর এ ঝঞ্ঝাটময় সংসারে থাকা নয়। মনে মনে এই ভাবিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম। পথে যাইতে যাইতে একবার মনে এ চিন্তা জাগিল—সেই রূপসী যুবতীর সহিত একবার দেখা করিতে হইবে। হয়ত তিনি ইচ্ছা করিলে এখনও আমাকে এ ঘোর দুর্দ্দশার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন। আবার সেই অট্টালিকাময় পুরীতে উপনীত হইয়া দেখি-লাম—বহির্দ্বারে আমার পূর্ব্ব পরিচিত মানবের দল নৈরাশ্যের হাহাকারে—দুঃখের হৃদয়ভেদি আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহারা আমারই মত দুঃখী। দুঃখী দেখিলে দুঃখীর কথা কহিতে জোর হয়—কেন না, দুঃখের মর্ম্ম দুঃখী সবিশেষ জানে। আমি তাহাদের নিকট সেই রমণীর কথা জানিতে চাহিলাম এবং আমার বর্ত্তমান আন্তরিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। তাহারা আমাকে বলিল—"আর সে রমণীর নিকট গেলে কিছুই হইবে না। এখন আর সে রমণী রমণী নাই। দানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছে। আমরা আমাদের

অবস্থা জানাইয়া তাহার প্রতীকারের উপায় জানিতে চাহিলে, রমণী উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বিকট মুখ-ভঙ্গী করতঃ বলিল—"আর এখানে কেন? যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলে, তেমন ফল ভোগ কর। এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও—আমাকে অনর্থক বিরক্ত করিও না। রমণীর প্রত্যুত্তরে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আমরা মাথায় হাত দিয়া এখানে বসিয়া পড়িয়াছি—কি করি, কোথায় যাই? আমি তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলাম,—"মহাশয়গণ, আর এখানে বসিয়া থাকিয়া 'হাহতোস্মি' রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলে কি হইবে? চলুন যাই, কোন নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া সকলে এই দুঃখ-তাপ-ক্লিষ্ট যন্ত্রণাময় পাপ জীবনের অবসান করি। কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়, আমাদের ভাগ্যে তাহাই এখন ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।" সকলেই আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া উঠিলেন। পথে এক জন প্রাচীন পুরুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের এই দুর্দ্দশার কাহিনী অবগত হইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে—মৃদুভাষে আমাদিগকে বলিলেন,—"বৎসগণ! তোমরা আমাকে জান না। তাই কুহকিনীর মায়াকুহকে ভুলিয়া জীবনটা অসার, অকর্ম্মণ্য ও বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলিয়াছ। আমি 'পরিশ্রম'।" আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনিও প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"যৌবনে বিলাসিতার প্রলোভনে মজিয়া অনেকেরই এ দশা ঘটিয়া থাকে। আমি চিরকালই এ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আসিতেছি। তোমরা বোধ হয় অবগত আছ, এই বিলাসিতার কবলে পড়িয়াই—তাহার আশু তৃপ্তিকর সুখের আশায় প্রমত্ত হইয়াই—প্রাচীন যুগে যদুবংশ ধ্বংস-মুখে নিপতিত হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলরামও তাহাদিগকে সে ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভারতের ইতিহাসে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। দেখ, প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল-সম্রাট দর্পের অবতার সিরাজদ্দৌলা জীবনে সর্ব্বদা বিলাস-ব্যসনে ব্যাপৃত থাকিয়া মোগল সাম্রাজ্য তরণী অকালে কাল-সমরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। বিলাসিতা আপাত সুখকর প্রলোভনে মানবকে মুগ্ধ করিয়া আপনার বশীভূত করিয়া লয়। মানব তখন তাহারই ইঙ্গিত মতে যথেচ্ছা পরিচালিত হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের পথে আসিয়া উপনীত হয়। দেখ, আমার উপদেশ মতে চলিয়া—আমার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শৌর্য্য-বীর্য্যে, ধন-বৃদ্ধিতে, যশঃ প্রতিপত্তিতে ইউরোপ আজ কত উন্নত অতএব তোমরাও

আবার সংসারে প্রবেশ কর—হতাশ না হইয়া দ্বিগুণ উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাতে অবিচলিত ভাবে নিরত থাক—ভাগ্য আবার ফিরিবে—অন্ধকারে আবার আলোকের রেখা প্রতিভাত হইবে। বর্ত্তমানে ভারতের যে দশা—তাহাতে অক্লান্ত পরিশ্রম ভিন্ন উন্নতি-মার্গে উড্ডীন হইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। শিল্পকার্য্যে, ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া ভারতমাতার এ দৈন্য মোচন কর। নতুবা ভারত-মাতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেওয়া তোমাদের ঘোর নির্লজ্জতার পরিচায়ক হইবে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই বাক্যের সার্থকতা নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত করিয়া জগদীশ্বরকে দেখাও।"

আমরা বৃদ্ধকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া আবার সংসারের কর্ম্ম বিভাগে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য চলিলাম।

* * * *

জাগ্রতাবস্থায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখি, আমি আমার বৈঠকখানা গৃহে শয্যায় শায়িত। প্রাচীদিক্ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিনদেব ধীরে ধীরে সোণার মুখ জগতকে দেখাইতেছেন। বাতায়ন পথে তাহার হৈম কিরণ আমার মুখ চোক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পাখিরা সুমধুর তানে প্রভাতী গান ধরিয়াছে। প্রাভাতিক সমীরণ নানা সুগন্ধযুক্ত ফুলের সৌরভ বহিয়া আনিয়া আমার নাসারন্ধ্রে ছড়াইয়া দিতেছে। মুখ ফিরাইবামাত্র দেখিলাম, দাসী মুখ প্রক্ষালনের জল লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত। তখন রাত্রির সমস্ত বৃত্তান্ত একে একে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম,—আমার এ স্বপ্ন ফলিবে কি? অই প্রভাত রবির মতন ভারতের ভাগ্য গগনে সুখ-সূর্য্য পুনঃ উদিত হইবে কি?

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

প্রার্থনা।

নয়ন-রঞ্জন
সাধের সংসারে,
অন্তর আমার মুগধ নয়;
স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে,
গভীর নিশায়—
দহে দুঃখ-বহ্নি পরাণ-ময়।
সুখের প্রভাতে
বিহগ-সুতান
ঢালেনা পরাণে অমিয়া-রাশি;
জোছনা-তরঙ্গে
ভাসে যবে ধরা,
আমিত কখন যাইনা ভাসি।
নীলিম-গগনে
নক্ষত্র-নিচয়,
বিমল-আলোকে পুলকে ধরা;
পাপিয়ার গান
বাজে হেন কাণে,
বিদ্রূপের বাণ বিষাদ-ভরা।
অশান্তির ছবি
হেরি চারিদিকে,
কি যেন হারায়ে সংসার-মাঝে;
আছি শূন্য প্রাণে,
আছি মাত্র শুধু,
বিপুল অভাবে উন্মত্ত সাজে।

মনে হয় কভু
নাহি অবসান,
মম ভাগ্যে এই দুঃখের নিশি;
এমনি করিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে,
অনন্তের কোলে যাইব মিশি।
এমনি করিয়া
বাঞ্ছিতের ধ্যানে,
রত আছি সারা জীবনময়;
ফলিবে কি স্বপ্ন
ঘুচিবে কি দুঃখ
মিটিবে প্রাণের কামনাচয়?
আবার বাজিবে
নীরব নিকুঞ্জে,
দিগন্ত মোহিয়া মোহন বাঁশি;
অলস পরাণ
পেয়ে নব সাড়া,
জাগিবে আবার ফুটিবে হাসি।
হরিহে দীনের
কামনা বাসনা,
এভবে সকলি হয়েছে হত;
একটি কামনা
পূরাও এবার,
পোড়া মনে আর পুড়িবে কত?

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

মাঘে দৃশ্য। *

(১)

সুখের পৌষ মাস শেষ হইয়াছে ; কিন্তু বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত, তুমুল হাসি-স্রোতের পর অধরকোণে ক্ষীণ হাসি রেখার মত,—এখনও পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে পৌষের পিঠা পুলী উৎসব চলিতেছে। সে উৎসবও নিতান্ত সামান্য নহে।

চলিত কথায় বলে 'মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে'। পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষক-গণের সহরবাসী ধনীদের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ নাই, তথাপি পল্লীবাসীগণ নিরানন্দ নহে, বেলা ৮টা বাজিলেও অলসভাবে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে পারে না। ভোর হইলেই বালক বালিকাগণ উঠিয়া দলবদ্ধ হইয়া কুটীর-প্রাঙ্গনে খড়কুটা, লতাপাতা, জোগাড় করিয়া, আগুণ ধরাইয়া তাহার নিকট বসিয়া মনের আনন্দে হাসিতেছে—গাহিতেছে আর আগুণ পোহাইতেছে। সামান্য একখানি 'দোলাই' গায়ে দিয়াই তাহারা এ ভীষণ শীত হাসিমুখে সহ্য করি-তেছে। কোন কোন বালক সূর্য্যদেবের কিরণ পাইলে শীত ভাঙ্গিবে সেই আশায়, সূর্য্যদেবের প্রকাশ হইবার দেরী দেখিয়া ছড়া গাইয়া সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতেছে,—

"সূয্যি মামা' সূয্যি মামা রোদ কর,
তোর ভাগ্নে শীতে মলো রোদ কর !'

সূর্য্যদেব যেন বালকদের কাতর আহ্বান আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাই তিনি হাসিতে হাসিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী কুহেলিকা রাশিকে সরাইয়া, অন্ধকার-রূপ গাত্র-আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে হাসিতে কিরণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য-কিরণ চঞ্চল বালিকাটির মত ছুটিয়া আসিয়া কুটীর শিখরে, গাছের মাথায়, পরে লতাপাতায় চড়িয়া কত খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল। বালকগণও আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

বালকগণ বেশীক্ষণ অলসভাবে থাকিবার নয়. তাহাদের রোদ পোহান একটু পরেই শেষ হইল। তাহারা গায়ের দোলাই ফেলিয়া দিয়া মাঠের দিকে দলে দলে চলিল। সদানন্দ বালকগণের হাসি দেখিয়া সূর্য্যদেবও হাসিতে হাসিতে তাহাদের মুখে, কপালে সোণারবরণ ফলাইতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা করে,—

* এই প্রবন্ধ প্রকাশে বিলম্ব হইল। তজ্জন্য লেখকই ষোল আনা দায়ী।

প্রভাত আলোক পুলকে আসিয়া
ললাটে তাদের যায় টিকা দিয়া
তাদের বদন চুম্বন করিয়া
আশীষিছে উৰ্দ্ধকরে,
শিশুদল মিলি হাততালি দিয়া
চলিছে মাঠেতে নাচিয়া গাহিয়া
পুলকিত প্রাণ, গাহে তারা গান
'জয় জগদীশ হরে'।
প্রকৃতি মায়েকে তাদের ডাকেছে

মাঠের দিকে চাহিয়া দেখ! প্রকৃতি দেবী সরলচিত্ত পল্লীবালকগণের জন্য নূতন শস্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দিকে দিকে হরিৎ বর্ণের ছোলার ক্ষেত, পীত বর্ণের ফুলে মাঠ শোভা করিয়াছে। বালকগণ ক্ষেতে বসিয়া কোঁচর পুরিয়া ছোলার ফল তুলিতেছে, আর মনের আনন্দে পেট পুরিয়া খাইতেছে, ছোলার ফল বড় মন্দ মুখ রোচক নহে। সহরেও এক পয়সায় সামান্য একটী একটী গাছ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি।

এইরূপ বালকগণ সমস্ত দিন মাঠেতে নাচিয়া গাহিয়া, ছোলার ফল ফুল খাইয়া কখনও বা দাণ্ডাগুলি, হাডু ডু ডু খেলিয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইল, সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া পাটে বসিলে পরে তাহারা ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসে।

মাঘ মাস হইতেই প্রকৃতিদেবী পল্লীবাসীর নূতন ফলের জন্য আয়োজন করিতেছেন। দিকে দিকে চাহিয়া দেখ! আমের গাছ সকল মুকুল ধারণ করিয়া নবীন বেশ ধারণ করিতেছে। কবি গাহিয়াছেন,—

"ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে।"

সেটা মাঘ মাসেও খাটে; কারণ মাঘ মাসেই আমের মুকুল ফুটিয়া, দিকে দিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া পল্লীবাসীর মনে বিমলানন্দ ঢালিয়া দেয়। আমের বিষয় পল্লীগ্রামে একটী প্রচলিত সময় নির্দ্ধারণ আছে, যথা—

'মাঘেতে বোল ফাল্গুনে গুটি,
চৈত্রে কাটিকুটি বৈশাখে ঝোল কুটি,
জ্যৈষ্ঠেতে আঁটি চুষি।'

অগ্ন হইতেই পল্লীবালকগণ তাহাদের দিদিমা পিসীমার নিকট শ্লোক শুনিতে বসিয়াছে। সে শ্লোক শুনার আগ্রহই বা কেমন! তাহারা দিদিমার হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতেছে,—"এক নির্ব্বাসিত রাজপুত্র গভীর বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক সুরঙ্গ দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই সুরঙ্গ দিয়া পাতাল পুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রকাণ্ড এক সাতমহল অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য এত বড় রাজপুরীর মধ্যে কোথাও একটী জনপ্রাণী নাই। রাজপুত্র নিঃসহায় অবস্থায় ভীত-ত্রস্তপাদ বিক্ষেপে সেই পুরী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সমস্ত কক্ষ লোক শূন্য, শেষে একটী অতি প্রশস্ত কক্ষে দেখিলেন,—দেখিলেন কি! একটী বহুমূল্য সোণার খাটে,হিরা,চুণি,পান্নার ঝালরযুক্ত মশারী খাটাইয়া, একটী দেবতার মত মেয়ে ফুটফুটে সুন্দরী শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য বালিকা নিদ্রিতা—মূর্চ্ছিতা—না মৃতা! নতুবা এত ডাকাডাকিতেও কথা নাই কেন?—ইতিমধ্যে আকাশের গায় মেঘের সঞ্চার হইল, প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল; হঠাৎ এমন হইল কেন? দেখিতে দেখিতে 'হাঁই, মাই খাঁই' করিতে করিতে ভীষণ-দর্শন রাক্ষসের দলের সেখানে আগমন—তাহাদের শাল বৃক্ষের মত বিশাল হস্ত দ্বারা রাজপুত্রকে জড়াইয়া ধরিতে গমন,—"শুনিয়া বালকদের দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হইল! বক্ষের স্পন্দন রুদ্ধ হইল! রাজপুত্রের আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়া তাহাদের দেহ পাষাণবৎ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনিল, আশ্চর্য্য উপায়ে রাজপুত্র সেই দলকে হত্যা করিয়া সেই দেব কন্যার মত রূপসী রাজকন্যাকে লাভ করিল,—তাহা কি অপূর্ব্ব মোহময় মিলনানন্দ! শুনিয়া বালকগণ আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিয়া বসিয়া আবার একটী বলিবার জন্য বায়না করিতেছে। তাহাদের জ্ঞান নাই যে, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর কি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইতেছে।

সহরবাসী সাহিত্য সেবীগণ! যদিও তোমাদের কৃপায় আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে নূতন নূতন ধরণের, খ্রীষ্টানী ধরণের, মারামারি বাটপারী ধরণের গল্পের অভাব নাই; কিন্তু তথাপি তোমরা লক্ষ্য করনা যে, বাঙ্গালা

দেশের প্রাণের সামগ্রী, বাঙ্গালার জলবায়ু ও বাঙ্গলার মাটীর মত আমাদের বাল্য জীবন পুষ্ট ও শৈশবে আমাদের অন্তঃকরণে এক আদর্শ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে; সেই সকল রূপকথা বা কাহিনী, কত মধুময়—কত শিশু-হৃদয়ের নব জাগ্রত কল্পনাকে মুখরিত ও অপূর্ব্ব পুলকালোকে সুরঞ্জিত করিয়াছে। এখন তাহাদের প্রতি অগ্রাহ্য করায় আমাদের যে কতদূর ক্ষতি হইতেছে তাহা একটু ভাবিবার বিষয়। দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের অযত্ন-বিক্ষিপ্ত, অশ্রদ্ধায় লুপ্তপ্রায় বঙ্গদেশের উপকথা, রূপকথা ও ছড়াগুলির প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। সুখের বিষয় এখন অনেকের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মাঘমাসের শেষেই বসন্তের অগ্রদূত কোকিল কুহু কুহু ডাক ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আর সহরের বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত নিষ্কর্ম্মা যুবতীগণ দ্বিপ্রহরে নভেল পড়িতে পড়িতে সেই কুহু কুহু রব শুনিয়া, হুহু হুহু করিয়া বিরহ ব্যথা অসহ্য ভাবিতেছে ও নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইতেছে। আর সে সময় পল্লীভামিনীগণ কাজের জ্বালায় ব্যস্ত হইয়া কোকিলের ডাক লক্ষ্যও করিতে পারিতেছে না। যদি কেহ বা দ্বিপ্রহরে সংসার কার্য্য হইতে একটু অবসর পাইয়াছে সে কুটীরে বসিয়া মহাভারত অথবা চণ্ডীপাঠ করিতেছে। আমরা এবার এখানেই "মাঘে দৃশ্য" শেষ করিলাম। আশা আছে মধ্যে মধ্যে এইরূপ মাসিক দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের সামগ্রী রূপকথা বা কাহিনী পাঠকগণকে শুনাইব।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

পুরাতন ও নূতন।

১। দিবসের শেষ আলো ঝিকিমিকি জ্বলে'—
চলিয়া পড়িছে ওই দিগন্তের কোলে।
সন্ধ্যাও আসিছে লয়ে আঁধার অঞ্চল;
নীড়েতে ফিরিছে সব পাখী সমাকুল।
পুরান বরষও আজ ম্লান মৃদু ভাবে,
অতীতের গর্ভে ধীরে ডুবিতেছে সবে।
যাও তবে পুরাতন, অতীতের কোলে।
নূতন বরষ এসো নব আলো জ্বেলে।

২। নবীন ভাবে, এস আজি নব বরষ,
আনগো সাথে নবীন জীবন হরষ।
আননে তব প্রীতি, উছলে যেন গো হাসি,
স্বরগ অমিয় পায় যেন বঙ্গবাসী।
অনশন ক্লেশ ও করাল ব্যাধি যত,
হাসিমুখে কর সব, চরণে দলিত।
দেব! দাস যাচে ভিক্ষা, এই নব শুভ দিনে,
হিংসা-দ্বেষ, যেন নাহি পায় স্থান মনে।
নবীন ভাবে এস গো নবীন বরষ;
আনগো সাথে, নব জীবন ও হরষ।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

বৃথা গরব।

সুস্রোতা তটিনী নাচিয়া নাচিয়া,
জলধি পুলিনে যেতেছে মিশিয়া,
তৃণ আদিলতা ভাসমান পাতা
হাসিয়া নাচিয়া যেতেছে ডুবিয়া।

কোথা যায় চলি! কে জানে কারণ,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মানব-মণ্ডন
আসে চলি যায়, জানিতে না পায়
ঐহিক মদেতে থাকে অনুক্ষণ।

"কেবা হয় বন্ধু, সম্পদ কাহার?
ভাই, ভগ্নী মম, আমারি সংসার
কিনহে আমার?" না ভাবি একবার
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কি আছে আমার।

শোক তাপ ক্লেশে হই হত-আশা,
সম্পদেতে শান্তি প্রণয়ে পিয়াসা,
আত্ম-সুখতরে, ফিরি স্তরে স্তরে
সবই যেন আমি আমারি এ বাসা।

নাহি মনে ভাবি আমি ক্ষুদ্র অতি
"বিশ্বময় আমি" বুঝেছি সম্প্রতি
"আমিত্বে" ডুবিয়া, আমিকে ভজিয়া,
উন্মত্ত সতত "আমারি" প্রতি।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ এ জগত
কোটী সূর্য্যে তায় করে প্রতিভাত
কোটী কোটী তারা এ নিখিল ভরা
সুপ্রচণ্ড গতি কি দূর সতত।

সে বিশাল পৃথ্বী পরমাণু কণা
জড়পিণ্ড মাত্র অন্য কিছু না,
নিমিষেতে লয়, পলকে উদয়,
চিন্তিলে নয়নে পলক আসেনা।

এ জগতী তলে আমি ক্ষুদ্রতম
অতি ক্ষুদ্র রেণু পরমাণু সম,
বিভু-সৃষ্ট জীব নিকৃষ্ট অতীব
এহেন বড়াই তবে কিসে মম।

শ্রীললিতরঞ্জন-সমদ্দার।

রমণী-রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুপুরের কথা।

রাম অক্ষয় বাবু বলিলেন, "হাটে যাহা ঘটিয়াছিল,—তাহা রামরূপ বাবুর নিকট শুনিয়াছি,—শাঁওতালনীসহ ব্রাহ্মণের নৌকা নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণও কি গোঁসাই?"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "না, তাহা নহে। ইহাও শাঁওতালনীর পাগলামি।—তাহাকে দেখিলেই লোকের ভয় হয়;—ব্রাহ্মণ নৌকা হইতে নামিয়া যাইবামাত্র সে তাহার ব্যাগ লুকাইয়া লইয়া কাচারিতে রাখিয়া নৌকায় ফিরিয়া আইল, তাহারপর মাঝিদিগকে ভয় দেখাইয়া নৌকা লইয়া একবারে আমার বাগান বাড়ীতে হাজির হয়। সেখানে আমার দেওয়ান তাহাদের ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দেয়। একটু মজা করিবার জন্যই জঙ্গলি এই কাজ করে। তাহার স্বভাবই এইরূপ, তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

রামঅক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে টাকা দিয়া ছিল কে?"

কুমার বলিলেন, "উহাকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া আমিই প্রথমবার তাহার নৌকায় নোট দিয়া আসি,—দ্বিতীয়বারও নিশা, আমার স্ত্রীর নিকট হইতে একটু লিখাইয়া লইয়া, গিয়াছিল,—সেই চিঠি ও নোট তাহার নৌকায় দিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম। কলিকাতায় রওনা হইবার সময় দেওয়ানকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি বাড়ী পৌঁছিবামাত্র যেন তাহাকে আমার নিজের নৌকায় তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়,—বরেন কেমন আছে আমি জানিতাম না, তাহাই তাহাকে যত শীঘ্র হয় কলিকাতায় পাঠাইতে বলিয়া আসিয়াছিলাম,—দেওয়ান যে তিনি পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে বিদায় করিবে, তাহা জানিতাম না।—তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, সরল-প্রকৃতি,—আমরা সর্ব্বদাই গোঁসাইয়ের ভয়ে ভীত, পাছে বদমাইস গোঁসাই তার নিকট হইতে আমাদের সকল কথা জানিয়া লয়, এই ভয়ে তাহাকে কোন কথা বলিতে, নিশাকে বিশেষ করিয়া—নিষেধ করিয়া আসিয়াছিলাম।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "আপনার আবার লাঠিয়ালের ব্যাপারটা কি ?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "গোঁসাই বনমালি রায়ের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া আমাদের নানা রূপ অনিষ্টের চেষ্টা পাইতেছিল,—অনেক মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়াছিল,—গোঁসাই সেই দিন লাঠিয়াল হইয়া উহাকে ব্রাহ্মণের নৌকা হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে বাহির হয়, কিন্তু বাবা সম্বাদ জানেন যে কে আমাদের রায় গ্রামের কাচারি ও হাট লুটিতে আসিতেছে,—তাহাই তিনিও লাঠিয়াল হইয়া বাহির হন, লাঠিয়ালগণ গোসাইয়ের কোন সম্বাদ না পাইয়া ফেরত আইসে,—কিন্তু পাছে সে অন্য কাচারি ও হাট লুট করে, বলিয়া বাবা সে দিন বাড়ী ফিরিতে পারেন না,—শুনিলেন গোঁসাই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "[illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] আপনাদের পারিবারিক কাহিনী;—ইহাতে মধুপুরের হত্যাকাণ্ডের কি হইতেছে,—আমাদের একজন ইন্‌স্পেক্টরকে গুলি করিয়াছে তাহারই বা কি হইতেছে!"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি কিছুতেই আপনার মন হইতে আমাদের উপর সন্দেহ যাইতেছে না।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "না যাইবার যথেষ্ট কারণ আছে।—মহাশয়দের জন্যই আমাকে এ পর্যন্ত রেল গাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইতে হইয়াছিল।"

"তাহাও আমরা জানি।"

"জানেন ?—দেখিতেছি আপনারা আমাদের চেয়েও ডিটেক্‌টিভ !"

"ঘটনাচক্রে পড়িলে সকলকেই হইতে হয়।—যখন জানিলাম যে মধুপুরের খুন, গোঁসাই আমাদের উপর চাপাইবার চেষ্টায় আছে, আর আপনার উপর অনুসন্ধানের ভার পড়ায় আপনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন —তখন পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমরা আত্ম রক্ষার জন্য আপনার উপর নজর রাখিতে বাধ্য হই,—যেদিন হইতে দিন-রাত্রি আমাদের লোক আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, এক মুহূর্ত্তও আপনাকে নজরের বাহিরে যাইতে দের নাই। আমরা সেদিন বদ্দিনাথে যাইতেছিলাম,—বর্দ্ধমানে টেলিগ্রাফ পাইলাম, আপনি আমাদের কিছু লইয়াছেন,—তখনই আমরা ভাবিলাম যে আপনিও সেই গাড়ীতে আছেন, তাহাই গোপনে একটা ছোট ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম,—ভাবিলাম পরের গাড়ীতে কারমাটারে নামিয়া পড়িব, তাহা হইলে আপনার হাত এড়াইতে পারিব।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন,—"আমাকে এত ভয় কেন ?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "খুনের মকদ্দমা,—পুলিশ যে মহা বিপদে আমাদের ফেলিতে পারে, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানিতাম। যাহা হউক পরের গাড়ীতে আমরা সেই ছোট ষ্টেশন হইতে উঠিলাম,—স্বয়ং কর্ত্তা যে সেই গাড়ীতে নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা আমরা জানিতাম না।"

এই বলিয়া কুমার বাহাদুর হাসিয়া উঠিলেন. বরেন্দ্র বাবু এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, তিনিও হাসিয়া বলিলেন, "কত বিপদেই এই হাঙ্গামায় পড়া গিয়াছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খুনী কে ?

কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"আমাদের লোক পাশের গাড়ীতে আপনার পাহারায় ছিল! আপনি আমাদের পিছু পিছু কারমাটারে নামিয়া পড়িলে সেও আপনার পিছু পিছু সেইখানে নামিয়া পড়ে। রামঅক্ষয় বাবু আপনি আপনার নানা ছদ্মবেশ সত্ত্বেও এক মিনিটের জন্য তাহার নজরের বাহিরে যাইতে পারেন নাই,—তাহার কাছেই আপনার সমস্ত খবর পাই।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "এই লোক যেই হউক,—সে পুলিশে প্রবেশ করিলে উন্নতি লাভ করিত। এখন অনুগ্রহ করিয়া মধুপুরের ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হউক।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "অনেক আগেই বোধ হয় সব কথা আপনাকে বলিতাম। তবে এত দিন আসল খবর পাই নাই,—তাহাই আপনাকে বলিতে সাহস করি নাই। আপনারা যেমন মধুপুরের খুনের তত্ত্ব লইতেছিলেন,—আমাদের উপর হইতে সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমরাও সেইরূপ সেই খুনের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

রামঅক্ষয় বাবু একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃতকার্য্য হইয়াছেন।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "রামঅক্ষয় বাবু আপনাকে হারাইয়াছি,—আপনি এত বড় ডিটেক্‌টিভ,—আপনি এই খুনের কিছুই করিতে পারেন নাই,—আমরা এই খুনের কিনারা করিয়াছি।"

"খুনি কে ?"

"গোড়া হইতে সবই বলিতেছি। আপ ি তো শুনিয়াছেন যে গোঁসাই সুখচাঁদকে জাল ছেলে সাজাইয়া—"

"সখিনা বলে,—ছেলে জাল নয়,—সত্যি।"

"তাহা হইতে পারে,—তাহাতে কিছু আসে যায় না,—তাহাকে ' পুত্র বানাইয়া শেষ রাণী বিন্ধ্যেশ্বরীর মেয়ে লক্ষ্মীর সহিত বিবাহ দিয়া বিষয়ও আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা পায়। রাণী তাহার জ্বালায়ই মধুপু' বাস করিতেছিলেন। যখন রাণী কিছুতেই বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন তখন গোঁসাই লক্ষ্মীকে চুরি করিয়া আনিয়া ছেলের সহিত বিবাহ দিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল,—যাহাতে সে ইহা করিতে না পারে, প্রধানতঃ সেই জন্যই রাণীর কাছে থাকিবার জন্য আমরা বৈদ্যনাথে ও কারমাঠায় বাস করিতে থাকি,—জঙ্গলী শাঁওতালনী শাঁওতালপরগণার সকলই জানে বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাণী বিন্ধ্যেশ্বরীর বাড়ীর পাহারায় রাখি,—সে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইত,—ডাইনী বলিয়া সকলেই তাহাকে ভয় করিত।"

"সেই তাহা হইলে খুনীকে তীর মারিয়াছিল।"

"সেটা ঠিক,—কিন্তু বট গাছে যে তীর বিদ্ধ ছিল,—সে তীর নয়,—বট গাছতলায় খুন আদৌ হয় নাই।"

"তাহা আমি অনুমান করিয়াছিলাম। একদিন একটা শাঁওতাল বালক তাহাকে বটগাছে একটা কাঠবিড়ালী মারিতে বলে,—তাহাই জঙ্গলি তীর ছুড়িয়াছিল,—কিন্তু কাঠবিড়ালীর গায়ে না লাগিয়া গাছ বিদ্ধ হয়। দারোগা যখন অনুসন্ধানে যায়,—তখন এই শাঁওতাল বালকই ডাইনীর তীর বলিয়াছিল।"

"তাহার পর কি হইল তাহাই অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

"যাহাতে কোনরূপে গোঁসাই রাণীর মেয়েকে চুরি করিতে না পারে,—বলা বাহুল্য আমরা সে বিষয়ে যাহা করা উচিত,—তাহার কিছুরই ত্রুটী করি নাই,—দারোগা বাবুকে হাত করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলাম,—কিন্তু এ সকল সত্বেও যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই রঙ্গিণীর কাছে শুনিয়াছেন।"

"হাঁ—তাহা হইলে কে খুন করিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই এই শাঁওতালনী দেখিয়াছিল।"

"দেখিয়াছিল বটে,—কিন্তু লোকটা কে তাহা বলিতে পারে নাই,—সে

যদি সেই দিনই সে কথা বলিতে পারিত,—তাহা হইলেই আমরা অনেক আগেই আপনাকে সংবাদ দিতাম।

"সে কি বলে?"

"সে বলে সে রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোকে ঘুরিতেছিল,—এই সময় গিরিধির রেলরাস্তার কাছে সে কতকগুলি লোক দেখিয়া সেই দিকে যায়,—রঙ্গিণীকে খুন করিতে উদ্যত হইলে, একটা লোক দুইজনকে গুলি করিল। সে দূরে ছিল,—সর্ব্বদাই তাহার কাছে তীর ধনুক থাকিত। লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িয়াছিল,—কিন্তু তাহার গায়ে বিঁধে নাই। সে যখন সেখানে উপস্থিত হইল,—তখন দেখিল সকলেই পলাইয়াছে। তাহার পর যাহা হইয়াছিল—তাহা রঙ্গিণী আপনাকে বলিয়াছে।"

"এই শাঁওতালনী খুনীর চেহারা কিরূপ বলে।"

"সে বলে সে লোকটার পেণ্টালুন, কোট পরা ছিল,—মাথায় টুপী ছিল কিনা ঠিক বলিতে পারে না।"

"বাঙ্গালি?"

"তাহাও ঠিক বলিতে পারে না,—কখনও বলে হাঁ বাঙ্গালি,—কখনও বলে হয়তো গোরা,—আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি সে আপনাদের—দারোগা।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি প্রকাণ্ড গাধা।

কুমার বাহাদুর যাহা বলিলেন, তাহাতে রামঅক্ষয় বাবু যথার্থই অতি বিস্ময়ে তাঁহার দিকে বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "বলেন কি?—আপনি কি পাগল হইয়াছেন?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আপনি এ কথা বলিবেন তাহা জানিতাম,—সেই জন্যই এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া কোন কথা আপনাকে বলি নাই। একটা পাগল শাঁওতালনীর কথায় নির্ভর করিয়া এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই;—এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি,—যখন ইহার নিকট অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি,—তখনই কেবল আপনার কাছে রঙ্গিণীকে পাঠাইয়াছিলাম।"

রামঅক্ষয় বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন, "সকল না শুনিলে কোন কথাই বলিতে পারিতেছি না। রুক্সিণীকে বাক্সে বন্ধ করিয়া এ ভাবে পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমরা জানিতাম যে গোঁসাইয়ের লোকেরা সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছিল—আরও দেখিলাম,—তাহারা আপনার বাড়ীর উপরও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছে,—আরও দেখিলাম যে সখিনা দুই তিন দিন আপনার বাড়ীর নিকট ঘুরিতেছে আমাদের অনিষ্ট করাই ইহাদের মতলব, তাহা আমরা জানিতাম,—কাজেই আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইল,—তখন ভাবিতে লাগিলাম যে কিরূপে আমরা আপনাকে সংবাদ দি!"

"আমার সঙ্গে আপনি দেখা করিতে পারিতেন।"

"পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি,—আমরা জানিতাম যে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন,—কিছু মনে করিবেন না, পুলিশকে সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না;—বিপদ ডাকিয়া আনা ভাল নয় বলিয়া আপনার সঙ্গে একেবারে দেখা করিতে সাহস করি নাই। জানিতাম ক্ষুদ্র রুক্সিণীর মুখে সকল কথা শুনিলে,—আপনার কতকটা বিশ্বাস হইবে। তাহাই তখন ভাবিতে লাগিলাম যে কিরূপে তাহাকে আপনার নিকট পাঠাই—"

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাহাই এই বাক্সের ব্যাপার?"

"কাজেই,—সর্ব্বদাই আপনার বাড়ীতে পাহারা,—তাহার পর কয়দিন হইতে সখিনা আপনার বাড়ীর কাছে ঘুরিতেছে—তাহারা কিছুতেই রুক্সিণীকে আপনার নিকট যাইতে দিত না,—বরং তাহাকে গুম করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইত;—এই জন্যই তাহাকে এই ভাবে পাঠাইতে হইয়াছিল।"

"মতলব খুব ভাল,—বিশ্বাস করি। তবে আমাদের ছদ্মবেশ ধরিলেন কিরূপে?"

"এটা কি বড় কঠিন,—আমরা জানিতাম আপনার চাকর ভিন্ন আপনি ও সুশীল বাবু ব্যতীত আর কেহই নাই,—সুতরাং যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী আপনার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহারা কে বুঝিতে কষ্ট পাইবার কারণ কি?"

"রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি কুমার বাহাদুর

আপনি পুলিশে কাজ করিলে একজন অদ্বিতীয় গোয়েন্দা হইতেন,—আপনাকে না পাইয়া পুলিশের বিশেষ লোকসান হইয়াছে।"

কুমার বাহাদুরও হাসিয়া বলিলেন, "বরেন কথা কহিতেছে না,—আপনার সঙ্গে কথা কহিবার ভার আমি লইয়াছি বলিয়া মনে করিবেন না যে আমিই সব করিয়াছি,—তাহা নহে,—অধিকাংশই বরেন্দ্র করিয়াছে।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "তাহা হইলে বরেন্দ্রবাবুর পুলিশে কাজ লওয়া উচিত। যাহাই হউক আপনাদের অসাধ্য কিছুই নাই। রঙ্গিণীকে আমার বাড়ী হইতে আবার উড়াইলেন কিরূপে?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "তাহা তাহার মুখেই শুনুন। আপনার বাড়ি পাহারা দিবার জন্য আপনার পাশের বাড়িটী অনেক টাকা দিয়া আমাদেরই ভাড়া করিতে হইয়াছিল।"

"আর আমি ইহার কিছুই জানি না।"

"সে দোষ আমাদের নয়;—বোধ হয় জানেন যে এই বাড়ীর ছাদ হইতে আপনার বাড়ীর ছাদে যাওয়া যায়,—তাহার পর মই দিয়া অনায়াসে আপনার বাড়ীতে নামিতে পারা যায়—"

"আর আপনারা তাহা হইলে আমার বাড়ী ছাদ দিয়া নামিয়া গিয়া সবই দেখিয়াছেন?"

"অগত্যা,—আপনি প্রায়ই এ বাড়ীতে থাকেন না,—আপনার চাকর মানুষ—সময়ে তাহাকেও ঘুমাইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং—সে সময়ে আপনার বাড়ী গিয়া সব দেখা স্বতঃসিদ্ধির নিয়ম নয় কি?

"দেখিতেছি আপনাদের কাছে আমি একটা প্রকাণ্ড গাধা—আর আমি বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছি যে আমার বাড়ীর কথা কেহই জানে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন বার্ত্তা।

কুমার বাহাদুর পূর্ব্ব হইতেই এক জন ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিয়া রঙ্গিণীকে তথায় পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন,—এই সময়ে সহাস্য-বদনে রঙ্গিণী তথায় উপস্থিত হইল। কুমার বাহাদুর ও বরেন্দ্র তাহাকে এতই আদর যত্নে রাখিয়াছিলেন যে সে তাহার দুঃখ কষ্ট সমস্তই ভুলিয়া গিয়া হাস্যমুখেই ছিল। সে

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এস রঙ্গিণী,—এইখানে বসো।"

"সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে কৌচের উপর বসিল,—কুমার বাহাদুর বলিলেন, "ইহাকে চেন ?"

রঙ্গিণী বিস্ফারিত-নয়নে রামঅক্ষয় বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এইতো সেই পুলিশের বাবু !"

রামঅক্ষয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এ মেয়েও বাহাদুর আছে ?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "রঙ্গিণী,—তুমি ইঁহার বাড়ী হইতে কেমন করিয়া পালাইয়াছিলে তাহাই ইঁহাকে বল।"

রঙ্গিণী বলিল, "কেন,—তোমরা আমায় যেমন যেমন বলিয়াছিলে,—ঠিক তেমনই তেমনই করেছিলাম।"

রামঅক্ষয় বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যেমন এঁরা তোমায় মুখস্থ করে দিয়েছিলেন,—ঠিক তেমনই তেমনই বলেছিলে—না ?"

রঙ্গিণী রামঅক্ষয় বাবুর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত-ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুমার হাসিয়া বলিলেন, "রামঅক্ষয়,—এখনও সন্দেহ থাকে,—ইঁহাকে জেরা করিতে পারেন। রঙ্গিণী,—এই বাবুকে তুমি যাহা যাহা বলিয়াছিলে,—তাহা কি আমরা তোমায় শিখাইয়া দিয়াছিলাম ?"

রঙ্গিণী বলিল, "শেখান কি ?"

"এই তুমি যে কথা বলেছিলে, তা সে না বানান কথা,—ঠিক কথা নয় ?"

"ঠিক কথা নয় ? আর তারা আমার মুখ বেঁধে নিয়ে আমার গলায় কাপড় বেঁধে মারছিল,—ডাইনী কি সব বলেনি !"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "আপনার এই ডাইনীকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—সে কোথায় ?"

"আপনিই তাহাকে দেখিতে চাহিবেন, তাহা আমরা জানিতাম,—তাহাই তাহাকেত এখানে আনিয়াছি,—এখনই ডাকিতেছি।"

কুমার বাহাদুর ভৃত্যকে ডাকিয়া শাঁওতালনীকে পাঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "এখন শোনা মাত্র,—তুমি আমার বাড়ী হতে পালিয়েছিলে কি করে।"

কুমার বলিলেন, "বল রঙ্গিণী।"

রঙ্গিণী বলিল, "কেন।—তোমরাই তো বলে দিয়েছিলে ? পাশের

বাড়ীতে তোমরা থাক্‌বে সুবিধা পেলেই আমি মই দিয়ে ছাদে উঠে। পাশের বাড়ীতে আস্‌ব,—আরও বলেছিলে যে এক জন সুন্দর মেয়ে মানুষ যদি সেখানে যায়,—তাহা হলে তখনই পালাতে ? যখন এই বাবু তার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন সেই সময় আমি পা টিপে টিপে বার হয়ে পালাই,—মই দিয়ে ছাদে গিয়ে পাশের বাড়ীতে আসি,—কেন,—আপনি সেখানে ছিলেন।"

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ইহা আমি অনুমান করিয়া ছিলাম,—আপনাদের এত সাবধান হইবার আবশ্যকও ছিল স্বীকার করি,—যাহারা আমার সুশীল বাবুরও লাঞ্ছনা করিতে পারে,—তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সাবধান হওয়া নিশ্চয়ই আবশ্যক।"

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীল বাবুর তাহারা কি করিয়াছিল ?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "সে কথাটা আর শুনিয়া কাজ নাই। এই বুঝি আপনার সাঁওতালনী;—অদ্ভুত-মূর্ত্তি নিশ্চয়ই !"

এই সময়ে জঙ্গলি সাঁওতালনী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল,—আমরা তাহাকে পূর্ব্বে রায়গ্রামের হাটে যেরূপ দেখিয়াছিলাম সেইরূপই আছে। সেই বেশ,—সেই ভাব তাহাকে দেখিলেই তাহাকে যে ডাইনী বলিয়া বোধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি !

রামঅক্ষয় বাবু বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "এ তো সম্পূর্ণ পাগল !"

রামঅক্ষয় বাবু এ কথা অতি মৃদু স্বরে বলিয়াছিলেন বটে,—কিন্তু তবুও তাহা ডাইনীর কর্ণে পৌঁছিল,—সে তাহার চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিল, "পাগল তোর বাপ !"

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ,—দোহাই তোমার ?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "জঙ্গলি, ইনি আমাদের লোক,—ইনিই সেই বদমাইশদের জেলে দেবেন,—সে রাত্রে কি হয়েছিল এঁকে বল।"

জঙ্গলি বলিল, "আর পাগল বলবে না। রামঅক্ষয় বাবু বলিয়া উঠিলেন. "কে তোমায় পাগল বলে,—এমন সাধ্য কার ?"

"এই মাত্র বলেছিস ?"

"অন্যায় বলেছি,—আর বলব না।"

"তবে শোন ?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জঙ্গলির ক্রোধ।

রামঅক্ষয় বাবু বোধ হয় জীবনে এরূপ স্ত্রীলোকের হস্তে পড়েন নাই,—তিনি হাসিতে লাগিলেন,—কুমার বাহাদুরও হাসিয়া বলিলেন, "কেমন রামঅক্ষয় বাবু, শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, "সহস্রবার।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, এখন জঙ্গলি কি বলে শুনুন—ইহাকে দেখিলে বোধ হয় এ কোন কথা বানাইয়া—সাজাইয়া বলিতে পারে?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "আদালতে ইহার কথা কতদূর গ্রাহ্য হয়,—তাহা বলা যায় না,—এখন শোনা যাক,—ইহার কি বলিবার আছে।"

কুমার বাহাদুর শাঁওতালনীকে অতি মিষ্ট-স্বরে বলিলেন, "জঙ্গলি,—এঁকে সব বল।"

জঙ্গলি একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল,—এই সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে ছিন্ন-মলিন-বসনা,—তৈল বিহীন উন্মুক্ত-কেশা জঙ্গলি উপবিষ্ট হইলে সে এক অপরূপ দৃশ্য হইল।

সে বলিল, "আমার নাম জঙ্গলি,—আমার মা বাপ কখন ছিল'না,—আমি ভিক্ষে করে খেতাম,—তারপর রাজা গিয়ে মধুপুর থেকে আমায় দেশে নিয়ে আসে,—সেই পর্য্যন্ত তার বাড়ী আছি—একে কোলে পিটে করে মানুষ করেছি,—এরা সব আমায় খুব ভালবাসে,—আমিও এদের জন্যে বুকের রক্ত দি।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "তারপর সে দিন রাত্রে কি দেখেছিলে তাই বল।"

শাঁওতালনী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বড় জ্বালাতন নয় বাপু,—সব বল্‌তে দেও।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বল,—আর কথা কহিব না।"

জঙ্গলি বলিল, "তোমরা না বদমাইসদের জব্দ করবার জন্যে মধুপুরে নিয়ে গিয়েছিলে,—আমি সেখানে গিয়ে বদমাইসদের জব্দ করবার জন্যে রাণীর বাড়ীর পাহারায় ছিলাম,—চারিদিক্ ঘুরে সেই বদমাইশদের সন্ধান করলাম,—জানইতো আমার রাত্রে ঘুম হয় না।"

রামঅক্ষয় বাবুর মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল,—"তা জানি!" এই

কপায় জঙ্গলি অভ্যস্ত চক্ষু রাঙ্গাইয়া তাঁহার দিকে চাহিল,—রামঅক্ষয় বাবু কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইলেন।

জঙ্গলি বলিল, "সে দিন আমি গিরিধি রেল পথের কাছে রাত্রে ঘুরচি,—এমন সময় দুর থেকে দেখ্‌লাম যে একটা গাছের গোড়ায় কতকগুলা লোক কি কচ্চে,—আমি সেই দিকে চল্লেম,—এমন সময় কে দুবার বন্দুক ছুড়ল, যে বন্দুক ছুড়লে,—তার দিকে আমি তীর ছুড়লাম,—তার গায় লাগল না,—আমি যখন গাছতলায় এলাম,—তখন তারা সব পালিয়েছে,—এই মেয়েটার গলায় কাপড় জড়ান রয়েছে—আমি তাকে সঙ্গে করে তোমাদের কাছে আন্‌লেম,—আর কি শুন্‌বে।"

রামঅক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে লোকটা গুলি করেছিল তাকে ভাল করে দেখেছিলে?"

"কেন দেখব না,—আমি তোর মত কানা নই।"

"কি পরা ছিল?"

"কোট আর ইজের,—গোরার মত।"

"গোরা নয়?"

"না—কাল।

"কোটের রংটা কি রকম—দেখেছিলে কি?"

"কেন দেখব না,—আমি তোর মত কানা?"

"রংটা কি রকম ছিল,—তাই শুনি।"

"প্যাঁকাটে—প্যাঁকাটে রংয়ের।"

কুমার বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, "থাকি।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে,—এখন ইহাদের যাইতে দিন।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"জঙ্গলি, আর কোন ভয় নেই, ইনি বদমাইশদের ধর্ত্তে পারবেন,—এখন তুমি যাও। রঙ্গিণী, তুমিও যাও, খেলা করগে?"

রঙ্গিণী ছুটিয়া পলাইল। রঙ্গিণী উঠিয়া রামঅক্ষয় বাবুর মুখের উপর দুই হাত অদ্ভুত-ভাবে দোলাইয়া বলিল, "ওগো আমার তুমি!"

তিন জনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—জঙ্গলি নানা ভাব ভঙ্গি করিতে করিতে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বারানসী।

ভূতলে অতুল-শোভা বারানসী ধাম
যাইলে যথায় হয় পূর্ণ মনস্কাম।
সংসারে তাপিত হলে
সংসারীর প্রাণজলে
জুড়ায় তখন গিয়ে আশা শান্তিমনে
চল মন হেরি গিয়ে বারানসী ধামে।

শুনিয়াছি সবে কয় বারানসী গেলে
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল মিলে।
কি অর্থ আসিবে কাজে
মৃত্তিকা বিকার সে যে?
কিছার সে অর্থ যদি পাই বারানসী
কেনবা চাহিব মুক্তি? সেত তাঁর দাসী।

ছিছি মুক্তি! বারানসি! মুক্তি তব
কাছে?
সুখ দুঃখ হীন মুক্তি কিবা সুখ আছে?
নির্গুণ জড়ের মত
এ মুক্তি সাংখ্যের মত (১)
এ মুক্তি লইয়া কেন বারানসী আশা
অবাচ্য সুখের তরে বারানসী আসা।

ধর্ম্ম তরে তবে মন বারানসী চল
যাহারে ধরিব সেই ধর্ম্ম তারে বল (২)

আর ফল চাহি কাম
যাহে পূর্ণ মনস্কাম
দুই ফল তরে তবে চল বারানসী
অন্য কলে কেন তবে হওরে প্রয়াসী?

স্রোতস্বতী মৃদুগতি বহিতেছে যথা
উথলিয়ে যায় কিবা মনোহরে তথা।
তাপিত শরীর যবে
স্পর্শেতে শীতল হবে
অবগাহি তাহে কবে প্রাণ
জুড়াইবে মন-জ্বালা কেমন?

বিশ্বেশ্বর পঞ্চানন ব মে
না রাখেন মন-দুঃখ কামে!
স্পর্শ করি সেই মূর্ত্তি
কবে জুড়াইবে আর্ত্তি
হায়রে সে দিন কিবা কবে বা হইবে
এ অভাগা ভালে কভু হেন দিন হবে!

অনন্ত-শরণ জনে গতি বারানসী
সতত দর্শন তরে তাই ভালবাসি।
আত্মীয় বান্ধব জনে
না চায় আমার পানে
অনাশ্রয় দেখি মোরে না করিও হেলে
ওগো বারানসী দেবি! রাখ পদতলে।

(১) সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা।
সাংখ্যদর্শনে ৫ অধ্যায়ে ১১৬ সূত্রং।

(২) ধর্ম্ম—(ধৃ+মন্) ধরতি লোকান্ ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মভিরিতি বা।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোললীলা-মহোৎসব।

শ্রীপাট কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণী সভাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ঠাকুরের শ্রীমন্দিরে এবারও পূর্ব্বমত মহা সমারোহে পরম কারুণিক শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোললীলা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস প্রত্যুষ হইতেই আনন্দ উৎসে আশ্রমের চারিদিক মুখরিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বপ্রথানুসারে পূজাভিষেকাদি ও মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণাদি নিমন্ত্রিত ভক্ত-মণ্ডলীর শ্রীপ্রভুর প্রসাদ ভোজন এবং তৎপরে দীন দরিদ্র প্রভৃতি সহস্রাধিক ব্যক্তিকে সমাদরে সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত করান হইয়াছিল। বিশেষতঃ নানা দেশীয় প্রভু সন্তানগণের শুভাগমনে উৎসবানন্দ আরও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

সেই অলৌকিক প্রতিভাশালী নিখিল জনগণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত-জীবন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ সংসার-দাবানল-দগ্ধ জগজ্জীবের শান্তি বিধানের নিমিত্ত উপদেশামৃত-ধারা বর্ষণ করেন। শুষ্ক ধর্ম্মের উত্তপ্ত সৈকত প্রান্তরে দয়াল প্রভু, ভক্তির স্নিগ্ধ-ধারা বর্ষণ করিলেন, আর অমনি তাহা শত শত ভক্তের প্রাণকে রসাইয়া গলাইয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় শক্তিলাভে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া তরতর বেগে প্রবাহিত করিল। সেই অমিয় শীতল ভক্তিপ্রভাবে জীব-জগতে দুঃখ দুর্ভোগ ক্রমশঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যে নিবিড় জলদের অপার করুণাধারা সম্পাতে এরূপ অভাবনীয় সুখশান্তির তরঙ্গ উঠিল—সেই ব্রজের জলদ-শ্যাম শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বিষয়ে স্বামীজি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শ্রবণে ভক্ত ও অভক্ত সকলেরই মন বিমোহিত হইয়া এই প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

তিনি বলিলেন,—দেহাত্মাভিমান অবগত হইলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত-শুদ্ধিতেই জ্ঞানের প্রসারতা এবং প্রসারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব সচ্চিদানন্দের অংশকণা। সুতরাং জীবের স্বরূপ নিত্য আনন্দময়। অবিদ্যার অজ্ঞানাবরণ জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়া জীব সংসারে বন্ধন জনিত দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু জ্ঞানের অনুশীলনে মুক্তি সহজে লাভ হইতে পারে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগ-সুখও সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু এরূপ সাধন-সহস্র দ্বারাও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ।

ভক্তি সুখনিষ্কাম; সুতরাং উপাধিশূন্য। কিন্তু মুক্তি স্বতন্ত্র কামনা বিশেষ, সুতরাং উপাধিবিশিষ্ট। অতএব মুক্তিসুখ উপাধিক সুখ। মুক্তি ভক্তিসুখকে আবৃত করে বলিয়া ভক্তগণ ইহাকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি কথামৃত শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন। তৎপরে "দোলযাত্রা" ব্যবস্থাটী * পবিত্র বেদমন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত ও বৈদিক সুরে পাঠ করতঃ বুঝাইয়া দেন।

আমরা সংসারে এত মজিয়া রহিয়াছি যে নিজের কিসে মঙ্গল হয় তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা যদি ক্ষণকালের জন্যও মনের মলিনতা দূর করিয়া, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি, তাহা হইলে সেই দীনদয়াল, পতিতপাবন, অনাথের নাথ নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। তাঁহার সেই কৃপার কণামাত্র লাভ করিতে পারিলে আমাদের দুঃখ মোচন হইবে। অতএব হে ভাই সকল, এস আমরা এই শুভদিনে দোল পূর্ণিমার দিনে আমরা যদি পবিত্র মনে ব্যাকুলতার সহিত আবার তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারি আবার সেইরূপ করিয়া তাঁহার মধুময় হরিনামের তরঙ্গ তুলিতে পারি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবেন। তখন আমাদিগের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে আমরা তাপিত প্রাণ শীতল করিতে সক্ষম হইব।

---

* তদিহব্যস্ত সমস্ত বচনৈরেকবাক্যতয়া ফাল্গুন পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ শেষ যাম গতায়া মুত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্তায়াম্বা দোলযাত্রা তদ্দিন এব সায়ং বহ্ন্যুৎসবং কুর্য্যাৎ চতুর্দ্দশ্যা ব্যাভেসায়মেব কুর্য্যাৎ ইতি দোলযাত্রা বিবেকঃ।

প্রাতঃসঙ্গব মধ্যাহ্নে দোলয়েত্ত দনন্তরং। তদনন্তরম্ অরুণোদয় কালভ্রষ্ট দোলারোহণানন্তরংন্তরম্ অরুণোদকাল এব দোলারোহণম্। এবঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাদিবচনেষু পৌর্ণমাস্যান্ অরুণোদয় কালপ্রাপ্ত দোলারোহাণানন্তরং তথা চ অরুণোদয় কাল এব দোলারোহণম্ এবঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড পুরানাদিবচনেষু পৌর্ণমাস্যান্ অরুণোদর কাল এব দোলারোহণাবধারণাৎ তত্র তদেব কর্ম্ম প্রধানম্ ইতি দোলযাত্রা তত্ত্বম্ দেব কর্ম্ম প্রধানম্ ইতি দোলযাত্রাতত্ত্বম্।

উপরি উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে অরুণোদয় দোল যাহাকে আমরা দেবদোল বলিয়া থাকি তাহাই দোলযাত্রার প্রধান কর্ম্ম। আর দেবদোল যে রাত্রির শেষভাগে হইবে সেই রাত্রির পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ সায়ংকালে চতুর্দ্দশী থাকুক আর নাই থাকুক বহ্ন্যুৎসব কর্ত্তব্য।

তাই বলিতেছি—ঐ আবার সেই মধুর ফাল্গুনে,—মধুর বসন্তে,—মধুর আকাশে,— মধুর পূর্ণচন্দ্রে ধরণীর পূর্ণ মাধুর্য্য। এ মাধুর্য্যে,—এ সৌন্দর্য্যে, জাগেরে কেবল চিত্তে,—মুহুর্মুহু উন্মাদ সঙ্গীতে ভক্ত কবির সেই মধুর গীতি,—

"মলয়জ পবন, পরশে পিক কুহরই,
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত, সবহু লতা তরু,
মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চুত, দূর ভেল ষটপদ,
সবদহি দেহল বাঢ়াই॥
চাতক পায়ে, কপোত শিখগুক,
দুহুঁজন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর বসন্ত, বিহঙ্গ সুখমুখ,
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥"

এব মধুমাসে কুসুম গন্ধময়, পূর্ণচন্দ্রে রজনী জ্যোৎস্নাময়, কুসুম রেণুকণে মলয় সৌরভময়, কুহুকুহু বোলে কোকিল কাকলীময়, গুণগুণ গুঞ্জনে ভ্রমর কেলিময়। বসন্তের এই পুলকিত জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মনে পড়ে না কি ভাই!

"ঐছে রজনী হেরে রসবতী রাই।
সহচরী সহ নিজ বেশ বানাই॥
তবহিঁ চলিল ধনী কালিন্দী তীর।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর॥
সখীগণ সহ তাঁহি মিলন কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান॥"

এমনই দিনে, বসন্তের এমনই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে, শ্রীবৃন্দাবন ধামে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন হইয়াছিল। এমনই দিনে, পূর্ণচন্দ্রের এমনই পূর্ণ মাধুর্য্যে, রাধা শ্যাম একাঙ্গে দোলমঞ্চে দুলিয়াছিলেন। ধরামাঝে সৌন্দর্য্য মিলনের এমন সুযোগ আর কি আছে? এমনই পুণ্য পবিত্রদিনে আমার রাধা-কৃষ্ণ একাঙ্গে ভক্তের হৃদয় মন্দিরে, আর বাহিরে দোলমঞ্চে দুলে দুলে নাচে ভাই।

তাই প্রাচীন ভক্ত কবি স্বপ্নসুখময় বীণার ঝঙ্কারে, নিত্য বসন্ত বিলাস বসন্ত রাগে, গাহিয়াছেন,—

"আওবরে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানুবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন মধূৎসব পিককুল রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীক রহু শিখর কোর॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥
সরোবর—সরসিজ শ্যাম লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিবহা॥"

এই বসন্তের দিনে ভক্তের স্মৃতিমাঝে এখন এই গীতি জাগিয়া উঠে। ভক্ত সিহরে! ভক্ত দেখে, হৃদয়ের দোলমঞ্চে রাধা-কৃষ্ণ,—বাহিরের দোল মঞ্চেও রাধাকৃষ্ণ। ভক্ত দেখ,—

"বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগু রঙ্গে আজি দুহুঁ হৈয়াছে বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারী;
শ্যাম নাগর—অঙ্গে দেওত ডারি,
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাই নিয়ড়ে ফাগুলেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে।
নাগর খেলহ রাইক সঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেহ করয়ে বিলাস॥"

রাধা শ্যাম মিলিল, জগৎ সৌন্দর্য্যে ভরিল। রাই আমার শ্যামের সঙ্গে ফাগ খেলিল, সখীরা রাধা-শ্যামকে ঘিরিয়া পিচকারী ভরিয়া ফাগগোলা জল রাধা শ্যামের অঙ্গে ডালিল। গোপীগণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য,—ফাগু—বিকিরণে উন্মত্তা। বৃন্দাবনময় ফাগলীলা। ফাগে ফাগে বৃন্দাবন লালে লাল। কবি গাহিয়াছেন,—

"মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ বনিতা ফাগু দেই শ্যাম—অঙ্গে॥

কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী—অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কুত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু সেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিলে গগনে।
বৃন্দাবন তরু-লতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পাণি।
গগন ভুবন দিগবিদিগ না জানি॥"

বৃন্দাবনের এমনই মধুর দোললীলা আজিও ভক্তের ঘরে অনুষ্ঠিত। বাঙ্গালায় আর সে দিন নাই, বাঙ্গালায় সে মানুষ নাই; কিন্তু এখনও বাঙ্গালায় ভক্ত হৃদয়ে অনুরাগ আছে। সে বাঙ্গালী আজিও রাধা-শ্যামের বিগ্রহ তেমনই করিয়া দোলমঞ্চে দোলাইয়া, তেমনই আবার কুঙ্কুম ছড়াইয়া তেমনই পিচকারী ছুড়িয়া, অনুরাগের তরুণ-অরুণ-কিরণ-ছটা ছড়াইয়া দেয়। ফাগই ত রজোগুণে অনুরাগ।

ভক্ত অন্তরে বাহিরে দেখেন,—

"দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলত সব সখীগণ বহুরঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহু জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুরূপ মরুছে অনঙ্গে॥"

যাহার যেমন অনুরাগ, তাহার তেমনই আনন্দ। যাহার অনুরাগ নাই, অনুকরণে তাহারও আনন্দ। একদিন ঘরে ঘরে অনুরাগ ছিল, প্রতি গৃহে দোলমঞ্চে রাধাশ্যাম দুলিতেন। এখন তেমন অনুরাগ দৃশ্য দেখি না বটে;—এখনও অনেকেরই ঘরে অনুকরণে বাহ্যানন্দ দেখি বটে; কিন্তু এমন দিন রবে না। পুনরায় ভক্ত অনুরাগে দেশময় কৃষ্ণপ্রেম জাগাইবে,—গৃহে গৃহে অনুরাগ বিলাইবে, আর দেখাইবে,—

"চাঁদের কিরণ মেখে শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ রেখে,
আমার রাই চাঁদ, শ্যাম চাঁদে দেখে,

এ দেখে ওকে, ও দেখে একে
দেখে দেখে চাঁদে চাঁদে মনসাধে মিশেছে।"

ভক্ত দেখ,—আজ দোলমঞ্চে যুগলরূপে রাধা-শ্যাম দেখ। ঐ মোহন মূর্ত্তি হৃদাকাশে দর্শন কর আর শুন আমার শ্যামের বাঁশরী কি বলিতেছে। বাঁশী বলে,—

"প্রেমে ডেকেছিস্ প্রেমে কেঁদেছিস্
প্রেমে পেয়েছিস্, আর ভুলিস্‌নেরে,—
প্রেমে যে ডেকেছে সেই পেয়েছে।"

প্রেমময় হরির এক অঙ্গ, কিন্তু দুইরূপ;—কভু শ্যাম কভু শ্যামা, কভু বনমালী, কভু কপালিনী; কভু অট্টহাস্যের বিকট রব, কভু মৃদুহাস্যের মধুরিমা; কভু প্রলয় হুঙ্কার, কভু মধুর মুরলীস্বর।

প্রভু হে! তোমার যেমন দুইরূপ,—দুই-ই তেমনি সুন্দর, দুই-ই নবজলধর অঙ্গ, স্থির বিজুরী তরঙ্গ। যেরূপে যখন প্রকাশ হও, তোমার সেই রূপেই 'মুগধা গোপকুঙারী'। খর্পর খাণ্ডা ধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, দৈত্যদলনীরূপে যখন অট্টঅট্ট হাস,—তখন তোমার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে মুগ্ধ; আর যখন বাঁকা হ'য়ে চরণে চরণ থুয়ে, অধরে মুরলী ল'য়ে মৃদুমন্দ হাস,—তখন তোমার মোহনরূপ দেখিয়া প্রেমানন্দে মুগ্ধ;—তোমার বংশীর ধ্বনিতে পূর্ণানন্দে আত্মহারা। তবেই বলিতেছি,—

"ভাবনা যাদৃশীযস্যসিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী,"—এই অমোঘ নীতিবাক্য এখন আবার এদেশের সহস্র সহস্র লোকের একমাত্র স্মরণীয় হইয়াছে। ইহাই শুভ লক্ষণ জানিতে হইবে।

হে শ্রীনন্দনন্দন শিখিপুচ্ছ রচিত চূড়া কর্ণযুগলে কর্ণিকারপুষ্প কনক সদৃশ কপিল বা নীল পীত মিশ্রিত রঙ্গের বস্ত্র এবং আবক্ষ প্রলম্বিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া জগন্মোহন সাজে সজ্জীভূত হইয়া এবং বদনাব্জ সুধায় বাঁশরীর সপ্তরন্ধ্র পূর্ণ করিতে করিতে তোমার সেই ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পরিশোভিত শ্রীপাদ চিহ্নাবলী দ্বারা আমাদের সকলেরই চিত্তে অত্যধিক আনন্দ প্রদান কর। হে দীন দয়ার্দ্র নাথ! মলিন জীবের প্রতি একবার করুণ কটাক্ষপাত কর। যাহাতে আমরা তোমার পবিত্র নাম লইয়া প্রেমভক্তিতে উন্মত্ত হইতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার কৃপা ভিন্ন জীব কখনই মলিনতা দূর করিয়া তোমার নিকট অগ্রসর হইতে পারিবে না। তুমি দয়া না করিলে আর কে করিবে।

তুমি অগতিরগতি, তুমিই কাঙ্গালের ঠাকুর। তুমিই ভিন্ন আমাদের আর কে আছে?

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

মাসিক সংবাদ।

ইসলাম রাজ্য তুরস্কে হঠাৎ এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তুরস্কের সুলতান মহামহিমান্বিত সম্রাট আবদুল হামিদ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, তুরুস্ক রাজ্যে গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে এমন অঘটনীয় ঘটনা ঘটে নাই, সমগ্র ইসলাম সমাজ এই সংবাদে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। প্রজাশক্তির নিকটে রাজশক্তি যে পরাজিত ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সে শিক্ষা দিয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই সমস্ত এসিয়াখণ্ডে প্রজাশক্তির প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইবে, সেদিন আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের কার্য্যাধিক্য হেতু অনেক দিন হইতে একজন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। অনেকেই আশা করিতেছেন যে ভারত সচিব উক্ত প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা হাইকোর্টে আর একজন অতিরিক্ত জজ নিয়োগ মঞ্জুর করিবেন, তাহা হইলে হাইকোর্টে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন জজ হইবেন।

গত ১৯০৮৯ সালের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, গত বর্ষে ভারতের সকল বন্দরেই আমদানী রপ্তানীর 'মন্দা' ছিল। আমদানীর কার্য্যে প্রায় আট কোটী টাকা কম পড়ে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যত টাকার মাল ভারতের বন্দরে আমদানী হইয়াছিল এবার তাহা অপেক্ষা আট কোটী টাকার কম মাল আমদানী হইয়াছে। রপ্তানীর কাজও অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। এ বৎসরও মোটের উপর ২৩ কোটী ৮৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মালের রপ্তানী কমিয়াছে। আমদানীর খাতে বিলাতে কাপড়ের প্রায় দেড় কোটী টাকা কমিয়াছে আর রপ্তানীর খাতে ধান্য ও তণ্ডুল প্রায় ৭২ লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছে, পাটের রপ্তানীও কম হইয়াছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

তুরুস্কের উন্নতি-প্রয়াসীরা, ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল হামিদকে রাজ-সিংহাসনচ্যুত করিয়া নূতন সুলতানকে বসাইয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষের কোন কোন মুসলমান সম্প্রদায় নব-সুলতানকে মুসলমান ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ভারতস্থিত তুরুস্ক দূত সে দিন জানাইয়াছেন যে, তুরুস্কের এই রাজ-পরিবর্ত্তন বিধি-সঙ্গত হইয়াছে, সুতরাং নূতন সুলতান অবশ্যই ধর্ম্ম রক্ষক হইবেন। দূতের কথায় সকলের সন্দেহ দূর হইয়াছে।

অনেক তর্ক-বিতণ্ডার পর লর্ড মর্লির সংশোধিত তৃতীয় ধারা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সংশোধিত সংস্কার এই, প্রাদেশিক কাউন্সিল বা মন্ত্রীসভা গঠনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বঙ্গদেশেই প্রদত্ত হইল। বঙ্গদেশ বলিতে এখন পশ্চিম বঙ্গ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক বোধ করিলে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতসচিবের নিকটে প্রেরণ করিবেন, সেখানে তাহা গৃহীত হইলে তৎপ্রদেশে কাউন্সিল গঠন হইতে পারিবে।

অবন্তীদেশে প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীর সন্নিকটে শিপ্রানদীতটে এবার কুম্ভমেলা বসিয়াছিল। গত ২২শে বৈশাখ শেষ স্নানের দিন ছিল, ঐ দিন প্রায় ছয় লক্ষ যাত্রী মেলায় মিলিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়রের মহারাজ সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রীগণের স্নানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ মোহান্তদিগকে শাল ও টাকা দান করিয়াছেন, মেলা এক মাস হইয়াছিল। মহারাজ প্রতিদিন ৪০ হাজার সাধুর সেবা করিয়াছিলেন। সাধুরা মহারাজের সেবায় পরিতৃপ্ত হইয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম-বেসিন আদালতে দুইজন ধনী চীনা মহকুমা মাজিষ্টার হলডে সাহেবকে ঘুষ দিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক আসামীর পাঁচশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে।

তিহারান সহরে সম্প্রতি এক সভা হইয়া ছিল। ঐ সভায় পারস্য শাহের প্রতিনিধি এবং রুষদূত ও ব্রিটিশ দূত উপস্থিত ছিলেন। রুষদূত ও ব্রিটিশ দূত সেদিন শাহের প্রতিনিধিকে বর্ত্তমানে শাহের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ-ছলে সকল কথাই বেশ বুঝাইয়া বলিয়াছেন, শেষ কথা এই—"শাহ যদি আমাদের এই ইতি-কর্ত্তব্যতার উপদেশ গ্রাহ্য না করেন—তাহা হইলে আমরা বুঝিব" অর্থাৎ রুষ আর ব্রিটিশ যেন তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন—"এখনও সাবধান, আমাদের পরামর্শ না শুনিলেই ঘোর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সুখের বিষয় পারস্যের শাহ মহম্মদ আলি রুষ এবং ব্রিটিশের উপদেশ মত কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। শাহ প্রকাশ্য ভাবে নূতন "শাসন প্রণালীর" ঘোষণা করিয়াছেন। তুরুস্কে নূতন-সুলতান—প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পারস্যে শাসন প্রণালীর নূতন সংস্কার।

বিলাতের পার্লামেণ্টে একশত ছচল্লিশ জন সভ্য বঙ্গদেশের নয়জন নির্ব্বাসিত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ সাহেব এই জবাব দিয়াছেন,—"ভারতে নির্ব্বাসনবিধি, শান্তি-সংস্থাপক দণ্ডজনক নহে। ঘোরতর অশান্তি হইতে রাজ্যরক্ষা করাই ঐ বিধির উদ্দেশ্য। নির্ব্বাসন সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচারক ভারত সেক্রেটরি লর্ড মর্লি ও ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহারা যে বিচার করিবেন তাহাতে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত।"

দেরাদুনের "ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউট" দেশেলাইয়ের কাঠী ও বাক্স প্রস্তুত করিবার উপযোগী কাষ্ঠের সন্ধান করিতেছেন। ভারতবর্ষের জঙ্গলে দেশেলাই প্রস্তুত করিবার উপযোগী কাষ্ঠের অভাব নাই। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। তাঁহাদের প্রেরিত পঁয়ত্রিশ প্রকার কাষ্ঠের নমুনা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পরীক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর তেষট্টি লক্ষ টাকার দেশেলাই আমদানী হয়। স্বদেশী দেশেলাই প্রস্তুতকারীরা কৃতকার্য্য হইলে মঙ্গলের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি?

গত ২৪শে বৈশাখ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ হইতে লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত প্রথম স্বদেশী যাত্রি-ষ্টিমার চলিয়াছে।

নববর্ষ।

আপনার মনে আপনার ভাবে
আজি ফুরাইল একটি বরষ!
কাহারো হৃদয়ে জাগায়ে বেদনা
কাহারো হৃদয়ে তুলিয়া হরষ।
বুক ভাঙ্গা শ্বাস কেহবা ফেলিছে
রহে কোন জন আমোদে মাতি,
চাহেনা বরষ কারো সুখে দুখে
চলে নিজ মনে দিবস রাতি।
পরে পরে পরে লহরে লহরে
কালের নিয়মে বরষ যায়।
কোন্ দূরদেশে অজানা অকূলে
কেবা তার কূল ভাবিয়া পায়!

এমনি করিয়া মানব জীবন
পরে পরে হায় ফুরায়ে যাবে
"আমার আমার" রহিবে কোথায়!
কালের বিষাণ সে গান গাবে।
নবীন বরষে ভগন হৃদয়
ভেঙ্গে যাবে কিনা কেমনে কই,
হাসি অশ্রুজল উভয় সমান
ভাঙ্গা বুক মোর জগত জয়ী!
আজি শুভদিনে থাক্ কথা থাক্
কেনগো মরমে রয়েছি মরি!
চাপি বুকে ব্যথা হরষ দেখায়ে
নবীন বরষে আরতি করি।

শ্রীমতী বিজনবালা বসু।

পুরুষ কি তুমি মেয়ে?

তোমারি কীর্ত্তি-মন্দির দ্বারে
এসেছি অনেক ঘুরি';
শ্রান্ত, ক্লান্ত, ভ্রান্ত মানস,
দাও তার দ্বিধা দুরি।
তুমিই দেখা'লে বিশ্ব অসীম,
তুমিই শুনালে গান;
তুমিই পিয়ালে মাতৃস্তন্য,
দিলে চন্দন ঘ্রাণ।
তুমিই চিনা'লে আপনার জন,
বাঁধিতে বলিলে ঘর;
তুমিই শিখা'লে প্রেমের মন্ত্র,
ভুলা'তে আপন পর।

তুমিই জ্বালিলে বিবেক-বহ্নি,
মানব হিয়ার মাঝে;
তুমিই লাগায়ে কর্ম্ম কুহক,
নিয়োগ করিলে কাজে!
বিশ্ব ব্যাপিয়া তোমারি কীর্ত্তি,
বিস্ময়ে আছি চেয়ে;
বুঝিতে দিলেনা লুকাইয়া থাকি'
পুরুষ কি তুমি মেয়ে!
তোমারি কীর্ত্তি-মন্দির দ্বারে,
এসেছি অনেক ঘুরি';
শ্রান্ত, ক্লান্ত, ভ্রান্ত মানস,
দাও তার দ্বিধা দুরি'!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি।

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস নয়; অথবা বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনাও নয়,—কারণ প্রথমতঃ আমার জ্ঞানের অভাব,—দ্বিতীয়তঃ সমালোচনা করিতে পারে, এমন শক্তি এই দীনের নাই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়, শিরোনামায় প্রকটিত হইয়াছে। আমার সাধ্যমত, আমি, বঙ্গভাষা কিরূপে শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে, কৈশোর হইতে বর্ত্তমান যৌবন-পদবী সমারূঢ়া হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার সক্ষমতা সম্বন্ধে, আমি নিজেই সন্দিহান। অতএব, ক্রটি দেখিলে গুণগ্রাহিগণ, মার্জ্জনা করিবেন।

"বঙ্গভাষা"—এই কথাটীর দুই বিভাগ। গদ্য ও পদ্য। কিন্তু পদ্য সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই;—গদ্যই আমাদের প্রধান আলোচ্য।

ঐতিহাসিকের চক্ষুতে দেড় শত বৎসরকাল নগণ্য। অথচ, এই সামান্য কাল মধ্যে বঙ্গীয় গদ্যের উৎপত্তি, প্রসার ও পরিণতি হইয়াছে। ভাষার এই অদ্ভুত উন্নতির কথা ভাবিবার বিষয়।

ইংরাজের নিকটে আমারা আমাদের গদ্য সাহিত্যের জন্য যথেষ্ট ঋণী। কারণ, তাঁহারা উৎসাহ না দিলে, হয় ত গদ্য সাহিত্য বলিয়া, আমাদের পৃথক্ একটা কিছু থাকিত না।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে, তখন ইংরাজেরা, দেশীয় পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে, বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের অধ্যয়নের নিমিত্ত, প্রথম বঙ্গীয় গদ্য পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হয়। গ্রন্থ দুইখানি, প্রকাশিত হয়। ১। প্রতাপাদিত্যচরিত; ২। প্রবোধচন্দ্রিকা। প্রথম খানির প্রণেতা ৺রামরাম বসু ও দ্বিতীয় খানির লেখক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার।

পুস্তক দুইখানির ভাষা, অতি কদর্য্য ছিল। তাহা সত্ত্বেও, প্রথম গদ্য লেখক বলিয়া উঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পুস্তক দুইখানির ভাষার নমুনা দিতেছি: "পূবে সিংহদ্বার পুরীর তিনভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশু রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উঠ তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক পশুগণ।" (৺রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত;—নিখিলবাবুর 'প্রতাপাদিত্য' দেখ)

"ইত্যবসরে তত্রস্থ এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন, "ওরে মূর্খ, কর্ম্মজড়, কূপমণ্ডূক, উড়ুম্বর, মশক, অনুপদেশ দুরাগ্রহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিস্ প্রভৃতি।" (৺মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত "প্রবোধচন্দ্রিকা"।)

এই দুই ভাষা, আজকালকার বটতলারও অধম। রামরাম বসু, ব্যাকরণে পণ্ডিত ছিলেন কি না, জানিনা; কিন্তু তিনি "সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ,"— "অনেক পশুগণ"—প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ব্যাকরণাভিজ্ঞতার প্রমাণ নহে। এই সময়ে রাজাবলী, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত হিতোপদেশ প্রভৃতি আরও কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের পরিচয় দিবার আর দরকার নাই কারণ, ঐ পুস্তকগুলির ভাষাও পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তক দ্বয়ের তুল্য।

ইহাই বঙ্গসাহিত্যের গদ্যবিভাগের প্রথম স্তর। এই স্তরের ভাষায়; কোথাও অতুল অনুপ্রাসের ঘটা, কোথাও বা গ্রাম্য শব্দ, কোথাও বা অনুস্বর বিসর্গ শূন্য সংস্কৃতের ছড়াছড়ি। যথা;—

"মলয়াচলানিল উচ্ছলকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

এই ভাষা পাঠকালীন জিহ্বার বেশ একটু ব্যায়াম হইয়া যাইত!

দুইখানি পুস্তকের ভাষা চয়ন করিয়া দিতেছি। "দ্বাপর যুগান্তে ভারত-বংশে অভিমন্যু-সন্ততি মহারাজা পরীক্ষিত সাধু, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রকারেতে শিষ্ট। এক দিবস মৃগয়াতে কার্য্যক্রমে অমাত্য ও সেনাগণের সঙ্গ হইতে ভিন্ন হইয়া, দৈবে দূর বন প্রবেশ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল না পাওনেতে বিব্রত জল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল, এক রম্যস্থল, কিন্তু জল নিকটের মধ্যে দেখেন না—প্রভৃতি"। (লিপিমালা)

"পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহৃত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন; এইরূপ প্রত্যহ হইতেছে, দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা, সকলেই রাজার প্রশংসা করে, দিনে দিনে রাজ্যের বৃদ্ধি এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে প্রভৃতি।" (কৃষ্ণচন্দ্র চরিত)

প্রথম প্রকাশিত "প্রতাপাদিত্য চরিত" হইতে এই শেষ দুই পুস্তকের ভাষা ও বর্ণনা প্রণালী অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুন্দর কিন্তু আশানুরূপ নয়।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথমেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে দেখিতে পাই। রামমোহন রায়ই বঙ্গভাষার আদি সংস্কারক। কিন্তু তাঁহার ভাষা, তর্কের ভাষা। তাহা দুর্ব্বোধ্য না হোক,—নীরস ছিল। যথা—

"নিবর্ত্তক যে শাস্ত্রানুসারে পতি-বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয়, সেই শাস্ত্রেই লিখেন, পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে, পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক প্রভৃতি।"

এই ভাষায় উত্তেজনা আছে, কিন্তু প্রাণ নাই।

প্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে সকল সাহিত্য-ছাত্রকে শিক্ষা বা উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন পরে, তাঁহারাই বঙ্গ-সাহিত্যের পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে কায়মনঃপ্রাণে ব্রতী হন।

গুপ্ত কবি পদ্য সাহিত্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ হইলেও, গদ্য রচনাতেও তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্যের ভাষা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। কেননা এই কালে নব নব নয়নবল্লভ পল্লব-মঞ্জরী-মণ্ডল মণ্ডিত নব নব সুচারু সুন্দর সুরভি-ফুল্ল ফুলদল প্রভৃতি।"

২। এই চিত্র চিত্র কোন চিত্রে কি চিত্র করিয়াছে? এ চিত্র, এ চিত্র কি চিত্র! অতি বিচিত্র। যিনি ইহার কারক' তাঁহার কি আশ্চর্য্য চিত্রশক্তি।"

এই ভাষা,—"মরি হায় হায়" শ্রেণীর!

৩। রে মন! পরমপুরুষের পবিত্র প্রেম পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নে রে; একবার নেরে; ওরে মন! ভূতনাথকে একবার দেখ্‌রে একবার দেখ্‌রে; মনরে মনরে, শোনরে শোনরে; ও মন! * * তাঁর প্রেমরস চাক রে, চাক রে চাক রে?

ইহা গুপ্তকবি প্রণীত একখানি বালকনাট্য পুস্তকের ভাষা। এই পুস্তক পাঠ করিয়া, বালকদের অতি উত্তম বিদ্যালাভ হইত, সন্দেহ নাই।

তৎকালীন গম্ভীর ভাবগর্ভ এক শ্রেণীর ভাষার পরিচয় গ্রহণ করুন। যথা,—চিত্তবৃত্তি অদৃষ্ট পদার্থ। যাহার দ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট যাবৎ পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি গো মহিষ্যাদিরো আছে, কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি কেবল আহার নিদ্রাদি বিষয়ে থাকে প্রভৃতি।"

বিনামেঘে বজ্রাঘাত বলিয়া যেমন একটা প্রবচন আছে, দিব্য ভাষায় সহসা ভয়ঙ্কর সমাস আড়ম্বর তখন উৎকৃষ্ট রচনা নীতির পরিচয়স্থল ছিল। যেমন, "সমভিব্যাহৃত"—"গো মহিষ্যাদিরো' প্রভৃতি।

তাহার পর তৃতীয় স্তর। ইহা সমধিক উল্লেখযোগ্য, অধিকন্তু উপভোগ্যও বটে। এই স্তরের রথীবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়

কুমারের নামদ্বয়ই অধিকতর প্রসিদ্ধ। আমরা ইঁহাদের দুই জনের রচনার পরিচয় প্রদান করিতেছি। বিধবা বিবাহ বিষয়ে উভয় লেখকের রচনার আস্বাদ গ্রহণ করুন, "যিনি দেখিয়াছেন যে সাধ্বী রমণী মাসদ্বয় পূর্ব্বে স্বামী সমাদরে মানিনী * * ছিলেন, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়-হীনা হইয়া দীনভাবে শীর্ণ-শরীরে সাশ্রু-নয়নে দিনপাত করিতেছেন * * তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?"

বিদ্যাসাগর বলিতেছেন,

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তান-গণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সান্তানগণেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।"

ইহাদের একটী কলনাদিনী, মন্থরগতি তরঙ্গিণী, অপরটি বর্ষাধারা-পুষ্টা তটপ্লাবিনী নদী। প্রথমটি লজ্জাবতী অর্দ্ধবিকশিত-লাবণ্য কিশোর—এবং দ্বিতীয়টি তরলিত-রত্নহারা যৌবনভার-নম্রা ষোড়শী। একটি স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরক এবং অপরটী পবন-করতাড়নে নৃত্যপরায়ণা বিকশিত কুমুদিনী। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের ভাষাগত বিভেদ এইরূপ।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষা, তদানীন্তন বিদ্বজ্জন-সমাজে সমাদর সহকারে গৃহীত হইত না।

"এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। "একি হ'য়েছে! এযে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে! এযে অনায়াসে বোঝা যায়!" (পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন।)

ভাষা যদি সরল ও সুবোধ্য হইত, তাহা হইলে, আর রক্ষা ছিল না। পণ্ডিতগণের চক্ষু "ছানাবড়াবৎ" হইয়া যাইত, এবং তাঁহারা চক্ষুর সম্মুখে "শর্ষেফুল" দেখিতেন;

উহার কিছুকাল পরের ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।

"পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময় এই বঙ্গদেশবাসী ব্যক্তিবৃন্দ, বঙ্গভাষানুশীলন-

বিষয়ে বিলক্ষণরূপে যত্নবান হইয়াছেন। অতএব আমরা বর্ত্তমান সময়কে জ্ঞান সময় বিবেচনা করিয়া "সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়" নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র প্রকাশ করণে স্থির সংকল্প হইয়াছি।" এই সময়ের ভাষা বেশ সরল।

আমরা ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের অন্ধতামসমগ্ন গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া, ভানুবিভা-দীপ্ত মুক্তালোক-প্রচুরা হাস্যময়ী মেদিনীতে পদার্পণ করিতে যাইতেছি।

এই দিবালোকে, আর সেই আঁধারে তুলনা হয় না।

এতদিন গদ্যেরই ভাষা পরিণতি লাভ করিতেছিল; কিন্তু অবসররঞ্জন গদ্যের প্রাদুর্ভাব তখনও হয় নাই। ৺প্যারিচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব মোচন করিলেন। "আলালের ঘরের দুলাল" নামধেয় আবাল বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত পুস্তক প্রণীত,—মুদ্রিত,—ও প্রচারিত হইল। ঐ পুস্তকের ভাষা যদিও তেমন সুরুচিসঙ্গত সুনির্ব্বাচিত ও সুগ্রথিত নয়,—তথাপি তাহাতে লেখকের মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্মজ্ঞান ও ছোট জিনিষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

অতঃপর এই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ও প্রতীচ্য প্রদেশের নব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, বঙ্গসাহিত্যের মহারথী আসিয়া সাহিত্য রঙ্গ-ক্ষেত্র মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হইল। সাহিত্যের গীত বিভিন্ন পথে ধাবিত হইল। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। গীত কতটা ফিরিল, তাহা দেখাইতেছি। আলালী ভাষা ও বঙ্কিমানুসৃত ভাষার রসাস্বাদন করিলেই তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে।

"রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে,—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া, পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। (আলালের ঘরের দুলাল—প্রাচীন সংস্করণ—২৯ পৃষ্ঠা) দুর্গেশনন্দিনীর স্বভাব বর্ণন দেখুন। "প্রান্তর পার হইতে না হইতে সূর্য্যাস্ত হইল। ক্রমে নৈশগগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইল যে

পান্থ কেবল বিদ্যুৎদীপ্তি প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।” (দুর্গেশনন্দিনী—প্রাচীন সংস্করণ ২য় পৃষ্ঠা) এই ভাষা তখনও সরল হয় নাই। যখন সরল হইল,—তখন কেমন প্রশান্ত ও সুন্দর ভাব ধারণ করিল দেখুন।

“তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রহে না। তুমি যে সমুদ্রে সাতার দাও না কেন,—জল নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না,—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে, তীরে বৃক্ষ তেমনই দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনই খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।” (চন্দ্রশেখর)।

আলালী ভাষা, অবশেষে মার্জ্জিত হইয়া, বঙ্কিমের ভাষা অবশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া, এমনই দাঁড়াইাছিল। মহাসাগরের সৈকতপ্রহত বজ্রনির্ঘোষী ফেনোর্ম্মিকীরিট-পরিবৃত ভীষণ তরঙ্গমালার সহিত, জাহ্নবীর মৃদুনাদিনী, দুকুলবাহিনী শ্বেতস্রোতের যেমন প্রভেদ এবং তরুণ অরুণ কিরণোদ্ভাষিত বিহগকূজিত প্রফুল্ল প্রভাতের সহিত, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগময়ী অন্ধতামসমগ্না বিভাবরীর যেমন পার্থক্য, বঙ্গসাহিত্যের বিগত ও গত যুগের সেইরূপ বিভেদ।

এখন নাটকের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বর্ত্তমান সন্দর্ভের উপসংহার করিব।

নাটকের ভাষাও পূর্ব্বে যৎপরোনাস্তি অসংস্কৃত, সমাসসমাকুল ও অবোধ্য ছিল। সেই ভাষায়, নাটক লিখিত চরিত্র সমূহের যথাবিহিত সৌন্দর্য্য প্রস্ফুট হইত না। নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, বারান্তরে “দৃশ্যকাব্য” শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টিত হইব। আপাতত, নাটকীয় ভাষার উন্নতি দেখাইতেছি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রই তাৎকালিক নাটক-রচয়িতা ছিলেন। প্রধানতঃ, বিগতযুগের দীনবন্ধু মিত্রের ও বর্ত্তমান যুগের শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাষার পরিচয় প্রদান করিলেই,—সেকাল এবং একালের নাটকীয় ভাষার রূপান্তর বোধগম্য হইবে। বিন্দুমাধব মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, “হে মাত ;—জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তন্য পানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া প্রভৃতি।” (নীলদর্পণ।) গিরিশচন্দ্রের ভাষা—

"আশ্চর্য্য! এই পৃথিবীর এমন শ্যামকান্তি—এই ফলে ফুলে সুশোভিত এই সূর্য্যের দীপ্তি এই চন্দ্র তারকার শোভা কিন্তু এ অপেক্ষায় আর নরক কোথায় সম্ভবে?" (হারানিধি।)

অন্যত্র :—

"এই যে আমার বাড়ীই জট্‌লা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ! দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো, দেখ, মর্ব্বার সময়ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ! আহা হা! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল!"—(প্রফুল্ল)

পূর্ব্বযুগের ভাষা যেমন জটিল ছিল, আধুনিক যুগের ভাষা তেমনি সরল হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের ভাষা,—অবশ্য, আমি গদ্যের কথা বলিতেছি,—অতি সুন্দর-ভাব প্রকাশিকা। তাঁহার ভাষার অন্যদিকে যাহাই থাকুক, এমন অল্পকথায় এত মহৎভাব প্রকাশিত করিতে, অতি অল্প ভাষাই পারে; এবং আমার বিবেচনায় উৎকৃষ্ট ভাবসত্তাই ভাষার প্রকৃত মনোহারিত্বের পরিচয়। সুনির্ব্বাচিত শব্দাবলীর যোজনে, ভাষা, শ্রবণ-সুখদায়িকা হয় বটে, কিন্তু তাহা ভাব প্রকাশ করিতে তত পারে না। গিরিশচন্দ্র, তেমন সুন্দর শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া, আপনার ভাষাকে সকল স্থানে সাজাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অল্পকথায় অধিকভাব ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তবে সকল স্থানে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন, এমন কথা বলি না। অসমর্থ যে, হন নাই,— এই নিবন্ধে উদ্ধৃত, "হারানিধি"র ভাষা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রবন্ধ অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়িল, আমি বুঝিতেছি, পাঠকপাঠিকাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, অতএব, এইখানেই "ইতি।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত।

মানিনী-বিলাপ।

ওগো আসিয়া দুয়ারে গেছে সে ফিরিয়ে
মরম ব্যথায় কাঁদিয়া
সে বিনে আমার আঁধার জীবন
আন তারে সখী সাধিয়া।

সখী— তাহার লাগিয়ে পরাণ উদাস
ক্ষণে ক্ষণে তাই চমকি উঠি—
মুছি আঁখিনীর আমি পাগলিনী
সে এলো বলিয়ে যাই লো ছুটি।
সে যে— আমার লাগিয়ে ভুলেছে জগত
আপনারে ভুলি দিয়েছে ধরা,
সে গেছে কাঁদিয়ে জাননা সজনী
কত ব্যথা তার হৃদয় ভরা।
হায় আশায় আশায় যাপিনু রজনী
আশায় আশায় দিবস গেল
ভেঙ্গে পড়ে বুক অথির পরাণ
কই প্রাণ-সখি আর সে এল ?

শ্রীমতী বিজনবালা বসু।

তুমি এসনা।

বিষাদ ব্যথিত অন্তরে,
অনন্ত বিজন প্রান্তরে,
(যবে) অনিমিষে চেয়ে, রহিব বসিয়ে,
আঁখি পাশে ব'সে হেসনা ;
তুমি এসনা।
নয়নের জলে ভাসিয়া,
যাইব যখন চলিয়া,
কোমল বাহুতে, বাঁধিয়া লইতে
মোর সনে দুখে ভেসনা ;
তুমি এসনা।
আকুল সঙ্গীত গাহিয়া,
লুঠিব যখন কাঁদিয়া,
শুভ্র অঞ্চলেতে, অশ্রু মুছাইতে,
মোর পাশে এসে ব'সনা ;
তুমি এসনা।
যবে যামিনী-জাগরণে,
প্রাতঃ সমীর-পরশনে,
রহিব ঢলিয়া, ঘুমেতে মাতিয়া,
স্বপনেতে এসে প'শনা ;
তুমি এসনা।
প্রবাসে যাপিব জীবন,
(তাই) ভুলেছি সব আকিঞ্চন,
কাজ নাই আর, দোসর আমার,
আর মোরে ভাল বেসনা ;
তুমি এসনা।

শ্রীমনোমোহন মজুমদার।

কেন অহঙ্কার।

মানব জীবনে কেন এত অহঙ্কার !
এই দেহ চিরদিন নাহি রবে হবে লীন্
মাটিতে মিশায়ে যাবে দেহটি তোমার।
তবে কেন বৃথা অহঙ্কার !

ওই কৃষ্ণ কেশরাশি মস্তকে তোমার,
যতনে যাহারে শিরে রেখেছ কবরী করে
একদিন হবে ওই ধবল তুষার !
তবে কেন বৃথা অহঙ্কার !

তব দুটি মুগ্ধ আঁখি দর্প কর যার,
চিরদিন ওই ভাবে জানিও নাহিক রবে
দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হবে নয়নে তোমার।
মানব জীবনে তবে কিবা অহঙ্কার।

ও চারু উন্নত বক্ষ রবেকি তোমার ?
গাত্র চর্ম্ম শীর্ণ হবে দেহের শকতি যাবে
না রবে সুন্দর আর অস্থিমাত্র সার।
তবে কেন মিছা অহঙ্কার !

যার তেজে এত দর্প করিতেছ হায় !
সেই সে যৌবন তব থাকিবে কি তুমি ভাব
যবে সে চলিয়া যাবে ডাক যদি তায়
ফিরিবে না তব কাছে হায় কভু আর।
তবে কার তরে কর বৃথা অহঙ্কার।

ধন মান পরিজন কেবা আপনার ;
যবে মৃত্যু আশি শিরে দাঁড়াইবে ধীরে ধীরে
বল কেহ যাবে কিগো সঙ্গেতে তোমার ?
তুমি যাবে পড়ে রবে পুত্র পরিবার
তরে কেন কর আর বৃথা অহঙ্কার।

ত্যাজি গর্ব্ব অভিমান সকাতর মনে
ডাক সেই শ্রীনিবাস　　পুরাবেন তব আশ
হৃদয়ে পাইবে সেই অমূল্য রতনে।

সঁপেদাও সেই পদে হৃদয় তোমার,
জীবন জৌবনধন　　তবপুত্র পরিজন
অনিত্য বিষয়াস্পদ ভেবনাক আর
ঘুচে যাবে সব তব মোহের আঁধার

শ্রীমতী——বসু—

আবার আবার!

ঐ গো অদূরে কে বাজাসে বাঁশি
জাগাইলে প্রাণে প্রেমের স্বপন;
মরম-মাঝারে পশিল সে তান
জাগাইল কত কথা পুরাতন!
কি আবেগ মাখা কি অমিয় ভরা
নীরব-নিশিতে বাঁশি গায় গান;
ভেদি নিস্তব্ধতা মথি প্রাণ মন
ছড়ায় দিগন্তে সে মোহন তান।
আছি জগতের এক কোণে পড়ে
দুঃখের আগুণে তনু জর জর;
এমন সময়ে ঢালিলে পরাণে
সান্ত্বনার সুধা—কি মধুর স্বর!
সংসারের সাধ ফুরায়েছে মোর
ঘোর নিরাশায় কাটিছে সময়;
আছি প্রতীক্ষায় এ দগ্ধ প্রান্তরে
শেষ দিন কবে হইবে উদয়!
উষার পরশে সাজে ধরারাণী
জগতে বহে কি নূতন সাড়া;
কর্ম্মক্ষেত্রে সবে কর্ম্মে নিমগন,
এ হৃদি আমার যাতনার কারা!
আছি বুক চেপে লয়ে দুঃখভার
জানাতে কারেও করি না যতন;
ভবে আমি একা—সঙ্গী কে আমার
কে বুঝিবে হায় মরম-দাহন!
কে হেন সুহৃদ্ তুমিহে আমার
হেন অভাগায় দিলে শান্তি প্রাণে;
যেই হও তুমি দেব-হৃদি তব
দেখিতে কি তোমা পাই ধরাধামে?
যদি দেখা দিতে বাধা থাকে দেব!
ক্ষতি নাই—শুধু এ ভিক্ষা আমার;
এমনি করিয়া এমনি সময়ে
বাজাইও বাঁশি আবার আবার!
নাচিবে ধমনী উঠিবে হিল্লোল
লাঘবিবে জ্বালা সংসার-কারার;
আসিবে পরাণে নবীন চেতনা
গাও দয়াময় 'আবার আবার'!

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

আকাশ ও মেঘ।

(সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি।

"But the sky for oll ; bright as it is, it is hot :—
Too bright or good For human naturis daily food."

J. RUSKIN.

অনেকে বলেন; পল্লীগ্রামে যেমন স্বভাবের শ্যামসৌন্দর্য্য দেখা যায়, নগরে তেমন যায় না ; এ মত অভ্রান্ত, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু নগরে কি দেখিবার মত কিছুই নাই ? মঙ্গলময়ের রাজ্যে, কোথাও ত অপূর্ণতা নাই। এখানেও নাই। সেই বিশ্ববন্দ্য জগতজনককে দেখিবার জন্য, দিব্য চক্ষুর আবশ্যক। লীলা-রম্য প্রকৃতি মাতার অপরূপ রূপ দেখিতে গেলেও তেমনি সাধারণের চাইতে একটু উচ্চ দৃষ্টির দরকার করে।

মাথার উপরে চাহিয়া দেখ, দৃষ্টিসীমা ছাড়াইয়া, গগন চলিয়া গিয়াছে। রন্ধ্রশূন্য ;—রমণীয়। ছেদশূন্য ;—অনন্ত।

যেখানে যতই সৌন্দর্য্য থাকুক,—আকাশের মত কোথাও নাই। নদী বা সাগর দেখিতে ভাল বটে,—কিন্তু তাদের শোভা কখন ? যখন আকাশের ছায়া, তাহাদের উপরে পড়ে। পাদপালঙ্কৃতা, দুর্ব্বামণ্ডিতা ভূমি দেখিলে, মানস চমৎকৃত হয় ; কিন্তু উপরে যদি আকাশের নীল-কান্তি না থাকিত তাহা হইলে এ শোভাও বুঝি নয়ন-রম্য হইত না।

আকাশের এত সৌন্দর্য্য কেন ? কারণ, একরূপ দেখাইয়া, তার সাধ মিটে না। ষোড়শী যেমন নানাবেশে,—কখনও সুবিন্যস্ত কবরীতে, আবার কখনও বা এলায়িত কেশে, কখনও স্বর্ণালঙ্কৃত অবয়বে, আবার কখনও বা কুসুম-খচিত তনুতে, তার প্রিয়-নয়ন-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ; এবং কখনও হাসিয়া, কখনও বা কাঁদিয়া, কখনও রাগিয়া, আবার কখনও বা বিনয় করিয়া, কান্ত-মন মোহিত করিবার জন্য বিভিন্ন লীলাভঙ্গিমা প্রকাশ করে, আকাশও তেমনি কত শত বেশ ধরিয়া,—কখনও আরক্তবহ্নিবৎ, কখনও শান্তশোভন-শতদল-প্রতিম, কখনও বা বর্দ্ধিত নীলাঞ্জন-তুল্য-বর্ণ-বিভাসিত হইয়া, কখনও নীরবে, আর কখনও ভৈরব-গর্জ্জনপূর্ব্বক, দর্শকের চিত্ত হরণ করে।

নগরে বসিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও না? এস, ছাদের উপরে যাই। এই ছাদের উপরে আসিলাম। ঐ ঊর্দ্ধে,—আকাশ; এই প্রবহমানা গঙ্গা। তুমি ঐখানে বোস,—আমি তোমার পাশে বসি। বসিয়া, আকাশের শোভা দেখি।

ঐ দেখ, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম-গগন-তোরণে স্তরে স্তরে বর্ণ রেখা। রবির আশেপাশের মেঘ হরিদ্রাবর্ণ রঞ্জিত। তারপরে রক্ত, তারপরে গোলাপী, তারপরে গভীর নীল। রবি-কর চক্রাকারে গগনে ঘুরিতেছে খণ্ড-জলদ-দল মৃদুপবন-তাড়নে বর্ণ-সাগর পার হইতে যাইতেছে, আর অমনি নানাবর্ণ-স্রোতস্মান্ হইয়া মোহন-শ্রী ধারণ করিতেছে। এখন ছোট মেঘ দলের আনন্দ দেখ।

গগনের এদিকে দেখ। কোথাও কাকচক্ষু-স্বচ্ছ অমল সরসী, কোথাও নৃত্য-চঞ্চল, গিরিবরচ্যুতা নির্ঝরিণী;—কোথাও তুষার-মগ্ন তুঙ্গ শৈলশ্রেণী; নির্ঝরিণী-দুকূলে চঞ্চল-প্রেক্ষা মৃগী-ত্রয় শ্যামোজ্জ্বল দূর্ব্বা ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও মহা অরণ্য। অরণ্যে কতরূপ বৃক্ষ! তাল, নারিকেল, তিন্তিড়ি, খর্জ্জুর, অশ্বত্থ, বট, কতরূপ জীব! সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, মহিষ, অশ্ব! কোথাও অপার সাগর ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, নাচিতেছে, উলটিতেছে! সহস্রবাহু-বেষ্টনে যেন সমস্ত মেঘরাজ্যকে আপনার কুক্ষিগত করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিতেছে। ঐ তীরে আছাড়িয়া পড়িল, এবং ঐ তট-ভূমি প্রহৃত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিল।

তুমি বল দেখি ভাই! এত ভিন্ন রূপের একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখিয়াছ? নদী আপনার কুলুকুলু গান শোনাইয়া আর ছোট লহরী-লীলা দেখাইয়াই তৃপ্ত থাকে। সাগর আপনার বৃহত্তরঙ্গ দেখাইয়া, আর কর্ণভেদী আরাব শুনাইয়াই ক্ষান্ত থাকে। উচ্চ অচল আপনার ভীমকান্ত রূপ দেখাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, বনস্পতি আপনার শ্যাম-শ্রী দেখাইয়াই নিবৃত্ত হয়,—কিন্তু আকাশ একরূপ দেখাইয়াই তৃপ্ত নয়, ক্ষান্ত নয়, সন্তুষ্ট নয়, নিবৃত্ত নয়। আকাশ জগতের যাবতীয় দৃশ্য সৌন্দর্য্য-দর্শকের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরে।

কিন্তু আকাশে যদি মেঘ না থাকিত, তাহা হইলে, তাহার বুঝি একরূপ হইত না। মানুষ একঘেয়ে কিছুই ভালবাসে না। যে প্রণয়পাশে জগৎ বাঁধা, ব্যবহারে সে প্রণয়ও পুরাতন হইয়া যায়। আকাশে যদি মেঘ-বৈচিত্র্য না থাকিত, তাহা হইলে শীঘ্রই আকাশের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা হইয়া যাইত।

আকাশে বর্ষার মেঘ লক্ষ্য করিয়াছ? একস্থান সুনীল-উৎপল-প্রতিম, অন্যস্থান বিমর্দ্দিত অঞ্জনরাশি-সদৃশ। কোথাও প্রভাবিশিষ্ট কোথাও নির্ব্বাপিত-জ্যোতিঃ। এখানে স্পষ্ট, ওখানে অস্পষ্ট। হেথায় আলোক-বিচ্ছুরিত হোথায় অন্ধতামস-মগ্ন।

মেঘ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে আমরা মেঘকে দেখিতেছি। কিন্তু উহার যে কি অনন্ত সৌন্দর্য্য, তাহা আমরা কয়জনে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি? "ও! ভারি মেঘ হয়েছে, এখনি বৃষ্টি আসবে, চল ভাই পালাই চল!" মেঘের প্রতি আমাদের সমালোচনা এই পর্য্যন্ত।

রজনীকালে আকাশের শোভা বড় মনোমদ। সমস্ত অম্বর কৃষ্ণাভ-সুনীল। আকাশ তখন গলদেশে তারকামালা ধারণ করে। জ্যোৎস্না তাহার বিপুল অঙ্কে খেলিয়া বেড়ায়। মধ্যে মধ্যে ধূমাকার ছায়া-পথ। সেখান দিয়া না জানি কত নর-নেত্র-বহির্ভূত দেবপুরুষ চলাচল করেন! মাঝে মাঝে খণ্ড জলদ-দল দিশেহারা হইয়া, পথহারা পথিকের মত ছুটাছুটী করে। চন্দ্রদীপক-শোভিত, তারাহার-খচিত, নীলাম্বরে মেঘ-শিশুগণের লীলা-চাপল্য দর্শকের মনোহরণ করে।

জগতে উচ্চের বড় সমাদর। আকাশের মত উচ্চ কে? কিন্তু কেবল তাই বলিয়া, আকাশের এত আদর নয়। আকাশ সুন্দর। সুন্দর বলিয়াই, মানুষ মরণের পর স্থাননির্দ্দেশ করে, আকাশের দিকে। জানি না, আকাশ-অন্তরালে কোথায় সেই সুখ-স্বর্গালয়!

উচ্চ পর্ব্বতমালার উপরে উঠিয়া, যে নিম্ন স্থানে মেঘের খেলা দেখিয়াছে, সে কখনও তাহা ভুলিবে না। *

নিম্ন উপত্যকা আবৃত করিয়া দলবদ্ধ জলদেরা সমস্ত রজনী গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকে। ভোরবেলা উপরে উঠিয়া দেখিবে, নিম্ন উপত্যকা যেন কুন্দেন্দু-শ্বেত-প্রতিম। ক্রমে জগৎ আনন্দ-বিধায়ক আলোকেশ ভানুর রক্ত সিন্দূরচ্ছটায় পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আর অমনি ঘুম-ঘোরে অচেতন মেঘমালা সজীব, জাগ্রত হইয়া উঠে। যেন কোন নিপুন কুহকীর মায়ামন্ত্র বলে মেঘেরা এতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিল। এখন জাগিয়া উঠিল।

---

* দার্জ্জিলিং প্রভৃতি উচ্চস্থানে দূরনিম্নে, উপত্যকার উপরে ঘুমন্ত মেঘ-শ্রেণী দেখা যায়।

ক্রমে দলে দলে মেঘশ্রেণী সত্তঃনিম্রোত্থিত হইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিতে থাকে। কোন মেঘখণ্ড গিরিশিখর-লগ্ন হইয়া, প্রভাতারুণের কনককিরণ-দীপ্ত হইয়া, পতাকাবৎ প্রভাতপবন-তালে কাঁপিতে থাকে।

হায় বিজ্ঞ! পুস্তক-নিবদ্ধ জ্ঞানে কি ছার সুখ উপভোগ করিবে? মঙ্গলময়ের অপার রাজ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করিতে শিক্ষা কর। হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইবে। দেখিবে, এই বিশ্বনিখিলের প্রতিরেণুকণাও কি মহৎসৌন্দর্য্য-পূর্ণ। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে বাস করিয়াও, আমরা রূপের সন্ধানে ভ্রান্তের মত ছুটিয়া বেড়াইয়া, কত হীনতম কার্য্যে বিলসিত হই।

আকাশ দেখ, মেঘ দেখ, নদী দেখ, সাগর দেখ, পর্ব্বত দেখ, পৃথিবী দেখ, কোথায় সৌন্দর্য্য নাই? অন্ধকারেও সৌন্দর্য্য আছে, আলোকেও সৌন্দর্য আছে। স্বর্ণ-প্রাসাদেও সৌন্দর্য্য আছে, পত্র-কুটীরেও সৌন্দর্য্য আছে। যে সৌন্দর্য্য-পিপাসু, যে রূপের পূজারি, যে শোভার সাধক, যে লাবণ্যের ভিখারি,—সে সকল জিনিষেই সত্য সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। এ জগতে সৌন্দর্য্য-সাধকই সকলের বড় সাধক। জানিও, সেই বিশ্বপিতার একনিষ্ঠ পূজারি। জগতে সেই নমস্য। কারণ "Beauty is truth,—truth beautys i" সৌন্দর্য্যই শিব।

যে বেশ্যাগামী, সে পাপিষ্ঠ, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সেই হীনা বেশ্যার চরণতলে বসিয়া, কামিতাশূন্য-হৃদয়ে তাহার মধ্যে জগৎমাতা প্রকৃতির অনন্ত শিব-সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়,—জগতে গুরুর সিংহাসন তাহার প্রাপ্য এ কথাও অস্বীকার করা যায় না।

সুন্দর কে?—ভগবান। সুন্দরের সৌন্দর্য্যের সত্তা হৃদয়ে অনুভব কর, সৌন্দর্য্যের মহা-মুক্তি গীতি গাও,—স্বর্গে তোমার সিংহাসন।

এস হে সুন্দর! এই নিকেতনে
যতনে আমি রাখিব।
হে সুন্দর! তব অঙ্কিত চরণ
অঞ্চলে আমি মুছাব।
সকল আকাশ ঘেরিয়া মহান্
সাধনা জাপনা উঠিবে।

হাসিয়া হাসিয়া নিখিল ভুবন
তোমারি ভজনা করিবে।
ভ্রমিছে প্রেমে বসুধা অন্ত
সুদূরে হোথা অম্বর-প্রান্ত
আকাশে ঘেরিয়া অনন্তে অসীমে
মহান্ সে গীতি ভরিবে—
অম্বর উথলি মেঘেরে নাচায়ে
উদার সে গীতি ধ্বনিবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

রমণী-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

রামঅক্ষয় বাবু হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "যাক,—মন্দ হইল না,—এখন হাসি তামাসা ত্যাগ করিয়া এ বিষয়ের একটু আলোচনা করা যাক।"

কুমার বাহাদুর ও বরেন্দ্র উভয়ই বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "আপনি একটু আগে বলিলেন যে দারোগা গুলি চালাইয়াছিল। কোন প্রমাণে আপনারা এ কথা বলিতেছেন, তাহা আমি জানি না,—আমি এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাই নাই। দারোগা কোথায় আছে, কে তাহাকে লইয়া গিয়াছে তাহাত আমরা জানি না। আপনাদের সাক্ষীর মধ্যে দেখিতেছি যে এই পাগলী আর এই মেয়েটা। পাগলীকে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে কোন আদালতই তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবে না—এই মেয়েটার সাক্ষীও যে বিশ্বাসযোগ্য হইবে তাহা আমার বোধ হয় না,—বিশেষতঃ ইহারা দুই জনেই আপনাদের লোক——"

"ইহাদের মিথ্যা কথা বলিবার স্বার্থ কি ?"

"স্বার্থ,—আপনাদের রক্ষা করা।"

"তাহা হইলে এখনও আপনার বিশ্বাস যে আমরাই খুন করিয়াছি।"

"কুমার বাহাদুর! পূর্ব্বেও বলিয়াছি,—এখনও বলিতেছি যে আপনাদের সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে।"

"আমরাই দারোগকে গুলি করিয়াছি!"

"সম্ভব,—তবে পূর্ব্ব হইতেই তো বলিতেছি গুরুতর সন্দেহ ব্যতীত আপনাদের উপর অন্য কোন প্রমাণ পাই নাই;—যদি পাইতাম, তাহা হইলে অনেক আগেই আপনাদের গ্রেফতার করিতাম।"

"তাহা আমরা জানি,—এই জন্যই আপনার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইয়াছে;—যে পর্য্যন্ত একটা প্রমাণ পাই নাই, সে পর্য্যন্ত আপনাকে কিছু বলিবার সাহস পাই নাই।"

"অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন।"

"নিশ্চয়ই—যদি আমরা দারোগাকে দেখাইয়া দি,—যদি তিনি নিজে গুলি করার কথা স্বীকার করেন,—যদি আপনি দেখিতে পান যে গোঁসাইয়ের লোকে তাহাকে গুমি করিয়া রাখিয়াছে,—তাহা হইলেও কি আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন না?"

"এরূপ হইলে অবশ্যই বিশ্বাস করিব। এ গুরুতর রহস্যত ভেদ হইবে,—অপরাধীও সাজা পাইবে।"

"সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে?"

"কেন।"

"অপরাধিদের ধরিতে পারিবেন কিনা, তাহা বলিতে পারি না।"

"কেন—এ কথা বলিতেছেন কেন?"

"কেন বলিতেছি তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কেমন আমার মনে হইতেছে যে ইহারা ধরা পড়িবে না।"

"সে ভার আমার থাকিল,—এখন কেবল প্রমাণ করিয়া দিন যে ইহারাই দোষী।"

"তাহা হইলে আজ রাত্রি আটটার সময় আপনারা জনকত বিশ্বস্ত লোক এখানে আসিবেন,—দারোগা যেখানে বন্দ আছে, সেই বাড়ীতে আপনাকে লইয়া যাইব। খুব সাবাধান, যেন কোন রূপে এ কথা প্রকাশ না হয়,—তাহাদের লোক যে কোথায় নাই, তাহা বলা যায় না,—কোনরূপে তাহারা জানিতে পারিলে তাহারা দারোগাকে লইয়া অন্যত্র পলাইবে।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন,—আমার দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হইবে না। ঠিক রাত্রি আটটার সময় এখানে উপস্থিত হইব।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যে পলাইব না, তাহা আপনি জানেন।?"

"তা জানি—পলাইবার হইলে অনেক পূর্ব্বেই সে কাজ হইত।"

"কি রকমে দারোগার সন্ধান পাইয়াছি, বোধ হয় দারোগাকে না পাই-বার পূর্ব্বে আপনি তাহা জানিতে চাহেন না।"

"এখন জানিয়া ফল কি? আপনারা যেরূপ গোয়েন্দাগিরিতে সিদ্ধ-হস্ত তাহাতে আপনাদের পক্ষে অসাধ্য কি আছে?"

"তাহা হইলে দারোগাকে বাহির করিয়া তখন এ সকল কথা বলা যাইবে।"

"সেই ভাল, আমি ঠিক রাত্রি আট্টার সময় হাজির হইব।"

"বলা বাহুল্য মহা বদমাইশের দলের ভিতর যাইতে হইবে, সঙ্গে পিস্তল আনিতে ভুলিবেন না।"

রামঅক্ষয় বাবু পকেট হইতে ক্ষুদ্র রিভলভার বাহির করিয়া বলিলেন, "এ যন্ত্রটী আমি কখনই হাতছাড়া করি না।"

কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি।"

রামঅক্ষয় বাবু পকেটে পিস্তল রাখিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "তবে এখন এই পর্য্যন্ত,—রাত্রি ৮ টার সময় প্রস্তুত রহিবেন।"

রামঅক্ষয় বাবু কুমার ও বরেন্দ্র বাবুর সহিত হস্ত আলোড়ন করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

আহারাদির পরই কুমার ও বরেন্দ্র উভয়েই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমস্ত দিনই উভয়ে যে কোন গুরুতর কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,—কিন্তু তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

সন্ধ্যার একটু পরে বরেন্দ্র বাবু বাড়ী ফিরিলেন,—তাহার পনর মিনিট পরেই কুমারও গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন,—পূর্ব্বেই বলা থাকায় আহার প্রস্তুত

ছিল, তাঁহারা সত্বর আহারাদি করিয়া রামঅক্ষয় বাবুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠিক আটটার সময় রামঅক্ষয় বাবু উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়া উভয়েই সত্বর উঠিয়া বলিলেন, "আর দেরি করা নয় চলুন।"

"চলুন।"

বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দ্বারের নিকট আসিয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে কয়জন আনিয়াছেন?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "ভাবিয়া দেখিলাম অনেক লোক আনিলে কেবল সন্দেহ বৃদ্ধি ও গোল হইবার সম্ভবনা,—তাহাই কেবল সুশীলকে আনিয়াছি,—আপনারা দুজন আছেন,—সুতরাং চারজনই যথেষ্ট, তাহার উপর সমস্ত থানায় সম্বাদ দিয়াছি, আমরা খবর দিবামাত্র লোক ছুটীবে—কোন ভয় নাই।"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "ঠিক ভালই করিয়াছেন,—আমরা জানি তাহাদের লোক সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছে,—এখন আপনি এখানে আসায় সন্দেহ করিবে!"

"খুব সম্ভব,—বরং উল্‌টা ভাবিবে,—'

"কেন—আপনি কি ভাবিতেছেন।'

তাহারা ভাবিবে আমি আপনাদের গ্রেফতার করিবার চেষ্টায় আছি—আজ যে সকালে আমি আপনাদের দলে সহসা মিলিয়া গিয়াছি, তাহা তাহারা কখনই মনে করিতে পারিবে না।

"এ কথা আপনি ঠিক বলিয়াছেন, তবুত সাবধান হওয়া ভাল। আপনি আগে বাহির হইয়া যান,—গোলদিঘির ধারে দেখা হইবে।"

রাম অক্ষয় বাবু বাহির হইয়া গেলেন,—তাঁহার গমনের পনের মিনিট পরে গাড়ী আসিল। সেই গাড়ীতে কুমার বাহাদুর বাহির হইয়া গেলেন, আবার পনের মিনিট উত্তীর্ণ হইল,—তখন বরেন্দ্র বাবু ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

এক ব্যক্তি দূরে থাকিয়া তাঁহাদের লক্ষ্য করিতেছিল,—সে তাঁহাদের অনুসরণ করিল না,—দ্রুতপদে মোড়ে আসিয়া একখানা গাড়ী লইল, কোচমানের কানে কানে কি বলিল, তাহার পর উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটিল।

আর এক ব্যক্তি ও এই লোকের অনুসরণ করিয়াছিল,—সে গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া বলিল, "ও গাড়ী থানার কত ভাড়া হল রে?"

এক জন গাড়োয়ান বলিল, "কেন বাবু ?'

"আমিও সেখানে যাব।'

"আপনিও তাই দেবেন।'

"কত আগে শুনি।"

"বাগমারি এক টাকা কি বড় বেশী।"

"না—তা নয়,—তবে আমায় গোলদীঘির ধার হয়ে একবার যেতে হবে।"

"কত দেরি হবে বাবু।"

"কিছু না,—পাঁচ মিনিটও নয়।"

"কিছু ধরে দেবেন বাবু।"

"চ—দেখা যাবে।"

গাড়ী গোলদীঘির দিকে ছুটিল। তথায় কুমার বাহাদুর প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তাহার পরই রামঅক্ষয় ও সুশীল বাবু উপস্থিত হইলেন,—পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে বরেন্দ্র বাবুও আসিলেন,—কুমার বাহাদুরের গাড়ী পার্শ্বেই দণ্ডায়মান ছিল,—তাঁহারা গাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন;—এই সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল,—কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এই এসেছে।"

একটী লোক লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের নিকট আসিল—কুমার বাহাদুর ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি ?"

সে বলিল, "হুজুর,—বাগমারি গেছে।"

কুমার বাহাদুর রামঅক্ষয় বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শুনিলেন,—সন্ধান পেয়েছে,—আগেই খবর দিতে গিয়াছে,—আর এক মিনিট দেরি করিলে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইবে! উঠুন—উঠুন—গাড়ীতে।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "দাঁড়ান,—একটু অপেক্ষা করুন,—আপনার লোক বিশ্বাসী।"

"খুব—নিশ্চয়ই।"

"তবে এই চিঠিখানা ইহাকে দিয়া বেলেঘাটার থানায় পাঠিয়ে দিন্।"

তখন উভয় গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে দুইদিকে ছুটিল। শিকারি শিকারের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যেরূপ উত্তেজিত হয়,—ইঁহারাও সকলে সেইরূপ উত্তেজিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গুণেন্দ্র, বরেন্দ্র, রামঅক্ষয় বাবু ও সুশীল বাবু মাণিকতলায় আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। তাহার পর চারিজনে পদব্রজে বাগমারির দিকে চলিলেন।

বলা বাহুল্য এ দিকে লোকালয় নাই বলিলেই হয়? কেবলই বাগান,—এক বাগানের পার্শ্বে অন্য বাগান,—এই সকল বাগানে দুই একজন মালি ব্যতীত আর কেহ বাস করে না,—অনেক বাগানে কেহ কখনও আসে না,—শনিবারে রবিবারে কোন কোন বাবুরা আমোদ প্রমোদ করিতে আইসেন।

এ দিকটা কলিকাতা হইতে একরূপ বাহিরে বেপোট যায়গায় বলিয়া অনেক বাগানের অদৃষ্টেই অযত্ন ঘটিয়াছে,—অনেক বাগানই "পড়ো" অবস্থায় পরিণত হইয়াছে,—এই সকল বাগান একরূপ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে,—উদ্যানস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকাগুলি ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিতেছে।

বাগমারির প্রান্ত সীমায় বড় রাস্তা হইতে দুইটী বাগানের মধ্য দিয়া একটী অপরিসর পথ,—এই দুইটী বাগানই পড়ো বাগানে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গলির প্রান্ত সীমায় যে বাগানটী স্থিত তাহা আরও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে—এই তিন বাগানেই জনমানব নাই,—নিকটে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই,—তাহার উপর এই সকল বাগানে ভূত আছে লোকের বিশ্বাস থাকায় রাত্রের কথা দূরে থাকুক দিনেও কেহ এই সকল বাগানের ত্রিসীমায় যাইত না।

গুণেন্দ্র ও বরেন্দ্র বাবুরা চারিজনে স্ব স্ব পিস্তল হাতে লইয়া অতি সাবধানে নিঃশব্দে অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া চলিলেন,—সুশীল বাবু ও রামঅক্ষয় বাবু,—উভয়েরই পকেটে পুলিশ' লণ্ঠন ছিল,—তাঁহারা তাহা জ্বালাইলেন,—সেই আলোকে সন্তর্পণে কান পাতিয়া চলিলেন,—কিন্তু কোন দিকে কোন শব্দ নাই।

রামঅক্ষয় বাবু মৃদু স্বরে বলিলেন, "কুমার বাহাদুর,—এখানে আড্ডা লইয়াছে,—এ সংবাদ আপনারা বিশেষরূপে জানেন?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "হাঁ,—নিশ্চয়ই,—আমি নিজে এখানে সুখ-চাঁদকে আসিতে দেখিয়াছি,—আর আমি যাহাদের এই বাড়ীর পাহারায় রাখিয়াছিলাম তাহারা সন্ধান পাইয়াছে যে আপনাদের দারোগা বাবু এই খানেই আটক আছে।"

রামঅক্ষয়বাবু বলিলেন, "মানুষ আটক করিয়া রাখিবার এ উপযুক্ত স্থান তাহা'ত সন্দেহ নাই,—এখানে হাজার চেঁচাইলেও কাহারও সে শব্দ শুনিবার সম্ভব নাই। তবে আপনারা এত সাবধানি লোক,—আজ এখানে আপনাদের কাহাকেই পাহারায় দেখিতেছি না কেন ?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন, "ইহাতে আমিও একটু বিস্মিত হইয়াছি,—বোধ হয় সে বাগানেই কোনখানে লুকাইয়া আছে।"

সুশীলবাবু লণ্ঠনের আলো পথে নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছেন ?"

মাটীর রাস্তা,—তাহাতে আগের দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে,—সুশীল বাবু পথের যেখানে তাঁহার লণ্ঠনের আলো নিক্ষিপ্ত করিলেন, সেখানে এক জনের পদচিহ্ন সুস্পষ্ট পতিত হইয়াছে।

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

সুশীল বাবু হস্তস্থ লণ্ঠনের আলোতে পথের দুই দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত করিয়া দেখাইলেন,—বরাবরই মানুষের পায়ের দাগ।"

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া রামঅক্ষয় বাবু সুশীল বাবুকে বলিলেন, "কি বুঝিতেছ ?"

সুশীল বাবু বলিলেন, "স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে দুই জন লোক একটু আগে এই পথে ছুটিয়া গিয়াছে।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "একজন আগে ছুটিয়া গিয়াছে,—অপরে তাহার একটু পরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে ?"

সুশীল বাবু বলিলেন, "পায়ের দাগে তাহাই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

"তাহার পর প্রথম লোকটার পায়ে জুতা ছিল না,—দ্বিতীয় লোকটার পায়ে নাগরা জুতা ছিল।"

"প্রথম লোকটী—কে মনে করেন।"

"স্ত্রীলোক—দ্বিতীয়টী কোন হিন্দুস্থানী।"

গুণেন্দ্র বলিলেন, "তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে,—যে এই বাড়ীতে এক জন স্ত্রীলোক ছিল,—সে এখান হইতে পলাইতেছিল,—আমি যে দারবানকে এই বাড়ীর পাহারায় রাখিয়াছিলাম,—সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল।"

বরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তাহাদের যে লোক আমাদের পাহারায় ছিল, সে

নিশ্চয়ই আমাদের আগে এখানে আসিয়া খবর দেওয়ায় স্ত্রীলোকটা পলাইয়াছে।"

সুশীল বাবু বলিলেন, "কই,—এ পথে বাগানে যে কেহ গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না,—তাহা হইলে তাহার পায়ের দাগ থাকিত।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিয়া উঠিলেন "এ কি ?"

এক অদ্ভুত শব্দ উত্থিত হইল,—সে শব্দের বর্ণনা হয় না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একটা অস্পষ্ট শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—তাঁহারা চারি জনেই চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। সে কোন পশুর শব্দ বা পক্ষীর শব্দ বা কোন মানুষের আর্ত্তনাদ তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন,—কিন্তু সে শব্দ আর শুনিতে পাইলেন না। রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "যাহাই হউক,—প্রথমে এই বাগানটাতো ভাল করিয়া দেখা যাক,—তারপর কি করা উচিত কি অনুচিত তাহা বিবেচনা করা যাইবে। আপনার লোককে দিয়া বেলেঘাটার থানায় খবর দিয়াছি,—এতক্ষণ ইনেস্পেক্টার স্বদলে এখান হইতে বাহির হইয়া যাইবার সকল পথেই লোক রাখিয়াছে,—সুতরাং আশা করা যায় যে, যে কেহই এখানে থাকুক,—আর কিছুতেই পলাইতে পারিবে না।"

সুশীল বাবু বলিলেন,—"এতক্ষণ কেহ আছে কি না সন্দেহ।"

"দেখাই যাক্,—বাজে কথায় সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি ?"

তাঁহারা পিস্তল হাতে লইয়া সাবধানে সেই ভগ্ন বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

অধিকাংশ ঘরই ভগ্নপ্রায়,—কোন কোন ঘরের ছাদও পড়িয়া গিয়াছে,—দুই একটা ঘরের প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়াছে।

বাড়ীটী এক সময়ে বৃহৎ ছিল,—দ্বিতল,—সিঁড়িটি প্রায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। রামঅক্ষয় বাবু নিম্নের সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন,—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না,—এ বাড়ীতে সম্প্রতি যে কেহ বাস করিয়াছে,—তাহা তাঁহার বোধ হইল না। তখন তাঁহারা অতি সাবধানে

ভগ্ন সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিলেন। রামঅক্ষয় বাবু উপরে উঠিবার পূর্ব্বে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যদি এ বাড়ীতে কেহ থাক উত্তর দাও।"

তাঁহার স্বর সেই ভগ্ন অট্টালিকা মধ্যে দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইল;—একবার যেন তাঁহাদের মনে হইল যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আবার সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন কিন্তু সে স্বতন্ত্র কোন শব্দ না, রামঅক্ষয় বাবুর স্বরের প্রতিধ্বনি তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

সকলে উপরে আসিলেন, ঘরের পর ঘর উত্তীর্ণ হইয়া একটী ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—এই ঘরের এক পার্শ্বে একটা বিছানা ছিল, কোনে দড়ির উপর দুই এক খানা কাপড়ও ঝুলিতে'ছল,—পার্শ্বে এক কলসি জল।" আরও দুই একটা ব্যবহার্য্য দ্রব্যও রহিয়াছে। রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "তবে এখানে লোক আছে।"

সুশীল বাবু বলিলেন. "সম্ভব ছিল।" দেখা যাক এ ঘরে কি, "এই বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘরে প্রবেশ করিলেন,—দেখিলেন তথায় উনন কয়েকটা হাঁড়ি,—চার পাঁচটী খালি কেরোসিন টিন,—তাহাতে চাল ডাল প্রভৃতিও আছে, এক কোণে কয়লাও কতকগুলি পড়িয়া আছে। যেই এখানে থাকুক, সে যে অতি তাড়াতাড়ি এখান হইতে পলাইয়াছে, কোন কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই,—তাহা নিশ্চয়।

তাঁহারা সকলে ঘরের পর ঘর দেখিলেন, কিন্তু কোন ঘরেই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন রামঅক্ষয় বাবু আবার চিৎকার করিয়া বলিলেন, "এ বাড়ীতে কে আছ—উত্তর দেও।"

এবার তাঁহারা সুস্পষ্ট কাহার আর্ত্তনাদ যেন শুনিতে পাইলেন, কিন্তু কোন দিক্ হইতে সে শব্দ উত্থিত হইল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "কুমার বাহাদুর, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। নিশ্চয়ই এ বাড়ীতে সেই দারোগা আটক আছে,—কোন ঘর, তেতালায় কোন ঘর নাইতো।",

সুশীল বাবু বলিলেন, "চলুন দেখা যাক দোতালায় তো সব ঘরই দেখা গেল।"

দেখা যাক লোকটা আবার শব্দ করে কিনা, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কোথা হইতে শব্দ হইল।"

এই বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু অতি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "কে কোথায়

আছে উত্তর দেও,—যদি তুমি আটক থাক,—আমরা তোমায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।

আবার সেই শব্দ,—কিন্তু নিতান্ত অস্পষ্ট কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

রামঅক্ষয় বাবু কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, "শব্দ নিশ্চয়ই উপর হইতে আসিতেছে।"

বরেন্দ্র বলিলেন, "উপরে যে ঘর আছে বলিয়া বোধ হয় না।"

"নিশ্চয়ই আছে—আসুন, দেখা যাক।" এই বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু অগ্রসর হইলেন,—সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ছাদে উঠিবার শিঁড়িটী আরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;—সেই শিঁড়ি দিয়া যে কেহ এখন সাহস করিয়া উপরে উঠিবে, তাহা দেখিলে বোধ হয় না,—দুই চারিটা ধাপ একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে, রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "এই শিঁড়ি দিয়া আমাদের এক সঙ্গে যাইবার উপায় নাই—তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িবে এক এক করে আসুন,—আমি আগে যাই।"

এই বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু অতি সন্তর্পণে ছাদে উঠিলেন। অন্যান্য সকলেই একে একে তাহার অনুসরন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ছাদে উঠিয়াই রামঅক্ষয় বাবু বলিয়া উঠিলেন। "দেখিবেন!"

যথার্থই ছাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র ঘর,—এই ঘর এত নিচু যে বোধ হয় ইহার ভিতর লোক দাঁড়াইলে তাহার মাথা ছাদে ঠেকে। এই জন্য বাড়ীর বাহির হইতে এই ঘর কেহই দেখিতে পাইত না।

এই ঘরে জানালা নাই, ছাদের আলিসার নীচে চারি প্রাচীরে চারিটী গুলগুলি আছে, তাহাও সুদৃঢ় স্থুল লৌহ গরাদে দিয়া বদ্ধ। একটী মাত্র দ্বার, তাহাও লৌহ-নির্ম্মিত,—ঘরটী, দেখিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে টাকা কড়ি ও অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার জন্যই এই মালখানা ঘর এক সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, দ্বারে একটা বড় লৌহ কুলুপ ঝুলিতেছে।

রামঅক্ষয় বাবু লৌহ কপাটে সবলে আঘাত করিয়া বলিলেন, "ঘরে কে আছে উত্তর দেও।"

প্রথমে গৃহ মধ্য হইতে কেহ কোন উত্তর দিল না,—রামঅক্ষয় বাবু সবলে

দুই তিনবার দ্বারে বুট সুদ্ধ পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "ঘরে কে আছ, শীঘ্র উত্তর দেও,—আমরা পুলিশের লোক,—এখনই দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

তখন ভিতর হইতে একটা শব্দ হইল,—মানুষের স্বর তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে লোকটা কি বলিল তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। রাম-অক্ষয় বাবু বলিলেন, "দরজা ভাঙ্গিতে হইবে, সুশীল, তুমি যাও, কাছেই বেলেঘাটার ইনেস্পেক্টারকে পাইবে—দরজা ভাঙ্গিবার জন্য সাবল প্রভৃতি লইয়া তাঁহাকে শীঘ্র এখানে আসিতে বল, আর এই বাগান হইতে কোন দিক হইতে কেহ—যাহাতে পলাইতে না পারে তাহার বন্দবস্ত করিয়া আসিও।"

সুশীল বাবু ছুটিলেন। তখন রামঅক্ষয় বাবু কুমারকে বলিলেন, "আমাদের অসাবধানতায় জন্যই ইহারা পলাইতে পারিয়াছে,—আমরা আসিতেছি, খবর পাইয়াই সরিয়াছে,—আর ধরা শক্ত হইবে। কুমার বাহাদুর,—একটু আগে যদি খবর দিতেন।"

কুমার বলিলেন, "এই বাড়ীতে যে ইহারা দারোগাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে তাহা কেবল কাল জানিতে পারিয়াছি। তাহাকে না পাইলে আপনার আমাদের উপর সন্দেহ যাইবে না ভাবিয়াই আপনাকে কিছুই বলিতে পারি নাই। "কাল যেমন খবর পাইলাম যে দারোগা এখানে আছে,—অমনই আপনার কাছে রঙ্গিণীকে পাঠাইয়াছিলাম।"

রামঅক্ষয় বাবু দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "যদি পলাইয়া থাকে, তবে আর উপায় কি ?"

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বদলে ইনেস্পেক্টার সহ সুশীল বাবু ফিরিলেন, তখন দরজা ভাঙ্গা আরম্ভ হইল। লৌহ-দরজা সহসা ভাঙ্গা সম্ভব নহে,—প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমে দরজা ভাঙ্গিল।

তখন আলো ধরিয়া সকলে দেখিলেন যে একটী লোক বিছনার উপর বসিয়া আছে, তাহার এক পা সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ, সেই শৃঙ্খলের এক এক দিক প্রাচারে নিবদ্ধ এক লৌহ কড়ায় সংযুক্ত,—সুতরাং লোকটীর উঠিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই।

তবে তাহার বিছানা বেশ পরিষ্কার পরিছন্ন,—নিকটে দড়িতে পাচ সাত খানা কাপড় জামা ঝুলিতেছে, হাতের কাছে একটা জলের বড় কুজা ও ইন্‌্যামেল গেলাসও রহিয়াছে, ঘরটী বেশ পরিষ্কার কোন দিকে কোন ময়লা

নাই, লোকটীর বিছানার পার্শ্বেই একটী বড় ছিদ্র করা হইয়াছে, তাহাতেই শৌচ কার্য্যাদি চলিত।

দরজা ভাঙ্গিবা মাত্র লোকটী বলিয়া উঠিল, "এত দিনে আপনারা এসেছেন, এই যে কুমার বাহাদুর, আমি জানি আপনারা আমায় ভুলিবেন না।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "তাহা হইলে আপনিই মধুপুরের দারোগা!"

দারোগা বলিলেন' "আজ্ঞে হাঁ।—বদমাইশ গোঁসাইয়ের দল আমাকে সেই পর্য্যন্ত এখানে আটক রাখিয়াছে,—আমি আপনাদের কোন সম্বাদ দিতে পারি নাই।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "আগে আপনার পা খুলিয়া দি, তাহার পর সকল শুনিব। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে তাহারা আপনাকে বড় মন্দ রাখেনি।"

দারোগা বাবু বলিলেন, "না,—অন্য কোন কষ্ট দেয় নাই, এক জন হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোক এখানে ছিল,—সেই আমার আহারাদি আনিয়া দিত,—সে বিষয়ে কোন কষ্ট ছিল না,—তবে যা এই আটক, আর পায়ের শিকল?"

"দাঁড়ান,—পায়ের শিকল খোলা হোক।" এই বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু স্বহস্তে দারোগা বাবুর পায়ের শিকল খুলিয়া দিলেন, দারোগা বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আঃ,—বাঁচ্লাম, ভগবান এমন দিন আর দেবেন মনে ছিল না।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "সুশীল, তুমি পাহারাওয়ালাদের নিয়ে চারিদিকে খুঁজে দেখ, কাকেও যদি দেখিতে পাও,—আমি ইহাদের সম্মুখে দারোগা বাবুর একটা জমানবন্দি, লিখিয়া লই—আসুন দারোগা বাবু।"

সকলে ছাদে আসিলেন, রামঅক্ষয় বাবু পকেট হইতে পেনসিল কাগজ বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দারোগা বাবু বলিলেন, "আমি কুমার গুণেন্দ্রবাহাদুর ও বরেন্দ্র বাবুর নিকট প্রথম এই গোঁসাইয়ের দলের কথা শুনিতে পাই। তাহারা যে রাণী বিন্ধ্যেশ্বরীর কন্যাকে চুরি করিবার চেষ্টা করিতেছে,—তাহা তাঁহাদের কাছেই শুনি। যাহাতে তাহারা কোন রূপে রাণীর অনিষ্ট করিতে না পারে,—তাহার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন,—আমি বলিলাম, "এতো আমার কর্ত্তব্য—সরকার হইতে ইহারই জন্য আমি মাহিনা পাই।"

সেই দিন হইতে আমি ঐ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে থাকি,—তাহার পর সুখচাঁদ প্রভৃতি মধুপুরে আসিলে তাহারও সংবাদ আমি পাই, তখন রাণীর সম্বন্ধে আমি আরও সাবধান হই।

এক দিন রাত্রে আমি জগদীশপুর হইতে মধুপুরে ফিরিতেছিলাম,—তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, দূর হইতে জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম দুই জন লোক একটী মেয়ের গলায় দড়ি দিতেছে,—তখনই আমার মনে হইল এ মেয়ে রাণীর মেয়ে ব্যতীত আর কেহ নহে,—আর এক মুহূর্ত্ত, তাহারা মেয়েটীকে হত্যা করে, আমি নিরুপায় হইয়া দুই জনকে গুলি করিলাম, এক জন আহত হইয়া ছুটিয়া পলাইল, অপরে পড়িয়া গেল, কিন্তু তিন চারি জন লোক তাহার দেহ লইয়া ছুটিল, আমি মেয়েটীর কাছে যাইতে ছিলাম, এই সময়ে আমার পশ্চাতে শব্দ শুনিয়া আমি ফিরিয়া এক ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম, পাগলী সাঁওতালনী আমায় লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতেছে,—এই সকল বিষাক্ত সাঁওতাল তীর যে কি ভয়ানক তাহা আমি জানিতাম, ইহার একটী দেহে বিদ্ধ হইলে জীবনের কোন আশা থাকে না, আধ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়,—আমি প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধ শ্বাসে পলাইলাম। মেয়েটীর কি হইল, তাহা আর জানিতে পারিলাম না।

রাত্রে যে কাণ্ড ঘটিল, সে সম্বন্ধে কি করা উচিত, তাহাই সমস্ত রাত্রি ভাবিলাম, শেষে স্থির করিলাম যে কুমার বাহাদুরদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে, তাহাই সকালে উঠিয়া কতকটা সন্দেহ দূর করিবার জন্য মুখিকে স্বপ্নের ছলে রাত্রের ব্যাপার বলিয়াছিলাম, আমার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে কাহাকে এ কথা কোন ভাবে না বলিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না।"

"তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,—আপনারা তাহা সকলই শুনিয়াছেন। সুখচাঁদ সে রাত্রে আমায় দেখিয়াছিল, পাছে আমি সকল কথা বলিয়া দি, কতকটা এ জন্যও বটে, কতকটা আবার সাজা দিবার জন্যই লোক সাজাইয়া থানায় পাঠাইয়া আমি কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বেই আমায় গাড়ীতে লইয়া তুলে, তাহার পর আমার জল তৃষ্ণা পাওয়ায় জল চাওয়ায় এক গেলাস জল দেয়,—সেই জল খাইবা মাত্র আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম আমি এই ঘরে পায় শিকল-বদ্ধ পড়িয়া আছি,—একটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক আমার ঘর পরিষ্কার করিতেছে।"

"সেই পর্য্যন্ত এই খানে আটক আছি, কোন মতে আপনাদের কোন খবর দিতে পারি নাই।"

রামঅক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাইয়ের দল যে আপনাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আপনাকে কে বলিল?"

দারোগা বলিলেন, "যে স্ত্রীলোক আমার সেবা শুশ্রূষা করিত সেই বলিয়াছে। সে প্রায়ই বলিত, আপনি যদি গোঁসাই বাবু ও সুখচাঁদ বাবুর দিকে হন, তাহা হইলে আপনাকে তাঁরা এখনই ছেড়ে দেন। আমি রাজি না হওয়াতেই তারা আমায় ছাড়ে নি।"

"কেন আপনি তাহাদের কথায় সম্মত হন নাই।"

"তাহা হইলে আমি বিপদে পড়িতাম, এই দুই হত্যা কাণ্ডের জন্য রক্ষা পাইতাম না, বিশেষঃ ইহাদের কথায় বিশ্বাস কি? আমি জানি আমি মেয়েটীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দুই খুনীকে গুলি করিয়াছিলাম,—সে জন্য আমি আইনানুসারে দায়ী নই,—সুতরাং এই বদমাইশদের সঙ্গে মিশিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিব কেন?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "ঠিক—ঠিক্।" দারোগা বাবু গুণেন্দ্র ও যরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি এত কষ্টের পর চাকরিটী যায়, ইহাঁরা আছেন।"

কুমার বলিলেন, "নিশ্চয়ই, আপনি আমাদের জন্যই এত কষ্ট পাইয়াছেন, আপনার জন্য আমরা যথা সাধ্য করিব।

এই সময়ে সুশীল বাবু ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, নিকটে কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না,—স্ত্রীলোকটী পলাইয়াছে।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "তবে আর উপায় কি,—চল, আর এখানে থাকিয়া ফল নাই।"

সকলে সেই ভগ্ন বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। বিদায় হইবার সময় রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "কাল এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে,—কাল সকালে আমি আপনাদের বাড়ী উপস্থিত হইব, দারোগা বাবুকে সঙ্গে লইয়া যাই, এখনই বড় সাহেবের সম্মুখে ইহাকে হাজির করিতে হইবে।"

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে রামঅক্ষয় বাবু আসিলে কুমার বাহাদুর তাহার হস্তে এক পত্র দিলেন। রামঅক্ষয় বাবু পাঠ করিলেন ঃ—

সুন্দরপুর

প্রিয় গুণেন,

আমি সুন্দরপুর হইতে তোমায় পত্র লিখিতেছি দেখিয়া তুমি হয় তো বিস্মিত হইবে, হইবারই কথা। বনমালী রায়ের বাড়ী আমি আসিয়াছি, ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইবে, কিন্তু উপায় নাই, দায়ে পড়িয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে আসিয়াছি। এখানে ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে।

তুমি পূর্ব্বে শুনিয়াছ যে সুখচাঁদ সমস্ত টাকা কড়ি গহনা লইয়া পলাইয়াছে, তাহাতেও সে সন্তুষ্ট না হইয়া গত শনিবার রাত্রে অনেক লোক জন লইয়া বনমালী রায়ের বাড়ী ডাকাতি করিতে আইসে। বনমালী রায়ের পাইকগণ প্রতিবন্ধক দেয়, দুই দলের হাঙ্গামায় সুখচাঁদ গুলি খাইয়া পড়িয়া যায়, প্রাতে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার দলের আরও আহত জনকয়েক ধরা পড়িয়াছে। এই হাঙ্গামায় গোঁসাইও জখম হইয়াছিল,—পরশু হাঁসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

এত দিনে এই বদমাইশদের লীলা ভগবান শেষ করিয়া দিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম সখিনা বনমালী রায়কে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল, এই ব্যাপার শুনিয়া এখানে আইসে, কিন্তু সেইদিনই আবার চলিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ জানে না, পুলিশ তাহার সন্ধান লইতেছে।

বনমালী রায় এখানে নাই। বরেনও এখানে নাই, আমি তাহাদের নিকট আনিব এই জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক রুল জারি করিয়া আমার এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—কি করি,—তিনি বলিলেন যতদিন বনমালী বা বরেন না দেশে আইলে, তত দিন আমাকে সকল দেখিতে শুনিতে হইবে, নতুবা আর দেখিবে শুনিবে কে!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বনমালী রায়কে পত্র লিখিয়া ছিলেন, সে উত্তর দিয়াছে, "সে আর দেশে যাইবে না,—তাহার সমস্ত সে তাহার পুত্র বরেনকে দিয়া সে কাশীবাসী হইবে।" তাহার ন্যায় মহা পাপীর পক্ষে ইহাই উচিত।

তুমি এই পত্র পাইবা মাত্র বরেনকে ও বধূ মাতাকে দেশে পাঠাইয়া দিবে,—বলা বাহুল্য বেহাই,— রামরূপ শর্ম্মাও সব্রাহ্মণী দেশে আসিবেন।

লোকে বলিতেছে সখিনাই মূর্খ সুখচাঁদকে দিয়া বনমালির টাকা ও গহনা চুরি করাইয়া হস্তগত করিয়া ছিল। তাহার পর গোঁসাই আর সুখচাঁদকে সরাইবার জন্যই এই ডাকাতির আয়োজন করিয়া ছিল, তাহার অর্থ-লইয়া তাহারই লোকে সুখচাঁদ ও গোঁসাইকে হত্যা করিয়াছে,— সত্য মিথ্যা বলিতে পারিনা। রমণী চরিত্র ও রমণী-রহস্য বোঝা সহজ নহে।

এখন যখন সকল গোল ভগবানের কৃপায় মিটিল, তখন আর বিদেশে আসিবার আবশ্যক নাই। বৌমাকে লইয়া শীঘ্র বাড়ী ফিরিবে, আমার বয়স হইয়াছে, আর বিষয় কার্য্যে কিন্তু আসিতে ইচ্ছা করি না ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনিমাই নারায়ণ শর্ম্মা—

রাম অক্ষয় বাবু পত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানের উপর কাহার কথা,—তিনিই বদমাইশদের বিচারার্থে তাঁহার খাস দরবারে লইয়া গিয়াছেন,—তাহার উপর কথা কি!—বরেন্দ্র বাবু কোথায়?

"বরেন আজ সকালেই দেশে রওনা হইয়াছে।"

"সখিনার বিষয় কি মনে করেন?"

"রহস্য—রমণী—রহস্য।

*

পাপ বিদায় হওয়ায় সকলই সুখী হইলেন। রামরূপ শর্ম্মা আবার দেশে গিয়া—নিজ ভিটায় বাস করিতে লাগিলেন। ঊষা নিশা উভয়েই বড় সুখী হইল। রাণী বিন্ধ্যেশ্বরীর কন্যার সহিত চাঁদপুরের রাজকুমারের বিবাহ হইল। কুমার বাহাদূর রঙ্গিণীকেও সৎপাত্রে দান করিয়া তাহার স্বামিকে নিজ জমিদারিতে কাজ দিয়া নিকটে রাখিলেন। পাগলী সাঁওতালনী তাঁহার বাড়ীতে সেই পাগলীই রহিল।

দারোগা বাবু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া বরেন্দ্রের দেওয়ান হইয়াছেন,— সময় পাইলেই রাম অক্ষয় ও সুশীল বাবু এই সখিনা রহস্যের কথা আলোচনা করেন।

সেই পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলে সে কাশীতে বনমালী রায়ের কাছে।—

যাহারা ধরা পড়িয়াছিল, বলা বাহুল্য তাহাদের সকলেরই জেল হইল।

সম্পূর্ণ

প্রতীক্ষা।

—:*:—

(আজি) কক্ষ আমার, সৌধ সমান,
অতুলন দীপ ভাতি,
চাঁদ উজল বিমল শীতল
প্রেম প্রবণা রাতি;
শান্ত শরৎ,— মুগধ কানন
সেফালি সুরভি মাখা—
ফুল্ল-সমীরণ, লুটে ফুলবন;—
স্বপনের ছবি আঁকা।
বিজয়ী মদন, শান্ত সুশোভন,
ধরেছে মোহন বেশ;
কি মায়া কুহকে,— মজায় পুলকে,
ভুবন,—হৃদয় দেশ—
কপোত দম্পতি, প্রেমালাপে মাতি
অলিন্দে অবশকায়,
(আমি) বুকে ল'য়ে আশা,— দারুণ তিয়াষা,—
বসে আছি প্রতীক্ষায়।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ পাল।

জীবনের পরপার।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় প্রস্তাব।

"I merely mean to say what Johnson said,
That, in the course of some six thousand years,
All nations have believed that from the dead,
A visitant at intervals appears."

Byron.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরলোক সম্বন্ধে মতামত।

যাহা ধ্রুব নয়, যাহা অসত্য, তাহা লইয়া কদাপি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বাদানুবাদ চলে না। কারণ, মিথ্যার উত্থান যেমন আকস্মিক, তাহার পতনও তেমনি আকস্মিক এবং তাহার স্থিতি ও নভঃবক্ষে বিজলী-বিকাশবৎ স্বল্পকাল-ব্যাপী।

এই যে প্রেততত্ত্ব—ইহা লইয়া মানুষের রসনা বহুকাল হইতে বহুকথা বলিয়া আসিতেছে। কেহ সেই সকল কথায় প্রত্যয় করিতেছে এবং কেহবা বিতর্ক জাল প্রসারিত করিতেছে। অবশ্য প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আজ অবধি সংগৃহীত ও প্রচারিত সকল তথ্যই যে অভ্রান্ত সত্য এবং তর্কের অতীত, তাহা নয়, জাগতিক সকল ব্যাপারেই মিথ্যার প্রভুত্ব আছে আলোকের পাশে যেমন ছায়া—সত্যের পাশে তেমনি মিথ্যা সর্ব্বদাই পরিপন্থী। আলোচনা দ্বারা তাহার মধ্য হইতে সার সত্য নিষ্কাষণ করিয়া লইতে হয়।

প্রাচ্য দার্শনিক কহেন,—

"উৎপন্নস্য কচিৎ সত্বনিকায়ে মৃত্বা যা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্যভাবঃ উৎপন্নস্য সম্বন্ধস্য সম্বন্ধস্ত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি বেদনাভিঃ পুনরুৎপত্তিঃ পুনর্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ পূর্ব্বোপাত্তান্ দেহাদীন্ জহাতিতৎ প্রৈতি যৎ ভূতোঽন্যতঃ দেহদীনানু-

পান্তততঃ তন্তবতি প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম স জন্মমরণ প্রবন্ধাভ্যাসোঽনাদি রপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবো বেদিতব্যঃ ইতি।" (১)

"মৃত্যুর পর আবার দেহধারণ বা পুনর্জ্জন্মকে প্রেত্যভাব বলা যায়।" কিন্তু মরণের পরে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার আগে, যে সময়ে আত্মা সূক্ষ্মশরীরে শূন্যে অবস্থান করেন, তাহাকে 'প্রেত্যভাব' বলা যায় না, তাহাই প্রেতভাব। এবং সাধারণ মানবেরা, দেহমুক্ত আত্মাকে সেই সময়ে 'ভূত' অর্থাৎ 'গত' আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

প্র-ই (গত্যর্থে)×ক্ত প্রত্যয়ে প্রেত কথাটী সিদ্ধ। জীবের ভাবনা-ময় শরীরের নামই প্রেত। ঐ সময়ে প্রেতভাবাপন্ন আত্মার মনে নানারূপ ভাবনার উদয় হয়। মৃত্যুর পুর্ব্বে নরদেহে সে যেসকল পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার নিমিত্ত তীব্র অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে থাকে। এই যে অনুতাপ,—পৃথিবীবাসী ইহাকেই 'নরক' আখ্যা প্রদান করিয়াছে। বস্তুত, নরক কোনও স্থানবিশেষের নাম নয়। দেহ-মুক্ত আত্মার সুখানুভূতির নামই স্বর্গ এবং দুঃখবোধের নামান্তর নরক। পরন্তু, স্বর্গ ও নরকের পৃথক্ ধারণা কবি কল্পনা মাত্র।

প্রেতাত্মা কদাপি সুচিরকাল-স্থায়ী হয় না। ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ ও নির্দ্ধারিত সত্য। প্রেতাত্মা কিয়ৎকাল ভাবনাময় শরীরে কৃতকর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখভোগ করে, এবং তৎপরে পুনর্ব্বার জগতে আসিয়া দেহান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়। এই দেহান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বহু সত্য কাহিনী আছে। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

প্রেতাত্মা যে বহুকাল সূক্ষ্মকলেবরে নিরাবলম্বনে অবস্থান করিতে সক্ষম হয় না তাহার প্রমাণ প্রাচ্য পণ্ডিতগণই দিয়াছেন। যথা—

"তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ণ ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্।" (২)

পুনশ্চ—

"অথ বিশেষ ভূতান্যুচ্যন্তে শরীরং পঞ্চভূতময়ং বৈশেষিণা শরীরেণ বিনা ক লিঙ্গস্থানং চেতি ক একদেহমুৎসৃজতি তদেবান্যমাশ্রয়তি নিরাশ্রয়ং আশ্রয়রহিতং লিঙ্গং।" (৩)

---

(১) বাৎস্যায়নাচার্য্য।

(২) সাংখ্যকারিকা।

(৩) গৌড়পাদাচার্য্য।

প্রেত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিগণ কি বলেন, তাহাই এখন দেখা যাউক। কবি-প্রধান বাইরণের উক্তি বক্ষ্যমাণ আলোচনার শিরোভূষণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। মিলটনও বলেন,—

"বহুলক্ষ আত্মা নর-নেত্রের অগোচরে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছে।" (১)

কবিসম্রাট শেকসপীয়র যে, প্রেতে আস্থাবান ছিলেন, তৎকৃত গ্রন্থাবলীতে আত্মার একাধিকবার আবির্ভাবই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রেতভাবসম্বন্ধে আর একজন পণ্ডিত বলেন ;—

"Disembodied disconnected from this natural body ; not unembodied ; for I by no means impugn the hypothesis of a spiritual body."

পাশ্চাত্যগণের অধিকাংশই প্রত্যয় করেন যে, আত্মা কদাপি মৃতদেহের সহিত ভূমিনিহিত গলিত মাংস-সমষ্টির মধ্যে বাস করে না। (২)

তাঁহাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরেই আত্মা অপরলোকে যাত্রা করে এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত শেষ বিচারের নিমিত্ত অপেক্ষা করে। এখানে পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বিধা উপস্থিত হয়। আত্মা যে পুনর্ব্বার দেহধারণ করে সে যে শেষ বিচারের জন্য বহুকাল ধরিয়া অপেক্ষা করে না, একথা এখন পাশ্চাত্যগণই স্বমুখে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিখ্যাত লেখক এডিসনের উক্তিও পাদ টীকায় উদাহৃত হইল। (৩)

---

(১) "Millions of spiritual creatures walk on the earth,
Unseen, both when we wake and when we sleep."
Milton.

(২) "Men have ever been familiar with the idea that the sprit does not rest with the body in the grave, but passes at once into new conditions of being."
National Review. July 1858. P. 32.

(৩) "I think a person who is thus terrified with the imagination of ghosts and spectres much more reasonable than one who, contrary to the reports of all historians, sacred and profane, ancient and modern, and to the traditions of all nations, thinks the appearance of spirits fabulous and groundless. Could not

আর একজন কবি প্রেতাত্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন :—

"If in your new estate you cannot rest,
But must return, Oh, grant us this request;
Come with a noble and celestial air,
And prove your tittles to the names you bear;
Give some clear token of your heavenly birth;
write as good English as you wrote on earth;
And what were once superfluous to advise,
Don't tell. I beg you, such egregious lies." !

আমরা আরও বহু মতামত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু মাত্র মতামতই আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই জন্য তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নানুভূতি।

"Half our days we pass in the shadow of the earth, and the brther of death exacteth a third part of our lives."—S. T. Brown.

নিদ্রা একপ্রকার জীবনবিশিষ্ট মৃত্যু। কথাটা, 'সোণার পাথর বাটী'র মত হইল। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাই।

নিদ্রাকালীন মানবের হৃদয়ে, "ইচ্ছা শক্তিটা" আদৌ থাকে না। তাহার মানসিক স্বাধীনতাও যেন মায়ামন্ত্রবলে অপহৃত হয়। তখন তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে নানারূপ অপূর্ব্ব-দৃষ্ট দৃশ্যাবলী ছায়াবাজীর চিত্রমালার মত পরে পরে ভাসিয়া যায়। তাহাই স্বপ্ন।

---

1 give myself up to this general testimony of mankind, I should to the relations of particular persons who are now living, and whom I cannot distrust in other matters of fact."—'The Spectator"—No 110, published Friday. July 6.

অনেক সময়ে, স্বপ্ন মানসিক বিকার মাত্র। দিনমানে আলোচিত কর্ম্মাবলী সেই সময়ে মস্তিষ্কফলকে প্রতিফলিত হয়। আবার অনেক সময়ে, স্বপ্নে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষামুকুটবিভাবৎ, ভবিষ্যৎ জীবন-সম্ভব ঘটনাবলী আত্মা প্রকাশ করে।

স্বপ্ন কি ? সে সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞ, বহু বাক্য বলিয়াছেন। (১) স্বপ্নদর্শনকালীন মানবের ইচ্ছাশক্তি অন্তর্হিত হয় বটে কিন্তু তাহার সূক্ষ্মানুভূতি বিলুপ্ত হয় না, পরন্তু জাগ্রত থাকে। (২) সময়ে সময়ে সেই অনুভূতি এতদূর তীক্ষ্ণ হয় যে, মেঘাবৃত অম্বরবক্ষে চকিত চপলাচমকে যেমন রজনীর তিমিরাবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া যায়, নিদ্রিত মানবের হৃদয়-পটে তেমনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক লহমামধ্যে চিত্রিত হইয়া যায়।

ইহার কারণ কি ? কারণ নিদ্রাবস্থাতে আত্মা জাগ্রত থাকে। জীব যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাহার চক্ষুই সমধিক প্রবল হয় এবং যখন নিদ্রিত রহে, তখন তাহার মন প্রবল হইয়া উঠে। হিন্দুদার্শনিকগণ বলেন, নিদ্রা প্রাপ্ত অবসরে, আত্মা ব্রহ্মলোকে গমন করে। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পরে, সে কথা আর স্মরণ থাকে না। (৩)

মানব জীবনকালে, যাহা কদাপি প্রত্যক্ষ করে নাই সুষুপ্তিকালে অনেক সময়ে তাহা দর্শন করে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার কারণ কি ?

---

(১) "Dreaming is the having of ideas' whilst the outward senses are stopped, not suggested by external object or known occasion, nor under the rule and conduct of the understanding." Locke.

(২) "While dreaming, the outward senses are, in general, only partially stopped; ideas are often suggsted by external objects and by physical sensations; and sometimes the understanding, instead of being dethroned, acquires a power and vivacity beyond what it possesses in the waking state."—
Eootfalls on the Boundary of the another world."

(৩) "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়া"। (ছান্দোগ্য)

মানব পূর্ব্বে বহুবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মে সে যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছে নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মানুভূতি বলে, তাহাই পুনর্ব্বার দর্শন করে। (১)

অনেক সময়ে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ পূর্ব্বেই সূচিত হয়, তাহার কারণ, তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার দিব্য জ্ঞানমধ্যেই আবদ্ধ আছে। জাগ্রতাবস্থায় তুমি স্থূল-দৃষ্টিসম্পন্ন থাক কিন্তু তুমি যখন সুপ্ত তখন তোমার দিব্যজ্ঞান প্রখর হইয়া উঠে। সেই তীক্ষ্ণ দিব্য দৃষ্টিতেই ভবিষ্যৎ ঘটনা তুমি আগেই দেখিতে পাও। (২)

সুষুপ্তিকালে অনেকের মানসিক শক্তি এতদূর প্রবলা হয়, যে মানব জাগ্রতাবস্থায় যে কঠিনতত্ত্বের মীমাংসা করিতে অক্ষম হয় সুপ্ত হইয়া তাহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারে। (৩)

আবার অনেকের স্থূলদৃষ্টি এতদূর তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্মানুভূতিশক্তি এতদূর ক্ষীণ যে বহু বৎসর ধরিয়া অসুস্থ শরীরেও কোনও রূপ স্বপ্ন দেখিতে পায় না। (৪)

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে হিন্দু দার্শনিকগণের মতে সুষুপ্তাবস্থায় মানব ব্রহ্মলোকে গমন করে। ইয়ুরোপীয় ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিগণও ঠিক এই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। (৫)

---

(১) "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। * * * দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চানমুভূতঞ্চ সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বং পশ্যতি।"

(প্রশ্নোপনিষদ্)

(২) "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।" (কঠোপনিষদ্)

(৩) "Dr. Franklin informed Cabanis, that the bearing and issue of political events which had puzzled him when awake were not unfrequetly unfalded to him in is drems." (Intellectual Powers. P. 221.)

(৪) "As of a young man, a scholar with no bad memory, who declared that till he had a fever, in his twenty sixth year, he had never dreamed in his life."

(Essay on Human Understandig,)

(৫) "In a dream * * * God openth the ears of men and sealth their instruction."—Job, xxx iii. 14.

অনেক সময়ে দেখা যায় দুই পরিচিত ব্যক্তি একরাত্রে একসময়ে একই স্বপ্ন দর্শন করেন।

এ সম্বন্ধে একটী কাহিনী নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

"উম ব্রাউন ও জন ব্লেয়ার উভয়েই যুবক সম্ভ্রান্ত বংশজাত এবং রূপবান। কুমারী ক্লারা নামে এক ষোড়শী যুবতীকে লইয়া উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্যের সঞ্চার হইয়াছিল।

ঘটনাটী কিছু বিচিত্র নয়। উদ্দামমতি সৌন্দর্য্য-পিপাসু যুবকগণের মধ্যে রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী ললনা আসিয়া দাঁড়াইলে যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, এখানেও তাহাই হইয়াছিল।

ক্লারা যুবতী। তাহাতে অবিবাহিতা। পরন্তু সৌন্দর্যবতী। ব্রাউন ও ব্লেয়ারও যুবক। তাহারাও অবিবাহিত। অতএব এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রেমের স্রোতও বহিয়াছিল।

ব্রাউন ক্লারাকে বিবাহ করিতে চায়। ব্লেয়ারের অভিপ্রায়ও তাহাই। ব্রাউন বলিল ব্লেয়ার! তুমি আমার সঙ্গে লাগিতে আসিলে এই পিস্তল দেখিতেছ কোনদিন গুলি করিয়া মাথা উড়াইয়া দিব।

ব্রাউন বলিল সে বরং ভাল। আমাকে গুলি করিলে তুমি ফাঁসী কাঠে প্রাণ ভরিয়া দোল খাইবে। ক্লারাকে আর পাইবে না। তা আমি সহ্য করিতে পারিব।

কিন্তু ভিতরে বড় এক মজা হইয়াছিল। প্রেম পদার্থটা নিতান্ত সাধারণ এবং প্রথমাবস্থায় উপভোগ্যও বটে কিন্তু প্রণয় দেবতাটী অন্ধ। এমন চক্ষুহীন দেবতা যাহার স্কন্ধে ভর করেন সেও সেই দেবতারই স্বভাব পায়। সে যাহাকে ধরিবে—একেবারে জড়াইয়াই ধরিবে। সে একান্ত নির্ভরতা আর অপরের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। কিন্তু এখানে এই চিরাচরিত প্রথাটীর পুনরভিনয় হয় নাই।

কারণ যুবতী ক্লারা দুই যুবককেই আপনার প্রাণটা সমর্পণ করিয়াছিল। একজনকে ছাড়িয়া অপরকে বিবাহ করিবার কথা মনে উদয় হইলেই তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

অতএব, উভয় প্রেমিক যখন তাহার রক্তোৎপল-প্রতিম (যদিও মোজা ও জুতা দিয়া ঢাকা!) চরণপ্রান্তে বিরসবদনে বসিয়া রুদ্ধ হৃদয়-বেদনা জানাইতে থাকিত। তখন ক্লারা সুন্দরী আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে ভাবিত

"কার হাতে যে ধরা দিব হায়!
তাই ভাবতে আমার বেলা যায়।
ডানদিকেতে তাকাই যখন,—
বাঁএর লাগি কাঁদেরে মন,—
বাঁএর দিকে চাইলে পরে
দক্ষিণ ডাকে আয়রে আয়।"

এইত ব্যাপার মহাশয়! তাহার পর সত্য সত্যই ব্রাউন একদিন পিস্তল তুলিয়া ব্লেয়ারকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। পৈতৃক প্রাণটা তত শীঘ্র ব্যয় করিতে, ব্লেয়ার একান্ত নারাজ ছিল। সে বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়পদে ভর দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

ঘটনা ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, ক্লারা বায়ুসেবনের ছল করিয়া 'ব্রাইটনে' পলায়ন করিল। কিছুদিন যায়। এক রজনীতে হঠাৎ ব্লেয়ার নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল, 'কুমারী ক্লারা যেন ব্রাইটনের সমুদ্রের অগাধজলে পড়িয়া গিয়াছে। সলিলের উপরে জাগ্রত তাহার মুখখানি যেন বিচ্ছিন্ন পুষ্প-প্রতিম ভাসিতেছে এবং তাহার কাতর আঁখি দুটী যেন নীরব ব্যগ্রতার সহিত সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে।

স্বপ্ন দেখিবার পরেই উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্লেয়ার ব্রাইটনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে নামিয়াই সে ব্রাউনকে সম্মুখে দেখিতে পাইল। ব্রাউনও তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ভাই ব্লেয়ার! তুমি ক্লারার কোন সংবাদ জান?"

ব্রাউন বলিল "না, আমি কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া, ক্লারার সংবাদ লইতে আসিয়াছি।"

ব্রাউন চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "দুঃস্বপ্ন? আশ্চর্য্য! আমিও যে কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। ভাই! আমাদের মনোমালিন্যের কথা আর তুলিও না তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, বল দেখি!"

বিপদে বিরোধ দূরে যায়। ব্লেয়ার তাহার স্বপ্নের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করিল। শুনিয়া ব্রাউন সাশ্চর্য্যে বলিল "ভাইত! আমিও যে কাল ঠিক ঐ স্বপ্নই দেখিয়াছি।" আর কোন কথা হইল না। উভয়েই ভয়-ব্যাকুল-হৃদয়ে সাগরতটে ছুটিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, স্থানীয় পুলিশেরা, জল হইতে একটা মৃতদেহ তীরে উত্তোলন করিতেছে। নিকটে

গিয়া উভয় প্রেমিকই স্তম্ভিতনেত্রে দর্শন করিল, সে মৃতদেহ আর কাহারও নয়,—কুমারী ক্লারার! (১)

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন।

"মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যদ্ কর্ম্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্॥" চাণক্য, ১০০।

আজ পাঠকগণের পরিচিত, মহাত্মার জীবনী লিখিতে আমরা উপস্থিত সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠক, পাঠিকাগণকে লইয়াই আমাদের লেখার যত্ন এবং তাঁহাদের উৎসাহে আমাদের লেখা, সেই পাঠক, পাঠিকাগণ বিমুখ হইলে কিরূপে চলিবে?

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া সমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥ চাণক্য, ৯৩।

যে বৃক্ষেতে ছায়া এবং ফল আছে এমন তরুবর আশ্রয় করিবে, কারণ! যদি হঠাৎ ফল না হয় তবু সুশীতল ছায়া কেহ ঘুচাইতে পারে না। সেইরূপ আমরাও পাঠকবর্গের সুশীতল ছায়া অর্থাৎ কৃপা-ছায়া পাইয়াই তবে লিখিতে থাকি। আজ সেই আশা পাইয়া পাঠকবর্গকে এক সাধক কবির জীবনী উপহার দিতেছি।

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥" চাণক্য, ১৪।

বিষে সুধা থাকিলে গ্রহণ করিবে, কুস্থান হইতে কাঞ্চন লইবে; হীন জাতি হইতেও বিদ্যা শিখিবে এবং হীন বংশ হইতেও কন্যারত্ন গ্রহণ করিবে। সুতরাং আমরাও সেই সুধাটুকু * পাঠক সমীপে উপনীত করিব। এক্ষণে

---

(১) Life and Death." By prof. Franklin 2nd part. P. P. 325.

* সুধা—এখানে যেন কেহ মদ্ ভাবিবেন না, কারণ, আজকাল "সুধা" অর্থে অনেকে তাহাই ব্যবহার করেন। "সুধা" অমৃতময় কবিত্ব।

"আমরা যে মহাপুরুষের জীবনী লিখিতেছি, তাঁহার নাম—"সাধক-কবি রাম-প্রসাদ সেন।" রামপ্রসাদ সেনের নাম এবং জীবনী প্রায় সকলেই অবগত আছেন সুতরাং আমরা তাঁহার সংক্ষেপ-জীবনী ও তাঁহার ভক্তিরসার্দ্র অমৃতময় গীত সকল কিরূপ ও তাঁহার কিরূপ কবিত্ব তাহাই দেখাইব। পাঠকগণ! একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঠ করিবেন।

মাতৃভক্ত প্রায় সকলেই থাকেন। কিন্তু এরূপ মাতৃভক্ত কয়জন আছেন? এরূপ মায়ের নিকট কয়জন আবদার করিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র মাতৃ-চরণে সমস্ত মন প্রাণ সঁপিয়াছেন, এরূপ লোক কয়জন দেখিতে পাও?

যিনি ভক্তি-গীতে দেশকে মুগ্ধ করিয়াছেন, এরূপ কয়জনে করিয়াছেন? যাঁহার গীত আজও গ্রামে-গ্রামে, নগরে, প্রান্তরে, কান্তারে ধ্বনিত হইতেছে, আজও যাঁহার সেই মধুময় শ্যামা সঙ্গীত শিশু কর্ত্তৃক গাহিত হইতেছে, সে গীতের রচনা কে করিয়াছেন,—"কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।" রামপ্রসাদের নাম জগৎ বিখ্যাত, কেনা তাঁহাকে জানে? সঙ্গীতের পূর্ব্বে গাহকগণ আগে সেই ভক্তিরসার্দ্র রামপ্রসাদের মধুর শ্যামা-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। মা'র সময় সময় নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল, তাই সাধক তাঁহাকে কখন তারা, কখন কালী, আবার কখন শ্যামা, উমা ইত্যাদি বলিয়া গীত রচনা করিয়াছেন। ঐ দেখ একজন অন্ধ বৈষ্ণব বেহালা বাজাইয়া গাহিতেছে;—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এ দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গা নাম কিনে এনেছি॥

মরি মরি কি সুন্দর মধুময় অপরূপ বর্ণনা। কবি অনেকেই আছেন কিন্তু এরূপ "কবি" কয়জন? না জানি রামপ্রসাদ বুঝি কোন দেবতা, শাপভ্রষ্ট হইয়া অথবা বঙ্গবাসীকে মুক্তি মন্ত্র কর্ণে দিবার জন্যই বোধ হয় তাঁহার ধরা-তলে জন্ম। হায়! এমন লোকও জন্ম গ্রহণ করিয়া হতভাগা "কালা বাঙ্গালীকে" মুক্তি মন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তখন কেহ চিনে বা শুনে নাই, যে শুনিয়াছে সে ভব যন্ত্রণা জুড়াইয়াছে। আর এক কথা—চিনিবে কি প্রকারে? তোমরা যে চাও না চেনা দিতে, চেনা, না দিলে চিনিবে কি প্রকারে? "বামন" হইয়া যে তোমরা চাঁদে হাত দিতে চাও—গতিকে থাকিয়া

যাও। এমন সুন্দর 'পথ' থাকিতেও কথা শুন না। সাধকের কি অপরিসীম ভক্তি!" আমি অভয় পদে প্রাণ স'পেছি " যে অভয়ার চরণে প্রাণ স'পিয়াছে, তা'র আর ভয় কি এবং যে স'পিতে পারে সে নিশ্চয়ই দেবীর "বরপুত্র।"

"এ দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গা নাম কিনে এনেছি।"

পাঠকগণ দেখুন "ভক্তি" কিরূপ? কথায় বলে ভক্তি থাকলে মুক্তি হয়।" এরূপ যার ভক্তি আছে সেই মুক্ত হইবে—ইহাত ধরা কথা!

"মেধাসি দেবি! বিদিতাখিল শাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভব সাগর নৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারি হৃদয়ৈক কৃতাধিবাসা,
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা॥ ১১॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী।

দেবি! যাহার দ্বারা অখিল শাস্ত্রের ফলভূত ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই ধারণা শক্তি বুদ্ধিও তোমারই স্বরূপ, তুমি দুঃখময় সংসার-সাগর তারিণী তরণী, কিন্তু সামান্য সাগর-তারিণী তরণী কর্ণধার সাপেক্ষ, আর তুমি অসঙ্গী অদ্বিতীয়া, তুমি দুর্জ্ঞেয়া, তাই তোমাকে "দুর্গা" বলে।

আর একটী দৃষ্টান্ত দেখুন।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ সাগরে ভাসি;
ওরে কালীপদ কোকনদে, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা।
ওরে অনলে দহন যথা—হয়রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃ ঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তা'র গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় তা'র দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলেরে এলোকেশী॥

দাশরথি রায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই।
অভক্তিতে আমি ব্রাহ্মণের নই॥"

বাস্তবিক কথাটা সত্য বটে। ভক্তি বিনা কিছুই সিদ্ধ হয় না বা ভক্তিতেই লোকে মুক্তিলাভ করে। সাধক কাশীর সঙ্গে আর মায়ের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন. সুতরাং ইহাতেই বুঝা যায় সাধক অতুল্য মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার কবিত্বের কেমন অর্থ ও মধুময় ভক্তিপূর্ণ গীত বলিয়া রামপ্রসাদকে সাধক না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি কেহ "মাতৃভক্ত" পাঠক থাকেন তবে বুঝুন মা হওয়া কি মুখের কথা। মা'র সম্বন্ধে গাহিয়াছেন ;—

কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন,
যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালেনা,
এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে-
বলে, মারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তা'তে তোমার হয় না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতার ধারা,
নাম ধরোনা জগন্মাতা॥

রামপ্রসাদের যে গীতটী পাঠ করা যায় সেইটেতেই মনঃপ্রাণ বিগলিত হয়। মা হওয়া কি মুখের কথা। মা যে কি বস্তু তাহা রামপ্রসাদের মত লোকই বুঝিয়াছেন। আমরা জ্ঞানান্ধ মানব সুতরাং এ সকল দুরূহ শব্দের অর্থ আমাদের বোধ করা বড় কঠিন ব্যাপার। শেষে উমার পিতার সহিত উপমা করিয়াছেন

যদি ধর আপন পিতৃধারা
নাম ধরোনা জগন্মাতা॥

এরূপ কথা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে? রামপ্রসাদ যে যথার্থই মায়ের বরপুত্র তাহা এ গীতে প্রমাণিত হইতেছে। বাঙ্গালীকে সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিবৃত্তি করিবার এবং শান্তি লাভ করিবার জন্য সাধক কবি বাঙ্গালীকে মোক্ষমন্ত্র কর্ণে দিয়াছেন। বাঙ্গালী তোমরা এই মন্ত্র সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হও এই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি মন্ত্র দিতে আসিয়াছিলেন তোমরা কার্য্যদ্বারা তাহা পরিণত করিয়া লও মুক্তি পাইবে। সেই

মুক্তকেশীর পাদপদ্মে স্থান পাইবে সেইখানে আবার রামপ্রসাদকে দেখিতে পাইবে—শান্তি পাইবে।

ঐ দেখ এক বৃদ্ধ গাহিতেছে :—

আমি নই আটাসে ছেলে।
ভয়ে ভুলবনাকো চোক রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ শিব ধরেন যা হৃৎকমলে।
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সৈ মোহর রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার ক'রব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দামায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দামা, ধূম হ'বে রাম প্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হ'ব যখন আমায়, শান্ত ক'রে লবে কোলে ॥

তেমনি তোমাদের ঐ শক্তি মাতা শান্তি করিয়া কোলেতে লইবেন—মায়ের কোল পাইবে।

কথায় বলে,—

সাধ্‌লেই সিদ্ধি। আগ্‌ভাগেই নি্‌ধি ॥

তেমনি তোমরাও সাধিয়া সিদ্ধ হও।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ;—

'ইথে আর কি আপদ আছে,
(এই যে তারার জমী আমার দেহ)
যা'তে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্র বীজ বুনেছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার, পাপতৃণ সব কেটেছে।'

দেখিলে! তেমনি ঐ অস্ত্রে তোমাদের দেহস্থিত পাপ তৃণ কাটিয়া যাইবে। কবিরঞ্জনের গান অতি সুমধুর একদিকে সুমধুর রাগিণী, অন্যদিকে গানের কবিত্ব ও তাহার অর্থ এবং অন্য দিকে ভক্তি। সুতরাং প্রসাদের গীতে জগৎ মাতোয়ারা!

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও মন কেন রে পেয়েছ এত ভয় ॥

তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়।
দুর্গা-নাম-তরণী করে বেগে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয়॥

ভাই পাঠকগণ! তুফানে ভয় করিও না ঐ দেখ রামপ্রসাদ তুফানকে ভয় না করিতে বলিয়া গিয়াছেন, তোমরাও ঐরূপ বল। কবিরঞ্জন গাহিছেন ;—

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরু দত্ত নাম কর,
দিবা নিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জান,
নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
আর নজর ফির মনে কর,
ঐ দক্ষিণা শ্যামা মারে॥

যত শোন কর্ণ পুটে,
সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী,
বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রাদ রটে,
ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।
ওরে, আহার কর মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মারে॥

সেই রূপ তোমরাও শ্যামা মাকে আহুতি দাও ইহাই সাধকের উপদেশ। সাধক সাটে সোটে বলিয়াছেন আবার কি বলিবেন? যাহা হউক, এক্ষণে সাধকের একটু সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিলাম।

১১৯৯ সালে ২৪ পরগণায়, হালিসহর, কুমারহট্ট পল্লীতে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইতি জাতিতে বৈদ্য ইঁহার পিতার নাম রামরাজ সেন, রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন।

রামপ্রসাদ কলিকাতায় কোন ধনাঢ্যের অধীনে চাকুরী করিতেন। তিনি এক দিন হিসাবের খাতায় "আমায় দাওমা তবিলদারী" এই গানটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কর্ম্মচারী রামপ্রসাদের প্রভুকে এই গীত সম্বলিত খাতাখানি দেখান। তাঁহার প্রভু ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়া তদবধি রামপ্রসাদকে ৩০৲ টাকা বৃত্তি দান করিলেন। পাঠকগণ! একটু মননিবেশ পূর্ব্বক উপরিউক্ত কথাটী পাঠ করুন। দেখুন রামপ্রসাদ সামান্য কর্ম্মচারী হইলে ও তাঁহার অন্তরে মাতৃভক্তি জাগ-

রিত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি পুনরায় অধিক বৃত্তিলাভে অধিকারী হইলেন।

অদৃষ্টই মনুষ্যের মূলাধার। কথায় বলে ;—

"যার যা কপালে আছে।
ঘটবে তা' পাছে পাছে॥"

যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিবরণটী বলা যাউক। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্বিখ্যাত এবং তাঁহার সদ্গুণাবলী চতুর্দ্দিকব্যাপী বিস্তৃত। যত প্রকার সুশিক্ষিত গায়ক, লেখক ও বলিষ্ঠ এবং কৌতুককর লোক সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগের গুণাবলী দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কর জমী এবং তদুপযোগী উপাধি ও বৃত্তি দান করিতেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, গোপাল ভাঁড়, আশানন্দ ঢেঁকি * প্রভৃতির ন্যায় রামপ্রসাদের সুমধুর ভক্তিরসাত্র সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি এবং একশত বিঘা নিষ্কর জমী দান করিয়াছিলেন।

সেই জন্যই বলিতেছি—তখন এককাল আর এখন এককাল! কবি বলিয়াছেন—

"কালে কালে কতই হবে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম উড়ে যাবে॥"

* আশানন্দ পূর্ব্বে এক অসীম শক্তিশালী বীর পুরুষ ছিলেন, ন্যাঙো ইত্যাদি তাঁহার কাছে লাগিত কিনা সন্দেহ। তিনি কোন এক ধনাঢ্যের বাটীতে গিয়া আশ্রয় লন। ধনাঢ্যও আদর যত্ন করিয়া রাখেন। সেই দিন রাত্রিকালে একদল ডাকাত আসিয়া ঐ ধনাঢ্যের বাটী লুট করিবার উপযোগ করে। তিনি কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটবর্ত্তী স্থলে একটী ঢেঁকি পুতা ছিল, তিনি তাহাই টানিয়া তুলিয়া সেই ঢেঁকি ঘুরাইয়া ২০।২৫ জন ডাকাতকে আহত করেন, অবশিষ্ট জন পলাইল।

গৃহস্বামী প্রত্যূষে এই ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তখন সমুদায় ঘটনা বলেন। তদবধি তাঁহার "ঢেঁকি" উপাধি হইল। ইনি আরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আশানন্দের মত কত লোক তখন এই বঙ্গভূমে ছিল তাহা ঠিক করা যায় না। বিশ্বনাথ, রঘুনাথ এক এক জন প্রসিদ্ধ ডাকাত ও প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল, বীরত্বেও বিজয়ী ছিলেন। দয়ামায়াও অপরদিকে অপরিসীম ছিল তাহা এ ক্ষুদ্র স্থানে বর্ণনাতীত।

আর একজন বলিয়াছেন ;—

"দায়ে না কেউ আসবে ছুটে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যাবে টুটে ॥"

তখনকার লোকেরা দেশের উপকার করিত ; পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিত ; সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইত। তখনকার লোকে মন অনুযায়ী ধন পাইত।

কথায় বলে ;— "যার যেমন মন।
তা'র তেমন ধন ॥"

এখনকার লোকের যেমন মন, তেমনি ধন পাইয়া থাকে, রামপ্রসাদও সেই মন অনুযায়ী ধন পাইয়াছিলেন। তখন খাদ্যাদি সস্তা ছিল কারণ দেশের জিনিষ দেশে থাকিত—চালান হইত না, চাষারা মাল-চালানের মর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝিত।

সেই এক কাল গেছে, আর এই এক কাল? একালে কেহ পরের ভাল দেখিতে পারে না। কিসে নিজের মঙ্গল হইবে, এই চেষ্টা—পর মরুক বা বাঁচুক তা'তে কিছু আসে যায় না। এখন আর সে দয়া, মায়া নাই, আছে কেবল—হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ এবং রাশি রাশি পাপ কার্য্য, সেই জন্য লক্ষ্মী দেবীও অচলা, ভারতের ভাগ্যও তেমনি! অন্য কথা বলিব কি—পিতা পুত্রে অসদ্ভাব, অন্যের কথা কি কহিব; এখন পাপ ষোল আনার কাছাকাছি, কেবল পূর্ব্ব পুণ্যবলে অথবা ঋষিদিগের পুণ্যে, লোকের এখনও দু'বেলা দু'মুঠা জুটিতেছে। যাহা হউক প্রকৃত কথা না বলিয়া হেলা মেলা বলা কেবল পাগলের মত বকা মাত্র!

রামপ্রসাদও প্রত্যুপকার স্বরূপ বিদ্যা-সুন্দর কাব্য রচনা করিয়া মহারাজকে অর্পণ করেন। ইনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাধককে অধিকপরিমাণে মাতৃভক্ত বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার কবিত্ব অতি মধুর ও ভক্তিপূর্ণ বলিয়া আজ রাজরাজেশ্বর রাজা এবং কুটীরবাসী কৃষক ও হিন্দু শিক্ষিত, অশিক্ষিত স্ত্রীলোক এবং বালক, বালিকা সকলেই তাঁহার কৃত মাতৃ-সঙ্গীত গ্রন্থ হৃদয়ে ধারণ করিতে ভাল বাসেন!

কবিরঞ্জন ধর্ম্মের দ্বেষাদ্বেষী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজ তল্লাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা, দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে; পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামপ্রসাদ নানা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এই গীতগুলি রচনা করেন। পাঠকগণ! একবার "দেঁতোর হাসি" কথাটার অর্থটী বুঝিয়া লউন।

মাকে আর এক স্থলে রামপ্রসাদ কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন ;—

মা বসন পর, বসন পর, বসন পর, মাগো, বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, (ঐ) পদে দিব আমি গো ॥ *
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারি, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হ'য়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
(কাল) কা'র বাড়ী গিয়েছিলে মা গো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে দেখি রক্ত জবা গো ॥
ডানি হস্তে বরাভয়, (মা) বাম হস্তে অসি।
কাটিয়ে অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো ॥

---

* বি, বসু রাম প্রসাদী সঙ্গীতে কয়েটী স্থলে কথার শেষে "গো" কথাটী বসাইয়াছেন, আমরা গো কথাটী শুনি নাই, ও দেখি নাই, এবং মাঝে মাঝে কথা কম আছে, তাহা আমরা ( ) বন্ধনী মধ্যে দিলাম।

অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হ'য়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো॥
(মা) আপনি পাগল পতি পাগল, মাগো আর এক পাগল আছে।
ওমা, দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো॥

সংসার অসার, সাধক তাহা বলিয়াছেন ;—

এই সংসার ধোকার টাটী।
ও ভাই আনন্দময় বাজার লুটী॥
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী॥
যেমন সরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব সেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটী॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা, সুখে পান করে, শেষে—বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটী॥
আনন্দে প্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী॥

পাঠক! রাগ করিবেন না,—প্রকৃত কথাই যা রামপ্রসাদ তাহাই লিখিয়াছেন। ভাবিতে গেলে রমণীই সর্ব্বনাশের মূল। বঙ্কিম বাবু আনন্দ-মঠে বলিয়াছেন,—"রমণী অনেক সময় সহায় এবং অনেক সময় নয়।" কিন্তু তিনি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সেইরূপ রমণী অতি অল্প। যাহা হউক রামপ্রসাদ অন্যায় বলেন নাই।

সাধক শ্মশানে মাকে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

হের কার রমণী নাচেরে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব নীল জলধরকায়,
হায় হায়, কেরে, হর হৃদি হর-পদে দিগবাসে॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন যায় রসাতলে ধরণী ;

হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে ভাসে।
কেরে, নিন্দিত রামকদলী তরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষ-বলে ভুজঙ্গ-দলে, নাভিপদ্মমূলে,
ত্রিবলীর দলে দংশিল এসে ॥
কেরে, উন্নত কুচ-কলি, মুখ শতদলে অলি,
অলি, গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকসিত সিতাম্ভোজ বনরে হায় ;
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোচনদৃশ্য, হয় মনোলোভা,
যেন আশার আবেশে, শিশু সুধা ভাসে।
কেরে, কুণ্ডল জাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহেভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা ;
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, ক্ষিতি মৃদু দোলে,
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত দুন্দুবা দুন্দুবী, নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া, সুধা যোগায় অমনি,
রামপ্রসাদ ভনে কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবছলে আশুতোষে ॥

কৃষ্ণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি,
নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে।
[illegible]তর লাঘব হেতু,
[illegible] তরণী,
[illegible] কর মনের রঙ্গে।
[illegible]পণ,
চাও [illegible] ধন,
[illegible] প্রেম তরঙ্গে।

আগে চরাইতে ধেনু,
বাজাইয়া মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে,
কোন্‌বা বিষয় পেয়ে,
খেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥
ভণে রামপ্রসাদ,
হায় একি প্রমাদ,
কাজে কি হে কথা প্রসঙ্গে ॥

সময় উচিত কও,

কোনরূপে পার হও,

দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥

ইহাতে বোধ হয়—কবিরঞ্জন কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করিলেও অধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। পাঠকবর্গকে উহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য এই গীতটী সঙ্কলিত করিয়াদিলাম। কবিরঞ্জনের আর একটী গীত লিখিয়া বিশ্রাম লাভ করিব।

জগৎ জননী—ত্বরা ওগো তারা।
জগৎকে তরালে আমাকে ডুবালে,
আমি জগৎ ছাড়া গো তারা ॥
দিবা অবসানে রজনী কালে,
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥
দীন প্রসাদে ভাবিয়ে সারা,
মা হয়ে পাঠালে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥

সাধকের এ গীতটী আরও শ্রুতি সুখকর। "মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া" এইটী বড় শ্রুতিসুখকর। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের যে গীতটী দেখা যায়, সেইটীই সুমধুর। সে রামপ্রসাদ আর নাই,—আছে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত। সেইরূপ মানুষ চলিয়া যায় "স্মৃতি" পড়িয়া থাকে। রামপ্রসাদ চলিয়াগিয়াছেন,—তোমরাও চল—তারপর চল, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও এবং মুখে বল "জয় মাইকি জয়!"

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য জ্যোতীরত্ন।

সে আমারি আমি তার।

নীরব অবনী আজি
সুধামাখা সুধাকর
কাঁপায়ে কুসুম বন
বহিয়ে মৃদুল বায়
সুস্নিগ্ধ অথাত তীরে,
বসিয়া ভাবিছে বালা
অনন্ত কালের সনে;
হেরি নাই কতদিন
দারুণ নিদাঘে যবে
মধ্যাহ্নে তপন তাপ
তাপিতা ধরণী হিয়া
রয়েছি আসিবে ব'লে
নীরদ মালায় যবে
কেতকী অঞ্চলসনে
বরসিছে অবিরাম
ভিজেছি হেরিব ব'লে
বিমল আকাশ তলে
শরতে সুধাংশু হাসি
তুলিয়া সরসী বুকে
কুমুদ কমল সনে
অমিয়া কৌমুদী রাশি,
হাসিছে মধুর হাসি,
ফুল্ল ফুল যুথিকার
ঢালিছে সুধার ধার।
বিগত প্রহর নিশি;
কতকাল গেছেমিশি,
মুরতি সুধার ধার
সে আমার আমি তার।
স্বেদ-সিক্ত কলেবর
উষ্ণানিল খরতর,
শুষ্ক কণ্ঠা চাতকিনী,
কতদিন একাকিনী।
গাঢ় তর নভস্তল,
ছোটে মৃদু পরিমল,
ঝম ঝম বারি ধার
সে আমার আমিতার।
রজত জ্যোছনা ধারা
করে যবে মাতোয়ারা,
মৃদুল লহরী রাজী
অপূর্ব্ব মোহিনী সাজি।
নিশীথে নীহার রাশি
তীক্ষ্ণ শীতবাত সনে
কুয়াসা কুআশঢাকি
হেরিতো! পাবকি তারে
বসন্তে সায়াহ্নে যবে
জাগাইয়া জীবনের
চূত শাখে বন বধূ
ভাবকি হে প্রিয়তম!
হীনজ্যোতিঃ দিনকর,
তরুকাঁদে নিরন্তর,
ভাবি শুধু বার বার,
সে যে মোর আমিতার।

শ্রীবসন্তকুমার কবিরঞ্জন।

ভুল।

—*—

যত কিছু মোর জীবনের সাধ,
হৃদয়ে গুছা'য়ে রেখে,—
তোমার নিকটে এক এক করি
নিবেদিব বলি সখে!
সখা! আসি পরে সমুখে দাঁড়া'লে,
হেরি ও রূপ অতুল,
সবসাধ, আশা,—পরাণের ভাষা,
সকলই হয় ভুল।
চাঁদিনী প্রদোষে, একাকিনী যবে
আপনার মনে মাতি;—
আধফোটা ফুল যতনে তুলিয়া,—
বড় সাধে মালা গাঁথি;
যখন মালার মোহন গাঁথনি
করিতে চাহি অতুল,—
তখনই তুমি, দাঁড়ালে আসিয়া,
সবই হ'য়ে গেল ভুল।
যত গৃহকাজ,—হাসি—সুখ—কাজ
অবশ্য কর্ত্তব্য যত,—
তোমার আনন বারেক হেরিলে,
সব মোর হয় গত।
মনে হয় শুধু এ ধরায় যেন,
তুমি যে সদা অতুল,
তব মুখ হেরি জগত পাশরি
জীবনও মহাভুল।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ পাল।

বীরবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পথে পরিচয়।

পূর্ব্বকালে বিন্ধ্যাচলের সন্নিকটে প্রতাপগড় নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এখন উহার ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে! যখন খিলিজি ও টোগলক বংশীয় পাঠান-সম্রাটগণের সিংহ বিক্রমে সমগ্র দক্ষিণাপথ আলোড়িত হইতেছিল, তখন ক্ষুদ্র প্রতাপগড় সগৌরবে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল। প্রতাপগড়ের এক পার্শ্বে রজত-সূত্র-বৎ-প্রবাহিতা স্রোতস্বতী নর্ম্মদা,—অপর পার্শ্বে পর্ব্বতসঙ্কুল দুর্ভেদ্য অরণ্যানী।

আজি হইতে প্রায় পাঁচ শত আশী বৎসর পূর্ব্বে এই দুর্গম অরণ্য-পথে একজন অশ্বারোহী পথিক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। নিবিড় অরণ্য, পথও অতি সঙ্কীর্ণ। সেই সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া অনুমান হয়, সে পথে মানুষের গতিবিধি অতি বিরল। অশ্বটি অতিশয় পরিশ্রান্ত, মুখে ফেনপুঞ্জ, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত, অশ্বারোহীও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর।

বেলা অবসান প্রায়। ভগবান মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইবার উপক্রম করিতেছেন; পথিক সেইস্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ইতঃস্তত অবলোকন করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষরাজী, উর্দ্ধপথে অনন্ত আকাশ; বনপ্রান্তে নীল গিরিমালা অন্ধকারে মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। অশ্ব যে পথে চলিতেছিল, সে পথ সেই স্থানেই অবরুদ্ধ; সম্মুখে অথবা পার্শ্বে কোন দিকেই অশ্বচালনার উপায় নাই, ক্রমশই অন্ধকার। নিবিড় অরণ্যমধ্যে অন্ধকারের নিবিড়তা অধিক, সুতরাং পথিক অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই বিরাট অরণ্যে জন-প্রাণীর সমাগম নাই; পথিক যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই অন্ধকার। নিশ্চল তরুরাজি অন্ধকারের বিরাট গহ্বরে ধ্যান মগ্ন যোগীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; অরণ্যানী

নিস্তব্ধ। অনুমানে বোধ হইতেছিল, যেন সেই বনরাজ্যের সাম্য প্রকৃতির জীবজন্তু সকলেই নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে পরমসুখে বিঘোর অচেতন।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা বিভঙ্গে একটা সুতীব্র আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইয়া পথিকের তন্মনস্কভাব তন্মুহুর্ত্তেই অপসারিত করিয়া দিল। তিনি স্থির কর্ণে নিস্পন্দ ভাবে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন।

পরক্ষণে আবার সেইরূপ হৃদয়ভেদী বিকট চিৎকার! যেন কোন অনাথা রমণী মর্ম্মাহত হইয়া সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় সকাতরে চিৎকার করিতেছে। পথিক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার অন্তরাত্মা সবেগে কাঁপিয়া উঠিল; শব্দ লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দুর্ভেদ্য বনপথে অগ্রসর হইলেন।

পথিক রাজস্থানীয় যোদ্ধ্‌গণের ন্যায় সমরবেশে সুসজ্জিত; সুদৃঢ় বর্ম্মে তাঁহার বক্ষদেশ আচ্ছাদিত, কটিদেশে কোষবদ্ধ অসি প্রলম্বিত; প্রশান্ত ললাটোপরি মহার্হ উষ্ণীষ শোভা পাইতেছিল; কর্ণে রত্নকুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নহার, সুদীর্ঘ বর্শা পৃষ্ঠদেশস্থ চর্ম্মরজ্জু সহকারে আলম্বিত। পথিকের বর্ণ যেরূপ অত্যুজ্জ্বল সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গের গঠনগুলিও তদ্রূপ প্রচুরায়ত, সুরম্য ও সুসৌষ্ঠব। সেই সুন্দর কান্তি ও সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠবোপরি সুদৃশ্য মহার্হ রত্নাবলী সুন্যস্ত হওয়ার তাঁহার বীরহৃদয় অতুল সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াছিল। পথিকের সর্ব্বাবয়ব নিরীক্ষণ করিলে বয়স্ এখনও পঞ্চবিংশতি বৎসরের সীমা অতিক্রম করে নাই এরূপ অনুমিত হয়।

পথিক দ্রুতপদে বনপথে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেন। লতা-কণ্টকে তাঁহার অঙ্গ বস্ত্র ছিন্ন হইতে লাগিল; পথ নাই, অথচ তাঁহার গতিরও বিরাম নাই, কোথায় লক্ষ্যস্থল—তাহাও তাঁহার জানা নাই, কোন্ পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে—তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহার অবসর নাই; শব্দ লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অরণ্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি বনভূমির কিয়দংশ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু আর সে ভাবে অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না, এবার তাঁহার গতিরোধ হইল।

পরক্ষণে আবার চিৎকার; আবার সেই শুদ্ধ অরণ্যানী প্রকম্পিত করিয়া বিকট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল; সেই আর্ত্তনাদ যে কোন বিপন্না রমণীর কণ্ঠপ্রসূত, তাহাতে পথিকের আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে আশ্বাস প্রদান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে

প্রবেশ করিলেন; আর তাঁহার পথাপথ বিচারের অবসর রহিল না; তাঁহার প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের নিকট বাধা বিঘ্ন সমস্ত অন্তর্হিত হইল; অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সেই নিবিড় অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া একটি প্রশস্ত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রান্তরে আসিয়া মুক্ত আলোকে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না; ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় তাঁহর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

পথিক দেখিলেন, তিন জন দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচ একটি রমণীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছে; রমণী তখন এক প্রকার সংজ্ঞাহীনা—হতচেতনা, আত্মরক্ষায় একেবারে সামর্থ্যহীনা।

এই হৃদয় স্তম্ভন ঘটনা সন্দর্শনে পথিকের প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। সিংহ বিক্রমে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া এক-জনের পৃষ্ঠদেশে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; প্রহৃত ব্যক্তি সেই মুহূর্ত্তে করকবলিতা রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পর হইল; হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া এবং আগন্তুকের সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার সঙ্গী-দ্বয়ও সেই পন্থা অবলম্বন করিল।

পথিক তখন রমণীর মুখমণ্ডল হইতে বন্ধন বস্ত্র বিচ্যুত করিয়া উভয় হস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন; তাঁহার শুশ্রূষায় রমণী চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পিশাচ, ছাড়িয়া দে—ছাড়িয়া দে!"

পথিক তখন উৎসাহ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আর আপনার ভয় নাই; দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে, আপনি বস্ত্রাদি পরিধান করুন।"

ভয়বিহ্বলা রমণীর হৃদয়ে যেন স্বর্গ হইতে অমৃতধারা পরিসিঞ্চিত হইল; তিনি কম্পিত হস্তে আলুলায়িত কেশপাশ পুঞ্জলিবদ্ধ করিলেন, অনন্তর বস্ত্রাদি সংবরণ পূর্ব্বক পথিকের সম্মুখীন হইয়া তিনি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি আমার জীবনদাতা; যে ধর্ম্ম প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, নারীর যাহা একমাত্র রত্ন, আপনার কৃপায় আজ তাহা রক্ষা পাইয়াছে; আপনি আমার উদ্ধার কর্ত্তা—আপনি আমার জীবনদাতা।"

তখন মুক্ত আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, চন্দ্রমার রজত-রশ্মি-জাল দেখিতে দেখিতে সেই সুবিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, পার্শ্বদেশস্থ নিবিড় বনরাজি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; প্রান্তর পার্শ্বস্থ বিটপীশ্রেণীর তুঙ্গ শীর্ষাবলী সেই শুভ্র-

রজত-রশ্মি-জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া অতি মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করিতেছিল। সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে পথিক সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন, যে রমণী তাঁহার নিকট সানন্দে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন—তিনি অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী নবীনা ষোড়শী যুবতী।

সেই নির্ম্মল নিশীথে, সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যানী পরিবেষ্টিত শুভ্র জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রান্তরে, সেই ফুল্ল-ফুলদল-সদৃশী মাধুর্য্যময়ী ললনামূর্ত্তি অবলোকন করিয়া পথিক একেবারে মন্ত্র মুগ্ধবৎ অচল হইয়া পড়িলেন। বিপন্না বালার বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর কথাগুলি তাঁহাকে আরও মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার বাক্যের উত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না; সেই অজ্ঞাত কুলশীলা অজানা ললনার রূপ-মাধুর্য্যের নিকট সেই সশস্ত্র যোদ্ধার হৃদয় নিহিত সৌজন্য, সাহস, শক্তি, লোকাচার যেন কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। তিনি অনিমেষ লোচনে সেই সুলোচনার রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতপক্ষে রমণী অনিন্দ্য সুন্দরী। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এরূপ ভাবে সুগঠিত যে, মর্ত্ত্যের মানবীতে বুঝি তাহা সম্ভব হয় না; মুখ খানি এত সুন্দর, এত মনোহর, এত প্রিয়দর্শন যে—পথিকের সতেজ নয়নে এ পর্য্যন্ত এরূপ বদন নিপতিত হয় নাই। চক্ষু দুটী কেমন প্রশস্ত, কেমন সুঠাম, কেমন পরিষ্কার, তাহার উপর আবার কেমন সরলতার ছায়া বিদ্যমান!—বুঝি বনের হরিণীরাও যুবতীর নয়ন দুটী দেখিয়া লজ্জায় স্ব স্ব নয়ন মুদিত করিবার চেষ্টা পায়। আবার ঐ কুরঙ্গ-নয়ন-বিনিন্দিত নয়ন দুটীর উপরিস্থ ভ্রূযুগল কি চমৎকার! কি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ! কেমন অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ধনুকের মত বাঁকা!—ঠিক যেন চিত্রকরের তুলিকায় অতি সাবধানে আঁকা! ললাটটী কেমন সুন্দর! কেমন সুঠাম! কেমন সুলক্ষণযুক্ত!—বুঝি বিধাতা স্বয়ং সুলক্ষণের ছাঁচে ঢালিয়া সেই সুলক্ষণার ললাটটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার মস্তকের আলুলায়িত, আপদ চুম্বিত ভ্রমর কৃষ্ণকেশ গুচ্ছও সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গের সুসৌষ্ঠব ও লালিত্যের অনুরূপ।

পথিক এক দৃষ্টে অনিমেষলোচনে যুবতীর অলৌকিক রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, এই অতুল রূপরাশি মর্ত্ত্যের মানবীতে সম্ভব নয়, বুঝি স্বয়ং প্রকৃতিরাণী মোহন ফুলসাজে সাজিয়া এক মনে মনোমোহন বসন্তদেবের আরাধনায় নিযুক্তা, অথবা বিশ্বপিতা বিধাতা জগতের সৌন্দর্য্য-

রাশি এই রমণী-হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া বিশ্ববাসীর মনমুগ্ধ করিবার নিমিত্ত মোহিনীকে এই নির্জ্জন প্রান্তরে স্থাপন করিয়াছেন।

পথিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় যুবতী অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আমাকে নিতান্ত হীনা পতিতা বালিকা বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু আমি তাদৃশা হীনা নহি, সদ্বংশে আমার জন্ম, আমি কোন স্বাধীনচেতা নৃপতির প্রাণোপম কন্যা, ভাগ্যদোষে আমি আজ হীনার মত এই ভীষণ প্রান্তরে নীতা হইয়াছি।"

মৌনমুগ্ধ পথিকের এতক্ষণে সংজ্ঞা হইল; তিনি তাঁহার ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি যে কোন মহৎবংশ-সম্ভূতা তাহা আমি আপনাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিয়াছি, এতক্ষণ মনে মনে তাহারই আলোচনায় নিযুক্ত ছিলাম, সেই জন্য আপনার বাক্যের কোন উত্তর দিতে পারি নাই, সেজন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।"

যুবতী লজ্জাবনত-মুখে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার জীবনদাতা, আপনার নিকট আমি চিরঋণী, সুতরাং এই আশ্রিতা বালিকার প্রতি এরূপ বিনয় প্রকাশ সঙ্গত নয়।"

পথিক ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "এই সামান্য উপকার পাইয়া আপনি আমার নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত লজ্জিত; অত্যাচারের হস্ত হইতে অবলা রমণীর রক্ষা রাজপুতের কর্ত্তব্য কার্য্য—শ্লাঘার বিষয় নয়; যাহা হউক আপনার পরিচয় প্রদান করিতে কি কোন বাধা আছে?"

যুবতী সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাধা?—জীবনদাতার নিকট পরিচয় প্রদানে আবার বাধা কি? আপনি যখন দস্যু হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তখন আমার আশা আছে, আপনার সাহায্যে আমি আবার নির্ব্বিঘ্নে আমার পিতৃ-গৃহে উপস্থিত হইতে পারিব।"

পথিক সানন্দে বলিলেন, "ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ইহাতো আমার কর্ত্তব্য কার্য্য; সেই জন্যই আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

যুবতী তখন অবনতমুখে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় প্রতাপগড়ের নাম শুনিয়াছেন?"

"প্রতাপগড়?" সবিস্ময়ে পথিক বলিয়া উঠিলেন, "প্রতাপগড়? আপনি কি তবে প্রতাপগড় হইতে এই স্থানে নীতা হইয়াছেন?"

যুবতী বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য; প্রতাপগড় হইতেই দস্যুরা আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রতাপগড়ের প্রান্তভাগে বিরূপাক্ষদেবের মন্দির আছে, আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি দেখিতে আসিয়া থাকি, আজ সন্ধ্যার সময় অন্যান্য দিবসের মত একজন দাসীর সহিত শিবিকারোহণে মন্দিরে আসিতেছিলাম, পিতার আদেশানুসারে আমার শিবিকার সহিত দুইজন করিয়া অশ্বারোহী সৈনিক আসিত, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তাহারা আসে নাই; পথিমধ্যে দস্যুরা আমার শিবিকা আক্রমণ করে, বাহকেরা দস্যুভয়ে শিবিকা ফেলিয়া পলাইয়া যায়, অবশেষে পিশাচেরা আমাকে এই প্রান্তরে লইয়া আসে, তাহার পরই আপনার এস্থানে আগমন।"

পথিক সাগ্রহে বলিলেন, "আপনি প্রতাপগড়ের কোন্ ভাগ্যবানের কন্যা, তাহা কি জানিতে পারি?"

যুবতী বলিলেন, "আপনি বোধ হয় প্রতাপগড়ের রাজার নাম শুনিয়া থাকিবেন, আমি তাঁহারই কন্যা।"

পথিক রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি রাজা মহীপৎ সিংহের কন্যা?"

যুবতী অবনত মুখে বলিলেন, "হঁা।"

যদি সেই মুহূর্ত্তে, সেই মুক্ত পথিকের সম্মুখে এককালে সহস্র বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও পথিক এত বিস্মিত হইতেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরক্ষণে তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "মহীপৎ সিংহের কন্যা আপনি? শুনিয়া সুখী হইলাম।"

যুবতী পথিকের এই প্রকার ব্যগ্রতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তাঁহার পরিচিত?"

পথিক বলিলেন, "তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই সত্য, কিন্তু বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোন আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য আমি তাঁহারই নিকট যাইতেছিলাম।"

উপযুক্ত অবসর পাইয়া এই সময় যুবতী বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার পরিচয় প্রদান করিতে কি কোন আপত্তি আছে?"

যুবক হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপত্তি কিছুই নাই; আপনি কর্ণাটরাজ প্রসেনজিতের নাম শ্রবণ করিয়াছেন?"

"কর্ণাটরাজ প্রসেনজিৎ? তিনি আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন;

পিতার নিকট শুনিয়াছি মহারাজ প্রসেনজিৎ রাজপুত-কুলতিলক, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—আপনি কি তাঁর কথা বলিতেছেন ?"

"হাঁ ; তাঁর নাম তবে আপনি শুনিয়াছেন ?"

"অনেকবার ; রাজপুত বীরগণের জীবনী শ্রবণ আমার নিত্য কাজ ; মহারাজ প্রসেনজিতের কথা আমি পিতার নিকট অনেকবার শুনিয়াছি।"

"আমি তাঁর পুত্র,—আমার নাম বুক্করায়।"

পথিকের বাক্য শেষ হইতে না হইতে যুবতী সসম্ভ্রমে অঞ্জলিবদ্ধ-করে বলিয়া উঠিলেন; "কুমার ! অবলার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, অজ্ঞানতা-বশতঃ অনেক ধৃষ্টতা করিয়াছি।"

রাজা বুক্করায় সহাস্যে বলিলেন, "এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়, তবে যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার নামটি বলেন, তাহা হইলে মুক্তি পাইবেন সন্দেহ নাই।"

যুবতী কিছু বলিলেন না, অধোবদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তদ্দর্শনে বুক্করায় বলিলেন, "নাম বলিতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?"

যুবতীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল ; তিনি তখন উভয় হস্তে বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া চক্ষু দুটি ভূতলে রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মৃ—ণ্ম—য়ী।"

হঠাৎ সম্মুখস্থ বনভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদ-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল ; সেই শব্দে মৃণ্ময়ীর মুখ বিবর্ণ হইল। বুক্করায় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি ভীত হইবেন না, আমি দেখিতেছি উহারা কে ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন সাহায্য।

বুক্করায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, এক দল লোক সেই বনভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রান্তরে অবতরণ করিতেছে ; তাহাদের সকলের হস্তে এক একটি জ্বলন্ত মশাল।

বুক্করায় মৃণ্ময়ীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "অনুমানে বোধ হইতেছে ইহারা প্রতাপগড় হইতেই আসিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে আগন্তুকেরা তাঁহাদের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, আগন্তুকদের প্রত্যেকের দক্ষিণ হস্তে এক একটি জ্বলন্ত মশাল, বাম হস্তে দীর্ঘ বর্শা, কটিতটে কোষবদ্ধ অসি আলম্বিত, সকলেই যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত; তাহারা সংখ্যায় দ্বাদশ জনেরও অধিক।

রাজা বুক্করায় ও রাজপুত্রী মৃণ্ময়ী আগন্তুকদিগের দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র তাহারা সবেগে আসিয়া উভয়কে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুকদিগের এই প্রকার অভদ্রজনোচিত কার্য্যে বুক্করায়ের কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল; তিনি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কি চাও তোমরা?"

"আমরা তোমাকে চাই।" আগন্তুকদিগের একজন অবজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা তোমাকে চাই।"

বুক্করায়ের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; হস্ত দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ হইল; তিনি কম্পিতকণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দলের আর একজন লোক তাহাতে বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "চোর—ডাকু! ভাবিয়াছ বুঝি তোমার মত চালাক আর দুনিয়ায় নাই?—তাই বুঝি ডাকাতি করিয়া অমনি অমনি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা দেখিতেছ?"

বুকরায় কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "কে তোমরা?—তোমাদের উদ্দেশ্যই বা কি?"

"উদ্দেশ্য কি?" আগন্তুকদলে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "উদ্দেশ্য কি? চোর! চুরি করিয়া বমাল সমেত ধরা পড়িয়াছ; তবু আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? চোর ধরিয়া তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়—তাহা কি তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে?"

লোকটার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একজন বলিয়া উঠিল, "প্রতাপগড়ের রাজকন্যাকে চুরি করিয়া আনিতে তোমার একটি কেশও কাঁপিল না?—তোমার সাহসকে ধন্যবাদ।"

আগন্তুকেরা যে রাজা মহীপৎসিংহের অনুচর—সে বিষয়ে বুক্করায়ের আর সন্দেহ রহিল না; তখন তিনি প্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি রাজা মহীপৎসিংহের অনুচর?"

যে লোকটী বুক্করায়ের সাহসকে ধন্যবাদ দিতেছিল, সে এই প্রশ্নে মুখ

বিকৃত করিয়া উত্তর করিল, "না,—আমরা তোমার কিঙ্কর; এখন দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গী হও, সব ল্যাটা চুকিয়া যাক।"

বুক্করায় বলিলেন, "আমি তোমাদের রাজকন্যাকে চুরি করিয়া আনি নাই, আমি তোমাদের রাজার হিতার্থী।"

"আমরা তার বিচার করিবার ক্ষমতা রাখি না, তুমি আপাততঃ আমাদের বন্দী।"—এই কথা বলিয়া দলের একব্যক্তি বুক্করায়ের হস্ত ধরিবার উপক্রম করিল।

"সাবধান বর্ব্বর!" বুক্করায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান বর্ব্বর! তোদের মত অসভ্য জন্তুদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ক্ষমতা রাখি।" তাঁহার হস্ত অসিমুষ্টি স্পর্শ করিল।

পরক্ষণে বারোখানি তরবারি বুক্করায়ের মস্তকের উপর উত্থিত হইল, দীপালোকে সেই নগ্ন অসিগুলি ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মৃণ্ময়ী এতক্ষণ বুক্করায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নীরবে সমস্ত দেখিতেছিলেন, আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে আগন্তুক সৈন্যগণের সম্মুখে গিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা কি আমার পিতার ভৃত্য? আমার অন্বেষণের জন্যই কি তোমরা এই প্রান্তরে আসিয়াছ? যিনি আমার জীবনদাতা, যাঁর অনুগ্রহে আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে—কার আদেশে, কোন্ সাহসে তোমরা তাঁহার অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?"

রাজপুত্রীর এই তেজোদ্দীপ্ত কথাগুলি শুনিয়া সৈনিকগণ একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; তাহাদের হস্তোত্থিত তরবারিগুলি নত হইল, ভয়স্তিমিত নেত্রে তাহারা প্রভু-পুত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃণ্ময়ী আবার বলিলেন, "যদি তোমাদের বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে যখন দস্যুরা আমার শিবিকা আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? ভণ্ড! প্রবঞ্চকের দল! শুন এই মহানুভব যোদ্ধাই আমার জীবনদাতা; ইহাঁরই সময়োচিত সাহায্যে আমি দস্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, তোমরা এখন অসময়ে আসিয়া শিরোপা লাভের আশায় এই মহাত্মাকে বুঝি চোর সাজাইয়া পিতার নিকট হাজির করিবার মতলব আঁটিয়াছ?"

মৌন-মুগ্ধ সৈনিকগণের বিস্ময় আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কপোলে আশঙ্কার রেখা প্রতিফলিত হইয়া উঠিল; তখন তাহারা

সকলে একযোগে তরবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়া উঠিল, "মা! আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন—রক্ষা করুন।"

রাজকুমারী মৃণ্ময়ী তখন প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "তোমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিলাম; এক্ষণে তোমরা নগরে যাও, সত্বর করিয়া একখানি শিবিকা লইয়া আইস।"

সৈনিকদলের একজন বলিল, "শিবিকা বাহকেরা আপনার শিবিকা লইয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, বোধ হয় তাহারা পশ্চাতে পড়িয়াছে, এক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইবে।" এই কথা বলিয়া সে প্রান্তর-প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; পরক্ষণে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা! ঐ দেখুন শিবিকা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে চারিজন বাহক একখানি সুসজ্জিত শিবিকা লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল।

তখন বুক্করায় বলিলেন, "তবে আপনি শিবিকায় আরোহন করুন; আমি পদব্রজে আপনার অনুসরণ করিব।"

মৃণ্ময়ী বুক্করায়ের প্রশান্ত বদনের উপর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শিবিকায় উপবেশন করিলেন, বাহকেরা তখন সমবেত কণ্ঠস্বরে সেই প্রশান্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রতাপগড় অভিমুখে ধাবমান হইল।

রাজা বুক্করায় এবং সেই সৈনিকগণ শিবিকার অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা মহীপৎসিংহ।

প্রতাপগড়ের অধিপতি মহীপৎ সিংহ তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে বসিয়া আছেন। গৃহটী দীর্ঘ প্রস্থে বিলক্ষণ পরিসর; গৃহাভ্যন্তর ভাগ উত্তমরূপে সুসজ্জিত, নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর চিত্রে সুচিত্রিত, মনোহর মনোহর দ্রব্যে সুশোভিত; কয়েকটী কারুকার্য্য শোভিত সুবৃহৎ ঝাড়, কক্ষ মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলে আলম্বিত, দেয়ালগিরি ও ছবীগুলি কক্ষ-দেয়ালে সন্নিবেশিত, গৃহতল মর্ম্মর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত, তদুপরি মহার্হ শয্যা সুবিস্তৃত রহিয়াছে।

রাজা মহীপৎ সিংহ অন্যমনস্ক ভাবে কক্ষমধ্যে বসিয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাবে উপবেশন তাঁহার আর সহ্য হইল না, তিনি অস্থির ভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। রাজা মহীপৎ সিংহের প্রশান্ত বদনে আজ ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-লালসা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত, ক্ষোভে দুঃখে মনোবেদনায় তাঁহার বীর-হৃদয় প্রতিমুহূর্ত্তে অভিভূত হইতেছিল, প্রতিক্ষণেই তিনি আরক্তনেত্রে দ্বারদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, পলিতকেশ প্রবীণ বীরের সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে সমস্ত প্রতাপগড় যেন আলোড়িত হইতেছিল; দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান অনুচরগণ এবং নিম্নস্থ প্রাঙ্গণে অবস্থিত সশস্ত্র প্রহরীমণ্ডলী লজ্জায় ঘৃণায় ও আশঙ্কায় বাত্যাহত বৃক্ষের মত কাঁপিতেছিল, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহারা তাহাদের ক্রোধান্ধ প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাজকুমারী মৃণ্ময়ীর অপহরণবার্ত্তা পূর্ব্বেই রাজা মহীপৎ সিংহের কর্ণগোচর হইয়াছিল, সেইজন্যই রাজপুরে আজ এই অশান্তির বৃষ্টি।

অকস্মাৎ দুর্গদ্বারে একটা অস্পষ্ট আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল, পরক্ষণে সে কোলাহল প্রাঙ্গণস্থ প্রহরী-মণ্ডলীর কর্ণগোচর হইল; দেখিতে দেখিতে জনৈক নবাগত সৈনিক সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক রাজা মহীপৎ সিংহের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া মহোল্লাসে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজের জয় হউক; রাজকুমারীকে পাওয়া গিয়াছে।"

অগ্নিস্রাবোন্মুখ আগ্নেয়-গিরির উত্তপ্ত কন্দরমুখে হঠাৎ যেন কি একটা দুর্ভেদ্য আবরণ নিক্ষিপ্ত হইল; রাজা মহীপৎ সিংহের শুদ্ধ-ঝঞ্ঝা-সঙ্কুল অমানিশাবৎ হৃদয়াকাশে সহসা যেন একটা জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় আলোক প্রতিফলিত হইয়া উঠিল; তিনি তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় তাহাকে পাওয়া গেল, কে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল?"

সংবাদদাতা সৈনিক বলিল, "রাজকুমারীকে দস্যুরা লইয়া যাইতেছিল, একজন রাজা তাহা দেখিতে পাইয়া দস্যুর হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।"

বিস্ময়ে ও অপ্রত্যাশিত আনন্দে মহীপৎ সিংহের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "সেই রাজা কি প্রতাপগড়ে আসিয়াছেন?"

সৈনিক সুরের মাত্রা একটু চড়াইয়া বলিল, "হঁা মহারাজ, আসিয়াছেন; তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মহীপৎ সিংহ ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "যাও, শীঘ্র তাঁহাকে এই কক্ষে লইয়া আইস।"

সৈনিক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। রাজা মহীপৎ সিংহ সাগ্রহে তাঁহার প্রাণোপম কন্যার উদ্ধারকর্ত্তা রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই রাজপুত্রী মৃণ্ময়ী ও রাজা বুক্করায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মৃণ্ময়ী অবনত মুখে পিতার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিলেন। বুক্করায় ভূমিষ্ঠ হইয়া মহীপৎ সিংহকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

এই সময় মৃণ্ময়ী পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, ইনি কর্ণাটের রাজা, আপনার বন্ধুপুত্র; ইনিই আমাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

কন্যার এই কয়টী কথা শুনিয়া মহীপৎ সিংহ বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন; সে সময় যদি স্বর্গ হইতে দেবতা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন, তাহা হইলেও তিনি বোধ হয় এতদূর বিস্মিত হইতেন না; বিস্ময়ের আতিশয্যে কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; অবশেষে তিনি আত্মসংবরণ পূর্ব্বক রাজা বুক্করায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমার প্রাণাধিক বন্ধুপুত্র এতকাল পরে আজ সহসা আমার কন্যার উদ্ধারকর্ত্তা রূপে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" অনন্তর তিনি অগ্রসর হইয়া বুক্করায়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, তোমার শৈশব অবস্থায় তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেই জন্য সহসা তোমাকে চিনিতে পারি নাই; তুমি আমার বন্ধুপুত্র, পক্ষান্তরে আজ তুমি আমার কন্যাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আমার মান সম্ভ্রম, বংশ গৌরব, অধিক কি আমাদের পিতা পুত্রীর জীবন রক্ষা করিয়াছ; আমার পরম সৌভাগ্য, সেই জন্য আজ তোমার এ অঞ্চলে আগমন।"

বুক্করায় অবনত মুখে বলিলেন, "এরূপ কথা আপনার মুখে শোভা পায় না, আমি আপনার পুত্রের সমান, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার চরণ দর্শন করিয়া আমিই আমাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া ভাবিতেছি।"

"তোমার স্বর্গীয় পিতা আমার পরমবন্ধু ছিলেন, তিনি এখানে প্রায়ই আসিতেন, আমিও তোমাদের আলয়ে অনেক সময় যাইতাম, তুমি তখন নিতান্ত বালক ছিলে; তোমার পিতার স্বর্গারোহণের পর পূর্ব্ব সম্পর্ক এক

প্রকার বিচ্ছিন্ন হইবারই উপক্রম হইয়াছিল,—এক্ষণে তুমি যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সেই সম্পর্ক পুনর্ব্বার দৃঢ়ীকরণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছ, ইহাতে যে আমি কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম; ভগবান বিরূপাক্ষ তোমার মঙ্গল করুন।"

"পিতৃদেবের আকস্মিক মৃত্যুর পর আমার স্কন্ধে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয়, সেইজন্যই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই; কিন্তু আমি জানিতাম, আপনি আমার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক; বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা ছিল আপনার চরণ দর্শন করি, কিন্তু কার্য্যগতিকে সমর্থ হই নাই; আজ একটু অবসর পাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

"পিতার মৃত্যুর পর তুমি যে আমাকে বিস্মৃত হও নাই, পূর্ব্ব সম্পর্ক ছিন্ন কর নাই—ইহাতেই আমি পরম সন্তুষ্ট।"

"কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আজ আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, পূজনীয় মাধবাচার্য্যই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

"তিনি ভাল আছেন তো? আহা, দাক্ষিণাত্যে মাধবাচার্য্যের মত নীতিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শী পণ্ডিত আর দেখা যায় না; তাঁহারই মন্ত্রণা ও বুদ্ধিবলে তোমার পিতা সেই ভীষণ যবন-বিপ্লবের মধ্যে কর্ণাটের অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার জন্যই দাক্ষিণাত্যে আজ হিন্দু আধিপত্যের সূত্রপাত।"

"সংপ্রতি তিনি দাক্ষিণাত্যে অখণ্ড হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দিল্লীশ্বর মহম্মদ টোগলকের পৈশাচিক অত্যাচারে সোণার ভারতবর্ষ বীভৎস শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার অবিশ্রান্ত অত্যাচারে এদেশের হিন্দু নৃপতিগণ, প্রজাগণ, কৃষকগণ, আপামর সর্ব্বসাধারণই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে; এক্ষণে সেই দুর্ব্বুদ্ধি সম্রাট স্বার্থপর চাটুকার বর্গের মন্ত্রণায় দাক্ষিণাত্যের নৃপতি ও প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু নরপতিগণের ধ্বংস সাধনের জন্য সে এক্ষণে দেবগিরি নগরে রাজধানী স্থাপন করিতেছে; এই রাজধানী পরিবর্ত্তনের জন্য সহস্র সহস্র হিন্দু প্রজার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই স্বেচ্ছাচার সম্রাটের অত্যাচার নিরাকরণের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দু নৃপতিই মস্তকোত্তোলন

করিতেছেন এবং যাহাতে দুরাত্মা যবন দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে না পারে সেই চেষ্টায় তৎপর ; এসম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিবার নিমিত্ত গুরুদেবের আদেশে আজ আমার প্রতাপগড়ে আগমন।"

বুক্করায়ের এই সারগর্ভ কথাগুলি শুনিয়া রাজা মহীপৎসিংহ কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন, পরিশেষে বলিলেন, "বৎস, তোমার উদ্দেশ্য যে খুব মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৎস দিল্লীশ্বরের সেই বিশাল বাহিনীর সহিত সম্মুখ সমরে এ প্রদেশের নববলদৃপ্ত রাজগণ কিরূপে জয়লাভে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বিষয়ে আমার দারুণ সন্দেহ হইতেছে।"

বুক্করায় সবিস্ময়ে বলিলেন, "কিসের সন্দেহ। দিল্লীশ্বরের বিষদন্ত তো অনেকদিন ভগ্ন হয়েছে ; চীন ও পারস্য বিজয়ের উদ্‌যোগে তার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট ও রাজকোষ অর্থশূন্য হয়েছে ; পাপিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতায় দিল্লীর চারিদিকে দারুণ অশান্তির আগুন জ্বলিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে; সুতরাং এ অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণের বিদ্বেষ বহ্নিতে যে পাঠান রাজ্য ভস্মীভূত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

রাজা মহীপৎ সিংহ পর মুহূর্ত্তে বুক্করায়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আজ জানিলাম তুমি মহারাজ প্রসেনজিতের উপযুক্ত পুত্র ; আজ জানিলাম তুমি সনাতন হিন্দুর প্রনষ্ট গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইবে। ভগবান বিরূপাক্ষ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি তোমার সঙ্কল্প সানন্দে অনুমোদন করিলাম ; কিন্তু বৎস তোমার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে।"

"আজ্ঞা করুন।"

"প্রতিজ্ঞা কর রক্ষা করিবে।"

"আমার সাধ্য হইলে প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।"

"বৎস. আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হয়েছি, এই কন্যাটী ব্যতীত এসংসারে আমার আর কেহই নাই ; এ সময় আমার ভার গ্রহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বৎস, শোন, তোমার স্বর্গীয় পিতা একদিন আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমার স্নেহময়ী কন্যা মৃণ্ময়ীকে তিনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবেন ; আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আজ ইহজগতে নাই. কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের এক্ষণে স্বর্গীয় পিতার প্রতিজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য নয় ?"

বুক্করায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; অবনত মস্তকে তিনি কোষবদ্ধ তরবারির মুষ্টি খুটীতে লাগিলেন। মৃণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া সলাজে অন্তঃপুর-সংলগ্ন দ্বার প্রান্তে সরিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বুক্করায়ের মুখের উপর ন্যস্ত রহিল; কক্ষটী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইল।

বুক্করায় ও মৃণ্ময়ীর মধ্যে যে অনুরাগ সঞ্চার হয়েছে, তাহা মহীপৎ সিংহ ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন বুক্করায় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে বুক্করায়ের দৃষ্টি সেই অন্তঃপুর সংলগ্ন দ্বার প্রান্তে পড়িতেছিল। মৃণ্ময়ীর সরল দৃষ্টি বরাবর বুক্করায়ের মুখের উপর ন্যস্ত ছিল, তবে যখন বুক্করায়ের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িত, তখনই চারিচক্ষুর মিলন হইত, পরক্ষণে মৃণ্ময়ীর দৃষ্টি ধরাতলে আকৃষ্ট হইত; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য; বুক্করায়ের দৃষ্টি মহীপৎ সিংহের উপর পড়িলেই মৃণ্ময়ীর সেই সুগোল চক্ষু দুটী আবার বুক্করায়ের মুখের উপর পড়িত। মহীপৎ সিংহ এই কৌতুক দেখিতে ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, তাঁহার সম্মতির পূর্ব্বেই প্রেম উভয়ের হৃদয় প্রচ্ছন্নভাবে অধিকার করিয়াছে।

বুক্করায়কে নিরুত্তর দেখিয়া মহীপৎ সিংহ বলিলেন, "বৎস, ইতঃপূর্ব্বে তুমিও আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ সাধ্যায়ত্ত হইলে আমার প্রার্থনা রক্ষা করিবে।"

বুক্করায় পূর্ব্ববৎ ধীর ও প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন, "এ কার্য্যে সম্মতিদান আমার সাধ্যাতীত।"

বুক্করায়ের কথাগুলি সুবিজ্ঞ মহীপৎ সিংহকে তত ব্যাকুল করিল না, কিন্তু দ্বার-পার্শ্ব-স্থিতা বালিকা এই কথাগুলি শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যেন অকস্মাৎ আশা ও উৎসাহ-শৈলের অত্যুচ্চ শিখর হইতে নিরাশার অতল-স্পর্শ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের শোণিতরাশি সহসা যেন পরিশুষ্ক হইয়া গেল, পদদ্বয় তাঁহার শরীরকে বহন করিতে অশক্ত হইয়া ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, হস্তদ্বয়ের অবস্থাও সেইরূপ; গোলাপ-বিনিন্দিত সুরম্য বদনটী সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুদুটী উদাস ভাবে বুক্করায়ের অবনত মুখখানির উপর পড়িয়া রহিল, তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই বিশুষ্ক বদন হইতে অস্পষ্টস্বরে প্রশ্ন হইল—"সাধ্যাতীত ?"

মহীপৎ। "বৎস, তোমার এই অসম্মতির কারণ বুঝিতে পারিলাম না।"

বুক্ক। "আপনার প্রস্তাবে সম্মতিদানের ক্ষমতা আমার নাই ; এ জীবন গুরুদেব মাধবাচার্য্যের সম্পূর্ণ অধীন।"

মহীপৎ। "যদি তোমার গুরুদেব সম্মত হন ?"

বুক্ক। "তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

মহীপৎ। "সুখী হইলাম। তোমার গুরুদেবও এ বিষয়ে আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। যে দিন আমি তোমার পিতার নিকট এ কথা উত্থাপন করি, তখন মাধবাচার্য্য সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এ বিষয়ে সানন্দে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। আমি শীঘ্রই তাঁহার নিকট লোক পাঠাইব।"

মহীপৎ সিংহের কথায় বুক্করায়ের অবনতমুখে হাস্যরেখা প্রতিফলিত হইল, সে হাসির সঙ্গে সঙ্গে মৃণ্ময়ীর বিরসবদনখানিতে আবার হাসির আলো ফুটিয়া উঠিল, সে হাসি—সে আলো—সে আনন্দ ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তররাজ্যে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে নিহিত হইল। পূর্ণিমার চাঁদ মেঘমুক্ত হইল, সুপ্ত কৌমুদী জাগিয়া উঠিল—দুষ্ট মেঘগুলি অন্তর্হিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গুরীয়-বিনিময়।

রাজা বুক্করায় তিন দিন প্রতাপগড়ের রাজপুরীতে অবস্থান করিলেন ; এই তিন দিন তাঁহার আদর ও যত্নের সীমা ছিল না। রাজা মহীপৎ সিংহের অকৃত্রিম যত্নে এবং রাজকুমারী মৃণ্ময়ীর আন্তরিক স্নেহে তিনি একাধারে সুখ ও শান্তি উপভোগ করিলেন।

চতুর্থ দিনে বুকরায় মহীপৎ সিংহের বিশ্রাম-কক্ষে বসিয়া একখানি গীতগোবিন্দ পাঠ করিতেছিলেন ; পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা চিন্তা উপস্থিত হইল ; পাঠে আর তাঁহার মন নিবিষ্ট হইল না, তিনি পুস্তক ফেলিয়া অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় চিন্তার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বুকরায় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আমি স্বেচ্ছায় গুরুতর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া আজ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রতাপগড়ের রাজপুরীতে পরম সুখে অবস্থান করিতেছি! গুরুদেব মাধবাচার্য্য আমার আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, আর আমি এস্থানে রাজভোগে দিন কাটাইতেছি,

একটি বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ভুলিতে বসিয়াছি।" তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অস্থিরভাবে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। এই সময় অপরাহ্নের সুস্নিগ্ধ বাতাস মৃদুমন্দভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; পরক্ষণে কক্ষটী চিত্তোন্মাদক মনোহর সৌরভে পূর্ণ হইয়া উঠিল; বুক্করায় বিস্মিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই সৌরভের উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিতে পারিলেন না। পরক্ষণে আবার সেই স্নিগ্ধ সমীরণ বাতায়ন-পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, আবার সেই সঙ্গে মধুর সৌরভে কক্ষটী সমাকীর্ণ হইল। আবার পরমুহূর্ত্তে সেই স্নিগ্ধ সমীর তাঁহার গাত্র-বস্ত্র অন্দোলিত করিয়া, প্রলম্বিত আলোকদানগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া, দুগ্ধফেননিভ শয্যাগুলি ঈষৎ কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে অন্য বাতায়ন পথে কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হইল। বুক্করায় এবার অনুমান করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই নিদাঘ-অপরাহ্ণ-প্রসূত স্নিগ্ধবায়ু সন্নিহিত কোন কুসুমোদ্যানের ফুল্ল ফুল রেণু হরণ করিয়া কক্ষমধ্যে মৃদুমন্দ ভাবে প্রবেশ করিতেছে, আবার উন্মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষান্তরে নীত হইতেছে। তখন তিনি ধীর পদ-বিক্ষেপে সেই কক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নিম্নে সুবৃহৎ সুরম্য পুষ্পোদ্যান। তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়াদেখিলেন, দ্বার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বারাণ্ডার পরেই একটী সুবৃহৎ সোপান-শ্রেণী দ্বিতল হইতে একেবারে নিম্নের পুষ্পোদ্যানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তখন তিনি সেই সোপান-শ্রেণী অবলম্বন করিয়া নিম্নস্থ পুষ্পোদ্যানে উপস্থিত হইলেন।

বুক্করায় পুষ্পোদ্যানটীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, প্রকৃতিদেবী যেন প্রাণপতি বসন্তদেবের সহিত জগতের তাবৎ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই মনোহর উদ্যানে বিরাজমান! কলকণ্ঠ বিহঙ্গ ও পুষ্পান্বেষী অলিকুল নিদাঘ-তপনের প্রখর তাপে পরিতপ্ত হইয়া যেন প্রকৃতি সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উদ্যানটীর চারিদিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদে পরিবেষ্টিত; উদ্যান মধ্যে মল্লিকা, বেলা, জুঁই, যূথী টগর প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষগুলি পুষ্পভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে; পুষ্পবৃক্ষ-বেষ্টিত কয়েকটী সুরম্য বেদিকা উদ্যানে স্থানে স্থানে শোভা সম্পাদন করিতেছে; পুষ্প-লতিকাগুলি সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে স্ব স্ব লম্বিত নধর দেহে বেষ্টন করায় সেগুলিকে নানা বর্ণের রত্ন-খচিত স্তম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সমস্ত পুষ্পোদ্যানটী প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুর সৌরভে আমোদিত।

বুক্করায় উদ্যানটীর এই সমস্ত দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে যেমন উদ্যানস্থ কতিপয় পুষ্পবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত একটী বেদিকায় উপবেশন করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার দৃষ্টি কোন একটী অভিনব বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইল।

তিনি দেখিলেন, যে বেদিকার পাদদেশে তিনি দণ্ডায়মান, তাহার প্রায় ত্রিশ হস্ত দূরে—উদ্যানের প্রান্তভাগে নিবিড় কুসুম-কুঞ্জ পরিবেষ্টিত একটী সুরম্য বেদিকার উপর একটী মূর্ত্তি সমাসীন! তখন সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়া ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং শুভ্র-কুসুম-কুঞ্জ-পরিবেষ্টিত অজস্র কুসুমাকীর্ণ শুভ্র বেদিকার উপর সেই উজ্জ্বল শুভ্রমূর্ত্তিটী বিরাজমান ছিল; সুতরাং বুক্করায় সেটীর অস্তিত্ব বিষয়ে সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। সেই মূর্ত্তিটীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি অনুমান করিলেন, শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত কোন মানব অথবা দেব মূর্ত্তি সেই শ্বেত বেদিকার উপরি প্রতিষ্ঠিত। তিনি সেই মূর্ত্তির দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, মূর্তিটি ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে; তখন তিনি ভাবিলেন, ইহা কোন জীবন্ত জীব বা জন্তুর মূর্ত্তি। সন্দেহাকুল চিত্তে তিনি আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন; এবার তিনি বিশেষ দৃষ্টি সহকারে দেখিতে পাইলেন, সে মূর্ত্তিটী কোন শ্বাপদ বা পালিত জন্তুর নহে, প্রকৃত মানব মূর্ত্তি, কোন স্থির কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এবার বুক্করায়ের সন্দেহ আরও প্রবল হইল; তিনি দ্রুতপদে একেবারে সেই মূর্ত্তির পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন; যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তিনি দেখিলেন, সেই পুষ্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিতা সেই পুষ্পাকীর্ণ বেদিকার উপরি বিদ্যমান সেই সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তিটী কোন জীব জন্তু বা মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতি নহে; সে মূর্ত্তি তাঁহার অপরিচিতাও নহে; সেই বেদিকার উপরি রাজকুমারী মৃণ্ময়ী স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া করতলে কপোল রাখিয়া গভীর চিন্তা করিতেছিলেন।

মৃণ্ময়ীকে দেখিবামাত্র বুক্করায় বলিয়া উঠিলেন, "মৃণ্ময়ী! তুমি এখানে?"

মৃণ্ময়ী প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, বুক্করায়ের আগমন তিনি জানিতে পারেন নাই, সহসা এই প্রশ্নে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন, পরক্ষণে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি যাঁহার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন, তিনিই সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত।

বুক্করায় আবার বলিলেন, "মৃণ্ময়ী, আমি এতক্ষণ তোমার পিতার বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাতে মন স্থির না হওয়ায় বায়ু সেবানার্থ এই পুষ্পোদ্যানে আসিয়াছি; তোমাদের এই পুষ্পোদ্যানটীর

কথা তো আমাকে একদিনও বল নাই, তাহা হইলে আমি প্রত্যহ এখানে আসিতাম।"

মৃণ্ময়ী কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না, নত মুখে নীরবে রহিলেন।

বুক্করায় পুনর্ব্বার বলিলেন, "এ কি! তুমি আজ কথা কহিতেছ না কেন; তোমাদের অনুমতি না লইয়া এই অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে আসাতে তুমি বোধ হয় আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছ?"

মৃণ্ময়ী এবার উত্তর করিলেন, গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলেন, "আপনি বলেন কি? ক্রুদ্ধ হইব কার উপর? এ সমস্ত তো আপনারই—"

বুক্করায় বাধা দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "বটে, ইতি মধ্যেই এতদূর ত্যাগ স্বীকার!"

মৃণ্ময়ী নতমুখে বুক্করায়ের পদতলে দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর দিলেন, "আমি আপনার সামান্য সেবিকামাত্র!"

বুক্করায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখন তিনি সাহস পাইয়া মৃণ্ময়ীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সুকোমল কর পল্লব দুটী ধরিয়া বলিলেন, "মৃণ্ময়ী, তবে কি তুমি সত্য সত্যই আমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক! তবে কি তুমি প্রতাপগড় পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রভুর সহিত সুদূর কর্ণাটে যাইবার ইচ্ছা কর?

মৃণ্ময়ী বলিলেন, "আপনি এই চারি দিনে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না ইহাই আশ্চর্য্য! যদি আপনি আমার মর্ম্মব্যথা জানিতে পারিতেন, যদি এ সম্বন্ধে আপনার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে এ কথা কখনই জিজ্ঞাসা করিতেন না; যে দিন আপনি আমাকে প্রান্তরে দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দিনই আপনি আমার মনের অবস্থা জানিতে পারিতেন।"

বুক্করায় বলিলেন, "মৃণ্ময়ী, আমার সে ক্রটী মার্জ্জনা কর, আমি তোমার মনের অবস্থা তোমারই নিকট শুনিয়া আরও সুখী হইলাম। মৃণ্ময়ী! এই নির্জ্জন উদ্যানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ভালই হইয়াছে; আমি তোমাকে একটী কথা বলিয়া যাইব; আগামী কল্য প্রত্যূষেই আমি কর্ণাট যাত্রা করিব; সুতরাং তোমার সহিত আপাততঃ বোধ হয় আর সাক্ষাৎ হইবে না।

সহসা যেন একটী তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া মৃণ্ময়ীর হৃদয় বিদ্ধ করিয়া চলিয়া

গেল। ব্যথিত-হৃদয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বিষণ্ণ মুখে মৃণ্ময়ী বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! আপনি কল্যই চলিয়া যাইবেন? পিতার নিকট শুনিলাম, আপনি এখানে কিছুদিন থাকিবেন, তবে কাল প্রত্যূষেই যাইবেন কেন? এই দরিদ্রের কুটীরে আপনার সেবার যথেষ্ট ত্রুটী হইতেছে, সেই জন্যই বোধ হয় আপনার এই বিরাগ?

বুক্করায় সহাস্যে বলিলেন, "না, না, আমার যত্নের কোন ত্রুটী হয় নাই—"

মৃণ্ময়ী বাধা দিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "তবে বোধ হয় দরিদ্রের কুটীরে অবস্থান করায় আপনার যথেষ্ট কষ্ট হইতেছে—"

বাধা দিয়া বুক্করায় বলিলেন, "দরিদ্র?—আপনার পিতা দরিদ্র? তোমার মত দেব দুর্ল্লভ কন্যা রত্ন যাঁর গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছে—তিনি যদি দরিদ্র, তবে এ সংসারে ভাগ্যবান ধনী কে মৃণ্ময়ী?"—ছি, ছি, তুমি এ সব কথায় আমাকে কষ্ট দিয়ো না; মৃণ্ময়ী, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি তো জান, আমার উপর এখন কি ভীষণ দায়িত্ব ভার ন্যস্ত রহিয়াছে! কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমাকে কল্য কর্ণাটযাত্রা করিতে হইবে; নচেৎ তোমাদের আন্তরিক স্নেহ ও যত্নের অন্তরালে থাকিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।"

মৃণ্ময়ী অবনত মুখে বলিলেন, "কর্ণাটে যাইলেই আপনি আমাদের ভুলিয়া যাইবেন।"

"ভুলিয়া যাইব?" মুখ তুলিয়া বুক্করায় সতেজে বলিলেন, "ভুলিয়া যাইব? ইহা কি সম্ভব? মৃণ্ময়ী শুন, "যতদিন আমার জীবাত্মা অনন্তে বিলীন না হইবে, ততদিন তোমার স্মৃতি প্রগাঢ়রূপে আমার হৃদয়ে আবদ্ধ থাকিবে।" বুক্করায় দেখিলেন, মৃণ্ময়ীর নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু একত্রিত হইতেছে, ক্রমে সেই বিগলিত অশ্রুবিন্দু নয়নপ্রান্ত হইতে গণ্ডদেশে নিপতিত হইয়া মুক্তাকণার ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। তখন তিনি স্নেহভরে মৃণ্ময়ীর হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, "মৃণ্ময়ী, তুমি কাঁদিতেছ? ছি, ছি, কাঁদিয়ো না, আমি আবার আসিব, তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আবার আসিব। যদি ভগবান দিন দেন, যদি দক্ষিণাপথে হিন্দুর গৌরব রক্ষা হয়, যদি তুমি এই পরিচিত বন্ধুটিকে ভুলিয়া না যাও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, তুমি কর্ণাটের অধীশ্বরী হইবে! এক্ষণে তুমি স্মরণচিহ্ন-

স্বরূপ আমার এই অঙ্গুরীয়টী রাখিয়া দাও।" বুক্করায় তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া মৃণ্ময়ীর চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গুলী মধ্যে পরাইয়া দিলেন।

পরমুহূর্ত্তে মৃণ্ময়ী স্বীয় অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "দেব, তবে স্মরণ চিহ্নস্বরূপ আপনিও অধিনীর এই তুচ্ছ অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করুন। ইহা আপনার দৃষ্টিপথে পড়িলেই এই দুঃখিনীর স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিবে। আর আজ হইতে আপনার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় আমি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিব; আপনি এই দীনার অঙ্গুরীয় হস্তে রাখিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" মৃণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ বুক্করায়ের হস্তে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন।

সেই নব বর্ষের জ্যোৎস্না-স্নাত নক্ষত্র-কিরীটিনী যামিনীতে, সেই সুনীল নির্ম্মল অম্বরে সমুত্থিত তারকামালা ও সুধাংশুদেবের কমনীয় শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে, সেই নীরব নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে—সেই নবীন যুবক যুবতী ব্রীড়ার তীব্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্ব স্ব অঙ্গুরীয় বিনিময় করিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিশীথে।

বুঝি এমনি মধুর নিশীথে
রূপের আলো কি শয্যা বিমল
শুয়েছিল উষা, সোনার কমল
প্রণয়ী তাহার মুগধ বিহ্বল
গিয়াছিল তারে চুমিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশীথে!

বুঝি এমনি মধুর নিশীথে
ভীষণ তটিনী বন্যার বারি
গম্ভীর নিশীথে একাকী সাঁতারি
প্রেমিক "বিল্ল" চিন্তার বাড়ী
গিয়েছিল তারে দেখিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশীথে!

বুঝি এমনি মধুর নিশীথে
যমুনা সলিল বহায়ে উজান

আকুল করিয়া ব্রজবাসী প্রাণ
বেজেছিল হায় "রাধা রাধা" গান
প্রথম শ্যামের বাঁশিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশীথে!

বুঝি এমনি মধুর নিশীথে
প্রমোদ কাননে পাইয়া "কুমারে"
বেঁধেছিল "ইলা" বন ফুল হারে
ধুয়ে পা দু'খানি নয়নের ধারে,
দিয়াছিল হৃদি বসিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশীথে!

বুঝি এমনি মধুর নিশীথে
"গোবিন্দলাল" বারুণীর তীরে
"রোহিণীর" মুখ দেখেছিল ফিরে
চরণ যুগল অবশ শিহরে
পারে নাই আর ফিরিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশীথে!

বুঝি এমনি মধুর নিশীথে
"ফুল জানি" হেরি নাথেরে আবার
লুটিয়া পড়িল চরণ মাঝার;
প্রিয়তম হায় শেষ উপহার
বিষ টুকু দিল করেতে
বুঝি এমনি মধুর নিশীথে!

বুঝি এমনি মধুর নিশীথে
ফুরাবে যখন বিরহ জীবন
আসিয়া বসিবে হে সখা মরণ!
অধরে অধর হইবে মিলন
হবে তোমা আমা মিশিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশীথে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

বরষায় স্মৃতি।

১

আজি এই বরষায়
ঘন বরিষণে
কি জানি কেন বা হায়
সুখ স্মৃতি ছায়া প্রায়
তারি কথা তারি গাথা
পড়িতেছে মনে
আকুল কেন বা প্রাণ।
কেন জাগে তার গান
সে সুখ স্বপন কেন মনে পড়ে ফিরে
অতীতের মাঝে সে যে ডুবে গেছে ধীরে।

২

আর তো হবে না দেখা
তবে মিছে কেন
শুদ্ধ বরষায় এই
মনে পড়ে মুখ সেই
অতীতের কথা তার
জাগাইছে হেন
আছে সে যে বহুদূরে
সে কেন আসিবে ফিরে
নিজ সুখে আছে সুখী সে কেন আমায়—
দেখা দিতে আসিবে এ ঘন বরিষায়॥

৩

আসিবে না—দেখা যদি
নাহি দিবে মোরে
শীতল এ সমীরণে
তাহার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে

কেন জাগে আজি তবে
বহুদিন পরে
অতীত দিনের কথা
দেয় হেন প্রাণে ব্যথা
ভুলিয়া ছিলাম যদি তবে কেন হায়
বরষায় তার স্মৃতি হৃদয়ে জাগায়॥

৪

মনে পড়ে—সেই এক
বরষার দিনে
বহুদিন গেছে চলে
মোর পানে আঁখি তুলে
"পরের হইনু আমি"
কহিল এখানে
"ভুলে যেও মোরে সখা
আর তো হবে না দেখা"
মুগ্ধ নেত্রে আমি শুধু রহিনু চাহিয়া
চলে গেল মোর পানে বারেক হেরিয়া।

৫

তার পর কত দিন
গিয়াছে চলিয়া
পাষাণীর সব কথা
হৃদয়ের সব ব্যথা
একে একে ভুলেছিনু
হৃদয় বাঁধিয়া
(কিন্তু) আজি যেন মনে হয়
সে দিন এসেছে হায়
শীতল সমীর সেই ঘন বরিষণ
আসিল সে দিন—কোথা হৃদয় রতন।

শ্রীবামনদাস বসু।

জয় ও পরাজয়।

এ পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই ধন, মান, যশ ও পদের জন্য লালায়িত। ধন, মান, যশ ও পদাদির জন্যই প্রায় সকলকে ব্যগ্র দেখি কিন্তু ধর্ম্ম বা প্রকৃত আত্মোন্নতির জন্য কাহাকেও বড় একটা ব্যস্ত হইতে দেখি না। পৃথিবীর এ অবস্থা যে কতযুগ ধরিয়া থাকিবে, মানবজাতির দূর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের তুলনা করিয়া দেখিলেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলতঃ মানবের ধর্ম্মোন্নতির গতি এত মৃদু যে, দুই তিন হাজার বৎসরে তাহার কতটুকু গতি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র; কিন্তু এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে মানুষ কেবল ধন মান বা যশের জন্যই কর্ম্ম করিতেছে, ধন মান বা যশের জন্যই একে অন্যের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিতেছে। কেহ জয়লাভ করিতেছে, কেহ বিজিত হইতেছে। কেহ সংসার রঙ্গ-মঞ্চে বিদ্যা জ্ঞান লোকহিতৈষণার অভিনয় দেখাইয়া নট নৈপুণ্যে লোক সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছে, আবার কেহ যথার্থ কর্ম্ম বীর হইয়াও আপনার সমগ্র শক্তিকে লোকসেবায় নিয়োজিত করিয়াও প্রতিদানে আপাততঃ—পদাঘাত পাইতেছে। কেহ ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিয়া নিজের পূর্ণ উদর পুনর্ব্বার পূর্ণ করিতেছে, দরিদ্রের পর্ণকুটীর ধূলিসাৎ করিয়া আপনার অট্টালিকার ইষ্টক পোড়াইবার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। আবার কেহ সারাদিন পশুর ন্যায় পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। পক্ষান্তরে কেহ আবার ন্যায়োপেত পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতার গুণে ধন, মান, যশ পদাদি লাভে সক্ষম হইতেছে, কেহ তাদৃশ পরিশ্রম তাদৃশ কার্য্যদক্ষতা সত্ত্বেও সে প্রকার ধন মানাদি লাভে সকল কাম হইতেছে না।

সংসার প্রাঙ্গণে এই প্রকার জয় পরাজয় নিত্য সংঘটিত হইতেছে আর অদূরদর্শী মানব এই জয় পরাজয়ের মধ্যেই মনুষ্যজীবনের সাফল্য বৈফল্য নির্ভর করে মনে করিয়া জয় যুক্তকে ভাগ্যবান এবং পরাজিতকে দুর্ভাগ্য আখ্যা প্রদান করিতেছে। কিন্তু এ কথা প্রায় কেহই ভাবিয়া দেখে না যে এই জয় পরাজয়ের সহিত প্রকৃত জয় পরাজয়ের কতখানি সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ ধনমানাদি লাভ হইলেই যে জয় লাভ হইল এবং ধন মানাদি লাভ করিতে না পারিলেই যে পরাজয় হইল ইহা মনে করিবার কোন কারণই দেখা যায় না।

জয় ও পরাজয় শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, জয় শব্দের প্রকৃত অর্থ সুখ এবং পরাজয় শব্দের প্রকৃত অর্থ দুঃখ। যিনি জীবনযুদ্ধে উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী সুখলাভ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে যে তিনিই প্রকৃত জয়লাভ করিয়াছেন। আর যিনি কেবল জীবনের দুঃখের ভারই বৃদ্ধি করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে যে তিনি পরাজিত হইয়াছেন।

চিরস্থায়ী যে সুখ তাহাই জয় কিন্তু ধন মান বা লৌকিক প্রতিষ্ঠা এই প্রকার সুখ কখনও দান করিতে পারে না সুতরাং ধন মান বা প্রতিষ্ঠালাভে জয় হয় না। সুখলাভই যে জয়লাভ এবং দুঃখকে বরণ করাই যে পরাজয়-লাভ তাহা যে আমরা আমাদের সহজ জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারি না এমন নহে, তবে সেই জয় বা সুখ, ধন মানাদিতে যে লাভ হয় না এই কথাটাই আমরা বুঝি না বা বুঝিতে চাহি না। অধিকতর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পৃথিবীর শত সহস্র ধনী, শত সহস্র দণ্ডধারী রাজা, শত সহস্র যশস্বী, ধন, রাজ-পদ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠার অসারতা এক বাক্যে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের অসুখকারিতা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমরা এমনই অজ্ঞান এমনই মোহের বশীভূত যে, তাহা কিছুতেই বুঝিতে চাহি না। ধনে যদি সুখ থাকিত তবে পৃথিবীর হাজার হাজার ধনী, ধনে আর সুখ নাই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন না। রাজপদে যদি সুখ থাকিত তবে রঘু-কুলাবতংস মহাসত্ত্ব মহাবীর রাজা রামচন্দ্র রাজাসনের উচ্চপীঠে আরূঢ় রহিয়াও অহোরাত্র কেবল সীতাশোকে কাতর রহিতেন না! কুরুক্ষেত্রের মহাসমর-বিজয়ী মহারাজ যুধিষ্ঠির আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতের রাজ-চক্রবর্ত্তী রূপে ভারত সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়াও দিক্‌পাল সদৃশ ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান এবং রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়াও অবিরত কেবল শোকের পাথারে ভাসিতেন না। এই সকল মহাসত্ত্ব মনুষ্যগণ শুধুই যে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাহাই নহে, মনুষ্যের হৃদয় রাজ্যেও ইহাঁদের অপরিসীম প্রভাব ছিল, অথচ এই সাম্রাজ্য ও এই অযাচিত যশ তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র সুখী করিতে পারে নাই। রাজ্য ও যশোলাভে তাঁহাদের জয়লাভ হয় নাই।

উক্ত দৃষ্টান্ত সকল হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, ধন যশ ও রাজ-পদাদিতে বাস্তবিক পক্ষে কোন সুখ নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এ সকলে যদি সুখ নাই জয় নাই তবে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত জয় কিসে? পণ্ডি-

তেরা বলেন প্রকৃত সুখ ধর্ম্মাচরণে; তুমি ধার্ম্মিক হও যথার্থ সুখী হইবে; জিতেন্দ্রিয় হও, ভগবানকে ভক্তি কর, মনুষ্যগণকে ভালবাস, জীব সকলকে দয়া কর—যথার্থই জয়যুক্ত হইতে পারিবে। কথা সত্য। যিনি ধার্ম্মিক তিনিই সুখী, তিনিই জয়ী; যে অধার্ম্মিক সেই দুঃখী, সেই পরাজিত। কিন্তু এ কথা এত সহজে বুঝিবার উপায় নাই।

আমরা সংসারে দেখিতে পাই, যে পাপিষ্ঠ সে যেমন দুঃখী যিনি ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত তিনিও তেমনই দুঃখী। যে ইন্দ্রিয় পরায়ণ নিশিদিন কেবল সহস্র উপায়ে আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহের ঘৃণিত পরিতৃপ্তি সাধনেই সচেষ্ট রহিয়াছে সে যেমন দুঃখী, যিনি দেবব্রত ভীষ্ম বা শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় পত্নী মাত্র গ্রহণ না করিয়া অথবা অলকা বিজয়ী মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় উর্ব্বশী তিলোত্তমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জিতেন্দ্রিয়তার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন তিনিও তেমনি দুঃখী। যে স্বার্থান্ধ পরের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পরকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় দানবী শক্তির তৃপ্তি সাধন করিতেছে সেও যেমন দুঃখী, যিনি পরের মঙ্গলে আপনার সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতেছেন তিনিও তেমনি দুঃখী।

সংসারের সর্ব্বত্রই এইরূপ দুঃখ, সর্ব্বত্রই এইরূপ পরাজয়। পৃথিবীর বিখ্যাত কাব্য ইতিহাসেও আমরা এই দুঃখের চিত্রই দেখিতে পাই। কুকাব্য সকলের কথা ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হইলে, বলিতে হয় যে, কাব্য কেবল বিরাট মনুষ্য সমাজ চিত্রের বা সংসার চিত্রের প্রতিচিত্র মাত্র; সংসার দুঃখে ভরা, সুতরাং কাব্যও দুঃখগীতিতে পরিপূর্ণ। ভারতের জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত এইরূপ দুঃখের চিত্রে উজ্জ্বল। রামায়ণ মহাভারতের আগাগোড়া দুঃখের অশ্রুজলে লিখিত দুঃখেই ইহাদের আরম্ভ এবং দুঃখেই ইহাদের পরিসমাপ্তি। রামায়ণ মহাভারতের প্রধান প্রধান পাত্র পাত্রী যাঁহারা তাঁহারা সকলেই দুঃখী, যাহারা অধার্ম্মিক, তাহারা দুঃখী, যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত তাঁহারাও দুঃখী। রামায়ণের রাম পত্নী হারাইয়া দুঃখী, ধর্ম্মার্থ পত্নী বিসর্জ্জন করিয়া দুঃখী, রাবণ অপত্যনাশে দুঃখী, সীতা পতি বিরহে দুঃখিনী, কৌশল্যা পুত্র বিরহে পুত্রবধু বিরহে দুঃখিনী, ভরৎ শত্রুঘ্ন-ভ্রাতৃবিরহে দুঃখী। মহাভারতে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিনাশে স্বজননাশে দুঃখী, ভদ্রা, দ্রৌপদী পুত্রনাশে দুঃখিনী, ধৃতরাষ্ট্র অপত্যনাশে, দুর্য্যোধন রাজ্যনাশে বন্ধু-নাশে দুঃখী, সকলেই অসুখী কেহ জয়যুক্ত নহেন। এখন কথা এই যে ধার্ম্মিক

অধার্ম্মিক নির্ব্বিশেষে কেহই যদি জয়যুক্ত না হন তবে ধর্ম্মেই জয়, যিনি ধার্ম্মিক তিনিই সুখী এ কথার সার্থকতা থাকে কই? যাঁহারা পরকালবাদী তাঁহাদের পক্ষে এ কথার উত্তর দেওয়া সহজ তাঁহারা বলেন ধার্ম্মিক ইহলোকে জয়যুক্ত হইলেন না বটে কিন্তু পরলোকে নিশ্চিতই সুখী হইতে পারিবেন। ইঁহারা আরও বলেন সুখদুঃখ মানবচিত্তের দুইটি আপেক্ষিক ভাব, দুঃখের অনুভূতি ব্যতীত সুখের অস্তিত্ব কখনও অনুভূত হয় না, দুঃখের ভোগ ভিন্ন সুখের ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্যই ভগবান ধার্ম্মিককে পরকালে অনন্ত সুখে সুখী করিবার জন্যই ইহলোকে কেবল দুঃখই ভোগ করাইয়া থাকেন।

পরলোকবাদীরা এইরূপে ইহলোকের ধর্ম্মের ফলকে দূর ভবিষ্যতের অন্ধকারগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা সে প্রকার অন্ধকারে নির্ভর করিতে চাহেন না, ইহলোকেই ধর্ম্মের জয় ধার্ম্মিকের সুখ দেখিতে চান, তাঁহারা উক্ত গভীর পরলোক বিশ্বাসীদিগের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া ইহলোকবাদী কিংবা ইহলোক পরলোক উভয় লোকবাদী ধর্ম্মনেতৃগণের শরণাপন্ন হইয়া আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা পান। এই ধর্ম্মনেতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি ধার্ম্মিক তিনি ইহলোকে সুখী পরলোকেও সুখী, তবে আমরা পৃথিবীতে যে বহু ধার্ম্মিককে দুঃখ ভোগ করিতে দেখি তাহার কারণ আমরা যাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করি তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে ধার্ম্মিক হইলেও সকল বিষয়ে পূর্ণ ধার্ম্মিক নহেন; কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা ধর্ম্মাচরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও তাঁহাদের ভিতরে এমন কতকগুলি অপূর্ণতা বা ত্রুটি থাকিয়া যায় যে, যাহার জন্য তাঁহারা সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারেন না। যিনি পূর্ণ ধার্ম্মিক নহেন সম্পূর্ণ সুখী হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আধুনিক যুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তা যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমি এই স্থানে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে তাহাদিগকে বৃত্তি বলা যাইতে পারে; এই বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য সাধনই মনুষ্যত্ব এবং তাহাই ধর্ম্ম। যাঁহার সমস্ত বৃত্তিগুলি অনুশীলিত, বিকসিত, চরিতার্থ ও সমঞ্জসীভূত হইয়াছে বুঝিতে হইবে যে তিনিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সুখী এবং তিনিই যথার্থ জয়যুক্ত হইয়াছেন।

এই বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট এবং কতকগুলি নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট

বৃত্তিগুলির অনুশীলন প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাতে আপাত সুখ হইলেও ইহা সমাজের শৃঙ্খলা ও শক্তিনাশক এবং পরিণামে ঘোর দুঃখদায়ক। যে সকল ব্যক্তি এই বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপ প্রস্ফুরণ ও সর্ব্বদা পরিতৃপ্তি সাধন করে আমরা তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর অতি ভয়ঙ্কর অধার্ম্মিক বলি, সভ্য জগতের সকল লোকই ইহাদিগকে অধার্ম্মিক বলে। এই বৃত্তিগুলির অনুশীলন না করিলেও এগুলি আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করে ও অশান্তি দান করে এজন্য এগুলিকে দমন করাই ধর্ম্ম। নিকৃষ্ট বৃত্তির অনুশীলন অধর্ম্ম বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাসাধন ধর্ম্ম। কারণ যাহা লোকসকলকে ধারণ করে তাহাই যখন ধর্ম্ম আর এই উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি অর্থাৎ দয়া, ভক্তি, প্রীতি, সত্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ক্ষমা, স্নেহ, মেধা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যখন মনুষ্য সমাজকে দৃঢ় ও পুষ্ট করে তখন অবশ্যই এইগুলির অনুশীলন, বিকাশসাধন ও চরিতার্থতাতেই ধর্ম্ম। আর ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, এইগুলির প্রস্ফুরণ ও পরিতৃপ্তিতেই মানবের প্রধান সুখ, সুতরাং ধর্ম্মাচরণেই সুখ। কিন্তু এগুলির অনুশীলন ও চরিতার্থতার একটা সীমা আছে সেই সীমা, বৃত্তিগুলির বিকাশসাধনের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা। সকল বৃত্তিগুলিরই অনুশীলন ও বিকাশসাধন করিতে হইবে। কিন্তু কোন একটী বা একাধিক বৃত্তির এরূপ অতিরিক্ত বিকাশসাধন কর্ত্তব্য নহে যে তাহা অন্য একটি বা অন্য কতকগুলি বৃত্তির বিকাশ প্রতিরুদ্ধ করে। যে বৃত্তিটি যেরূপ অনুশীলিত ও বিকসিত হওয়া উচিত সেটীকে ঠিক সেইরূপ অনুশীলিত ও বিকশিত করিতে হইবে। কোন একটী উৎকৃষ্ট বৃত্তির অত্যধিক অনুশীলন ও বিকাশসাধন ধর্ম্মসঙ্গত নহে, অনেক সময়েই ইহা দুঃখের কারণ হয়। অনেক ধার্ম্মিককে যে আমরা দুঃখভোগ করিতে দেখি তাহারও ইহাই একমাত্র হেতু। এ দুঃখ ধর্ম্মের, পরাজয় নহে—ইহা প্রকারান্তরে অধর্ম্মেরই ফল। দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে বোধ হয় একথাটা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

দাম্পত্য প্রেম ও স্বজাতি বাৎসল্য মানব হৃদয়ের দুইটা উৎকৃষ্ট বৃত্তি। মনে কর, ক—নামক কোন ব্যক্তি এই দুইটী বৃত্তির মধ্যে প্রথম বৃত্তি অতিরিক্ত অনুশীলন করিয়াছেন, স্বজাতি বাৎসল্যের তাদৃশ অনুশীলন করেন নাই, দাম্পত্যপ্রেমের চরিতার্থতাতেই তাঁহার জীবনের প্রধান এবং সারসুখ কিন্তু স্বজাতি বাৎসল্যের চরিতার্থতাতে সেরূপ কোন সুখ নাই। এখন

ঘটনাক্রমে ক, যে দেশের অধিবাসী সেই দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, যিনি দেশের রাজা তিনি রাজ্যশাসনে মন দেন না অপরন্তু প্রজাদের ধনশোষণ করিয়া আপনার বিলাস বাসনা চরিতার্থ করেন। রাজ্যের এ অবস্থায় দেশের কতকগুলি শিক্ষিত লোক স্বদেশকে দুঃখ দারিদ্রের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য একটী সমিতি সংগঠন করিলেন এবং "ক"কে সেই দলে আহ্বান করিলেন—বলিলেন "আমরা দেশের জন্য সকলেই আপাততঃ স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়াছি, তুমিও স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত যোগদান কর, তুমি বুদ্ধিমান এবং ধনবান তোমার দ্বারা দেশের অনেক কাজ হইবে।" এখন ক যদি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়াও তাহার উদ্ধার কল্পে স্ত্রীপুত্রের সংসর্গ ত্যাগ করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি যে একাংশে অধার্ম্মিক একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে, আর যদি ক কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় স্ত্রীপুত্রকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত হন ও অহর্নিশ কেবল স্ত্রীপুত্রের বিচ্ছেদ যাতনায় শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং শোকাশ্রুবিসর্জ্জন করেন আর দেশের কাজ করেন তাহা হইলে "ক" অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার যে দুঃখ সে দুঃখ পূর্ব্বগামী অধর্ম্মাচরণের দুঃখ, অত্যধিক পত্নীপ্রীতির বা অত্যধিক অপত্যপ্রীতির অনুশীলন এবং স্বজাতি বাৎসল্যের অননুশীলনজনিত দুঃখ। ইহা আদর্শ ধার্ম্মিকের দুঃখ নহে। দাম্পত্যপ্রীতির বা অপত্যপ্রীতির অনুশীলন ধর্ম্ম, স্বজাতিপ্রীতির অনুশীলনও ধর্ম্ম, কিন্তু দাম্পত্যপ্রীতি অপেক্ষা স্বজাতিপ্রীতি উৎকৃষ্টতর বৃত্তি, যিনি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুশীলন না করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বৃত্তির অধিক অনুশীলন করিয়াছেন তিনি কখনও আদর্শ ধার্ম্মিক নহেন, তাঁহার দুঃখ আদর্শ ধার্ম্মিকের দুঃখ নহে।

অমুক গ্রামের অমুক ব্রাহ্মণ বড় ধার্ম্মিক তিনি নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ করেন, মৎস্য মাংস খান না, দিনান্তে একবার মাত্র আহার করেন, জপ তপ সন্ধ্যা আহ্নিকে তাঁহার বড় অনুরাগ; গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন ও অতিথি সেবা আছে, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতিও তাঁহার গৃহে বাদ পড়ে না। অথচ বিধাতার কি চক্র—তাঁহার একটী মাত্র পুত্র বি, এ পাশ করিয়া সহসা জ্বর বিকারে প্রাণত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছাপনয়নে বুঝিলেন এই মূর্চ্ছা চির মূর্চ্ছা হইলেই ভাল হইত, সংসার তাঁহার পক্ষে শুষ্ক বদরীর ন্যায় নীরস ও নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া গেল। তাঁহার জপ তপ সন্ধ্যা

আহ্নিক সব ঘুরিয়া গেল। পাড়া-প্রতিবাসীরা একে অন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল "দেখিলে? কলিকালে ধর্ম্মের জয় নাই, ব্রাহ্মণ কখনও কাহারও মন্দ করেন নাই—অথচ তাঁহার মন্দ আগে হইল।" ব্রাহ্মণও ভাবিতে লাগিলেন "কেন আমার এমন হইল? আমি ত কখনও অধর্ম্ম করি নাই, ভগবান আমাকে এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ কেন দিলেন? তিনি মঙ্গলময় কিন্তু আজ যেন আমার সে কথায় বিশ্বাস হইতেছে না।

ব্রাহ্মণের এই যে দুঃখ, এই যে চিত্ত বিকৃতি ইহার কারণ অবশ্যই তাঁহার সন্তান প্রীতির চরিতার্থতার অভাব, তিনি সন্তান স্নেহের অত্যন্ত অনুশীলন করিয়াছিলেন সন্তানকে সম্মুখে দেখিয়া, তাহার সুখ চিন্তা করিয়া তাঁহার সে বৃত্তির পরিতৃপ্তি ঘটিত। এই পরিতৃপ্তি জনিত পুত্রের মৃত্যুতে সে সুখে অলঙ্ঘনীয় বিঘ্ন উপস্থিত হইল, সে সুখের আর আশামাত্র রহিল না, তাই অসহনীয় দুঃখ আসিয়া ব্রাহ্মণকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কিন্তু যে দুইটী চিত্তবৃত্তি মনুষ্যের সকল চিত্তবৃত্তির উপরে, যাহাদের অনুশীলন-জনিত সুখ অন্য বৃত্তি সকলের অনুশীলন-জনিত সুখ অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে, ব্রাহ্মণ যদি সেই দুইটী বৃত্তির বা তাহার একটী বৃত্তির বিশেষরূপ অনুশীলন করিতে পারিতেন তবে পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার দুঃখ কিছুতেই হইত না। তিনি যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিয়া ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় আদর্শ ভক্ত হইতে পারিতেন, যদি তিনি প্রহ্লাদের ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতে পারিতেন, ঈশ্বরে সর্ব্বস্বার্পণ করিতে পারিতেন তবে পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার শোক কিছুই হইত না। যিনি কেবল মানস চক্ষে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ভগবানকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার প্রেম-মহিমায় আত্মবিস্মৃত রহিয়া অহরহ পরমানন্দ অনুভব করেন, পুত্রের মৃত্যুজনিত দুঃখ তাঁহার কাছে তুচ্ছ। অথবা ব্রাহ্মণ যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া আদর্শ জ্ঞানী হইতে পারিতেন তাহা হইলেও পুত্রের মৃত্যু তাঁহার শোকের কারণ হইত না। কারণ জ্ঞানীর চক্ষে মৃত্যু কিছুই নহে, ব্রাহ্মণ জ্ঞানী হইলে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেন—মৃত্যু বিনাশ নহে, মৃত্যু পরিবর্ত্তন; লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিহার করিয়া নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেইরূপ জীর্ণ শরীর পরিহার করিয়া নবীন শরীর গ্রহণ করেন মাত্র। ব্রাহ্মণ কিন্তু এ ভক্তি ও এ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই, তাই তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে এত দুঃখ। এ দুঃখ তাঁহার নিজেরই ত্রুটী বা অধর্ম্মের ফল, ইহা ধার্ম্মিকের দুঃখ নহে। রামায়ণ

মহাভারতের রাম দশরথ যুধিষ্ঠিরাদি যে দুঃখ পাইয়াছিলেন সে দুঃখ এই শ্রেণীরই দুঃখ, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট চিত্তবৃত্তিসমূহের অনুশীলনের অসামঞ্জস্য জনিত দুঃখ; সুতরাং তাঁহাদের এই দুঃখ বা পরাজয় দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে না যে, ইহলোকে ধার্ম্মিকগণ দুঃখ ভোগ করেন বা ইহলোকে ধর্ম্মের পরাজয় ঘটে।

অতএব এক্ষণে ইহা বোধ হয় প্রমাণীকৃত হইল যে, ধন, মান যশ বা পদাদি, বাস্তবিকপক্ষে জয় বা সুখ দান করিতে পারে না, ধর্ম্মই প্রকৃত জয় দান করে। যিনি ধার্ম্মিক তিনিই সুখী, তিনিই জয়ী তিনি রাজা হউন আর দরিদ্রই হউন, প্রাসাদেই বাস করুন আর কুটীরেই বাস করুন, নগরবাসীই হউন বা বনবাসীই হউন, তিনিই যথার্থ সুখী এবং তিনিই যথার্থ জয়যুক্ত।

শ্রীসুধারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

পথ মাঝে।

এক দিন মধুর সন্ধ্যায়
শুধু এক নিমেষের তরে
প্রথম দর্শন-সুখ ঘটিল যথায়
এ দুঃখের দিনে তাহা আজো মনে পড়ে।
নিতি সেই পথের মাঝারে
সেই মত শুধুই একাকী—
নীরবে বসিয়া থাকি হেরিতে তোমারে
যতনে সে স্মৃতিটুকু তপ্ত বক্ষে রাখি।
খর স্রোতে পাণার মতন
ভেসে, ভেসে' চলেছিনু আমি
অজানিত পথ মাঝে আসিয়া তখন
তুমিই রুধিলা গতি হ'য়ে শুভকামী।
ব্যর্থ সুখে উঠিনু শিহরি,
মজিলাম ভ্রান্তি বশে হায়?
কোন্ প্রাণে বল এবে রহিলে বিসরি'?
রবির কিরণ অই হের ম্লান প্রায়।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কেন গাহিব না ?

(১)

কেন গাহিব না ? তুমি হাসিবে আমায় ?
নাই তাল নাই মান,
নাই মম মধু-তান,
তবে কি মরিব জ্বলি হৃদয়-ব্যথায় ?

(২)

যখন দুঃখের বহ্নি জ্বলে হৃদিময়,
ধু ধু করে দিবানিশি,
কি ভাব মরমে পশি,
তখনি গাহিতে প্রাণে বাসনা জাগায়।

(৩)

অথবা আনন্দ-নীরে ভাসে যবে মন,
না থাকে চিন্তার লেশ,
হৃদে হ'য়ে ভাবাবেশ,
খেলায় পরাণে স্বর-লহরী তখন।

(৪)

ভুবি আপনার ভাবে গায় সবে গান,
সম্পদে বিপদে তার,
বহে স্রোত অনিবার,
এ অমিয় পরশনে জগৎ অজ্ঞান!

(৫)

যদিও রাগিণী মম বড়ই কর্কশ,
তথাপি সান্ত্বনা প্রাণে,
ঢালে এ নীরস-তানে,
নীরস আমার কাছে অতীব সরস।

(৬)

কেন গাহিবনা? তুমি হাসিবে কেমন?
তোমার মধুর-তান,
করে পুলকিত প্রাণ,
আমার এ ভাঙ্গা গলা নহেত তেমন!

(৭)

জগতের রীতি কভু নহে এ প্রকার,
বসন্তে কোকিল যবে,
ঢালে সুধা-রাশি ভবে,
করিয়া মানব-প্রাণে উন্মাদ সঞ্চার।

(৮)

সে ঝঙ্কারে প্লবগেরা হয় কি নীরব?
ধরেনা উচ্ছাসে তান,
লাজ ভাবি ম্রিয়মাণ?
লুকায় বিশ্বের কাছে বিশ্ব-ত্রাস রব?

(৯)

অথবা বায়স বসি বিটপী-শাথায়,
থাকে কি নোয়ায়ে মাথা?
চিরাভ্যস্ত মিষ্ট গাথা,
গায় না কি তার সেই বেসুরা-গলায়?

(১০)

থাকেনা কণ্টক-তরু চন্দন-কাননে?
নিরখি গগনে শশী,
খদ্যোত কি থাকে বসি—
আচ্ছাদি পল্লবে জ্যোতিঃ—লাজভাবি মনে?

(১১)

কভু নয়? গায় সবে ভাবের উচ্ছ্বাসে,
বনের নির্ব্বোধ পাখী,
জানেনা ত মিষ্টতা কি?
তবু গেয়ে গেয়ে সারা মনের হরষে।

(১২)

হায়রে সঙ্গীত পূর্ণ নিখিল ভুবন,
ফল্গু-প্রবাহের মত,
স্বর-ধারা অবিরত,
খেলায় মানব প্রাণে থাকি সংগোপন!

১৩

নির্দ্দয় শ্বাপদ-প্রাণী সঙ্গীত-মগন,
বাজিলে বাঁশরী ধ্বনি,
বিষধর ভুজঙ্গিনী,
নেচে আসে, ভুলে যায় স্বভাব আপন।

১৪

এ অপূর্ব্ব সুধা-রসে থাকিতে রসনা,
বঞ্চিত হইব কেন?
আছে কত মম হেন,
ভূমণ্ডলে, গাব আমি, কেন গাহিব না?

১৫

উঠিছে ভারতে নিত্য নব-বীণা-তান,
পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে,
ছুটিছে জলদ-মন্দ্রে,
সে ধ্বনিতে মানবের স্তব্ধ মনপ্রাণ।

১৬

এ ভাঙ্গা বীণার পানে কেবা ফিরে চায়?
হাস তুমি খুব হাস,
নাহি মোরে ভালবাস,
বল মন্দ—তবু গাব—ভাবি না লজ্জায়।

১৭

আমার কর্কশ-স্বর ভাল লাগিবেনা—
জানি হে তোমার কানে,
তথাপি আপন মনে,
গাইব—গাইব—আমি, কেন গাহিব না?

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

উত্তীর্ণ।

হৃদয় উদ্যমশীল
হয় যদি অনুক্ষণ,
অন্তরের বল যদি
থাকে সদা বর্ত্তমান।
শত বাধা শত বিঘ্ন
আসে যদি নিশিদিন,
সে আঁধারে প্রাণ কভু—
হবেনাক আশাহীন।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

শেফালিকা।

(১)

সাধে কি শেফালি তোরে এত ভালবাসি ?
সাধে কিরে তোরে আমি দেখিবারে আসি ?
ও ক্ষুদ্র হৃদয় তব,
গন্ধ বহে অবিরত,
তাই গন্ধ লোভে তোরে (আমি) হেরি দিবানিশি।
সাধে কি শেফালি তোরে এত ভালবাসি ?

(২)

সাধে কি শেফালি তোরে এত ভালবাসি ?
সাধে কিরে তব কাছে বারে বারে আসি ?
তব ও সুবাস গুণে,
মিশাইছি প্রাণে প্রাণে,
তবু তুমি অভিমানে পড়িতেছ খসি।
সাধে কি শেফালি তোরে এত ভালবাসি ?

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহ।

বাজবাহাদুর ও রূপমতী।

(ঐতিহাসিক সন্দর্ভ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। (

আদম খাঁ ও রূপমতীর মিলনের দিন যথা নিয়মে সূর্য্য উদয় হইলেন। প্রত্যেক দিনই সূর্য্য উদয় হয়, কিন্তু রূপ-যৌবনমদ-গর্ব্বিত আদম খাঁর চক্ষুতে আজিকার দিন কি মধুর বোধ হইতে লাগিল; সে ভাবিল সূর্য্যদেব আজ জগতে কি স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করিতেছেন! পাখীগণ কি মিষ্ট রবে কলরব করিতেছে! উহারা কি বলিতেছে?—উহারা প্রেম-গাথা গাহিতেছে!—প্রেম আর কোথাও নাই! প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার রূপমতী! আজ সেই অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আদম প্রাণ ভরিয়া মধু পান করিবে! আদম কি সৌভাগ্যশালী!

আদম খাঁর হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। ইহা আশ্চর্য্য, সুখের দিন কত শীঘ্র যায়। রূপমতী যথা নিয়মে সন্ধ্যার পর তাহার রাত্রিকালের আহার শেষ করিল। আহার শেষ করিয়া আজ নবীন বেশে সজ্জিত হইতে আরম্ভ করিল। বাজবাহাদুর রূপমতীকে যে বেশে দেখিতে ভালবাসিতেন, রূপমতী আজ সেই বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল, সে অতি সুন্দররূপে কেশ রচনা করিয়া মস্তকে সিঁথি পরিল। গলদেশের সাতলহর দীপালোকে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। পরে কটীতে কিঙ্কিনী পরিয়া মনমোহিনী বেশে সজ্জিত হইল। সর্ব্বশেষে বাজবাহাদুরের একমাত্র প্রিয় নয়নরঞ্জন বাসন্তি রঙ্গের ওড়না খানিতে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল। অনেক দিন পরে আজ আবার রূপমতীর অঙ্গে গহনা-বস্ত্রাদি শোভা পাইতে লাগিল, অনেক দিন পরে আজ রূপমতীর অধর-কোণে মৃদু হাসি খেলিতে লাগিল। সকলে নির্ম্মল-চরিত্রা, সতী রূপমতীর আজিকার বাহ্যিক ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু তাহারা রূপমতীর অন্তরের ভাব কিছুই বুঝিল না।

বেশভূষান্তে রূপমতী তাহার এক সুদৃঢ় পেটিকাভ্যন্তর হইতে একটী অতি সুন্দর দ্বিরদ-রদ নির্ম্মিত কৌটা বাহির করিল। রূপমতী কৌটা হস্তে তাহার শয়ন কক্ষে যাইয়া দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার উপর বসিয়া কৌটা হইতে একটী

বটিকা বাহির করিয়া হাসিমুখে তাহা গলাধঃকরণ করিল। অতঃপর অতি প্রফুল্লিত চিত্তে রূপমতী গান আরম্ভ করিল,—

"তবে আর কেন থাকি, আমি এ ভবে,
বহিতে শুধু দুঃখের রাশি" ইত্যাদি।

রূপমতী বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে শয্যায় পড়িয়া খেদের গান গাহিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর স্বর বাহির হইল না, দেহ অবশ হইল, অঙ্গ হিম হইতে লাগিল,—অবিলম্বে রূপমতী অবশ-অলসে উপাধানে মাথা গুঁজিয়া ঢলিয়া পড়িল।

এদিকে আদম খাঁ সন্ধ্যার পর নবীন বেশে সজ্জিত হইয়া রূপমতীর শয়ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। আদম খাঁ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে রূপমতী আজ রাজরাজ-মোহিনী বেশে সজ্জিত হইয়া বিছানায় শুইয়া তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছে। আদমের কাম-কলুষিত হৃদয় সে মনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, সে ধরা গলায় ভগ্ন আওয়াজে ডাকিল,—"রূপমতী!" সে ধ্বনিতে প্রকোষ্ঠ কম্পিত হইল। কিন্তু রূপমতী উঠিল না। তখন আদম খাঁ রূপমতীর অঙ্গের ওড়না সরাইয়া, তাহার পেলব দেহ স্পর্শ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। তাহার বোধ হইল যেন বরফে হাত দিয়াছে। আদম তখন রূপমতীর প্রতি নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া দেখিল অহো! তাহার রমণীয় কমনীয় রূপ কালিমাময় হইয়া গিয়াছে। তখন আদম বুঝিল রূপমতী বিষ খাইয়া রমণীর শ্রেষ্ঠ ধন সতীত্বকে তাহার ন্যায় পাষণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। জগতের শ্রেষ্ঠ রূপসী রূপমতী এইরূপে তাহার দেহের অন্ত করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। আর আজি পর্য্যন্ত ইতিহাস সে গৌরব গাথা বহন করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রূপমতী একজন সুকবি ছিলেন। তিনি অনেক কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি গাথা "বাজভূপ-কল্যাণ" নামে বাজবাহাদুরের নামে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত সেগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, এস্থলে বহুমূল্য রত্নের আদর করিবার লোক নাই। যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক রূপমতীর লিখিত গাথাগুলি সংগ্রহ করেন তবে সাহিত্য জগতে একটা নূতন দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। অদ্যাপিও মালব প্রদেশের লোক তাহাদের অবসরকালে ঐ গান করিয়া আনন্দ অনুভব করে। অদ্যাপিও সেখানকার ভিক্ষুকেরা রূপমতী গ্রথিত গান দ্বারে দ্বারে গাহিয়া

অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সকল গান এরূপ সুন্দর ও ক্ষমতাপূর্ণ ভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক গানের সঙ্গে বাজবাহাদুর ও রূপমতী এই উভয় প্রেমিক যুগলের নাম গ্রথিত আছে। যখন বাজবাহাদুর রাজ্য ও রূপমতীকে হারাইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় রূপমতী কতকগুলি বিরহ সঙ্গীত লিখিয়াছিলেন; তাহা এরূপ নির্ম্মল প্রেম ও ভক্তির সমবায়ে লিখিত হইয়াছিল যে, সেই গান যে কেহ শুনিত সেই চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিত না; বিখ্যাত সঙ্গীতকার রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের কতকগুলি গান রূপমতী লিখিত সঙ্গীতের অনুকরণরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি গুপ্ত মহাশয়ের গানে রূপমতী লিখিত গানের ন্যায় ততদূর বিমল-প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হয় না; তাঁহার গান ততদূর হৃদয়-তন্ত্রী বাজাইতে পারে না। এক কথা রূপমতী লিখিত গান শুনিলে হৃদয়ে এক অননুভূত ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়। সে গান বিমল স্বর্গীয় সুখ অনুভব করাইত; যাহা আজ পর্য্যন্ত কোন কবির গান ততদূর মাদকতা আনিতে পারে নাই। রূপমতীর প্রধান ক্ষমতা তিনি অবিলম্বে মুখে মুখে গান রচনা করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে রূপমতী বিষপানান্তে তখনই গভীর খেদের গান গাহিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার একটী অদ্ভুত ক্ষমতা।

এইরূপে জগতের অতুল রূপময়ী ও রমণীগণের শ্রেষ্ঠা রমণী রূপমতীর জৈবী লীলা শেষ হইয়া গেল। বাজবাহাদুর আদম খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া খান্দেশ সীমান্তে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে গিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি শীঘ্রই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মালব রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য আসিলেন কিন্তু সেবার দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় পীরমহম্মদ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পুনরায় বাজবাহাদুর খান্দেশ যাইয়া মিরন সাহের সাহায্যে সৈন্য বল বাড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আবার বিপুল সৈন্যদল লইয়া পীরমহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অদম্য উৎসাহে বাজবাহাদুর পীরমহম্মদের নিকট হইতে স্বদেশ উদ্ধার করেন। কিন্তু ইহার ৭ বৎসর পরে আকবর পুনরায় আবদুল্লার সেনাপতিত্বে এক বিপুল বাহিনী মালব আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে বাজবাহাদুর পরাজিত হইয়া পর্ব্বত গহ্বরে পলায়ন করেন। আবদুল্লা মণ্ডু জয় করিয়া তথায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। বাজবাহাদুর আর একবার আবদুল্লার বিরুদ্ধে স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে

পারেন নাই। বাজবাহাদুর শেষে স্বদেশ উদ্ধারের আর কোন উপায় না দেখিয়া আকবর বাদশাহের নিকট যাইয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দুই হাজারী মনসবদারের পদে উন্নত হইয়াছিবেন। কিন্তু ইহার কিছুদিনের পরেই তিনি মারা যান (১০০১ শকে)। তাঁহার আজন্ম পোষিত শেষ জীবনে স্বদেশ উদ্ধার করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাই তাঁহার গভীর পরিতাপের বিষয় রহিয়া গেল। বাজবাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী রূপমতীর কবরের নিকট তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছিল। বাজবাহাদুর দেখাইয়া গেলেন মৃত্যুর পরও প্রণয় কখন ছিন্ন হয় না। আজিও প্রেমিক যুগলের গোরস্থান উজ্জয়িনীর পুষ্করিণীর তীরে বিরাজমান আছে।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

ভগ্ন-হৃদয়।

আর না রাখিতে চাহি
মোর এই তাপিত পরাণ।
ভাগ্যলক্ষ্মী ছেড়ে গেছে,
প্রেমতৃষ্ণা মিটিয়াছে,
মোর কাছে কাঁদা হাসা
সকলি সমান।
আর না রাখিতে চাহি
মোর এই তাপিত পরাণ।
কি ফল তাহারে বিনে,
এছার তাপিত প্রাণে,
সহেনা পরাণে তার বিরহ বেদন।
আর না রাখিতে চাহি
মোর এই তাপিত পরাণ।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

রেঙ্গুনে তিন লক্ষ টাকা মূলধনে "বর্ম্মা ল্যাক রিফাইনারী লিমিটেড" নামক একটী যৌথ কারবার খোলা হইয়াছে। এই কারবারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লাক্ষা প্রস্তুত হইবে।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের নৌবল বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ফ্রান্স আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না, তাঁহারাও রণতরণীর সংখ্যা বাড়াইবার সংকল্প করিয়াছেন।

বিগত ১১ই জুন ফ্রান্সে প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। ল্যাম্বোজ নামক স্থানে একটী বাটী পড়িয়া গিয়া আটজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গিরিধির শ্রীযুক্ত সুন্দর মল ও কুণ্ডার জমীদার শ্রীযুক্ত রামেশ্বরনাথ সিংহ হাজারিবাগের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে যথাক্রমে দশ হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সীমান্ত প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, আমীর মহোদয় সীমান্তস্থিত রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি শান্তি রক্ষার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বরদাবাসী ওয়াই, জে, পণ্ডিত নামক, একজন ব্রাহ্মণ সন্তান কার্পাস-বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য বরদার মহারাজার সহিত আমেরিকায় গমন করিয়াছেন।

গত ১৪ই জুন ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথে এক ভীষণ কাণ্ড হইয়াছে। ঐ দিন লুপলাইন দিয়া একখানি মালগাড়ি ধীর গতিতে কলিকাতার দিকে আসিতেছিল। সাঁউথিয়া ষ্টেসনের নিকটে অজয় নদের সেতুর উপরে গাড়ি যখন উঠিল, অমনি সেতু থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই ভীষণ শব্দের সহিত মালগাড়িকে লইয়া সেতু অজয়ের জলরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইল। রেলওয়ে রিপোর্টে প্রকাশ ১৪ জন লোক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, আর লোক সকল লাফাইয়া পড়িয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে।

সান্ধ্য-ভ্রমণ।

দিনদেব সমস্ত দিন ধরাবক্ষে অনলময় কিরণ ঢালিয়া অবসন্ন-কলেবরে রক্তিমাভা ধারণ করতঃ পশ্চিম-গগনের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। আমি ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। এমনি সময়ে বেড়াইতে আমার যেন কি একটা আগ্রহ—কি একটা আনন্দ! কিন্তু আজিকার এ ভ্রমণে আর আর দিনের চেয়েও যেন অধিকতর প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আজ পূর্ণিমা। চাঁদকে সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইব। আমি একাকী বেড়াইতেই ভালবাসি। নির্জ্জন আমার অতি প্রিয়। অথচ একাকী নীরবে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া অনন্ত বিশ্ব প্রকৃতির সুচারু সুষমা-রাশি দর্শন করিবার—অনাবিল ভাব-তরঙ্গে ভাসমান থাকিবার—ইহাই উপযুক্ত অবসর! সুবর্ণ সুযোগ! তাই একেবারে কর্ম্ম-কোলাহলময়—স্বার্থের বিপণি সংসার ছাড়িয়া প্রকৃতির মুক্ত-প্রাঙ্গণে কবিত্বের আধার,—বিমল-প্রেমের অনন্ত-উৎস—নদীতীরে যাইয়া উপবেশন করিলাম। প্রাণে যেন কি একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সুবাতাস বহিতে লাগিল। সংসারের কর্ম্ম-ক্লিষ্ট যন্ত্রণা-মথিত আত্মা কিয়ৎক্ষণের জন্য এ অনন্তের রাজ্যে অনন্তের ধ্যানে মুগ্ধ হইয়া রহিল। যেন কোন অজ্ঞেয় শক্তি আসিয়া অসাড় দেহে নবীন-চেতনার তাড়িত সঞ্চার করিল—কর্ম্ম-ভারাবনত প্রাণ একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ততক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে। সুধাময় স্নিগ্ধ কিরণ বৃক্ষের শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে, শ্যামল তৃণ রাশির উপর—তটিনীর প্রত্যেক তরঙ্গ-ভঙ্গে—প্রত্যেক ফুলে ফুলে প্রতিফলিত হইয়া প্রকৃতিকে পরমা রূপবতী সাজাইয়া তুলিয়াছে। যেন এই মলিন-মর্ত্ত্যধামে নন্দনের শোভা ফুটিয়া উঠিল। মৃদু-মন্দ-সমীরণ ফুলের পবিত্র-সৌরভ বহন করিয়া আনিয়া নাসারন্ধ্রে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। ধরণীর বিশাল আলেখ্য নানা-বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠিল। তাই কবি বিমুগ্ধ-প্রাণে একদিন গাহিয়াছিলেন,—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য শ্যামলাং
মাতরম্,
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং মাতরম্।"

প্রকৃতির এই মনোহারী দৃশ্য—এই প্রাঙ্গন-শোভা যিনি এমন সুন্দর নির্জ্জনে আপন মনে দর্শন না করিয়াছেন—তাঁহার মনুষ্য-জন্মই বৃথা!

এখানে আসিলে পৃথিবীর হিংসা, দ্বেষ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, প্রলোভন ইত্যাদি নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি-চয় ক্রমে ক্রমে অন্তর হইতে অপসারিত হইয়া যায়। অনেক সময় এমনও ভ্রম হয় যে,—যেন আমি স্বার্থ-দিগ্ধ কামনা-বাসনাময়—সুখদুঃখ-জরা-মৃত্যুময় সংসারের কেহ নহি। আমি যেন সেই অনন্ত দেবের অনন্ত-রাজ্যেরই এক জন। অনন্তে মিশিয়া গিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি। আমি যেন আর সে আমি নাই—যেন আমার সে আমিত্ব—অস্তিত্ব বদলাইয়া গিয়া সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়াছে। প্রাণ যেন মর-জগতের মায়া-মমতার বন্ধন উপেক্ষা করিয়া সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবানের প্রেমেই বিভোর হইয়া রহিয়াছে!

এখানে আসিয়া অবধি আমার অন্তরে কত ভাবের সঞ্চারহইল—কত পুরাতন স্মৃতি,—সুখ দুঃখের কথা, পাপ-পুণ্যের কথা, স্বদেশের কথা, সংসারের অনিত্যতা, পরকালের কথা—কতই মনে উঠিয়া পড়িয়া আবার মনেই মিশিয়া যাইতে লাগিল। আরো মনে হইল—প্রিয়-কবির সেই ভাবময়—উচ্ছ্বাসময় কবিত্ব-গাথা!

"হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি;
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদ এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলে থাকি সে সকলে,
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাঁহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার জ্বালায়?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি কভু দিবারাতি,
আবার নির্জ্জনে বসি কাঁদি পুনরায়?
"বসিয়া যমুনা তটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হ'লো মনে কত যে ভাবনা;
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্ম, বন্ধু জন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না;

কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল ;
কত ভাঙ্গি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্ত-ভাঙ্গা মন যার সেই সে বুঝিল।" *

আহা কি মধুর ! কি পবিত্র ভাব ব্যঞ্জক ! এ যেন আমারই প্রাণের কথা ! কবি যেন কল্পনার চক্ষে সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন ! মানব-হৃদয়-শাস্ত্রের প্রত্যেক অধ্যায়—প্রত্যেক পৃষ্ঠা—প্রত্যেক পংক্তি—প্রত্যেকটী অক্ষর তিনি কি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন ! নতুবা কবিতায় মানব-প্রাণের প্রতিধ্বনি মাখান থাকিবে কেন ? কবিতার প্রত্যেকটী ছত্র যেন আমার কাছে মধুময়—শান্তিময় বোধ হইতে লাগিল। তাই মনে মনে যতবার পারি, কবিতাটীর আবৃত্তি করিলাম। বড় শান্তি বোধ হইল !

উপরে জ্যোৎস্না তরঙ্গায়িত নক্ষত্র মালা খচিত সুনীল আকাশ অসীম—অনন্ত ; নীচে কুলু কুলু নাদিনী স্রোতস্বিনী বুকভরা উচ্ছ্বাস লইয়া প্রেম গীতি গাহিয়া—বাঞ্ছিতের অনুগমনে ছুটিয়াছে—তটিনীর প্রত্যেক হিল্লোল চন্দ্র কিরণ মাথায় লইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে—উপবনে কুসুম-সুন্দরীরা ঘোমটা খুলিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া—সলজ্জ হাসি হাসিতেছে—সকলই সুন্দর ! সকলই মর্ম্মস্পর্শী ; সকলই মধুর ! উজ্জ্বল—স্বর্গ। মন্দ ভ্রমর এমন সময়ও তাহার স্বভাব-সিদ্ধ রসিকতাটুকু ছাড়িতেছে না। কুসুমের কানে কানে দুটা প্রণয় কথা জানাইয়া আপনাকে যথার্থ প্রণয়ী মনে করিয়া আমোদ অনুভব করিতেছে। সাধের নির্জ্জনে বসিয়া সেই মঙ্গল মুহূর্ত্তে মধু যামিনীতে আপন মনে উলঙ্গ বিশ্ব-প্রকৃতির এই বিরাট—মহান্—উদ্দাম চারু রহস্য-লীলা দর্শন করিয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। হৃদয়ে স্তরে স্তরে প্রীতি প্রফুল্লতার ক্ষীণ প্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল। যিনি প্রাণ ভরিয়া এ শোভা দর্শন করিয়াছেন—এই সুবিমল ভাবের নদীতে সাঁতার দিয়াছেন—জগতে তাঁহার সমান ভাগ্যবান্ কে ? তিনিই কেবল বুঝিতে পারিয়াছেন জগতের যত পবিত্রতা—শান্তি, প্রেম, সৌন্দর্য্য—উজ্জ্বলতর ভাবে পুঞ্জীকৃত হইয়া এই খানেই বিরাজিত। মনে হইল ; যদি এমন ভাবে প্রাণটাকে প্রকৃতির এই বিশালতার চারু-সুষমার মাঝে

* কবিতাবলী। (যমুনা-তটে—হেমচন্দ্র)

ডুবাইয়া রাখিতে পারিতাম—তাহা হইলে এই আকাশ,এই নদী, এই উপবন, এই প্রসূনগণ, সকলেই আমার সাধের সহচর হইত—ইহাদের লইয়া আমি এখানেই স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতাম—! পাপময় সংসারের অধীনতা কালিমা মুছিয়া গিয়া সেখানে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোক ফুটিয়া উঠিত! হায় রে সে দিন কত সুখের! এ অভাগার ভাগ্যে কি সে দিন কখন আসিবে?

বিহ্বল চিত্তে একাগ্রতার সহিত এবম্বিধ চিন্তা লহরীতে ভাসিয়া যাইতেছি—এমন সময় কে যেন কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিল। চারিদিকে চাহিলাম—কোথাও কেহ নাই! উর্দ্ধে চাহিলাম,—চন্দ্র কিরণে উদ্ভাসিত নীলিমাময় অনন্ত আকাশ প্রসারিত রহিয়াছে। তবে কাহার এ স্বর? কোথা হইতে আসিল! অমনি আবার—এক সঙ্গে দুই তিন বার—সেই সুধা মাখা স্বর! এবার দেখিলাম,—একটী ক্ষুদ্র পাখী আমারই মাথার উপরে থাকিয়া আকাশ হইতে সুধা ছড়াইয়া দিতেছে। হায়, আমিও যদি ওর মত স্বাধীন হইতাম—এমনি ভাবে জ্যোৎস্না-অঙ্গে মাখিয়া মনের সুখে প্রাণ খুলিয়া অনন্তে মিশিয়া গাহিতে পারিতাম!

আমি কবির সুরে আদরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি;—

"কে তুমি রে বল পাখী,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হ'য়ে,
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে মধু মাখা সঙ্গীত শুনাও"? *

অমনি পাখী তাহার মধুর স্বর ধারায় দিগন্ত প্লাবিত করিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল। হায়, জগতে দুঃখীর দুঃখ কেহ বুঝে না! বৈষ্ণব কবি চণ্ডী দাসের কয়টী ছত্র এখানে মনে পড়িল—

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল;
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল!"

এবার বড় আশায় চাঁদের পানে চাহিলাম—আহা কি সরলতার ছবি! কি পবিত্রতার খনি! এ দুঃখের জগতে চাঁদই কেবল সুখী;—সদানন্দ ময়!

---

* কবিতাবলী। (হেমচন্দ্র)

হৃদয়ে আমিও যদি এই চাঁদের মতন হইতাম!— চাঁদ আমার প্রাণের আশা বুঝিতে পারিল কি না—জানি না তবে আমার দিকে চাহিয়া কেবলই হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল। সে হাসির অর্থ নাই—সে মধুর চাহনি উদ্দেশ্য বিহীন! হায় চাঁদ! কবির কবিত্ব-সম্বল—বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নর নারীর প্রাণের বাঞ্ছিত ধন—তুমিই যথার্থ সুখী। সংসারের মলিন কূপে একদিনও অবগাহন কর নাই—একদিনও সংসারের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হও নাই—তাই তোমার মনে এত আনন্দ! চাঁদরে, এ তৃষিত—তাপিত অভাগাকে তোমার অই আনন্দের কণামাত্র দিও—এখানে আসিলে এমনি ভাবে আমার প্রাণের ভিতর বসিয়া মধুর হাসি হাসিও—মধুর খেলা খেলিও! আমি ঐ টুকুই চাই—জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তোমার ঐ নয়নানন্দ কর—পুণ্য পবিত্রতাময় মোহনছবি খানি দেখিতে দেখিতে ইহলীলা শেষ করি!

সহসা এক খণ্ড মেঘ আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চাঁদের সেই নশ্বর হাসি মাখান মুখ খানি ঢাকিয়া ফেলিল। প্রকৃতিরও চারু বদন-মণ্ডলে অন্ধ কারের গাঢ় যবনিকা পতিত হইল। হায়, জগতে পরের সুখ কেহ দেখিতে পারে না। হায় সংসার, তোমাতে কি স্বার্থ পরতা—কি পরশ্রী-কাতরতা! কি অপবিত্রতা!

এমন সময় অদূরে মনুষ্য কণ্ঠ শ্রুত হইল,—

স্বার্থ মলিন অসার সংসারে
কেন র'লে মন মজিয়ে;
বিফল সাধনা করোনা করোনা
বিষয় ভাবনা ভাবিয়ে।
দুদিনের লাগি এসে এ সংসারে,
ভাসায়েছ তরী অকূল পাথারে,
কি আছে সম্বল কে নিবে উদ্ধারে?
স্বেচ্ছায় ঠেকেছ এ ফাঁদে পা দিয়ে;
এখনো আছেরে উপায় ইহার,
ছাড় ছাড় ত্বরা স্বার্থের আগার,
নহে শান্তি ধাম—এ যে কারাগার,
গাও তাঁরি নাম হৃদয় খুলিয়ে।

কথা গুলি যেন আমার কাছে বড়ই সাময়িক—অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রতীত

হইল। চিন্তাকুল চিত্তে বহির্জগতের অন্ধকারের সঙ্গে অন্তর্জগতের অন্ধকার মিলাইয়া ধীরে ধীরে আবার সেই পাপ সংসারের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইতে চলিলাম।

"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

জীবনের-পরপার।

(চতুর্থ প্রস্তাব।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"তদ্যথাতৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং
গত্বাঽন্যমাক্রম্যাক্রম্যাত্মান মুপসংহরতি।"

বৃহদারণ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুনর্জ্জন্ম।

জীবের মৃত্যু হইল। তাহার পর আত্মার ভাবনাময় স্থিতি। তাহার পর পুনর্জন্ম। এই যে স্থিতি,—ইহা কতকাল স্থায়ী—তাহা অদ্যাপি গবেষণার বহির্ভূত। তবে পুনর্ব্বার দেহান্তর গ্রহণ যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রমাণসিদ্ধ।

আত্মা যে নিস্পৃহ হইয়া, সূক্ষ্মাবয়বে অবস্থান করে না, তাহা আমরা প্রথম প্রস্তাবেই বলিয়াছি। কারণ মরণকালে, জীবের অনেক বাসনাই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। অথচ ভাবনাময় শরীরে, ভোগ অসম্ভব। (১) সুতরাং সূক্ষ্মদেহধারী জীব তাহার অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। অতএব ভোগের জন্য তাহাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়।

---

(১) "নাশরীরস্যাত্মনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি।"

(বাৎস্যায়নাচার্য্য)

'কর্ম্মফল বলিয়া আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে। ইহা আর কিছুই নয়, পূর্ব্বজন্মে যে সকল সুকার্য বা কুকার্য্য কৃত হয়, পরজন্মে সেই অনুসারে সুখ বা দুঃখভোগ হয়। ইহাও স্বর্গ বা নরক আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে।

একটি গল্প আছে, য একব্যক্তি মৃত্যু কালে কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে। পরজন্মে সে কুক্কুর দেহ ধারণ করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, মরণকালে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই লাভ করা যায়। বোধ হয়, এই জন্যই মৃত্যু-কাতর রোগীর কর্ণমূলে হরিনাম করা হয়। তাহা হইলে, মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি শ্রীহরির চরণে আশ্রয় লাভ করিবে।

এই যে বিশ্বাস, ইহা অভ্রান্ত সত্য না হইলেও আংশিকভাবে মিথ্যা নয়। মরণকালে মানুষের মনে কোন চিন্তা সমধিকরূপে আপনার প্রভাব বিস্তার করে? নিশ্চয়ই, জীবনে যাহা ভোগ করা হইল না, যে বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া গেল, যে কাজ অসম্পন্ন রহিল। সেই সমুদয়ই আসন্নমৃত্যু জীবের মনে অধিকবার করিয়া আলোচিত হয়। এবং দেহমুক্ত আত্মা যখন শূন্যে উড়িয়া যায়, তখনও সেই সকল অপূর্ণ বাসনার স্মৃতি তাহাকে পীড়া প্রদান করিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই কারণেই জন্মান্তর গ্রহণ। তাহার পর, যতদিন না জীবের এই বাসনার লয় হয়, ততদিন সে এই পৃথিবী বক্ষে পৌনঃপুনিক ভাবে গমনাগমন করিবে। যেদিন বাসনার লয়, সেইদিন মোক্ষ প্রাপ্তি।

অনেকে পুনর্জ্জন্মের কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। জন্মান্তরের বিষয় তাঁহারা অলীক কাহিনী বা রচা কথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। অমুক লোকের মনে আছে, সে পূর্ব্বজন্মে কি ছিল। এইরকম কোন দৃষ্টান্তের কথা, উত্থাপন করিলেও তাঁহারা সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে বসা বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই। সুতরাং এই নিবন্ধে সে চেষ্টা করা অরণ্যে রোদন মাত্র হইবে।

পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনকার দুইটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। গৃহীতজন্ম শিশু, জন্মগ্রহণ করিয়াই নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করে। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং সাগ্রহে মাতার স্তন্যসুধা পান করে তাহার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? শিশু কিরূপে বিনা অভ্যাসে জানিল যে জননীর স্তন-

পান করিলে তাহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে? ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মস্মৃতি। মানব শিক্ষাদ্বারা সংসারের বশীভূত হয়। কিন্তু শিশু বিনাশিক্ষায়, অপর কিছু ধারণ না করিয়া, ঠিক স্তনবৃন্তই গ্রহণ করে। (২)

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীই আস্থাবান। এ সম্বন্ধে যিনিই একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই জন্মান্তরের কথায় প্রত্যয় স্থাপন না করিয়া, থাকিতে পারেন নাই। আমরা, একে একে সেই সকল মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি!

বুদ্ধদেব এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, "সংসারহেতু বার বার মৃত্যু হয়। (৩)

জৈনগণের ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, "যতদিন না জীব দৃশ্যমান মায়াময় বিষয় সকল হইতে আপনার অন্তঃকরণকে নিবৃত্ত করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বার বার জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়!" (৪)

এ সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রও মূক নয়। "সাধু জন ইলিয়াস মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, তাহা যীশুর ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন।" (৫)

---

(২) "পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষ ভয় শোক সম্প্রতিপত্তেঃ।"
পুনশ্চ—
"প্রেত্যাহারাভ্যাস কৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ।"

(৩) "কিং পুন র্জরাব্যাধি মৃত্যু নিত্যানু বদ্ধাঃ।
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচনম্।" (ললিত বিস্তর)

(৪) "আদা কর্ম্মমলিমসো ধারদি পানে পুনো পুনো অন্নে।
এ জহাদি জাব মমত্তিং দেহপধাণেসু বিষয়েসু।" (জৈন প্রবচন)

(৫) "And as his desciples asked him saying why then say the scribes that Elias must first come. And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things; but I say unto you, that Elias is come already, and they knew him not * * Then the desiples understood, that he spoke unto them of John the Baptist."

Mathew.

বিজ্ঞবর পাশ্চাত্য দার্শনিক মহামতি প্লেটোও পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনিও তাহার অনুকূলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আত্মা একবার দেহ পরিগ্রহ করে না। পরন্তু বহু বারেই করে।" (৬)

মুসলমান শাস্ত্র মধ্যেও যে পুনর্জ্জন্ম বাদ নাই, তাহা নয়। তবে তাঁহাদের ভিতরে অনেকেই জন্মান্তরের কথায় আস্থাস্থাপন করেন না বটে। জনৈক মৌলবি এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—

"ভূমিতে শস্যোৎপাদন যেমন বহুবার হয়,—এবং তাহা ব্যয় হয়ও যেরূপ অনেকবার এই দেহকেও আমি সেইরূপ অনেকবার জন্মিতে ও মরিতে দেখিয়াছি।" (৭)

এইরূপ, সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্মই এক কণ্ঠে এই মহাবাণী ঘোষণা করিতেছে, যে মৃত্যুই চিরনিদ্রা নয়। মৃত্যুর পর আবার জীবন জীবনের পর আবার মৃত্যু। মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র। ফলতঃ আত্মার বিনাশ নাই। মানব যেমন ছিন্নবস্ত্র ত্যাগ করিয়া, বস্ত্রান্তর গ্রহণ করে, আত্মাও তেমনি জরাগ্রস্ত ভগ্ন দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদেহ ধারণ করে।"

অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, এক ব্যক্তি কোন অপরিচিত স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, ঐ স্থানের সকল বস্তুই তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত। অথচ, তিনি জীবনে কখনও উক্ত স্থানে পূর্ব্বে গমন করেন নাই। ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি। কিন্তু সকলেরই অদৃষ্টে এরূপ সুযোগলাভ ঘটিয়া উঠে না। কারণ গতজন্মে হয় ত তুমি ইংরাজ ছিলে। হয় ত তুমি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। এবং এ জন্মে তুমি বাঙ্গালী, তুমি বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার ইংলণ্ডে যাইবার সুবিধা নাই। অথবা তুমি ইংলণ্ডে গিয়াও, গতজন্মে তুমি ইংলণ্ডের যে স্থানে বিচরণ করিতে সেস্থান

---

(৬) "Plato * * * said that the soul has a natural strength which will hold out and he born many times." (DR. L. Figner.)

(৭) "হম্মও সব্‌ হকত্তাদ্ কালব দিদেহ অম্
হমচু সবজহ বারহা রবীদেহ অম।"
মৌলবি রুমি।

দর্শন করিবার সুযোগলাভ করিবে না। কিন্তু তেমন সুযোগ যদি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ তোমার সুপ্ত স্মৃতি পুনর্ব্বার জাগরিত হইতে পারে।

অপর পক্ষে, মানবের স্মরণশক্তি কত সামান্য। আমি আজ যাহা করিলাম,—এক বৎসর পরেই তাহা বেমালুমভাবে স্মৃতিপট হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল! এ ক্ষেত্রে, কত কাল পূর্ব্বের বিগত জীবনের কথা স্মরণ রাখা বড় সহজ কথা নয়। যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি সাধারণের চাইতে কিছু উন্নত, এবং কিয়ৎ পরিমাণে অলৌকিক বল-শালিনী, তাঁহারাই আকস্মিক ভাবে লব্ধ-সুযোগে স্থান কাল পাত্র দর্শন করিয়া, বিলুপ্ত প্রায় স্মৃতিকে জাগরিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়েন। এই বসুধাবক্ষে বিচরণশীল অযুত অযুত নরের মধ্যে, ঐরূপ বিস্ময়াবহ মেধা বিশিষ্ট মানবের সংখ্যা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনাযোগ্য এবং তাঁহাদিগের মধ্যেও কয়জনে জন্মান্তর-ঘটিত ঘটনাবলী-সংশ্লিষ্ট স্থান দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহাও বিবেচ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"Truth is stranger than fiction."

Shakespeare.

জন্মান্তরীণ স্মৃতিমূলক কাহিনী।

প্রথম ঘটনা, যাহা আমি বলিতেছি, তাহা আমার সম্মুখেই ঘটিয়াছে। যাঁহার বিশ্বাস হইবে না, তাঁহাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

কোন কার্য্যবশতঃ আমি একদিবস বাগবাজারের কাছে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমি যখন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি সদর দরজায় দাঁড়াইয়া একজন কাশ্মীরি শালওয়ালার সহিত, শালের মূল্য সম্বন্ধে কথা কহিতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মূল্য স্থির হইল, বন্ধুবর শালখানি লইয়া, দাম আনিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শালওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। কথা কহিতে কহিতে, হঠাৎ শালওয়ালা বড় অন্যমনস্ক হইল

এবং দুই চোখ মুদিয়া, যেন কোন কথা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া, শালওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ বাবু—এই বাড়ীটী কি দু'মহল? প্রতি মহলে দ্বিতলে কি চারিটী করিয়া ঘর আছে?"

আমি তাহার এই অপূর্ব্ব প্রশ্নে বড় বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, বেটা চোর, নিশ্চয়ই আমার কাছ হইতে বাড়ীর কোথায় কি আছে, জানিয়া লইবার চেষ্টায় আছে! একটু কর্কশ স্বরে বলিলাম,—"কেন হে বাপু! তোমার সে খোঁজে দরকার কি?"

শালওয়ালা কহিল, "বাবু! আমার যেন বোধ হইতেছে, অনেকদিন আগে আমি এই বাড়ীতে ছিলাম। অথচ, আমি জীবনে কখনো এই বাড়ীতে আসি নাই কলিকাতায় সবে দুই বৎসর মাত্র আসিয়াছি।"

আমার মনে তখন পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির কথা উদয় হইল। আমি ব্যগ্র ভাবে শালওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এই বাড়ীর বিষয়ে তুমি আর কোন কথা বলিতে পার?"

শালওয়ালা বলিল,—"হাঁ, পারি বৈকি বাবু! এই বাড়ীর সিঁড়ীটা কাঠের সিঁড়ীর পাশে একটা কূপ আছে, ছাদে উঠিবার জন্য একখানা মৈ আছে।"

ইতি মধ্যে আমার বন্ধু শালের মূল্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আমার মুখে শালওয়ালার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "শালওয়ালা, বাড়ীর যে রকম বর্ণনা করিল, তাহা অনেক দিনের আগের। আমাদের সিঁড়ীটা আগে কাঠেরই ছিল, আজ ষোল সতেরো বৎসর হইল, সেটা ভাঙ্গিয়া—ইটের সিঁড়ী করা হইয়াছে। ছাদে আগে মৈ ছিল এখন সিঁড়ী হইয়াছে! কূপটাও অনেকদিন বুজাইয়া ফেলিয়া সেই স্থানে নূতন ঘর করা হইয়াছে।"

শালওয়ালা আবার বলিল—"এই বাড়ীতে আর একজন লোক আছেন, তাঁর মুখে দাড়ী গোঁফ আছে, খুব মোটাসোটা, পৃষ্ঠদেশে একটা খুব বড় আগুনে পোড়ার দাগ আছে।"

বন্ধু কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া দেখিয়া কহিলেন, "কৈ এরূপ লোক ত আমাদের বাড়ীতে নাই! হাঁ মনে পড়িতেছে আমার ঠাকুর দাদাকে অনেকটা ঐরকম দেখিতে ছিল বটে কিন্তু তাঁহার ত আজি ২০।২৫ বৎসর হইল, মৃত্যু হইয়াছে!

শালওয়ালা বলিল "তাঁর কি একটী চোখ কাণা ছিল?"

বন্ধু খানিকক্ষণ অবাক হইয়া, হাঁ করিয়া শালওয়ালার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ ত! আমার ঠাকুরদাদার একটী চোখ ছিল না শুনিয়াছি, বাল্যকালে খেলা করিতে করিতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

শালওয়ালা তাহার পর আমার বন্ধুর পারিবারিক অনেকগুলি ঘটনার কথা বলিল। সে সকল কথা, এখানে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্য নয়। কিন্তু সমস্ত কথাগুলিই অবিকল মিলিয়া গিয়াছিল। তবে, সেই কথা গুলির বর্ণিত কাল এক্ষণকার নয় বহু বৎসর পূর্ব্বের।

দ্বিতীয় ঘটনাটী একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে সংকলন করিয়া দিলাম।

"মিঃ বেকার, তাঁহার এক নব বন্ধুকে আপনার বাড়ীতে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি একজন প্যারিসীয়ান ইংলণ্ডে ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন। লণ্ডন নগরে, কোন সূত্রে তাঁহার সহিত মিঃ বেকারের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। নাম মিঃ হ্যালেভী। হ্যালেভী ইহার আগে, আর কখনও লণ্ডনে আসেন নাই।

সন্ধ্যার সময়ে হ্যালেভী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বেকারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেকার, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং আপনি আগে আগে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন!

খানিকদূর গিয়া, হ্যালেভী হঠাৎ এক জায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না।

তাঁহার এই ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বেকার কহিলেন—"কেন মহাশয়! আপনার কি হইয়াছে?"

হ্যালেভী ভয়চকিতভাবে কহিলেন, "বাবা, আগে আপনার বুলীকে সরাইয়া ফেলুন—তবে আমি এখান হইতে নড়িব।"

বেকার অধিকতর বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, "বুলী আবার কে? আপনি স্বপ্ন দেখিতেছেন নাকি?"

হ্যালেভী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সন্ধ্যা বেলায়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখা আমার অভ্যাস নাই। বুলী একটী পরমশান্ত বুলডগ। একবার আমার ডান হাতে এমনি কামড়াইয়া দিয়াছিল যে আমি তাতে মোটেই খুসি হইয়া যাইতে পারি নাই। বরং এক মাস দিনরাত ধরিয়া বিছানায় শুইয়া আরাম করিতে হইয়াছিল।"

বিস্মিত বেকার বলিলেন, "বুলডগ? আমার বাড়ীতে? আপনাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল? মহাশয়! আপনি কি বলিতেছেন—আপনার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে নাকি?"

হ্যালেভী বলিলেন, "আমার মাথা এখন খুবই ভাল আছে আর, বোধ হইতেছে চিরকাল ভালই থাকিবে। আমি ঠিক কথাই বলিতেছি। এই দেখুন—আমার ডান হাতে এখনও বুলীর সুন্দর দাঁতগুলির চিহ্ন আছে।" বলিয়াই তিনি আপনার দক্ষিণ হস্তের জামা তুলিয়া ক্ষত চিহ্ন বাহির করিতে গেলেন—কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তাইত মহাশয়! আমি জাগিয়া জাগিয়া সত্য সত্যই স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? আমার হাতেত ক্ষতচিহ্ন নাই! কিন্তু আমার ঠিক বোধ হইতেছে—যেন ঐখানে 'বুলী' নামে একটা খুব বড় বুলডগ শিকলি দিয়া বাঁধা আছে।"

বেকার কহিলেন, "যদি তাই-ই থাকিত,—তাহা হইলে আপনি কি করিয়া আগে হইতেই তাহা জানিতে পারিবেন? আপনি আমার বাড়ী ত দূরের কথা জীবনে কখনও লণ্ডনে আসেন নাই।"

হ্যালেভী হতভম্বের মত মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পাশেই একটী ঘর ছিল। সেই ঘরে বেকারের বৃদ্ধ পিতামহ বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় নবতি বর্ষ হইয়াছিল। তিনি বসিয়া বসিয়া একান্ত মনে উভয়ের কথা শুনিতে ছিলেন। এখন, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই হ্যালেভী সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মাননীয় মিঃ ক্রোগান! ওঃ! সে কত দিনের কথা,—আপনার কাছ হইতে আমি পাঠ-শিক্ষা করিতাম!"

মিঃ ক্রোগান আকাশ হইতে সদ্যপতিতের মত খানিকক্ষণ হ্যালেভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন— "আমারও নাম আপনার জানা আছে, দেখিতেছি! শুধু জানা নয়— আপনি বলিতেছেন, আপনি আমার কাছ হইতে পাঠ লইতেন। কিন্তু মহাশয়! আমি জীবনেও আপনাকে কখনও দেখি নাই। শুনিতেছি, আপনি প্যারিসে থাকেন। আপনি কখনও ইহার আগে ইংলণ্ডে আসেন নাই, আর আমিও আমার জীবনে কখনও ফ্রান্সে যাই নাই। আপনি কি টেলিফোন সাহায্যে আমার কাছ থেকে পাঠ লইতেন? আশ্চর্য্য!"

হ্যালেভী আনতশিরে একান্ত মনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

বৃদ্ধ ক্রোগান আবার কহিলেন, "আরও আশ্চর্য্যের কথা,—আপনি বলিতেছেন, 'বুলি' আপনাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল। আপনি কি বলিতে চাহেন, আপনার বয়স ষাট বৎসরেরও বেশী?"

হ্যালেভি মাথা তুলিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা না,—আমার বর্ত্তমান বয়স আটাশ বৎসর।"

ক্রোগান বলিলেন, "তবে আপনার কথা কিরূপে সম্ভব হইবে? আজ ষাট বৎসরেরও অধিক হইল, আমার 'বুলী' নামে একটী বুলডগ কুকুর ছিল। সেটী এইখানেই সর্ব্বদা শিকলি দিয়া বাঁধা থাকিত। আমি যখন যুবক,—তখন আমার এক বন্ধুর পুত্র আমার নিকটে পাঠ শিক্ষা করিতে আসিত। বুলী তাহার ডান হাতে কামড়াইয়া দিয়াছিল বটে? সেই দংশনে, আমার বন্ধু পুত্রের জীবন সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু আজ অনেক দিন হইল, আমার বন্ধুপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, আর বুলীও নাই।" (৮)

এই গল্পটি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, হ্যালেভীর হৃদয়ে পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগরূক হইয়াছিল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নেপালের কথা।

(১)

বর্ত্তমানে ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সমূহ প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ঐ রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতির ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, সমাজপদ্ধতিও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে হিমাচলের পাদদেশে অবস্থিত নেপাল রাজ্যই ভারতের মধ্যে একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের আদর ও গৌরব, হিন্দু রাজনীতি, সমাজ পদ্ধতি এক্ষণে কেবল নেপাল রাজ্য মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের অনেকেই নেপাল রাজ্যের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই

(৮). Life and Death,—P. P. 120.

অবগত নহেন। আমরা এই প্রবন্ধে নেপালের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের দক্ষিণ সীমা অযোধ্যা ও ত্রিহুত, পূর্ব্ব সীমা কালেলু পর্ব্বত, উত্তর সীমা হিমাচল, পশ্চিম সীমা মহাকালী বা সরযূনদী। এই চতুঃসীমাবদ্ধ রাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৮০ ক্রোশ; ইহার ভূপরিমাণ ৪০,০০০ হাজার বর্গক্রোশ।

নেপাল রাজ্য প্রধানতঃ চারি বিভাগে বিভক্ত। (১) কাটমুণ্ড প্রদেশ, (২) পূর্ব্ব পার্ব্বত্য প্রদেশ, (৩) পশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ, (৪) তরাই।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ দ্বাদশ আড্ডা বা শাসন বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্বে ধনকূটা ও পশ্চিমে পাল্পা বা তাম্‌সিন প্রধান। কাটমুণ্ড হইতে ধনকূটা প্রায় ১২৫ ক্রোশ ও তাম্‌সিন প্রায় ৬৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। অন্যান্য বিভাগের রাজস্ব আসিয়া প্রথমতঃ এই দুই স্থানে জমা হয়; তথা হইতে কাটমুণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে।

তরাই নয় আড্ডায় বিভক্ত। পশ্চিমে (১) বাঁকি, (২) বটোল; দক্ষিণ পশ্চিমে (৩) পর্শা; দক্ষিণে (৪) কলেয়া, (৫) কঠোরবানা, (৬) শর লইয়া, (৭) মহত্তরী; পূর্ব্বে (৮) সপ্তরী, (৯) মোরঙ্গ।

প্রত্যেক আড্ডায় এক একজন রাজকর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা সুবা নামে অভিহিত। ইঁহাদের নিকট দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার আপীল হইয়া থাকে। নিম্নতর কর্ম্মচারীকে লেপ্টনেণ্ট বলে। ইঁহারাও ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলার বিচার করিয়া থাকেন। সর্ব্বোচ্চ আপীল শুনিবার জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে দুই জন করিয়া সর্ব্বোচ্চ রাজপ্রতিনিধি আছেন। তাঁহাদিগকে জেনারেল বলা হয়। ইঁহাদের আপীল কাটমুণ্ড রাজদরবারে প্রেরিত হয়। প্রধান মন্ত্রীর পুত্র বা তাঁহার অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কেহ জেনারেল পদ প্রাপ্ত হন না।

কাটমুণ্ড প্রদেশ নিজ কাটমুণ্ডের শাসনাধীন। কাটমুণ্ড প্রদেশের বিচারকার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য প্রদেশের আপীল নিষ্পত্তি করিবার জন্য কাটমুণ্ডে চারিটী আদালত আছে। এই আদালত চারিটীর নাম—(১) কোটলিঙ্গ, (২) ধনসার, (৩) টগসার, (৪) ধর্ম্মকাছারী। এই সমস্ত আদালতের আপীল রাজদরবারে নিষ্পত্তি হয়।

নেপালের শাসন প্রণালী।

নেপাল রাজ্যের শাসন-প্রণালী স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র। রাজাই রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু। বর্ত্তমানে রাজার নাম মাত্র অস্তিত্ব। প্রধান মন্ত্রীই রাজ্যের প্রকৃত প্রভু। রাজা প্রধান মন্ত্রীর হস্ত চালিত পুত্তলিকা মাত্র। রাজার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। প্রধান মন্ত্রীর একজন অন্তরঙ্গ রাজার নিকট থাকেন, রাজা ইহাঁর দ্বারাই মন্ত্রীকে তাঁহার অভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

সহকারিতার জন্য প্রধান মন্ত্রীর এক সভা আছে। সেনাপতি, জেনারেল, আদালতের বিচারপতি, সুবা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারীগণ উক্ত সভার সভ্য। ইহাঁদের সহায়তায় প্রধান মন্ত্রী রাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

দণ্ড প্রণালী।

চৌর্য্যাপরাধী প্রথম অপরাধে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য অধিকারীকে প্রদান করিলে অব্যাহতি পায়। দ্বিতীয় অপরাধে তাহার দুইবৎসর কারাদণ্ড হয়। তৃতীয় অপরাধে চারি বৎসর। এইরূপ উত্তরোত্তর প্রতি অপরাধে দুই বৎসর করিয়া বৃদ্ধি হইয়া ষষ্ঠ অপরাধে অপরাধী যাবজ্জীবনের জন্য কারারুদ্ধ হয়। প্রথম অপরাধে অপরাধী যদি মূল্যপ্রদানে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কারাদণ্ড ভোগ করে। শতকরা একবৎসর হিসাবে কারা আদেশ হয়। অপহৃত দ্রব্যের মূল্য যত টাকাই হউক না কেন, দশ বৎসর অতীত হইলেই অপরাধী মুক্তি পাইবে।

ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী কোন অপরাধেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন না। কোনরূপ কায়িক-যাতনা এবং শৃঙ্খল-বন্ধনও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কারামধ্যে ব্রাহ্মণ অপরাধীকে সামান্য নজরবন্দীর ন্যায় কালযাপন করিতে হয় মাত্র।

যদি কেহ ব্রাহ্মণী হরণ করে, তাহা হইলে রাজ বিধান অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। অপরাধী ব্রাহ্মণ হইলে দশ বৎসরকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

সুরাপান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজ বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় দুই বৎসর কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে সুরাপান

করিতে দেখে অথচ রাজাকে যথা সময়ে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে তাহাকেও ঐ দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

গো-হত্যা নেপালের সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতির মধ্যে নিষিদ্ধ। গো হত্যা-কারীর প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমে সুখ।

আকাশ প্রসূনে, হেরিয়া স্বপনে
কে মজেছে বল হায়!
অকূল পাথারে, বল কে সাঁতারে
প্রেমে কেবা সুখ চায়?
জল অন্বেষণে, মরীচিকা পানে
বুঝিয়া বল কে ধায়?
কে চাহে জুড়াতে, জ্বালা শীতলিতে
অনল মাখিয়া গায়?
ফণীর মাথায়, রহিয়াছে হায়
অমূল্য রতন মণি।
হের স্থাণু ভালে, হৈম কর জালে
শোভা পায় নিশা মণি।
সাগরের তলে, রতন উজলে
কেবা তায় বল পায়?
বিফল আশায়, সুখের নেশায়
শুধু কে কাঁদিতে চায়?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বীরবালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু মুসলমান।

সেই নিশীথকালে প্রতাপগড়ের পুষ্পোদ্যানে যুবক যুবতীর অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের পর তাঁহাদের সংবাদ প্রদানে আপাততঃ আমরা পাঠক পাঠিকার কৌতূহল দূর করিতে পারিলাম না। বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই সময়ের ইতিবৃত্ত প্রদান করিতে হইতেছে।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদার দক্ষিণে যে প্রশস্ত প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই দক্ষিণাপথ। পাঠান-শাসনের প্রারম্ভে এই বিস্তৃত দক্ষিণাপথে চারিটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল। অতি দক্ষিণে দ্রাবিড়, তাহার উত্তরে কর্ণাট. তাহার উত্তরে মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তৈলঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। হিন্দু রাজারা এই প্রদেশগুলিতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের শাসনকালে সমস্ত দক্ষিণাপথ সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ নগরীতে পূর্ণ ছিল; ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণ ও রাজ-কর্ম্মচারীগণ কর আদায় ও বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। প্রজাগণও যথেষ্ট সুখ ও শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত; শান্ত কৃষকগণ শস্য উৎপাদন করিয়া রাজার প্রাপ্য অংশ রাজাকে বা জায়গীরদারকে প্রদান করিত। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণ এইরূপ পরমসুখে নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথের হিন্দুরাজগণের শান্তি-স্নিগ্ধ সৌভাগ্যাকাশে, সহসা কাল মেঘের সঞ্চার হইয়া উঠিল। বিপ্লবের ঘন মেঘমালা বিদ্যুৎ গতিতে দক্ষিণাপথের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সাম্রাজ্য-লিপ্সু পাঠান সম্রাটগণের দিগ্বিজয়ের স্রোতরাশি সহসা দক্ষিণাপথ প্লাবিত করিয়া ফেলিল; সেই অনন্ত স্রোতে পড়িয়া দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগৌরব কিছুদিনের জন্য ডুবিয়া গেল।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ পাঠানের অত্যাচারে পর্য্যুদস্ত হইলেও দক্ষিণাপথে এ পর্য্যন্ত কোন পাঠান নৃপতি হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। দিল্লীশ্বর জেলালুদ্দিন খিলিজির শাসনকালে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খিলিজি নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যাচল পার হইয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশের রাজধানী দেবগিরি আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। এই উদ্যমে কেবল মাত্র দেবগিরি রাজ্যই পাঠানের অধিকৃত হয়, অপর প্রদেশগুলি অধিকার করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া আলাউদ্দীন পুনরায় দিল্লীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনার পর আলাউদ্দীন দিল্লীশ্বর হন এবং পুনরায় দক্ষিণাপথ বিজয়ের সংকল্প করেন। তাঁহার সেনাপতি মালিক কাফুর ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। প্রথমে তিনি দেবগিরি অবরোধ করিলেন এবং তত্রত্য রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করাইলেন। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে কাফুর তৈলঙ্গ আক্রমণ করিয়া তথাকার হিন্দুরাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বরমঙ্গল দুর্গ কাড়িয়া লইলেন; রাজা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে কাফুর কর্ণাট রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক তথাকার রাজধানী দ্বারসমুদ্র অধিকার করিলেন। এই সময়ে বিলালবংশীয় রাজগণ কর্ণাটে রাজত্ব করিতেছিলেন; ইঁহারা আপনাদিগকে যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।

কর্ণাটরাজ পাঠানের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের বিস্তর ক্ষতি করেন, এইজন্য পাঠানেরা কর্ণাট রাজধানী অধিকার করিয়া এই পুরাতন রাজবংশ ধ্বংশ করিতে কৃত সংকল্প হইল। পাঠানের নিষ্ঠুর হস্তে পতিত হইবার ভয়ে রমণীরা "জহর ব্রত" অবলম্বন পূর্ব্বক পবিত্র নারীধর্ম্ম রক্ষা করিলেন; পুরুষেরা নিষ্কাসিত অসি হস্তে শত্রু সেনার সম্মুখীন হইয়া সম্মুখ সমরে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন। কেবল মাত্র রাজভ্রাতা প্রসেনজিৎ রাজার অনুরোধে পিতৃপুরুষের জল গণ্ডুষ দান লুপ্ত হইবার ভয়ে একমাত্র বংশধর বুক্করায়কে লইয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন। দ্বারসমুদ্র অধিকারের পর কাফুর দ্রাবিড়রাজ্যও দিল্লীশ্বরের অধিকার ভুক্ত করিলেন। অবশেষে ভারতের অতি দক্ষিণ রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করিয়া দিল্লীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ভীষণ পাঠান বিপ্লব হইতে কোন রূপে আত্মরক্ষা করিয়া প্রসেনজিৎ

গুরুদেব মাধবাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। পরে বিপ্লব নিবৃত্ত হইলে মাধবাচার্য্যের মন্ত্রণায় তিনি কর্ণাটের উত্তর সীমায় নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। পাঠানেরা কেবল মাত্র রাজধানী দ্বারসমুদ্র বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহারা সমগ্র কর্ণাট রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পায় নাই। প্রসেনজিৎ কর্ণাটের উত্তরাংশে রাজধানী স্থাপন করিলেন। নূতন নূতন দুর্গ ও সুদৃশ্য সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা সম্পাদন করিলেন; জঙ্গলাকীর্ণ উত্তর কর্ণাট শীঘ্রই জনসঙ্কুল নগরে পরিণত হইল। দলে দলে প্রজাগণ সেই স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মাধবাচার্য্যের মন্ত্রণায় রাজা প্রসেনজিৎ সৈন্যবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অচিরে কর্ণাটনগরী আবার পূর্ব্ববৎ শোভান্বিত হইল।

কিন্তু কর্ণাট রাজবংশের পুনরভ্যুদয় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের অবিদিত রহিল না; তিনি সেনাপতি কাফুরকে পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিলেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে কাফুর সসৈন্যে কর্ণাটের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, প্রসেনজিৎ মাধবাচার্য্যের মন্ত্রণায় দিল্লীশ্বরকে করপ্রদানে স্বীকৃত হইলেন। দক্ষিণাপথের অন্যান্য রাজারা প্রসেনজিতের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিলেন; সুতরাং বিনা রক্তপাতে সেনাপতি কাফুর দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন প্রাণত্যাগ করিলেন এবং সেই সঙ্গে সেনাপতি কাফুর বিদ্রোহীর ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুবারক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া দাক্ষিণাপথের রাজগণ আবার মস্তকোত্তোলন করিবার প্রয়াস পাইলেন। মহারাজ প্রসেনজিৎ এই সময় কর্ণাটের অধিকাংশ স্থান পুনরায় অধিকার করিলেন; কর্ণাটের বিধ্বস্ত রাজধানী দ্বারসমুদ্রে আবার হিন্দু বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। এই সময় দেবগিরি-রাজ হরপাল প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দিল্লীশ্বর মুবারক এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বাধীনতা-ইচ্ছু হিন্দুরাজগণের বিরুদ্ধে সসৈন্যে দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণাপথের সকল নৃপতিই এ সময় দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

নর্ম্মদার দক্ষিণে প্রতাপগড় নামে একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। মালিক কাফুর যখন দক্ষিণাপথ আক্রমণ করেন, তখন তিনি এই রাজ্যটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। রাজ্যের ক্ষুদ্রতা-

নিবন্ধনই হউক, অথবা অনেকগুলি সুদৃঢ় দুর্গমালায় রাজ্যটী পরিবেষ্টিত থাকায় সহজে অজেয় বলিয়াই হউক, তিনি এ রাজ্যে দিল্লীশ্বরের প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পান নাই। এই রাজ্যের রাজা মহীপৎ সিংহের সহিত প্রসেনজিতের বাল্যকালাবধি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। যখন প্রসেনজিৎ কর্ণাটরাজ্য পুনরধিকারের চেষ্টা করেন, তখন রাজা মহীপৎসিংহ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মহারাজ প্রসেনজিৎ এক্ষণে দিল্লীশ্বর মুবারকের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য মহীপৎসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; রাজা মহীপৎসিংহ বন্ধুর সাহায্যার্থে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন। এই সাহায্য পাওয়ায় মহারাজ প্রসেনজিৎ দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা স্থির করিলেন।

১৩১৮ খৃষ্টাব্দে মুবারক সহসা দেবগিরি রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দেবগিরি-রাজ হরপাল সে সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, পাঠান-সেনার অতর্কিত আক্রমণে তিনি পরাস্ত ও বন্দী হইলেন এবং অবশেষে ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। দেবগিরি বিজয়ের পর মুবারক দাক্ষিণাত্যের আর কোন রাজ্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে মুবারক প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই খিলিজি বংশ লুপ্ত হইল।

মুবারকের মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দীন টোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াই পুত্র জুনাখাঁকে দক্ষিণাপথ বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে জুনা খাঁ তৈলঙ্গ আক্রমণ করিলেন। তৈলঙ্গরাজ তাহাতে ভীত না হইয়া রাজ্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সময় মহারাজ প্রসেনজিৎ সসৈন্যে তৈলঙ্গরাজের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। এই সাহায্য পাইয়া তৈলঙ্গরাজ মহোৎসাহে জুনাখাঁকে আক্রমণ করিলেন। জুনাখাঁ সে বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হইল; হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া জুনাখাঁ অতিকষ্টে দিল্লীতে পলায়ন করিলেন।

১৩২৪ খৃষ্টাব্দে জুনাখাঁ বিশাল বাহিনী লইয়া পুনরায় তৈলঙ্গ আক্রমণ করিলেন। তৈলঙ্গরাজ এবার সম্পূর্ণরূপ অসতর্ক ছিলেন, তিনি পাঠান সেনার গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। এই সময় মহারাজ প্রসেনজিৎ সহসা দেহত্যাগ করিলেন; সুতরাং কর্ণাট-সেনা তৈলঙ্গরাজের সাহায্য করিতে পারিল না। বরঙ্গল দুর্গ পুনর্ব্বার পাঠান হস্তে পতিত হইল। রাজা পরাস্ত হইয়া কর প্রদানে স্বীকৃত হইলেন।

প্রসেনজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বুকরায় পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় জুনার্খা মহম্মদ টোগলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই অস্থিরমতি যথেচ্ছাচার সম্রাটের অত্যাচারে ভারতবর্ষের চারিদিকে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অনুচিত দুরাকাঙ্ক্ষা সেবায় যুক্তিবহির্ভূত সঙ্কল্পপরম্পরায় আরূঢ় হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের রাশি রাশি দুঃখ সমুৎপন্ন করিতে লাগিলেন। পারস্য ও চীন রাজ্যের প্রতি সহসা তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা পতিত হইল। প্রথমত পারস্য বিজয়ের জন্য বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ হইল; তাহারা রাজকোষ নিঃশেষ করিল, পরে বেতনের অভাবে সম্রাটের কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিল। তখন চীনের লুণ্ঠন দ্বারা শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিবার বাসনায় বিচক্ষণ সম্রাট হিমালয়ের ভিতর দিয়া লক্ষ অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাগণ চীন সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্থলে অসংখ্য চীন সৈন্য দেখিয়া ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। চীনেরা সে সুযোগ পরিত্যাগ করিল না, তাহারা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রবৎ পাঠান সেনার উপর পতিত হইল; তাহাদের আক্রমণে, পার্ব্বতীয়গণের অত্যাচারে, বৃষ্টি ও জলপ্লাবনে এবং দুর্ভেদ্য জঙ্গল অতিক্রম কালে তাহারা এত কষ্ট পাইল যে, সেই বিশাল বাহিনীর একজন সৈন্যও ভারতে ফিরিয়া আসিল না।

এই সমস্ত ব্যয়ে দিল্লীর রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। তখন বুদ্ধিমান সম্রাট তাম্রের মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া তাহাকে রৌপ্য মুদ্রার মূল্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন; কিন্তু প্রতারিত হইবার আশঙ্কায় কোন প্রজা সে মুদ্রা গ্রহণ করিল না; ইহাতে সম্রাট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে সম্রাট অনন্যোপায় হইয়া এরূপ অসঙ্গত কর বৃদ্ধির ঘোষণা করিলেন যে, প্রজাগণ তাহাতে রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল; কৃষকেরা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে লুক্কায়িত হইল। তখন ক্রোধোন্মত্ত সম্রাট অদ্ভুত বৈরনির্য্যাতন সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মৃগয়া ব্যাপারের ন্যায় সসৈন্যে এক এক খণ্ড জঙ্গল অবরোধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত পলাইত কৃষক ও পল্লীবাসীগণকে পশুবৎ সংহার করিতে লাগিলেন। এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল; চারিদিকে হাহাকার উঠিল, কিন্তু তাহাতেও সম্রাটের অত্যাচার নিবৃত্ত হইল না; হিন্দুগণই অধিকতর নির্য্যা-

ত্যক্ত হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণাপথে পলায়ন করিল। মাধবাচার্য্যের মন্ত্রণায় রাজা বুক্করায় সেই সমস্ত নিরাশ্রয় প্রজাগণকে স্বরাজ্যে স্থান প্রদান করিতে লাগিলেন।

সম্রাট মহম্মদ টোগলকের এই প্রকার অত্যাচারে দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র ভীষণ অনল জ্বলিয়া উঠিল। উপযুক্ত অবসর পাইয়া দাক্ষিণাত্যের রাজগণ মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহোন্মুখ দক্ষিণাপথের বশীকরণের জন্য সম্রাট রাজধানী দিল্লী হইতে উঠাইয়া দেবগিরিতে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। তৎক্ষণাৎ দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই দেবগিরিতে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন এবং দেবগিরির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দৌলতাবাদ নাম রাখিলেন। বুক্করায় এই সংবাদ অবগত হইয়া মাধবাচার্য্যের মন্ত্রণায় দাক্ষিণাত্যের রাজগণকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া দক্ষিণাপথে হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করিতে ও পাঠান সম্রাটের অভিলাষ ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইলেন।

যখন দক্ষিণাপথের নৃপতিগণ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন, তখন মাধবাচার্য্য বুক্করায়কে প্রতাপগড়ে মহীপৎসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে মহীপৎসিংহের সহিত বুক্করায়ের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠক পাঠিকার অগোচর নহে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মাধবাচার্য্য।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে মাধবাচার্য্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি। এই মাধবাচার্য্যই নূতন কর্ণাটের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহারাজ বুক্করায়ের মন্ত্রণাদাতা ও উপদেষ্টা।

কিন্তু মাধবাচার্য্য শুধু রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন না, শস্ত্র ও শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বিপ্লবের সময়ে তিনি স্বয়ং অসি হস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন; আবার শান্তির সময় শিষ্যমণ্ডলীকে লইয়া ঐকান্তিকভাবে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার রচিত বেদ স্মৃতি ও সংহিতার টীকা টিপ্পনী—তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে; শিক্ষাজগতে মাধবাচার্য্য—সায়নাচার্য্য নামে খ্যাতিলাভ করেন।

বুক্করায় কর্ণাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মাধবাচার্য্য তাঁহাকে মন্ত্রগৃহে আহ্বান করিয়া প্রতাপগড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুক্করায়—পুষ্পোদ্যানে মৃণ্ময়ীর সহিত অঙ্গুরীয় বিনিময় প্রসঙ্গটী বাদ দিয়া—অপর সমস্ত ঘটনা গুরু-দেবের গোচর করিলেন।

রাজা মহীপৎসিংহ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া মাধবাচার্য্য বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে আর আমাদের নীরব থাকিবার আবশুক কি? দক্ষিণাপথের সমস্ত নরপতি কর্ণাটের মুখা-পেক্ষী হইয়া বসিয়া আছেন; সুতরাং আর আমাদের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন আমাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য হইয়াছে, কিন্তু শুধু আত্মরক্ষার জন্য এই সামর্থ্যটুকু লইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না, এবার আত্মশক্তির বিকাশ করিতে হইবে—অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে হইবে। কর্ণাটের চতুঃপার্শ্বে এবং সমগ্র দক্ষিণাপথে—যে সকল ভূভাগে এখনও পাঠানের বিজয়-পতাকা উড়িতেছে, সেই সকল ভূভাগ কাড়িয়া লইতে হইবে, পতাকাগুলি ছিঁড়িয়া তুঙ্গভদ্রার জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। দক্ষিণ হইতে যাহাতে পাঠানের নাম মুছিয়া যায়, সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে সেই চেষ্টা করিতে হইবে।"

বুক্করায় বলিলেন, "মহম্মদ টোগলক দেবগিরিতে আবার রাজধানী বসাই-বার চেষ্টা করিতেছে; এবারকার কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, গড়, পরিখা, সেনাবাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শুনিলাম, মহম্মদ নাকি সদলবলে দেবগিরিতে আসিতেছে। এখন আপনি কি করিতে বলেন? প্রথমে পাঠান রাজ্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, না, মহম্মদের রাজধানী স্থাপনের উদ্যমে বাধা প্রদান সঙ্গত?"

মাধবাচার্য্য কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন,—"না, এখন মহম্মদের উদ্যমে বাধা দিবার আবশুক নাই, আর আপাততঃ পাঠানরাজ্যে হস্তক্ষেপ করা স্থগিত থাকুক!"

বু। আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না? দীর্ঘকাল চেষ্টা উদ্যমের পর কেন আবার আমরা নীরব থাকিব? আপনার কি এই অভি-মত যে, পাঠান আসিয়া দেবগিরিতে নির্ব্বিঘ্নে শক্তিসঞ্চয় করুক আর আমরা নীরবে বসিয়া তাহাদের আধিপত্য দর্শন করি?

মা। না, আমি এরূপ অভিমত দিতেছি না; আমি বলি না যে, পাঠান

নির্ব্বিঘ্নে শক্তি সঞ্চয় করুক এবং তোমরা নিশ্চেষ্টভাবে তাহাদের শক্তিক্রীড়া দর্শন কর! বর্ষার আর বিলম্ব নাই; শীঘ্রই প্রবল বারিপাতে দক্ষিণাপথ প্লাবিত হইবে। সুতরাং মহম্মদ টোগলকের রাজধানী স্থাপন সম্পূর্ণ হইবে না; বর্ষাকালে পাঠান সেনা এ অঞ্চলে কখনই তিষ্টিতে পারিবে না। এখন মহম্মদ মহা উৎসাহে দেবগিরিতে আসিতেছে, কিন্তু বর্ষা পড়িলেই আবার তাহাকে দিল্লীতে পলাইতে হইবে। আমরা এখন পাঠানের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিব এবং তাহারা যাহাতে আমাদের শাসিত রাজ্য হইতে একটি তণ্ডুলকণাও সংগ্রহ করিতে না পারে, সে বিষয়েও সচেষ্ট থাকিব। তাহার পর, যেমন দেখিব বর্ষার বেগে পাঠাম পলাইতেছে, অমনি আমরা সিংহবিক্রমে চারিদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিব; সেই সময়েই আমাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে।

বু। এতক্ষণে আপনার অভিমত বুঝিতে পারিয়াছি; আপনার এই উদ্দেশ্য অতি সঙ্গত—অতি চমৎকার।

এই সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "প্রতাপগড়ের রাজদূত মহারাজের দর্শন প্রত্যাশায় দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মাধবাচার্য্য বলিলেন,—"আসিতে বল।"

আজ্ঞামাত্র দূত মন্ত্রকক্ষে প্রবেশ করিয়া মাধবাচার্য্যের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল।

মাধবাচার্য্য পত্র পাঠ করিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পরে বুক্করায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"তুমি যে দেখিতেছি সম্বন্ধ করিতে গিয়া বিবাহ করিয়া আসিয়াছ! রহস্য মন্দ নয়!"

লজ্জিত হইয়া বুক্করায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি! কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

মাধবাচার্য্য বিনা বাক্যব্যয়ে বুক্করায়ের হস্তে পত্রখানি প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মাধবাচার্য্যের অনুমতিক্রমে বুক্করায় প্রতাপগড়ের রাজকুমারীকে বিবাহ করুন। রাজা মহীপৎ সিংহ বুক্করায়ের আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যে যথাশক্তি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

বুক্করায় নীরবে পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "তিনি 'আমার নিকট একথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম, গুরুদেবের আজ্ঞা ব্যতীত আমি এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিব না। সেই জন্যই তিনি আপনাকে পত্র লিখিয়াছেন'।"

মাধবাচার্য্য বলিলেন,—"দূত! রাজা মহীপৎসিংহকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিয়ো, এ বিষয়ে আমার আপত্তি নাই। তবে বুক্করায় এক্ষণে যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করিতে পারেন না। কার্য্য সফল হইলেই তিনি প্রতাপগড়ের রাজকুমারীকে বিবাহ করিবেন।"

অভিবাদন করিয়া দূত চলিয়া গেল।

মাধবাচার্য্য একবার বুক্করায়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বুক্করায় নীরবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। মাধবাচার্য্য তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে আগন্তুক!

প্রতাপগড়ের সেই শান্তিময় সুরম্য পুষ্পোদ্যানে একটি প্রশস্ত প্রস্তর-বেদিকায় বসিয়া রাজকুমারী মৃণ্ময়ী সায়াহ্ন গগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল; নীড়ান্বেষী বিহগকুলের কলধ্বনি, বিবরস্থ ঝিল্লিকুলের অবিশ্রাম কলধ্বনি ও দুর্গপার্শ্বে রজতসূত্রবৎ প্রবাহিত স্রোতস্বতী নর্ম্মদার মৃদু মধুর কল্লোল অনর্গল শ্রুতিগোচর হইতেছিল। মৃদুমন্দ মলয়ানিল সান্ধ্যস্ফুট ফুল্লমঞ্জরী ঈষৎ কাঁপাইতে কাঁপাইতে সন্ধ্যারাণীর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল; সেই শুভসংবাদে ফুলকলি আনন্দে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সহাস্য আস্যে সন্ধ্যাদূতীর সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছিল। সন্ধ্যারাণী যেন আপনার গরিমায় প্রফুল্ল হইয়া বিশ্বরাজ্যে ধীরে ধীরে আপনার আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হইতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ছায়া গভীরতর ভাব ধারণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানটি সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শুক্লপক্ষের সপ্তমী শশিকলা সুনীল অম্বর আলো করিয়া উত্থিত হইল; রজতশুভ্র রশ্মিরেখা গগনগাত্র আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্বরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিল; তারকাপুঞ্জ শশাঙ্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে বিশাল গগনরাজ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে শশিকলার শুভ্রোজ্জ্বল রশ্মিরেখা চিন্তামগ্না রাজকুমারীর সুন্দর বদনে আসিয়া প্রতিফলিত হইল; ক্রমে ক্রমে সে মধুর কৌমুদীরাশি বালিকার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করিল।

মৃণ্ময়ী সহসা বিস্মিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, জ্যোৎস্নাস্নাত সুনীল অম্বরে প্রতিফলিত তারকামালা যেন তাঁহার অবস্থা

দর্শন করিয়া নীরবে হাস্ত করিতেছে, সুধাংশুদেব যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে করিতে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছে! মৃণ্ময়ী সলজ্জভাবে উদ্যানের দিকে চাহিলেন, তথায় দেখিলেন, যেন ফুল্ল কুসুম কলি তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছে, বল্লরীসমূহ যেন সে আমোদে আত্মহারা হইয়া সহকার-অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে! মৃণ্ময়ী ঈষৎ হাসিলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "সেই একদিন, আর আজ একদিন! সেদিন এই কৌমুদীস্নাত নক্ষত্রকিরীটিনী রজনীতে, এই পুষ্পোদ্যানে, এই পুষ্পবেদিকায় সেই দেবদুর্ল্ভ বীরযুবার সহিত আলাপ করিয়া কত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, ভবিষ্যৎ আশায় কত উৎফুল্ল হইয়াছিলাম; আর আজ—সেই চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত পুষ্পোদ্যানে বসিয়া সেই আনন্দ ও প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে কি এক অকথনীয় অচিন্তনীয় মনবেদনায় কষ্ট পাইতেছি! আকাশে সেই চন্দ্র হাসিতেছে, উদ্যানে সেই ফুল ফুটিতেছে, সেই সবই রহিয়াছে, নাই কেবল বুক্করায়—মৃণ্ময়ীর হৃদয়রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর! জানি না, আবার কতদিনে তাঁহার দর্শন পাইব, জানি না, আবার কবে তিনি এই পুষ্পোদ্যানে আসিয়া বসিবেন, অভাগিনী মৃণ্ময়ীর হৃদয়ের এতদিনকার সঞ্চিত সুখদুঃখের কথা শুনিবেন! ভগবান্! কবে সেদিন আসিবে?"

মৃণ্ময়ীর নেত্রপ্রান্তে দুইবিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল। বালিকা পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিল, "সেদিন পিতার নিকট শুনিলাম, তাঁর গুরুদেব বলিয়াছেন, যতদিন তাঁহার কার্য্য পূর্ণ না হইবে, ততদিন তিনি বিবাহ করিতে অক্ষম! হায়! কতদিনে তাঁহার কার্য্য পূর্ণ হইবে!"

মৃণ্ময়ী তখন করযোড়ে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্! তাঁকে রক্ষা করিয়ো; তিনি এখন যে কার্য্যসিদ্ধির জন্ম আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে তাহাতে সাহায্য করো।" মৃণ্ময়ীর আয়ত নেত্রদৃষ্টি হইতে অশ্রুকণা প্রবাহিত হইয়া মুক্তাপুঞ্জের ন্যায় গণ্ডদেশে একত্রিত হইল। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। সহসা বোধ হইল, কেহ যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। চকিতা হরিণীর ন্যায় তিনি সেই দিকে ফিরিয়া দেখিলেন,—একজন অপরিচিত যুবক তাঁহার পশ্চাতে যোদ্ধবেশে দণ্ডায়মান!

অকস্মাৎ সম্মুখে উন্নতফণা কালসর্প দর্শন করিলে পথবাহী পান্থ যেমন আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে এই অপরিচিত যুবককে দেখিয়া মৃণ্ময়ী সেইরূপ শুষ্ক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক সহসা

যেন এক ভীষণ বৈদ্যুতিক বলে বিকম্পিত হইয়া উঠিল; গোলাপবিনিন্দিত সুকুমার মুখবর্ণের উপর এক গভীরতম আরক্তিম বর্ণ প্রতিফলিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু নিষ্প্রভ হইল; চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে তিনি আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী।

আগন্তুকের পরিচ্ছদ রাজপুত যোদ্ধৃগণের ন্যায়। আকৃতি নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, বক্ষস্থল সুপ্রশস্ত, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনের অভাবে দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ অসৌষ্ঠবের কারণ হইয়াছে। বদন বীরত্ব ব্যঞ্জক হইলেও তাহাতে যেন নিষ্ঠুরতার ঈষৎ ছায়া বিদ্যমান। বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর।

আগন্তুক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মৃণ্ময়ী! আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি?"

মৃণ্ময়ী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

আগন্তুক একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মৃণ্ময়ী! আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি যে তোমাদেরই অন্নে প্রতিপালিত; আমার নাম দুর্জ্জয় সিংহ।"

মৃণ্ময়ীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; বদন আরক্তবর্ণ হইল; কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"তুমি সেই দুর্জ্জয় সিংহ? যে নরাধম আশ্রয়দাতা প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্পে পাঠানের পদতলে আশ্রয় লইয়াছে—তুমি সেই অকৃতজ্ঞ পশু? তোমার পূর্ব্বের স্বাধীনহৃদয়ে অধীনতার কালীপড়াতে এতক্ষণ তোমাকে চিনিতে পারি নাই। এবার তোমাকে চিনিয়াছি। আজ আবার প্রতাপগড়ে—পূর্ব্ব প্রভুর আলয়ে কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

গম্ভীর স্বরে দুর্জ্জয় সিংহ বলিলেন,—"তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

মৃ। আমার সহিত সাক্ষাতে তোমার কি প্রয়োজন?

দু। কি প্রয়োজন? মৃণ্ময়ী! কেমন করিয়া বলিব—আমার কি প্রয়োজন! কেমন করিয়া বলিব—কি প্রয়োজনে, কিসের প্রলোভনে, কোন উদ্দেশ্য সাধনে, শত শত সশস্ত্র প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া সাধারণের অগম্য এই নির্জ্জন পুষ্পবাটিকায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি!

মৃ। সেজন্য তোমার সাহসকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু তোমার স্মরণ রাখা উচিত অসূর্য্যম্পশ্যা পুরবালা আমি; এই নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে এ সময় তোমার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব যুবকের সহিত কথোপকথন করা আমার মত পুরবালার কর্ত্তব্য নয়। এই নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে আমাদিগকে এরূপ অবস্থায় দেখিলে লোকে কি মনে করিবে বল দেখি ?

দু। লোকের মনোভাব জানিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই; আমি আসিয়াছি—তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। এই দীর্ঘ দুই বৎসর তোমার অদর্শনে আমি জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাইয়াছি। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, সম্প্রতি দিল্লীশ্বর দৌলতাবাদে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন, দিল্লীশ্বরের দশহাজারী মনসবদার হইয়া আমাকেও এ অঞ্চলে আসিতে হইয়াছে। এই সুযোগে বহুদিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

মৃ। চোরের মতন গোপনে এখানে আসিয়া তুমি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ। আমি তোমার সহিত অধিক কথা কহিতে অনিচ্ছুক; ইচ্ছা করিলে তুমি পিতার নিকট যাইতে পার।

দু। তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার সহিত গোপনে আলাপ করাই আমার অভিপ্রায়; তাই চোরের ন্যায় এই নির্জ্জন স্থানে তোমার নিকট আসিয়াছি।

মৃ। কি জন্য তুমি আমার নিকট আসিয়াছ ?

দু। ভিক্ষার জন্য।

মৃ। কি ভিক্ষা ?

দু। প্রেম ভিক্ষা।

দুর্জ্জয় সিংহের এই কথায় মৃণ্ময়ী কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, কম্পিত স্বরে বলিলেন,—"নরপিশাচ! এখনি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, নতুবা এখনি আমি চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।"

মৃণ্ময়ীর তিরস্কারে দুর্জ্জয় সিংহ শঙ্কিত হইলেন না, তিনি মৃণ্ময়ীর সম্মুখে আসিয়া অবিচলিত কণ্ঠে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"চুপ কর মৃণ্ময়ী, চীৎকার করিও না, আজ মনের আবেগে তোমাকে অনেক কথা বলিব, স্থির হইয়া শোন।—যে আশার জন্য আমি হিতাহিত জ্ঞানহীন হইয়াছি, যে আশার জন্য তোমার পিতার নিকট চোরের মত—দস্যুর মত

লাঞ্ছিত হইয়াছি—ঘৃণিত পিশাচের মত বিতাড়িত হইয়াছি, যে আশার জন্য জাতি-গৌরব, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া পাঠানের নিকট শির নত করিয়াছি—হৃদয়কে দগ্ধ মরুভূমির আকারে পরিণত করিয়াছি,—মৃণ্ময়ী! তুমিই আমার সেই কাঙ্ক্ষিত আশালতা,—তোমার প্রেমই সেই পল্লবিত আশালতা-প্রসূত প্রফুল্ল কুসুম; যে কুসুমের হৃদয়োন্মাদী সৌরভে দুর্জ্জয় সিংহ এতদিন উন্মাদের মত চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। মৃণ্ময়ী! প্রাণেশ্বরী! তোমারই জন্য লালায়িত হইয়া আমি হৃদয়কে দগ্ধ শ্মশানাপেক্ষা ভীষণ করিয়া তুলিয়াছি; আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য চুল্লী অহোরাত্র এই শ্মশানে প্রজ্বলিত হইতেছে! যতদিন তোমার শান্তিস্নিগ্ধ প্রেমবারি এই দগ্ধ শ্মশানে নিপতিত না হবে, ততদিন আমার এই মরুময় হৃদয় শ্মশানে অহর্নিশি রাবনের চুল্লী প্রজ্বলিত থাকিবে। মৃণ্ময়ী! প্রাণেশ্বরী! দোহাই তোমার, আর আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে হলাহল বর্ষণ করিয়ো না; দয়া করিয়া আমার প্রতি সদয় হও—হৃদয়ে স্থান দাও।"

দুর্জ্জয় সিংহের এই অসঙ্গত প্রলাপে মৃণ্ময়ী লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিলেন; ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। দুর্জ্জয় সিংহকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"যে অকৃতজ্ঞ নরপিশাচ আশ্রয়দাতা প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার কন্যার প্রতি এইরূপ কদর্য্য ভাষা প্রয়োগ করিতে সাহস পায়; যে নরাধম কুলাঙ্গার পবিত্র রাজপুতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিধর্ম্মী পাঠানের পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়, রাজকুমারী মৃণ্ময়ী তার মুখে এইরূপে পদাঘাত করে।"

মৃণ্ময়ী সক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করিলেন। দুর্জ্জয় সিংহ কয়েকমুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে মৃণ্ময়ীর তৎকালীন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। পরক্ষণে তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"উত্তম! আজ হইতে তোমার সহিত আমার সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল; তোমার জন্য আমার হৃদয়ে যতটুকু প্রেম সঞ্চিত ছিল, আজ হইতে তাহা জ্বলন্ত ঘৃণায়—তীব্র প্রতিহিংসায় পরিণত হইল। মৃণ্ময়ী! আমি পাঠানের দাসত্ব করিতেছি বলিয়া তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া পদাঘাত করিলে! তোমার এই স্পর্দ্ধার প্রত্যুত্তরে আমিও বলিতেছি—তোমার ঐ দর্প চূর্ণ করিব, তোমার ঐ কমনীয় মূর্ত্তি পাঠানের উপভোগ্য করিবার জন্য উপহার প্রদান করিব। দুর্জ্জয় সিংহের প্রতিজ্ঞা কখনও নিষ্ফল হইবে না।"

সহসা মৃণ্ময়ীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময় তাঁহার মাথার উপর দিয়া একটি পেচক বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল। মৃণ্ময়ী সভয়ে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, দুর্জ্জয় সিংহ উদ্যানে নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোকিল।

অই যে পাখিটী বসি সহকার ডালে,
ঢাকিয়া আপন তনু পাতার আড়ালে;
ধরিয়ে মধুর তান গগন পুরিয়া,
গাইছে মনের সাধে ভাবেতে গলিয়া,
সমীরণ সহ সেই, গান মনোহর,
মিশিয়া বেড়ায় আহা! মরি কি সুন্দর।
যাহার শ্রবণে পশে, সে মোহন ধ্বনি,
অবশে গলিয়া পড়ে পরাণ অমনি।
মনে হয় পাখী যেন বরষিছে সুধা,
যত শুনি শ্রবণের বেড়ে যায় ক্ষুধা,
মনে হয় বুক চিরে পাখী পুরে রাখি,
না হয় পাখীর সনে পাখী হয়ে থাকি।
ওর সনে বনে বনে ঘুরিয়ে বেড়াই,
মন খুলে ডালে বসে প্রাণ খুলে গাই,
হোক্‌না বরণ কালো, হোক কদাকার
গুণে বশীভূত এই নিখিল সংসার।
সুচিত্র বিচিত্র কায় পাখী শত শত,
রয়েছে কাননে, তার সংখ্যা কব কত!
কিন্তু কেবা জানে তারে কেবা নাম লয়,
যার গুণ তার যশঃ সকলেই কয়।

শ্রীসুশীলাবালা সেন।

পাট ও ধান।

আজ কাল বাঙ্গালাদেশে—কৃষক সমাজে পাটের আবাদ লইয়া বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ধান ও পাট—এই দুইটির মধ্যে কোন্ আবাদটির বিস্তার আবশ্যক, কোন্ আবাদে লাভের সম্ভাবনা সমধিক প্রবল,—এই সমস্যা লইয়া কৃষক সমাজে তুমুল জল্পনা চলিতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গত কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা দেশে পাটের ব্যবসায় প্রবল বেগে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য সকল ব্যবসায়ই ইহার নিকট নিতান্ত প্রভাহীন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে এ দেশে ধান্য চাউলের বাণিজ্য যেরূপ প্রবল ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই; পাটই এখন বাঙ্গালা দেশের বাণিজ্যের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নীলের বাণিজ্য অন্তর্হিত, হলুদের বাণিজ্য বিলুপ্ত; এখন পাট বাঙ্গালার হাট মাঠ ঘাট—সকল স্থান অধিকার করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে।

কিন্তু এই পাটের বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়; একাধিক সহস্র রজনীর উপকথা বর্ণিত দৈত্যের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার দেহ সমগ্র দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইউরোপে বড় কেহ পাটের অস্তিত্ব অবগত ছিল না। ১৭৯৫ অব্দে ডাক্তার রক্সবরো বিলাতের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট প্রথমে এক গাঁইট পাট পাঠাইয়াছিলেন, সেই হইতে এই একশত পঞ্চদশ বৎসরে পাট বাণিজ্যের প্রধান উপকরণে পরিণত হইয়াছে। উড়িষ্যা দেশে পাটকে 'ঝাট' বলে, তদনুসারে পাটকে ইংরেজেরা 'জুট' বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে রসি, শিকা, চট প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য দুই এক কাঠা জমিতে গৃহস্থেরা ও চাষীরা যৎসামান্য পাটের আবাদ করিত, তাহা তাহাদের গার্হস্থ্য প্রয়োজন সিদ্ধিতেই ব্যয়িত হইত। কিন্তু ইউরোপে এখন পাট, তুলা ও ধানের নীচেই স্থান পাইয়াছে। পাটে এখন নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, সুতরাং পাটের বাণিজ্য নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে। ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে পাটের মূল্য প্রতি মণ ৭৮ টাকার অধিক ছিল না; কিন্তু তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ইতি-

মধ্যে ১৪।১৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর পাটের দর সেরূপ বৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া বঙ্গদেশের কৃষক, গৃহস্থ, জমীদার, মহাজন সকলকেই ক্ষতি-গ্রস্থ হইতে হইয়াছে।

পাট ইউরোপীয়গণের বিপুল অর্থাগমের সহায় স্বরূপ হইয়াছে। সুতরাং পাট যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও পাটের ব্যবসায় প্রবলবেগে চলে, সে জন্য তাঁহারা নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকও পাটের দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। অনেক জমীদার পাটের জমীর খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন, অনেক মহাজন এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া ধনবান হইতেছেন, অনেক গুদামওয়ালা গুদাম ভাড়ায় ফাঁপিয়া উঠিতেছেন, অনেক গৃহস্থ, কৃষকও অর্থের মুখ দেখিতেছেন; সুতরাং তাঁহারা সকলেই প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া পাট উৎপাদন ও পাট বিক্রয়াদি করিতেছেন।

বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথায়ও পাট উৎপন্ন হয় না। চীন, মিসর আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাটের আবাদের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। একা বঙ্গদেশেই পৃথিবীর আবশ্যকীয় পাট উৎপন্ন হই-তেছে এবং তাহার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায় চলিতেছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, তাহা যথেষ্ট আসাপ্রদ ও উৎসাহজনক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাটের আবাদ ও ক্রয় বিক্রয়ের যে সকল দোষ, তাহাও ভয়ানক। কৃষকেরা পাটে বেশী টাকা পায় বলিয়া প্রতি বৎসর ধানের আবাদ কমাইয়া পাটের চাষ বৃদ্ধি করিতেছে। ধান্যের আবাদ এতই কমিয়া গিয়াছে যে, অন্নপূর্ণা ভারতলক্ষ্মী দিন দিন নিরন্ন হইয়া অন্নের জন্য পরদেশের মুখাপেক্ষিণী হইয়া উঠিয়াছেন। ভাগ্যে নিকটে ব্রহ্মদেশ ছিল, তাই গত কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষে এ দেশের লোকের প্রাণ রাখিয়াছে, নতুবা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতবাসী দুর্ব্বৎসরে কি খাইয়া বাঁচিত তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না।

ইউরোপের ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জন সাধারণের যে পরিমাণ খাদ্য শস্য আবশ্যক তাহা তাহারা উৎপন্ন করিতে পারে না। তাহারা বিপুল অর্থ ব্যয়ে দেশ দেশান্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবনধারণ করে। সুতরাং স্বদেশে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিতে না পারিলে যে বিষম বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ইংরেজদের দেশে তাহাদের তিনমাস চলিবার মত খাদ্যও উৎপন্ন হয় না। বৎসরের

অবশিষ্ট সময়ের উপযোগী খাদ্য তাহারা দেশ দেশান্তর হইতে সংগ্রহ করে। তাহাদের দৈনিক ব্যক্তিগত আহার্য্য ব্যয় দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা, অনেকের আবার দশ পনের টাকাও লাগিয়া থাকে। সুতরাং ইংরেজ আমাদের দুঃখ ও অভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আমাদের দৈনিক ব্যক্তিগত আহার্য্য ব্যয় দুই আনা হইলেই আমাদের প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠে। রেঙ্গুন হইতে চাউল আমদানী করিলে যে চিরদুর্ভিক্ষ আমাদের গ্রাস করিবে—তাহা ইংরেজের ধারণার অতীত; ইংরেজের তাহা বুঝিবার সামর্থ নাই। সুতরাং ইংরেজ চায়—আমরা ধান না বুনিয়া কেবল পাটই উৎপন্ন করি। কিন্তু ইহাতে আমাদের দুর্ভিক্ষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে,—ইহা আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

জীবনরক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই উদর পূরণ একান্ত আবশ্যক; ইহাই জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য। সুতরাং যাহাতে আমাদের উদর পূর্ণ হয়, সর্ব্ব প্রথমে তাহাই দেখিতে হইবে। ধান্য, যব, গোধুম, কলাই, সর্ষপ প্রভৃতি খাদ্যোপযোগী শস্যই যথার্থ ধন। আমাদের দেশে এখনও এমন পল্লীর একেবারে অভাব হয় নাই, যেখানে জীবন ধারণের জন্য একটি মাত্র পয়সারও আবশ্যক হয় না। গোলায় ধান, কলাই, সর্ষপাদি আছে পুষ্করিণীতে মাছ আছে, বাগানে ফল মূল ও নানাবিধ তরকারী আছে, গোশালায় গাভী আছে; কেবল গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে লবণ নাই, দুই চারি আনার লবণ কিনিয়া লইলেই দিনপাত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত অর্থের আবশ্যক হয় না। রাজার খাজনা ট্যাক্স ধান্য বিক্রয় দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে।

গৃহে অর্থ নাই, তথাপি ধন-ধান্যে সৌভাগ্যবান সুখী গৃহস্থ প্রতিদিন পরিতৃপ্তির সহিত উদরপূর্ণ করিতেছে, এবং অন্যেরও আহার্য্য যোগাইতেছে। এরূপ ধনবান অথচ অর্থহীন গৃহস্থ পূর্ব্বে আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। এ কালের মত অর্থবান অথচ ধনহীন গৃহস্থের সেকালে অত্যন্ত অভাব ছিল। ধনই মানুষের যথার্থ প্রয়োজনে লাগে; মুদ্রা ধন আহরণের ও ব্যবসায়ের উপায় মাত্র। (Money is the medium of exchange) তাহা ক্রয় বিক্রয়ের ও ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেয়, দেশের অর্থবৃদ্ধিরও সহায়তা করে; কিন্তু দেশে যাহার ধন নাই, অর্থে তাহার উপকার হয় না। পাট মানুষের গৌণ উপকারে ভিন্ন মুখ্য উপকারে লাগে না। সুতরাং আমরা পাটের আবাদ বৃদ্ধি করিয়া—অর্থবান হইলেও এত অধিক অর্থ উপার্জ্জন

করিতে পারিতেছি না যে, পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে যে কোন মূল্যে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করিতে পারি। একজন ইংরেজ, দৈনিক আহার্য্যের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ, একজন ভারতবাসী মাসিক আহার্য্য সংগ্রহে তাহা ব্যয় করিতে কষ্টবোধ করেন। এ অবস্থায় পাটের আবাদ বাড়াইতে গিয়া ধান্যের আবাদ কম করায় আমাদের লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

পাটের দর প্রতি মণ ১৪।১৫ টাকা হইলেও আমরা কোন প্রকারে চাউল ক্রয় করিয়া ক্ষুন্নিবারণে সমর্থ হইতে পারি, কিন্তু পাটের দর কমিলে আর বিড়ম্বনার অন্ত থাকিবে না। পাটের দর ক্রমেই কমিবে, কারণ পাটের আবাদ ক্রমেই বাড়িতেছে, আর ধানের আবাদ কমিতেছে। ইহা হইতে অন্যরূপ ফলের আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমরা পাটে যে অর্থ পাইতেছি, ব্রহ্মদেশের চাউলের বিনিময়ে তাহা নিঃশেষিত হইতেছে; প্রত্যক্ষতঃ আমাদের অর্থলাভ ঘটিতেছে,—কি বস্তুতঃ আমরা দিন দিন নিঃস্ব হইতেছি।

পাটের আবাদে চাষাকে অনেক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, এবং সারের জন্য অনেক বেশী খরচ করিতে হয়; তাহার উপর শরতের প্রখর রৌদ্রে, এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া, কখন বা বৃষ্টিতে অবিশ্রান্ত ভিজিয়া সেই পাট কাটিতে হয়; এই অতিরিক্ত ও অনিয়মিত পরিশ্রমে কৃষকগণ স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল ও রোগের সেবা করিতে করিতে নির্ধন হইয়া পড়ে। পাটের আবাদে মশক বংশের বৃদ্ধি হয়, পাট-পচা জলে ও পাটের ক্ষেত্রে তাহারা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, দেশ মশকের প্রাদুর্ভাবে ম্যালেরিয়ায় পূর্ণ হয়, তাহার উপর পাট-পচা দুর্গন্ধ দূষিত বিষাক্ত জল পান করিয়া দেশের লোক ম্যালেরিয়া ও কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, জনপদ সমূহে নানা সংক্রামক পীড়ায় বিধ্বস্ত হইতে থাকে। পাটের চাষের বিস্তৃতিতে গোচারণ ক্ষেত্র-সমূহ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে, উপযুক্ত পরিমাণে তৃণাদির অভাবে গোজাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য দুগ্ধ ঘৃতাদির অভাব ঘটিতেছে;—কিন্তু সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই, উন্মত্ত হইয়া বাঙ্গালার কৃষক পাট চাষ করিতেছে। এমন আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী অদূরদর্শী জাতি ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ।

পাটের আবাদ কি তবে আমরা একেবারে ত্যাগ করিব?—এরূপ পরামর্শ কেহই দিবেন না; অল্প পরিমাণে পাটের আবাদ করিলে দেশের প্রকৃত ধন বৃদ্ধি হইতে পারে। ঘরে ধান থাকিলে টাকার তেমন আবশ্যক হয়

না,—'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে'—বেশ সন্তোষ ও প্রীতির সহিত দিন কাটাইতে পারে। পাটের আবাদ কম হইলে ২০৷২৫ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হইতে পারে। তাহাতেই রাজার খাজনা, লবণাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয়, এমন কি অনাবশ্যক বিলাসিতার ব্যয়ও কতক পরিমাণে নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমাদের দেশে রোগের অভাব নাই; ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা অনেকদিন হইতেই আছেন, পাটের আবাদে তাঁহাদের পরাক্রম ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার উপর প্লেগ আসিয়াছেন;—এখন আবার ব্রহ্মদেশের চাউল ভোজনে আর একটা নূতন ব্যাধিকে আমরা গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছি—ইহার নাম বেরিবেরি; ইনি শমনের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি!—ধান্তের আবাদ বৃদ্ধি না করিলে এ দেশের আর রক্ষা নাই।

যাহার যে পরিমাণ জমি আছে তাহার ষষ্ঠাংশ জমিতে পাট বপন করা কর্ত্তব্য। যে কৃষক ছয় বিঘা জমি করে—সে এক বিঘায় পাট বপন করুক। একেবারে পাট তুলিয়া দিলে দেশের বাণিজ্য অচল হইবে; তাহা কদাচ প্রার্থনীয় নহে। পাটের পরিমাণ অল্প হইলে দরবৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। কারণ ইউরোপীয়দের পাট ভিন্ন চলিবার যো নাই; পররাজ্য-লোলুপ রঙ্গজীবি ইউরোপের নিকট পাট মহার্ঘ রত্নস্বরূপ। নানা কার্য্যে তাহাদের পক্ষে পাট অপরিহার্য্য। পদ্মাতীরের অর্দ্ধ পয়সা মূল্যের ইলিস মৎস্য যেমন কলিকাতায় অর্দ্ধ টাকায় বিক্রয় হয়, সেইরূপ ৩।৮ টাকা মণের পাট দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকেও ৪০৷৫০ টাকা মূল্যে কিনিতে হইবে, না কিনিয়া উপায় নাই। সুতরাং পাটের আবাদ কম করিলে লাভ সমানই থাকিবে। আমাদের দেশের কৃষকেরা এখন দশগুণ পাট উৎপন্ন করিয়া যাহা পাইতেছে—একগুণ উৎপন্ন করিলেও তাহাই পাইবে। অথচ অবশিষ্ট জমিতে ধান, কলাই, প্রভৃতি খাদ্য শস্য বপন করিলে অন্নাভাবে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

এখন রৌপ্যের ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে; এখন ইচ্ছা করিলেই আর ঘরের রূপা গলাইয়া টাকা পাওয়া যায় না, গবর্ণমেণ্ট সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে টাকায় আটমণ চাউল পাওয়া যাইত, কিছুকাল পূর্ব্বেও দেড় টাকা কি দুই টাকা চাউলের মণ ছিল। আর এখন আট টাকায় এক মণ চাউল। সুতরাং যখন টাকায় আট মণ চাউল ছিল, তখনকার

এক টাকা এখনকার ৬৪ টাকার সমান ছিল; অর্থাৎ টাকার মূল্য ৬৪ গুণ কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ অল্প মূল্যের মুদ্রার জন্য দেশের প্রকৃত ধনলক্ষ্মীকে তাচ্ছিল্য করা কোনক্রমে সঙ্গত নহে।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ললিতার প্রতি।

কেন লো ললিতে ডাকিস্ আমায়
কি আর আমার সেদিন আছে
গিয়া ফুলবনে তো'সবার সনে
ভ্রমিব হরষে উদ্যান মাঝে।
কুতূহলে মিলে তুলি ফুলগুলি
গাঁথিতাম যবে চিকনহার
ছিললো তখন মম প্রাণধন
ছিল কত আশা কবনা আর।
নাথ মৃদুহাসি হায়লো স্বজনি
সে স্মিতে কি যেন মাখান ছিল
তুষিতেন মোরে অপাঙ্গের ঠারে
হায়রে সে সব কে ভেঙ্গে দিল।
সাদরে আসিয়া নিকটে আমার
ধরিয়া ছুকরে কমল আঁখি
বলিতেন কত উন্মাদের মত
সাদরে সস্নেহে আমারে চাহি।
"কহল সুন্দরি! কারতরে এত
গাঁথিছ যতনে ফুলের মালা
কার কণ্ঠে তুলে দিবে কুতূহলে
কে আছে বা আর বিনা একালা;"
এত বলি তুলি ফুল রাশি রাশি
সাজাইয়া মোরে ফুলের সাজে
বনদেবী বলি দিত করতালি
আজিও সে স্বর হৃদয়ে বাজে।
হায়লো গিয়াছে সে সাধের দিন
বিনা সে মাধব রাধিকানাথ
এবে বিড়ম্বনা কেন লো বলনা
কর চতুরালি আমার সাথ।
আমিত যাবনা আর সে কাননে
বৃথা অনুরোধ ক'রনা আর
মিছে শান্তি আশা হয়েছি নিরাশা
এবে লো কেবল বিষাদ সার।
চাব না লো আর ফুলকুল পানে
যাদ্দিন এ জগতে থাকিতে কভু
হেরি প্রতিকূলা না হোয়ো ব্যাকুলা
সাথে বাদ মোর সেধেছে বিভু।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ।

প্রেমোন্মাদিনী রাধা।

অই সখি বাজিতেছে শ্যামের বাঁশরী
চল শ্যাম দরশনে যাই ত্বরা করি।
অই কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের মূলে
অই শুন বাজে রাধা নামে সাধা বাঁশী
চল আঁখি ভরে শ্যামরূপ দেখে আসি।

বড়ই প্রবল শ্যাম রূপের পিপাসা
সেরূপ নিরখি কভু নাহি মিটে আশা
সখি! শ্যামচাঁদ-রূপ অপরূপ সুধা-কূপ
সেই সুধা আশে লুব্ধ নয়ন চকোর
উদাস পরাণ সদা শ্যাম বিনে মোর।

নিত, পূর্ণ, চিদানন্দময় শ্যাম চাঁদ
বিশ্ব বিমোহন শ্যাম-চাঁদ-রূপ-ফাঁদ
যে হেরেছে একবার সেত তাতে নাই আর
ভেসেছে সে কৃষ্ণ প্রেম অকূল সাগরে
আত্ম নিবেদন করি রসিক নাগরে।

সাধে কি গো শ্যাম নামে রাধা আত্মহারা
শ্যাম নামে নেত্রে বয় তারাকারা ধারা
শুনিলে বাঁশরি স্বর কণ্টকিত কলেবর
পুলকে, ঘটায় মোর বিলাস বিভ্রম
লজ্জা ঘৃণা ভয়ে নহে রাধার সম্ভ্রম।

শ্যামের রূপের ফাঁদে যে দিয়েছে পদ
তার কি আছে লো সখি! সম্পদ বিপদ
পেলে প্রেম-রসা-স্বাদ দূরে যায় অবসাদ
কামহীন পিরীতে সে শ্যাম চাঁদে ভজে
সেই জানে কি সুখে সে শ্যাম রূপে মজে।

কামুকের কাছে আমি কলঙ্কিনী রাই
প্রেমিকের কাছে মোর তুলনা তো নাই
তাই প্রেমময় শ্যাম চূড়াতে রাধার নাম
লিখিয়া ধরেছে শিরে মোর গুণমনি
তাই আমি শ্যাম গরবের গরবিনী।

যথা শ্যাম তথা বয় প্রেম মন্দাকিনী
যথা নাই শ্যাম তথা কাম বৈতরণী
বৈতরণী হলে পার তবে প্রেমে অধিকার
তথা নাই বাসনার জলন্ত আগুন
তথা নাই ভেদাভেদ নিগু'ণ সগুণ।

শ্যামের বাঁশরী মন্দাকিনীর কল্লোল
পুলকাশ্রু দুই তার সুখদ হিল্লোল
শুনিলে সে কলোধ্বনি উছলে প্রাণ আপনি
সাধে কি গো বাঁশীশুনে গোকুল আকুল
সাধে কি ত্যজেছে রাধা জাতি মান কুল?

শ্রীবঙ্কবিহারী রায়।

ভুল।

যত কিছু মোর জীবনের সাধ,
হৃদয়ে গুছায়ে রেখে,—
তোমারে দেখিলে এক এক করি
নিবেদিব বলি সখে,—
সখা! আসি পরে সুমুখে দাঁড়ালে,
হেরি ও রূপ অতুল,
সব সাধ, আশা, পরাণের ভাষা,
সকলই হয় ভুল।

সাঁঝিনী প্রদোষে, একাকিনী যবে
আপনার মনে মাতি,—
আধ ফোটা ফুলে, যতনে তুলিয়া,
বড় সাধে মালা গাঁথি,—

যখন মালার মোহন গাথনি
করিতে চাহি অতুল,
তখনই তুমি দাঁড়ালে আসিয়া,
সবই হয়ে গেল ভুল।

যত গৃহ কায, হাসি,—সুখ,—সাজ,
অবশ্য কর্ত্তব্য যত,—
তোমার বদন বারেক হেরিলে,
সব মোর হয় গত;
মনে হয় শুধু এধরায় যেন
তুমি যে সদা অতুল,
তব মুখ হেরি জগত পাশরি
জীবন ও মহাভুল।

ভাব!

ভাব,—ভাব,—ভাব,—ভাব-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে ভাবনার মন্দাকিনী ছুটাও,—এই শোক মথিত-ব্যথিত বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ের দারুণ মরু-মরিচীকা লইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিকট উন্মুক্ত হৃদয়ে দণ্ডায়মান হও, কেহ তোমায় সে রুদ্ধ পিপাসায় শান্তি সলিল প্রদাম করিয়া সান্ত্বনা দিবে না। অতৃপ্ত যৌবনের প্রথম উদ্যমে কতই না সুখের কল্পনা ছবি এই মানস-পটে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম,—মনে ভাবিয়াছিলাম,—সুখ-স্বপ্ন-ময়-রাজ্য হইতে সুখের নন্দন-কানন আনিয়া এই দীর্ণ জীর্ণ অবসাদ মথিত হৃদয় মরু সাজাইয়া রাখিব—আর এই স্বর্গীয় দেব-ভোগ্য নন্দন-কাননের শীতল ছায়ায় বসিয়া স্বর্গীয় বিমল সুখ উপভোগ করিব,—বাসনা-বৈতরণী তটে উপস্থিত হইয়া প্রবৃত্তি তরণী বাহিয়া নিবৃত্তির পথে ছুটিব। এই দুঃখ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তির জ্যোৎস্না ঢালিয়া আলোকিত করিব। আশা ছিল হৃদয়-উদ্যানে "জীবনের তাপ-দগ্ধ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে" সে সমাপ্ত সুখ-ময় তরুভগ্ন হইয়া গিয়াছে,—কামনা ও আকাঙ্ক্ষা নদীর তট হইতে তাহাদের শাখা-পল্লবিত নব-পত্রোজ্জ্বল নব-তরু আনিয়া পুনর্ব্বার রোপণ করিয়া শান্তি সুখে ফল ভোগ করিব। কিন্তু আমি এমনি দুর্ভাগা—যে আমার সে সাধ আর পূরণ হইল না! কেনই বা হইবে;—অভাগার সাধ কবে মিটিয়া থাকে,—তাই কথায় বলে,—

অভাগা যদ্যপি চায়
সাগর শুখায়ে যায়
বালুকণা রহে শুধু পড়ি।
ধন রত্নে পূর্ণ করি'
ডোবে এসে তীরে তরী,
সাগর সাঁতারি দিয়া পাড়ি।

(২)

কেবল ভাবিতেই আছি,—কেন যে মিছামিছি ভাবি তাও জানি না। তাই কবি বড় দুঃখে বলিয়া গিয়াছেন,—

"কিযে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না,
ভাবি শুধু এক মনে হৃদয়ের ভাবনা।"

(হেম বসু)

বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবি,—কিন্তু কে যে ভাবায় এবং কেন যে ভাবি তাহার কিছু তত্ত্ব কোন দিন লইয়াছি কি?—এই পৃথিবী ব্যাপী দিগন্তের কোন শুভ গ্রহ উপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র কক্ষে সেই বিরাট মহাপুরুষের স্বর্গ-সিংহাসনটির সুখ শয্যা আস্তৃত তাহা কে বলিবে।—হায় যদি পাইতাম, তবে এই উন্মুক্ত গগন তলে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় বায়ু সাগর পাড়ি দিয়া সুনীল অভ্রস্তূপ ভেদ করিয়া এই দীর্ণ জীর্ণ শোক মথিত, ব্যথিত বেদনা ক্লিষ্ট দুঃখ-ময় জীবনের দুঃখ কাহিনী লইয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতাম। তাহা হইলে বুঝি আমার এ জ্বালার অবসান হইত। অভাগার এই শত ছিন্ন, হৃদয়ের এক একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস শোক দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া সেই স্বর্গস্থ পরম পিতার স্বর্গ-স্বর্ণ সিংহাসন পর্য্যন্ত টলাইয়া দিতেছে, তথাপি দীনের কাতর প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করিতেছেন না। শুনিয়াছি কলিতে দেবতা গণ নিদ্রিত,—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সে নিদ্রার কি অবসান নাই, এই চারি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার বৎসরের মধ্যে তাহাদের নিদ্রার কি বিন্দু মাত্র অবসান হইবে না। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে এই কলি জগতের কেহ নিয়ন্তা বা নিয়ন্ত্রী নাই! তবে ঈশ্বর কি কেবল মানুষকে দুঃখ দিবার জন্যই এই জগত-সংসারে পাঠাইয়াছেন! তাই কবি বড় দুঃখে গাহিয়া গিয়াছেন,—

> "জীব দুঃখ তবে কি গো অনাদ্যারি রচনা,
> অদম্য তবে কি দেব পরাণীর যাতনা।
> জগত সৃজন লীলা দুঃখদিতে প্রাণীরে,
> না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেব শরীরে।"
>
> (দশ মহাবিদ্যা)।

(৩)

তাই বলি আর ভাবিলে কি হইবে?—ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর ক্ষয় কর;—তোমার অস্থি পাঁজর সার হউক,—তোমার আঁখি জ্যোতিহীন হউক,—জগত-সংসার তোমার চক্ষে অন্ধকার বলিয়া প্রতীয়মান হউক—তথাপি তোমার এ ভাবার অন্ত হইবে না।

আর ভাবিতেও পারি না,—লুব্ধ আশা ও মুগ্ধ বাসনা এই দুয়ের তরঙ্গা-ঘাতে আয়ুর তলদেশ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। কোন দিন এই দীর্ণ জীর্ণ, জীবনের শোকে তাপে ব্যথিত মথিত দেহতরণীখানি এই পরিবর্ত্তন শীল

জগতে,—কাল চক্রের আবর্ত্তনে, ঘুরিতে ঘুরিতে সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে,—কাল সমুদ্রের গভীর ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া জন্মের মত ডুবিয়া যাইবে,—তাহা কে বলিবে? কেবল দিন গণনা বইত নয়,—আমি এখন কেবল, সেই দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। কেন না আমি যন্ত্রণার শেষ চাহি না জীবনের শেষ চাই। হায়! কত দিন এই দীর্ণ জীর্ণ শোক মথিত হৃদয়ের উপর দিয়া বিষাদের অগ্নিবর্ণ রথ নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে,—তাহার সে দহনের তীব্রানলে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে,—তাহার পর এই শোক দুঃখ দীর্ণ দেহের উপর দিয়া কত শত দিন অতীত হইয়া গিয়াছে—তথাপি সে জ্বালার অবসান হইল না। কখন হইবে কি প্রভু? বোধ হয় অভাগার ভাগ্যাকাশ তেমন সুখ-চন্দ্রমার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে না,—কেমনা আমি যে ভাগ্যচক্রের পূর্ণ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত নরলোকের অগোচরস্থিত যাতনাময় জীব! আমি এতদিন ধরিয়া সুখ-স্বপ্নময়-রাজ্যে,—বাসনা-দেবীর উপর কল্পনা কুহকিনীর দ্বারা যে মানস-প্রতিমা গড়িয়া তুলিতেছিলাম, আজ তাহা অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায়,—কর্ত্তব্যের ঘাত প্রতিঘাতে,—ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর ভাগ্য-লিপিতে,—ও অদৃষ্ট দেবীর কঠোর কশাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরণীর ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছে। যখন মনে ভাবিয়াছিলাম, আমার সেই মানস-প্রতিমাকে কামনার ফুল চন্দনে সজ্জিত করিয়া,—মনের সুখে সাধ মিটাইয়া,—প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিব,—আর তাহার পায় পরাণ লুটাইয়া ভাল বাসিব,—কিন্তু আমার বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে,—বড় সাধে বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন।

যখন আমার সকল আশা ভরসা অতীতের অতীত স্মৃতিগর্ভে জন্মের মত ডুবিয়া গেল,—তখন আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এখন এ জীবন অবসান হইলেই মঙ্গল।

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানস-প্রতিমা।

সাঁঝের গগন গায়,
তারকারাজীর মত—
ধীরে ধীরে ফুটিতেছে
হৃদয়ে, ভাবনা যত!

কে গো তুমি তারি মাঝে, মোহিনী প্রতিমা সাজে
বিকাশিছ ছায়া?
স্বপন রচিত কায়, জ্যোছনা উছলি যায়
মাখা যেন মায়া!
শরতের এ উষায়
আন মনে করি খেলা
আন মনে পরায়েছি
তোমারই গলে মালা!
নিরখি তোমার হাসি এ বিশ্বে কবিতা রাশি
তুলিছে স্পন্দন।
তোমারই মুরতি ধ্যানে, কবিগণ মুগ্ধ প্রাণে
র'য়েছে মগন।
কল্পনা পরাণ তব
ভাষাতব তনুর তনিমা;
কে তুমি এ নিখিলের
মানস-প্রতিমা?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট।

সুখ-স্বপ্ন মণিময়ী অদৃষ্ট নাগিনী,—
লুব্ধ আমি, মুগ্ধ বক্ষঃ করি আক্রমণ,
এমন-মৃণাল-বেড়ি, কাল-ভুজঙ্গিনী,—
দংশিতেছে দিবানিশি দারুণ দংশন!
হৃদয়ের সুখ, শান্তি কামনা বিমল,
পুড়িতেছে নাগিনীর তীব্র হলাহলে,—
কোথা তুমি অন্তর্য্যামী দুর্ব্বলের বল,—
দেহ নাথ পরাভক্তি—মুক্তি পদতলে।
ছিঁড়ে ফেল নাগিনীর ফণা জ্বালাময়,
জুড়াক তাপিত হৃদি' তোমার কৃপায়!

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়।

লাঞ্ছিতা।

(১)

যদিও নির্গুণ আমি কলঙ্কিতা তব পাশে,
ক্ষমার অযোগ্যা নহি তবু ;
তাই, সাহসে বাঁধিয়া হিয়া দাঁড়ায়েছি বড় আশে
নিরাশ না হব এথা কভু।

(২)

যদিও ঠেলেছ পায় এক দিন ক্রোধ-ভরে,
দোষী আমি—তোমার কি দোষ ?
কিন্তু হে করুণাময় নাথ আজি দয়া করে
মুছে ফেল হৃদয়ের রোষ।

(৩)

এক দিন—প্রিয়তম এমনি দাঁড়ানু পাশে তব,
হায়রে সে কি সুখের দিন !
আদরে শুধালে মোরে কত সুখ-কথা নব,
নাহি বেসেছিলে কভু ভিন্ !

(৪)

মাঝে মাঝে ঝলসিয়া যায় ম্লান হৃদি মোর,
উজলি সে আনন্দের রেখা ;
সে চিন্তায় কত দিন হ'য়ে যায় নেশা-ভোর,
ভাবি মনে কেন আমি একা ?

(৫)

তাই আজ বড় সাধে সাধিলাম শ্রীচরণে,
ভুলে যাও অপরাধ যত ;
অবলার শত দোষ—কিছু না রাখিও মনে,
এই ভিক্ষা যাচি অবিরত।

শ্রীমুক্তকেশী চৌধুরী।

"বারেক দেখাও আনিয়া।"

১

ওগো, বহুদিন সে যে গিয়াছে ছাড়িয়া,
বারেক দেখাও আনিয়া ;
সে যে, ছিল জীবনের বড় আদরের,
হৃদয় মানস মোহিয়া।

২

সে যে, নয়নে নয়নে শয়নে স্বপনে
থাকিত মরম জুড়িয়া ;
সেত, নিমেষেরি তরে যাইত না কভু,
আমারে একাকী ফেলিয়া।

৩

কল্লোলিনী যবে "কুল কুল" তানে
যাইত আনন্দে নাচিয়া,
সে যে, থাকিত নিয়ত তার পানে চাহি
আবেশে বিভোর হইয়া।
যেন, তালি দিয়া নদী শত হাত তুলি,
তারে, ডাকিত অঙ্গুলি নাড়িয়া ?

৪

তার, আগুল্ফ লম্বিত অনিবদ্ধ বেণী,
থাকিত মধুরে শোভিয়া,
তরুণ অরুণ চন্দ্রমা নিন্দিত,
রাতুল চরণ চুমিয়া ;
আমি, অতৃপ্ত নয়নে হেরিতাম সদা,
সে মাধুরি আঁখি ভরিয়া।

৫

কভু "ফুলে ফুলে ফুলে" সাজি ফুলরাণী,
জ্যোছনা অঙ্গে মাখিয়া,
হাসি মুখে মোর ধরি দুটি কর,
থাকিত পুলকে চাহিয়া ;

আমি, আবেশে, অবশে, সোহাগে, যতনে,
যেতাম আপন ভুলিয়া ?

৬

তারে, সাজাতাম কত সোহাগে যতনে,
বাসন্তি সুষমা ধরিয়া ;
তার, রভসে অবশ অলস তনুটি
আবেশে পড়িত ঢলিয়া।

৭

গগনের তারা কভু ধরি আমি,
দিতাম সোহাগে গাঁথিয়া ;
কাননের ফুল করিয়া চয়ন,
মাথায় দিতাম গুঁজিয়া ;—
কহিতাম কত সোহাগের কথা,
আলিঙ্গন পাশে বাঁধিয়া ;
তার, জ্যোছনা জড়িত বরাঙ্গে সুন্দর,
মাধুরী উঠিত ফুটিয়া।

৮

আমি, নিতি নিতি নিতি পুজিতাম তারে,
মানস-মন্দিরে রাখিয়া ;
হেরি, চির জীবনের, সেই মুখখানি,
পিপাসা যাইত মিটিয়া !

৯

সে যে, "আসি" ব'লে গেছে, বহুদিন হ'ল,
আজিও এল না ফিরিয়া,
বুঝি, সোহাগের ধন, যতন অভাবে,
গিয়াছে আমারে ছাড়িয়া ;
ওগো, যাহা চাও দিব দেখাও বারেক,
সেই মুখখানি আনিয়া ?

(১০)

কত দিন গেল, না হয় স্মরণ,—
অনন্তের পথে চলিয়া,

কত, যুগ, বর্ষ হায়, গেল যুগান্তর,
অতীতের সনে মিলিয়া ;
আমি, দিবস, যামিনী তাহারি আশায়,
রয়েছি সতত বসিয়া !

(১১)

আমি চাইনা তাহার সুখ সম্মিলন,
সারাটি জীবন ধরিয়া ;
শুধু অতৃপ্ত পিয়াসা মিটায়ে ক্ষণিক,
দেখিব নয়নে চাহিয়া ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সংবাদ।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট পালাম কোটার সারাটুশার বিদ্যালয় সংলগ্ন অন্ধ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

কাবুলের আমীর বাহাদুর গ্রীষ্মকাল অতিবাহনের জন্য পাগমান নামক শৈলাবাসে গমন করিয়াছেন।

কলিকাতার পাথুরিয়া ঘাটার মহারাজ স্যার প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর মহা-সমারোহে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের জন জেমস্ রবিনসন নামক একজন ব্যবসায়ী মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন উইল করিয়া যান নাই এবং তাঁহার নিকট বা দূর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় আছে বলিয়া কেহ জানে না। সেই জন্য তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মূল্য ৫৫৬০৫৲ টাকা রাজবিধান অনুসারে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পারস্যে অন্তর্বিপ্লবের দাবানল ক্রমশই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে,—জাতীয় দল জয়ধ্বনি করিয়া তিহারাণ নগরে প্রবেশ করিয়াছে। সাহের কসাক সেনা নগরের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে। রাজপথে উভয় পক্ষীয় সেনাদলে ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধে জাতীয় দলই জয়যুক্ত হইয়াছে। এখনও সংঘর্ষ চলিতেছে।—সমগ্র সভ্যজগৎ এখন বিস্ফারিত নয়নে পারস্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্তপ্রদেশে আবার অশান্তি দেখাদিয়াছে। পার্ব্বত্য পাঠানগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সহসা ইংরেজ অধিকারে প্রবেশপূর্ব্বক লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মোল্লারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে। দুই এক স্থানে ইংরেজপ্রহরীগণের সহিত দস্যুদলে সংঘর্ষও হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে—সীমান্ত প্রদেশে বুঝি বা আবার রণদুন্দভি বাজিয়া উঠে।

ময়মনসিংহ—জামালপুরের ভূতপূর্ব্ব নামজাদা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লার্ক স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাছারী বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক খাতাপত্র নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি মিঃ ফ্লেচারের এজলাসে অভিযুক্ত ও পাঁচ শত মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। মিঃ ক্লার্ক এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে মিঃ ক্লার্ক বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন প্রধান বিচারপতি সার জেঙ্কিন্স জেঙ্কিন্স মহোদয় তাঁহার এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—আইন অনুসারে আমি এরূপ মকদ্দমার আপীল করিবার অনুমতি দিতে পারি না।—মিঃ ক্লার্কের কাদাঘাঁটাই সার হইল!

সর্‌দার রাধানাথ।

দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রিয় নিকেতন শ্মশান বাঙ্গলা চিরদিনই যে এইরূপ ছিল,— ইতিহাস তাহা স্বীকার করে না। স্বাস্থ্যে, সম্পদে, ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে একদিন ইহা "সোণার বাঙ্গলা" বলিয়াই জগতের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আমরা পুরাকালের কথা বলিতেছি না। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার যে অবস্থা ছিল, স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে, সাহসে বাঙ্গালীর যে খ্যাতি ছিল, বাঙ্গলার স্থানে স্থানে তখনও যে দুই এক জন বীরপুরুষের বাহুবলের কাহিনী শ্রুতিগোচর হইত, এখনকার বাঙ্গলায়—ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুর্ব্বল দুস্থ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে দুই এক জন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ দেখা যাইত, অনেকে হয় তো তাঁহাদের নাম শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ সকলে অবগত আছেন কি না সন্দেহ। ঐ সময়ের একজন বাঙ্গালীর চিত্র অদ্য আমরা সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। আমরা যাঁহার সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করিব, তাঁহার নাম সর্দ্দার রাধানাথ।

হুগলী জেলায় রাধানাথ ডাকাত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহার বাড়ী ছিল হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত—মসুরে নপাড়া গ্রামে। রাধানাথ জাতিতে চণ্ডাল, উপাধি সর্‌দার।

রাধানাথ দস্যুর সর্দ্দার; রাধানাথ দীর্ঘবপুঃ, গৌরকান্তি; রাধানাথের বিশালবক্ষ; আজানুলম্বিত বাহু। রাধানাথ পদ্মপলাশলোচন। সারল্যে,—পরার্থ-প্রাণতায় রাধানাথ দেবকুমার। রাধানাথের দেহে অটুট বল,—কিন্তু সে শক্তি পরার্থে নিয়োজিত; আতুর কাঙ্গালের এমন বন্ধু বুঝি আর নাই। যে কোন বিপদে পড় না কেন, একবার রাধানাথকে স্মরণ করিলেই হইল। রাধানাথ মুখ ভরা হাসি লইয়া, প্রাণভরা স্ফুর্ত্তি লইয়া, তোমাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে আসিবে।

লাঠি সড়্‌কি এবং তরবারি খেলায় রাধানাথ সিদ্ধ-হস্ত; রাধানাথ বন্ বন্ ঢেঁকি ঘুরাইত; রায়-বাঁশে রাধানাথ অদ্বিতীয়; তীর বেগে এক নিশ্বাসে রাধানাথ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইত; দুই তিন দিন জলেই পড়িয়া থাকিত। অ.তরে রাধানাথের অতুল শক্তি; লম্বা লম্বা বাঁশের গিঁটে পা দিয়া,

রাধানাথ বায়ুবেগে চলিয়া যাইত। রাধানাথের যেমন দৈহিক শক্তি, মনের শক্তিও তেমনি। রাধানাথ নানাপ্রকার ঔষধও জানিত। গ্রামের বহুলোক বহুরোগে রাধানাথের ঔষধে সুস্থ হইত। পরের কষ্টে পরের বেদনায় রাধানাথের প্রাণ গলিয়া যাইত। এমন রাধানাথও দস্যুর সর্দার! কিন্তু বিধির বিধান কে বুঝিবে? চন্দ্রে কলঙ্ক কেন, গোলাপে কণ্টক কেন,—ক্ষীর সাগরে বাড়বানল কেন, কে বুঝিবে? প্রাকৃতিক বিধানই বল, আর প্রাক্তন প্রভাবই বল,—এ ক্ষেত্রে রাধানাথের এই পরিবর্ত্তনের মূলাধার,—শ্রীনাথ!

শ্রীনাথ,—সয়তানের সহোদর; ইহার শিরায় শিরায় কাল-সর্পের কালকূট! শ্রীনাথ রাধানাথের প্রতিবেশী। রাধানাথ পরার্থে প্রাণ বলি দিয়াছে, শ্রীনাথের ইহা অসহ্য! রাধানাথের নিঃস্বার্থ-পরতায় গ্রামের—কেবল গ্রামের কেন,—চতুষ্পার্শ্বের শত শত লোকে রাধানাথের ভক্ত শিষ্য—একান্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদের জন্য রাধানাথ অষ্টপ্রহর বুক পাতিয়া পাষাণ ভাঙ্গিতে প্রস্তুত, রাধানাথ তাহাদের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ হইবে না তো আর কে হইবে? গ্রামে যাহার ঘরে যে দিন যে ভাল জিনিসটি হয়, সে তাহা যত্ন করিয়া রাধানাথকে দিয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে শ্রীনাথের এমনই সম্মান ছিল, শ্রীনাথ এমনই প্রীতি-উপহার পাইত। এখন রাধানাথ হইতে তাহার সে সাধে বাদ পড়িল। রাধানাথের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া শ্রীনাথ অগ্নি সাক্ষী পূর্ব্বক শপথ করিল,—'এ বেটাকে যদি জব্দ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার পিতৃপুরুষগণের যেন সদ্গতি লাভ না হয়। এ বেটাকে আমি ফাঁসি কাঠে লটকাব, তবে ছাড়িব।' সয়তানের তীব্র ফুৎকারে প্রলয়-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

আগুন জ্বলিয়াই উঠিল। পুলিসের দারোগার সহিত শ্রীনাথের ভাব ছিল। শ্রীনাথ দারোগাকে টিপিয়া দিল। ফলে আশেপাশে যেখানে যে চুরী ডাকাতি হয়, রাধানাথের উপরই তাহার সন্দেহ হইতে থাকিল! একবারের জন্য, রাধানাথের উপর জুলুম-জবরদস্তি চলিতে লাগিল! বলা বাহুল্য রাধানাথ তখনও ডাকাত হয় নাই,—তখনও সে নিষ্কলঙ্ক নিষ্কাম বীর, বলিয়া জন-সমাজে আদৃত। দুর্ভাগ্য রাধানাথ বুঝিল,—শ্রীনাথই ইহার মূল। সে একদিন শ্রীনাথের বাড়ী গিয়া, তাহার সম্মুখে ধূলায় গড়াইয়া পড়িল,—কাতর-কণ্ঠে বলিল,—"আমার উপর এ নির্য্যাতন কেন? আমি তো তোমার কোন

অনিষ্ট করি নাই। আমি তো কই, কখনও কাহারও কোন লোকসান করি নাই। যদিও অজ্ঞানে তোমার কাছে কোন দোষ করিয়া থাকি, গলায় কাপড় জড়াইয়া, দন্তে তৃণ লইয়া তাহার জন্ম ক্ষমা চাহিতেছি। পুলিশের যাতনা আর আমি সহিতে পারি না; আমায় রক্ষা কর,—রক্ষা কর।"

বিষম ভ্রূকুটি করিয়া, শ্রীনাথ ভেংচাইয়া উঠিল; বলিল,—"রক্ষা করিব সেই আদালতের মশানে—ফাঁসিকাঠে। আর তোকে ফিরিতে হইবে না; পাহারাওয়ালা, ডাকাতকে পাকড়াও।" পুলিসের দুইজন বরকন্দাজ রাধানাথের হস্ত হইতে শ্রীনাথকে রক্ষা করিবার জন্ম সদাসর্ব্বদা তাহার বাড়ীতে গোপনে অবস্থান করিত। শ্রীনাথের আহ্বানে রাধানাথকে ধরিবার জন্ম তাহারা নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিল। রাধানাথ 'জয়কালী' রবে হুঙ্কার দিয়া বিশ হাত পিছাইয়া পড়িল,—সেইস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া শ্রীনাথের দিকে চাহিয়া রাধানাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"সূর্য্যদেব! তুমি সাক্ষী; শ্রীনাথ সাক্ষী; রাধানাথ কোন অপরাধে অপরাধী নহে; তথাচ তাহার প্রতি ডাকাতের সাজা দেওয়া হইতেছে। আর অত্যাচার সহিতে পারিব না। রাধানাথ আজ থেকে ডাকাত। কিন্তু জেনো শ্রীনাথ, জগদম্বা আছে। যদি আমার গলায় দড়ী হয়, তো তোমারও হবে। "জয়কালী।" চকিতে রাধানাথ উধাও হইল। রাধানাথ এখন ডাকাত।

রাধানাথ ডাকাত। রাধানাথের দল ভারি জমকালো রাধানাথের দল প্রায়ই ডাকাতি করিয়া থাকে; কিন্তু বড় বুঝিয়া সুঝিয়া। যে অত্যাচারী,—পরস্বাপহারী, রাধানাথের দল তাহারই বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া থাকে। যাহার ধর্ম্মসঞ্চিত অর্থ—দরিদ্রসেবায় ব্যয়িত হয়, রাধানাথ ডাকাত তাহার বাটীর ত্রিসীমা দিয়াও পথ চলে না। আবার লুণ্ঠনের ধন,—রাধানাথ বিপন্নের বিপদ উদ্ধারে ব্যয় করিয়া থাকে। কন্যাদায়,—মাতৃদায়,—ঋণদায়, ব্যাধিদায়,—যে দায়ে পড় না কেন, রাধানাথকে জানাইলেই হইল,—রাধানাথ সেই লুণ্ঠিত অর্থে মুক্তপ্রাণে তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে।

রাধনাথ বড় কালীভক্ত। থাকিয়া থাকিয়া রাধানাথ কেবল "জয়কালী" রবে হুঙ্কার ছাড়ে; কালীর পূজা করিয়া কালীর প্রসাদ পাইয়া, জয়কালী রবে রাধানাথ ডাকাতি করিতে বাহির হয়। রাধানাথ মাঝে মাঝে জয়কালী নামে মাতিয়া যায়; তখন বোধ হয়, তাহার বিস্ফারিত-চক্ষু যেন জগদম্বার

মূর্ত্তি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। রাধানাথ শক্তি-মূর্ত্তির উপাসক। স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার চির উপাস্য। কিশোরী হউক, যুবতী হউক,—কুমারী হউক, বৃদ্ধা হউক,—স্ত্রীলোক দেখিলেই রাধানাথ তাহার চরণতলে গিয়া পড়ে; সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে,—পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধন্য হয়। রাধানাথ যেন মায়ের কোলে দুধের গোপাল। সে ভাব এমনি সরল,—এমনি মধুর! কিন্তু এমন সরল রাধানাথকেও পাপাশয়ের প্রলোভনে প্রতারিত হইতে হইয়াছিল,—তাহার দলের বামনা ডাকাত একদিন তাহাকে বড়ই ঠকাইয়াছিল।

একদিন বামনা ডাকাত রাধানাথকে বলিল,—"দেবল গ্রামের ভূদেব চৌধুরীর বাড়ীতে ডাকাতি করিতে হইবে; তাহার অগাধ টাকা আছে।"

রাধানাথ বলিল, "অগ্রে সন্ধান লও, ভূদেব চৌধুরী কি প্রকৃতির লোক। যদি সে দরিদ্রপোষক ও দেব ব্রাহ্মণ-ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেখানে যাওয়া হইবে না।"

বামনা বলিল,—"দেবল গ্রাম আমার জন্মস্থান; সেইখানে আমি জন্মিয়াছি। ভূদেব চৌধুরীর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তাহার মত দুঁদে দুর্দ্দান্ত লোক দুনিয়ায় নাই। প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ, গ্রামের গৃহস্থের বউ ঝির সর্ব্বনাশ সাধন তাহার নিত্যকাজ।"

ভূদেব চৌধুরীর প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া রাধানাথ জলিয়া উঠিল,—চৌধুরীর বাড়ী লুণ্ঠন করা সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু দুষ্ট বামনা রাধানাথের নিকট যে সকল কথা বলিল, তাহা সত্য নহে। ভূদেব চৌধুরীর অগাধ টাকাও ছিল না এবং প্রজাপীড়ন বা গৃহস্থের কুলকামিনী হরণ তাঁহার কাজের মধ্যে পরিগণিত ছিল না। প্রকৃত কথা এই,—চৌধুরী বাড়ীতে এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী ছিল; যুবতী ভূদেব চৌধুরীর কন্যা,—দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিধবা। বামনার পাপদৃষ্টি সেই সুন্দরীর উপর পতিত হয়। দুরাত্মার মনোগত অভিপ্রায় ছিল,—ঐ কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ করা। বহুদিন হইতে সে ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাই ডাকাতির সুযোগে সে তাহার চিরপ্রিয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

একদিন গভীররাত্রে চৌধুরী বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। দুম দাম কপাট ভাঙ্গার শব্দ উঠিল। মশালের আলোকে বাড়ী আলোকিত। ঘন ঘন বাক্স পেটরা ভাঙ্গা হইতেছিল মাঝে মাঝে কাতরকণ্ঠে চীৎকার উঠিতেছে,—

'বাপ্‌রে গেলাম রে!' দস্যুদল ক্ষিপ্র-হস্তে কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। এমন সময় দল হইতে সহসা একটা চীৎকার উঠিল,—'বাম্‌না! বাম্‌না কই!' অমনি চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল; জাল গুটাইবার সময় হইয়াছে; অথচ বাম্‌নাকে পাওয়া যাইতেছে না। হঠাৎ দলের একজন সিঁড়ির ঘরের দিকে গিয়া দেখিল,—কি সর্ব্বনাশ! এ যে নরকের দৃশ্য! স্তিমিত আলোক-ছায়ায় একি পিশাচের অভিনয়! এক অনিন্দ্য-সুন্দরী ষোড়শী যুবতী বামনা ডাকাতের কবলগত! বাম্‌না এই সতী-সাধ্বীর সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত; সিংহ-বিক্রমে-সন্ত্রস্তা কুরঙ্গীর ন্যায় সাধ্বী যুবতী এক এক বার এই দুর্দ্দান্ত পশুর গ্রাস হইতে পলাইবার প্রয়াস পাইতেছে,—পারিতেছে না; মাঝে মাঝে বন্ধনবিকল মুখে—যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে কেবল আর্ত্ত-স্বরে ডাকিতেছে,—'হা শঙ্করী! কি করিলে? হা শঙ্করী! রক্ষা কর? চকিতে একটা তীব্র জ্যোতি ঝকিয়া উঠিল, তীব্র তরবারি ঝলসিল;—পরক্ষণে বাম্‌না ডাকাতের কর্ত্তিত মুণ্ড ধরাতলে লুটিয়া পড়িল; রক্তের স্রোত ছুটিল! কম্পিতা সতী চক্ষু চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখে দস্যুসর্দ্দার রুদ্রমূর্ত্তি রাধানাথ!

রাধানাথের দৃঢ় আদেশ,—দলের কেহই যেন স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ না করে। ডাকাতিকালে আজ দলের একজন সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে দেখিয়া রাধানাথ জ্বলিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার দণ্ডবিধান করিল। কিন্তু এই ঘটনায় তাহার প্রাণে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল। রাধানাথ ভাবিল,—আমার দল হইতেই আজ সতী-সাধ্বী লাঞ্ছিতা হইলেন; এ পাপে আর কি আমার রক্ষা আছে? তখন গললগ্নীকৃতবাসে গদগদভাবে রাধানাথ জগদম্বাকে ডাকিতে লাগিল,—"মা! আমি তো এজন্য অপরাধী নই! আমি তো মা! কোন পাপে পাপী নই!" বলিতে বলিতে রাধানাথ কাঁদিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িল।

অতঃপর রাধানাথ লুণ্ঠিত সমস্ত ধন সম্পত্তি গৃহস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিল; শুধু ইহাই নহে, গৃহে গিয়া গৃহস্বামীর ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু অর্থও পাঠাইয়াছিল। এই ঘটনায় রাধানাথের নাম হুগলী জেলার গৃহে গৃহে ফিরিতে লাগিল; গ্রামের আশে পাশে ধ্বনি উঠিল,—'এমন দয়াল আর কোথাও দেখি নাই! রাধানাথ দ্বিতীয় রঘুনাথ!' (রঘো ডাকাত) ফলে ডাকাত রাধানাথেরও সুখ্যাতি-সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হইতে তাহাকে ধরিবার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা হইতে লাগিল। রাধানাথের নামে বিস্তর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল। রাধানাথও সতর্ক হইল; সে এখন ফাঁকে ফাঁকে—চোরাগোপ্তা ভাবে গ্রামে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। রাধানাথ ভাবিল, এ সকল অনর্থের হেতু সেই শ্রীনাথ। তাহার বাড়ীতে ডাকাতি করিতে হইবে। তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া আনিয়া জগদম্বার চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। যেমন কল্পনা,—অমনি কার্য্য। স্থির হইল,—আজ রাত্রে শ্রীনাথের বাড়ী ডাকাতি করিতে হইবে।

শ্রীনাথ পূর্ব্বেই ডাকাতির সংবাদ পাইয়াছিল। সে দিন থাকিতে পলাইয়াছে। বাড়ীতে কেবল শ্রীনাথের এক কুমারী কন্যা; আর এক বর্ষীয়সী রমণী। শ্রীনাথের অর্থলুণ্ঠন তো রাধানাথের উদ্দেশ্য নহে,—সে চাহে শ্রীনাথের কাটা মুণ্ড! কিন্তু শ্রীনাথ কই! দলের লোক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু শ্রীনাথকে কেহই দেখিতে পাইল না। রাধানাথও জয় কালী রবে হুঙ্কার দিতে দিতে উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া, শ্রীনাথকে পাতি পাতি খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাইল না; খুঁজিতে খুঁজিতে রাধানাথ সহসা দেখিতে পাইল,—এক কুমারী কন্যা তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা। এ কন্যা শ্রীনাথের। রাধানাথ অমনি হাতের তরবারি ভূমিতলে ফেলিয়া দিল—ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কুমারীকে প্রণাম করিল। তাহার পর দুই হাত পাসরিয়া কুমারীকে কোলে লইয়া তাহাকে প্রাণভরা পুলকে সোহাগ করিতে লাগিল। কুমারী যে মাতৃমূর্ত্তি;—আর জগদম্বাই যে রাধানাথের মা! হউক এ কুমারী তাহার চিরশত্রু শ্রীনাথের কন্যা;—কিন্তু রাধানাথ যে তখন পার্থিব সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে রাধানাথ কুমারীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! বলিতে পারো, তোমার বাপ কোথায় গিয়াছেন?" কুমারী বলিল,—আমাদের বাড়ীতে আজ ডাকাত পড়িবে শুনিয়া, বাবা সন্ধ্যার আগেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে।" রাধানাথ বুঝিল, তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। তখন রাধানাথ কুমারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জয়কালী রবে শ্রীনাথের বাটী হইতে চলিয়া গেল।

এইবার রাধানাথ ধীরে ধীরে অবিদ্যার মোহে পড়িল। এ অবিদ্যা রাধানাথের গ্রামেই থাকিত। রাধানাথ এখন প্রায়ই তাহার বাড়ী গিয়া শুইত,—বসিত। পুলিশ জানিতে পারিল, রাধানাথ এখন এই বেশ্যার ঘরেই

অধিকক্ষণ থাকে। একবার পুলিস দলবল লইয়া, বেশ্যা-বাড়ী ঘেরাও করিল, কিন্তু রাধানাথকে ধরিতে পারিল না। রাধানাথ যখন শুনিল, পুলিস তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে, অমনি সে জয়কালী রবে হুঙ্কার দিয়া একটি প্রকাণ্ড বংশদণ্ড লইয়া পুলিসবাহিনীর মধ্যস্থলে পতিত হইল,—সিংহ বিক্রমে অনেককে জখম করিয়া একলাফে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। তখন পুলিস স্থির করিল,—এ বেশ্যাকে হাত করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। অনেক কষ্টে—অনেক প্রলোভনে তাহারা বেশ্যাকে বশ করিল। একদিন রাধানাথ যেমন বেশ্যার ঘরে আসিল,—বেশ্যা অমনি পুলিসে সে সংবাদ দিল। পুলিস এবার বিরাট আয়োজন করিয়া বেশ্যার বাড়ী ঘিরিল; বাড়ীর উঠানে সরিষা ছড়াইয়া দিল। বেশ্যা কিন্তু খানিক পরে নিজেই রাধানাথকে এ সংবাদ জানাইল। রাধানাথ যেমন পলাইতে যাইবে,—অমনি উঠানে সেই ছড়ানো সরিষায় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। পুলিস তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, সদরে চালান দিল। বিচারে রাধানাথের ফাঁসির হুকুম হইল। রাধানাথ কিন্তু আজ বড়ই প্রফুল্ল; রাধানাথের মুখে এখন মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠিতেছে,—"বল জয় কালী!—বল, জয় কালী!"

রাধানাথের ফাঁসির দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নির্দ্দিষ্টদিনে রাধানাথ মশানে নীত হইয়াছে। রাধানাথকে দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে বিস্তর লোক আসিয়া জমিয়াছে। আজ রাধানাথের ফাঁসি। এই ভীষণ মশানে—এই অন্তিম সময়ে রাধানাথের মুখে হাসি ধরিতেছে না। রাধানাথের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব তাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইতে আসিয়াছে তাহার সেই বেশ্যাও আসিয়াছে; সে এখন পাগলিনী;—পুলিসপ্রহরী কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা। রাধানাথ একবার অপাঙ্গ-ভঙ্গে সেই বেশ্যার দিকে চাহিল,—দেখিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর একদিকে রাধানাথের দৃষ্টি পড়িল,—রাধানাথ দেখিল—শ্রীনাথ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাধানাথ শ্রীনাথের দিকে চাহিয়া করপুটে বলিল,—ভাই! চলিলাম, আমার পাপের নিবৃত্তি হইল, তুমি ভালই করিয়াছ; কিন্তু শ্রীনাথ! তুমিই তো এ পাপের মূল!" তাহার পর রাধানাথ জল্লাদকে বলিল,—"একটু দাঁড়া ভাই, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া জয়কালী নাম ডাকিয়া লই। জয় মাতৃ-গঙ্গে! জয় মা কালী! ভাইসব! বলো—প্রাণভরিয়া সকলে বলো—জয় মা কালী!" অমনি সেই অগণ্য লোকারণ্য হইতে ধ্বনি উঠিল,—"জয় মা কালী

বলো!—জয় মা কালী বলো!" শব্দে বায়ু স্তম্ভিত হইল,—মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল,—রাধানাথের শবদেহ ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল। যেন ইন্দ্রজালে কি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়া গেল।—হুগলীতেই রাধানাথের বিচার এবং ফাঁসি হইয়াছিল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবনের পর-পার।

পঞ্চম প্রস্তাব।

(পরিশিষ্ট)

"Eor this is not a matter of to day
Or yesterday but hath been from all time:
And now can tell us whence if come or how."

SOPHOCLES.

এই পরিচ্ছেদে, আমরা কতিপয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভূতের পরিচয় প্রদান করিব। এতদিন গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি মধ্যে মধ্যে চাটনি ভাল, ইহাতে জ্ঞানলাভ যত না হৌক—প্রচুর আনন্দলাভ হইবে। আনন্দে যাঁহাদের অরুচি নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বসিয়া যান, আমি পরিবেশন সুরু করিলাম।

"ফ্লাইং ডাচম্যান" নামক ভূতের জাহাজখানির নাম অনেকেই অবগত আছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক কাপটেন মারিয়াট এই বিষয় অবলম্বন করিয়া একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছেন। এই জাহাজখানি অনেকেই দেখিয়াছেন এবং তন্মধ্যে আমাদের ভাবী সম্রাট এবং বর্ত্তমান প্রিন্স অফ-ওয়েলসের নামই উল্লেখযোগ্য। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের ১১ই জুলাই প্রাতঃকালে চারিটার সময়ে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ও তাঁহার সহযাত্রীবর্গ দেখিতে পান,—দূরে সাগর-গর্ভ আলোড়িত এবং বিক্ষোভিত করিয়া 'ফ্লাইং ডাচম্যান' বহিয়া যাইতেছে। একরূপ অনৈসর্গিক রক্তালোক-জ্যোতিঃ তাহার অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

এই অমঙ্গলকর দৃশ্য দর্শনে জাহাজস্থ সকলেই ভয়চকিত হইয়া উঠিলেন। কারণ, ঐ ভূতের জাহাজ খানি যে জাহাজের নিকটস্থ হইয়াছে তাহারই যে কোন প্রকার একটা অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই 'ফ্লাইং ডাচম্যান' অদৃশ্য হইয়া যাইবার ছয়ঘণ্টা পরেই প্রিন্স অফ ওয়েলসের জাহাজের একজন নাবিক এক উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই নাবিকই সর্ব্বপ্রথমে 'ফ্লাইং ডাচম্যান'কে দেখিতে পাইয়াছিল!

করনেলিয়াশ ভেণ্ডারডেকেন একজন কাপ্তেন ছিলেন। তিনি আপনার জাহাজ লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ব্যাটেভিয়াতে আসিতে-ছিলেন। হঠাৎ ঝটিকাতাড়িত হইয়া তিনি আপনার জাহাজ লইয়া নয় সপ্তাহ দিক্‌হারাবৎ উর্ম্মি-সঙ্কুল সাগরে ভাসমান থাকেন। বহু চেষ্টা করিয়াও, ভেণ্ডারডেকেন যখন আপনার জাহাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেন না, তখন নিরাশায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তিনি জাহাজের ডেকের উপরে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং পরমাত্মাকে অভিশাপপূর্ব্বক, স্বর্গ ও নরকের নাম লইয়া শপথ করিলেন, "আমি উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিবই—এজন্য যদি আমাকে জগতের শেষ দিন পর্য্যন্তও চেষ্টা করিতে হয়,—তবে তাহাও করিব।"

বিধনিয়ামকের অভিশাপে, সেইদিন হইতে তিনি ও তাঁহার নাবিকবর্গ জাহাজ লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন।

কেরীর (Kerry) সৈকত ভূমি হইতে আরও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একদিন প্রভাতে সাগরতটচারীগণ দেখিতে পাইলেন, তট হইতে কিছুদূরে—সাগরগর্ভে একখানা বৃহৎ ও জনশূন্য মাস্তলহীন অর্ণবযান নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অনেকে নৌকারোহণপূর্ব্বক সেই ভগ্নপ্রায় জাহাজের নিকটস্থ হইল। এবং পুলকিতনেত্রে দেখিল, জাহাজের মধ্যে স্বর্ণাদি নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে আগ্রহে সেই সকল সংগ্রহ করিয়া নৌকা সাহায্যে তটাভিমুখে আসিতে লাগিল। সহসা কোথা হইতে এক বর্দ্ধমান উচ্চতরঙ্গ গর্জ্জিয়া উঠিল এবং তট হইতে অপেক্ষাকারীগণ অশ্রুস্তিমিতনেত্রে দর্শন করিল, সেই ভীষণ তরঙ্গগর্ভে এক নিমেষমধ্যে তাহাদের ভ্রাতা, বন্ধু, পিতা ও স্বামীগণ নৌকাসমেত অদৃশ্য হইয়া গেল! তাহার পর হইতে প্রতিবৎসরের এক নির্দ্ধারিত দিবসে, ঐ একই শোচনীয় বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় হয়।

প্যালেটাইনের "নব স্বর্গ" (New Haven) নামক একখানি অর্ণবযান ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে নির্ম্মিত হয়, এবং সাগরোদ্দেশে যাত্রা করে। পরবর্ত্তী জানুয়ারীমাসে ভীষণ ঝটিকা-তাড়নে জাহাজখানি ডুবিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, যখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল—তখন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অনেকে দেখিতে পাইল, উক্ত জাহাজখানি একটী নদীর মুখে শরাসনমুক্ত তীরের মত উত্তর পার্শ্বে জল কাটিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। ক্ষণপরেই জাহাজখানি অগাধজলের ভিতরে নামিয়া গেল।

কবিবর লংফেলো এই ভূতের জাহাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

> "And the wasts with all their rigging
> Eell slowly one by one ;
> And the hull dilofed and banished
> As a sea-wist in the sun."

সেণ্ট লরেন্স হ্রদে, অদ্যাপি একখানি ভৌতিক অর্ণবযান দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসীগণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরী অ্যান (Queen Afine) অনেকগুলি জাহাজ প্রেরণ করেন। জাহাজগুলি যখন গাসপি উপসাগরে গিয়া পৌঁছিল—তখন হঠাৎ ঝটিকাবর্ত্তে পতিত হইয়া জাহাজগুলি এক একখানি করিয়া তটদেশে প্রবলভাবে নিক্ষিপ্ত এবং চূর্ণিত হইয়া গেল।

পতাকাবাহী জাহাজখানা আরও কিছুদূরে গিয়া ধ্বংস হইয়া যায়। আজও প্রতিবৎসরে পৌনঃপৌনিক ভাবে এই দৃশ্য অভিনীত হয়। দেখা যায়, পতাকাবাহী জাহাজখানা জলের উপরে ভাসিতেছে—তাহার ডেক সৈন্য-মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। এবং তাহার পুরাণো খাঁজের আলোকাধার হইতে উজ্জ্বল আলোক দীপ্তি আসিতেছে। একদিকে একজন লোহিত বস্ত্রধারী সেনানায়ক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার এক হস্ত তীরের দিকে প্রসারিত এবং অপর হস্ত একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর কটি-বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ ধপ্ করিয়া জাহাজের আলো নিবিয়া যায় জাহাজখানা ভয়ানক দুলিয়া কাৎ হইয়া পড়ে—তাহার পশ্চাদ্ভাগ উপরে উত্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক বহুকণ্ঠোচ্চারিত হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ বায়ুস্তর বিকম্পিত করিয়া তুলে এবং জাহাজখানা হেলিয়া অন্তস্বসাগত সাগর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

রত্নাকর চিরকালই যেমন রহস্য-নিবাস, তাহার সর্ব্বত্রই তেমনি নানাবিধ অলৌকিক লীলাভিনয়। সাগরে অনেক কৃপালু প্রেতাত্মার দর্শনলাভ করা গিয়াছে। H, M, S, সোসাইটীর কাপটেন রগার্সের সম্মুখে একবার এইরূপ একটী সলিল-সমাধি মৃত-প্রেতাত্মার অপূর্ব্ব আবির্ভাব হইয়াছিল। রজনীকালে এই প্রেতাত্মা দর্শন দিয়াছিল। তাহার কথামত কার্য্য করিয়া কাপ্তেন অতল সাগর গর্ভেও সাতফাতমমাত্র জল দেখিতে পাইলেন এবং প্রাতঃকালে দেখিলেন—তিনি একশত মাইল দূর হইতে একেবারে ভারজিনীয়াতে আসিয়া পড়িয়াছেন।

লিম রেজিসে আর একটী রমণীর প্রেতাত্মা দেখিতে পাওয়া যায়। হতভাগিনীর পুত্রের সাগরে মৃত্যু হইয়াছিল। অশান্তি-দিগ্ধ জীবনাবসানের পরেও ঐ রমণী সাগরোপকূলে কালকালান্তর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতপুত্রের দেহান্বেষণের জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। বহুব্যক্তি ঐ রমণীকে বহুবার দর্শন করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি সাহসপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে—সেই দেখিয়াছে—যে স্থান দিয়া ঐ রমণীর আত্মা চলিয়া যায়, সেই স্থানে মুদ্রা পড়িয়া থাকে।

আমরা এখারে অনেকগুলি ভৌতিক কাহিনীর উল্লেখ করিলাম। এই সকল ঘটনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এবং বহুবার পরীক্ষিত। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। এইবার জনকত প্রসিদ্ধ চিত্রকরের অঙ্কিত "ভূতের ছবি" বর্ণনা করিব।

P, Delonce নামধেয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর সাধু ডেনিসের প্রেতাত্মার চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। গিরিবিরাজিতা নদী-সরসা ভূমি। একদিকে একটী বাঁধ। অপর দিকে নিম্নভূমি। মধ্যে সংকীর্ণ পথ। নিম্নভূমিতে কৃষকগণ কাজ করিতেছিল। হঠাৎ তাহারা দেখিতে পাইল,—একটী পুরোহিতের বস্ত্রধারী লোক পথ দিয়া আসিতেছেন। মূর্ত্তির মস্তক গলদেশে নাই—মুখটী দিব্য আরামে বাহুগুলির উপরে বসিয়া আরাম করিতেছে। ইহাই সাধু ডেনিসের প্রেতাত্মা।

উইলিয়াম হগার্থ "Lovet's Ghost on Pilgrimage" নামধেয় আর এক খানি অদ্ভুত ছবি আঁকিয়াছেন। মূর্ত্তিটী তীর্থ যাত্রীর বেশে শোভিত। গলদেশে মালা—কটিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রুশ—অনাবৃত পদ এবং দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ যষ্টি। স্কন্ধের উপরে কেবল জামার কলার দেখা যাইতেছে। মাথাটী

দেখিতে চাও যদি বাম হাতের দিকে চাহিয়া দেখ! সেখানে মাথাটী বসিয়া আছে। শুধু বসিয়া নাই,—আবার বদনে তাহার কেমন সুন্দর হাসি দেখ!

C, Schwenlnger—"The phantom of Anna the Faithless" একখানি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন।

একদিকে সরল-গিরিপৃষ্ঠ শূন্যে উদ্ধতভাবে দণ্ডায়মান। এবং তাহার চরণ প্রক্ষালনপূর্ব্বক বিপুল বারিধি-তরঙ্গ ফেনিলোচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতেছে। দূর তটান্ত-রেখার উপরে নীল-অম্বর চুম্বনেচ্ছায় অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আকাশের বুকে মেঘের খেলা। সাগরের সেই তরঙ্গ-সমাকুল বক্ষে একব্যক্তি একখানি নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল,—হঠাৎ সম্মুখস্থ সাগরোর্ম্মি উন্নত হইল—তাহার শীর্ষে ভগবানে বিশ্বাসহীনা আনার অভিশপ্ত প্রেতাত্মার শুভ্রধবল-মূর্ত্তি দুই হাত শূন্যে প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান!

পি, ডি, লেগুন, "The vision of Lagoon" নামক চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। একটী জেলে নৌকা বাহিয়া শান্ত-সুস্থ-চিত্তে ধীরে ধীরে তাহার কুটীর-শোভিত জল মঞ্চের নিকটে আসিল এবং ভয়চকিত-দৃষ্টিতে দেখিল,—আপাদশির-প্রসারী-শুভ্র বসন-বিমণ্ডিত হইয়া একটী অভভ্র ভূত দিব্য সপ্রতিভভাবে তাহারই সলিলভবনের সোপানাবলম্বনে নামিয়া আসিতেছে।

আরও অনেক ভূতের ছবি আছে। ফ্রান্সে একটী ভূতের প্রতিমূর্ত্তি (STATUE OF GHOST) আছে। কিন্তু সে সকলের সবিশেষ বর্ণনার আর স্থান নাই। তাহার আবশ্যকও নাই। কারণ যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন, ভৌতিক ঘটনাবলী ইউরোপীয়গণের হৃদয়ে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মেরী করেলী, রাইজার, হ্যাগার্ড, কাপ্তেন মারিয়াট এবং রেণল্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক গণের বহু পুস্তকই আত্মিক কাহিনী-প্রধান। পরন্তু ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সাধারণের আগ্রহও খুব।

জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার পরলোককে "অনাবিষ্কৃত প্রদেশ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরলোক অদ্যাপি "অনাবিষ্কৃত";—তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তাহা 'অজানিত' নয়, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

প্রমাণ দুই প্রকার। চাক্ষুষ ও বাচনিক। পরলোক সম্বন্ধে জাগতিক ধারণা চাক্ষুষ নয়, কিন্তু বাচনিক বটে। যেখানে চাক্ষুষ প্রমাণ অসম্ভব,—সেখানে বাচনিক প্রমাণেই সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য। এবং ইহাও

এব যে আনুমানিক প্রমাণে ভ্রম অনিবার্য্য কিন্তু বাচনিক প্রমাণে ভ্রম তত সুলভ নয়।

তথাচ, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এত ভ্রম-গর্ভ মত মানব সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আলোচকের বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও সকল সময়ে তাহা নিষ্কাশিত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

একে পরলোক গাঢ় কুহেলিকায় অন্ধতমসাচ্ছন্ন বলিয়া নরকল্পনায় তাহা রহস্য নিবাসবৎ প্রতীয়মান হয়। সেই অন্ধকারপুঞ্জ ভেদ করিয়া অম্লান ভানু-বিভা-দর্শন-সৌভাগ্য কদাচিত ঘটিয়া গেলে, তাহা পরম ভাগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেই রবিকরদীপ্তি কত ক্ষণিক! পরন্তু সেই ক্ষণিক সুযোগও সাধারণ মানবের পক্ষে কত দুর্লভ! অতএব প্রতিপদক্ষেপেই ভ্রম আত্ম-প্রকাশ করে। তাই সন্দিগ্ধচরিত্র নরের অন্তরে দ্বিধার অন্ত হয় না।

অনেকে বলেন, প্রেত হইতে জীবিত মানবের কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। কারণ তাহারা অশরীরী; সুতরাং শরীরী মানুষের উপরে তাহারা আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়,—এই উক্তি সত্যের ছায়া মাড়াইয়া যায় নাই।

"গ্রে কলম্বিয়ায় কোন সিগারেট কোম্পানীর অফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার সাপ্তাহিক আয় অতি সামান্য ছিল চোদ্দসিলিং সাত পেন্স মাত্র। এই সামান্য আয়ে কোন প্রকারে গ্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

একদিন প্রভাতে ইউনাইটেডষ্টেট হইতে হঠাৎ একখানি পত্র গ্রের হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া সে আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল। পত্রে লিখিত ছিল, তাহার এক সম্পত্তিসম্পন্ন অপুত্রক খুল্লতাত মৃত্যু শয্যায়। গ্রে অবিলম্বে যেন তাহার নিকটে যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি উইল করিয়া তাহার সমুদয় বিষয় গ্রেকে দান করিয়া যাইবেন। বলা বাহুল্য, পত্র প্রাপ্তিমাত্র গ্রে কলম্বিয়া হইতে যাত্রা করিয়া তাহার খুল্লতাতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু অবিলম্বেই তাহার 'হরিষ' 'বিষাদে' পরিণত হইল। গ্রে গিয়া দেখিল তাহার খুল্লতাত আবার ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার আর প্রাণের ভয় নাই। শরতের শুচিশুভ্র গগনে তরল মেঘের প্রাসাদের মত গ্রের অন্তরের সকল সুখ স্বপ্ন এক লহমায় বিলয় প্রাপ্ত হইল। কিন্তু নিরাশ-তাড়িত হইয়া হতভাগ্য গ্রে একেবারে হিতাহিতজ্ঞানকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে

সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। ভগবানের উপরে অভিশাপ করিল এবং সয়তানের অশুভজ্ঞাপনায় মত্ত হইল।

তাহার খুল্লতাতের শয্যাপার্শ্বে ত্রিপায়ার উপরে দুইটী শিশি ছিল। তাহার একটী সেবনের জন্য এবং অপরটী লেপনের নিমিত্ত। শেষোক্ত শিশির উপরে বিষ লেখা ছিল। শরীর একটু সুস্থ ছিল বলিয়া, গ্রের খুল্লতাত আপনিই ঔষধ সেবন করিতেন। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, গ্রের খুল্লতাতের জীবনহীন দেহ শয্যার উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গেল, তিনি ভ্রমক্রমে লেপনের বিষাক্ত ঔষধটী পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

গ্রের খুল্লতাতের অপর কোন উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ছিলেন না। সুতরাং আইনতঃ গ্রেই সেই বিপুল সম্পত্তির ভোগ-স্বত্ব-লাভ করিল।

তিনমাস নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। গ্রে এখন একজন বিপুল বিত্তবান মান্যগণ্য বক্তি। তাহার অমায়িক ব্যবহারে প্রতিবাসীগণ সকলেই সন্তুষ্ট।

তিনমাস অতিবাহিত হইয়া গেলে, সহসা গ্রের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। গ্রে আর প্রতিবেশী সমাজে মিশিত না। সে সদাই অন্যমনস্ক থাকিত এবং বাড়ীতে যখন একাকী বসিয়া থাকিত, তখন আপন মনে অনতিউচ্চস্বরে কত কথা বলিত। ক্রমে গ্রের মানসিক অবস্থা শোচনীয়তর হইয়া উঠিল। গভীর রজনীতে নিদ্রোত্থিত প্রতিবাসীবর্গ সবিস্ময়ে শুনিত, গ্রে কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে। সে আর্ত্তনাদের মর্ম্ম এইরূপ, "কাকা! কাকা! আমাকে ক্ষমা কর! আমাকে ক্ষমা কর! অর্থলোভে আমি তোমাকে হত্যা করিয়াছিলাম—এখন তাহার শাস্তি পাইতেছি! কিন্তু আর না—যথেষ্ট হইয়াছে আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না—ছাড়িয়া দাও—ছাড়িয়া দাও!, ইত্যাদি!"

অবিলম্বে এই সকল কথা পুলিশের কর্ণগোচর হইল। ফলে, গ্রেকে হাজতে যাইতে হইল। কিন্তু জগতে অর্থের পরিমাণে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। অর্থই এখানে তুলাদণ্ড। অর্থবলে গ্রে পুলিশের বজ্র কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। মুক্তিলাভ করিয়া, গ্রে আর সেখানে থাকিতে পারিল না। আবাস-বাটিকা অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া ফেলিল এবং ইংলণ্ডে গমন করিয়া, তথায় অবশিষ্ট জীবনটা শান্তিতে অতিবাহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু তাহার মনের বাসনা মনেই রহিয়া গেল। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব্বদিন অকস্মাৎ রাত্রিতে সে শয়নকক্ষ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"রক্ষা কর!

রক্ষা কর! ভূতে আমাকে মারিয়া ফেলিল!" দাস দাসীরা ছুটিয়া আসিয়া দেখে, শয়নকক্ষের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। অবিলম্বে দ্বার বল-প্রয়োগে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলে ভয় স্তম্ভিত নেত্রে দর্শন করিল,—বিকৃত মুখে গ্রে শয্যাতলে পড়িয়া রহিয়াছে। দেহে হাত দিয়া দেখা গেল, হতভাগ্যের পাপ-কলুষিত আত্মা দেহ-কারা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তবায়ুতে বিলীন হইয়াছে।" (১)

এই ঘটনাটী পাঠ করিলে, কে বলিবে, যে প্রেতাত্মা কর্তৃক মানবের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয় না?

তবে, ইচ্ছাশক্তি বলিয়া যে একটা প্রবলশক্তি সর্ব্বদা পরের মনে কার্য্য করিতেছে, তাহার সাহায্যে দুষ্টাত্মাকে আপনার নিকট হইতে অনায়াসে দূরে রাখা যায়। কিন্তু, এই যে ইচ্ছাশক্তি,—ইহা মানবমাত্রেরই উপরে সমভাবে আপনার কার্য্য করিতে পারে না। অনেক মানুষ আছে,—যাহারা একান্ত দুর্ব্বলচরিত্র-সম্পন্ন এবং তাহাদের হৃদয়ে ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কিছুই নাই। পবনতাড়নে সপল্লববৃক্ষ যেমন একান্ত নিঃসহায়ের মত আন্দোলিত হয়,—ঐ সকল মানুষ অবস্থাস্রোতের মুখে তেমনি নির্ব্বিচারে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। অবস্থাস্রোতকে যে বিভিন্নমুখে প্রবাহিত করিবে,—সে চেষ্টা তাহাদের নাই,—অথবা তেমন ইচ্ছাশক্তিরও তাহাদের মধ্যে একান্ত অভাব। ইচ্ছা না থাকিলে চেষ্টা কোথা হইতে আসিবে এবং চেষ্টা না থাকিলে কার্য্যের ফল কিরূপে হইবে।

এই ইচ্ছাশক্তির নামান্তর হইতেছে, যোগ। যোগবলের নিকটে দুষ্টাত্মা সর্ব্বদা পরাস্ত।

"আমি ভূতকে ভয় করি না" এইরূপ উক্তি অনেকের মুখেই শ্রবণ করা যায় এবং অধিকাংশস্থলেই তাহা সত্যগোপনের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু যদি এই উক্তি সত্য হয় তাহা হইলে বাস্তবিকই প্রেতাত্মা হইতে তাহার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কারণ,—"আমি ভয় করি না, ভূত দেখিলেও করিব না"—এই যে প্রবল ইচ্ছা ইহাই তাহাকে প্রেতের কবল হইতে সর্ব্বদা মুক্ত রাখে।

মিডিয়াম সাহায্যে প্রেত নামাইয়া, তাহাদেরই মুখে শুনা গিয়াছে, যে দুর্ব্বলচরিত্রের মানুষের উপরেই তাহারা আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করিতে

(১) After Death. By. J. Hume. P. P. 43.

সক্ষম হয়। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ইচ্ছাশক্তিটা বিলক্ষণ রূপেই বর্ত্তমান আছে তাহারা শত চেষ্টা করিয়া তাহাদের উপরে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু আপনারাই বিতাড়িত হইয়াছে।

আমরা 'জীবনের পরপার' সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। অবশ্য এতটুকু অনতিদীর্ঘ সন্দর্ভে এই গুরুতর বিষয় লইয়া বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় এবং ইহাই যথেষ্ট নয়। তথাপি লেখকের শক্তি বিস্তার পরিমাণে এই সামান্য আলোচনাই তাহার পক্ষে 'গুরু-পাক' হইয়াছে। অতএব এইখানেই ইতির আয়োজন করা গেল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ।

কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মিত্র এম, এ, বি, এল মহোদয় বিবিধ প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্ম সমূহের সম্মিলনার্থ মহানগরী কলিকাতাস্থ টাউনহলের সুবৃহৎপ্রাসাদোপরি আর্য্যভূমির সর্ব্বস্থান হইতে সুধীমণ্ডলী আহ্বান পূর্ব্বক একত্র সমাবেশ করিয়া এক অভিনব, অভূতপূর্ব্ব অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই ধর্ম্মসভাটী ভারতে বর্ত্তমান যুগের প্রথম সভা। এই ধর্ম্ম সম্মিলনীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধর্ম্মের সার মর্ম্মের মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। দম্ভ অহঙ্কারাদি অজ্ঞতা সম্ভূত ভ্রম জ্ঞান প্রযুক্ত পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদই এই ভেদ জ্ঞানের মূল। জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডস্থ সজীব ও নির্জ্জীব যাবতীয় পদার্থই সেই একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সর্ব্বব্যাপী অনন্তদেব ভগবান হইতে সমুদ্ভূত। প্রায় ষোড়শবর্ষ পূর্ব্বে চিকাগো সহরে যে বিরাট ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জগতের প্রায় সকল ধর্ম্মের লোকে উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকাবাসীগণও স্বীকার করেন যে, সেই বিরাট ধর্ম্মসভা তাঁহাদের স্বীয় মৌলিক চিন্তার ফল নহে উহা এই ভারতের। ভগবান বুদ্ধদেবের দেহান্তর প্রাপ্তির পর রাজা অজাত শত্রু প্রথমে এক বিরাট ধর্ম্মসভা করেন। তখন এই ভারতেই বহুবিধ মতের প্রচলন ছিল। বস্তুতঃ ভারতে যখন "ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি" প্রকৃত পক্ষে ঠিক এই ভাবটী আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই মানব সমাজে শ্রীভগবান আবির্ভাব হন।

বিগত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা প্রদেশে চিকাগোতে যে ধর্ম্মসঙ্ঘ হইয়াছিল, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার এবং হিদেন পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ। কিন্তু নারায়ণের উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ; সেই সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মজ্ঞগণের যে বিরাট সভায় সমাবেশ, ধর্ম্মবীর মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ সেই ধর্ম্ম সভার মধ্যে অতি সামান্য ভাবে প্রবেশাধিকার পাইয়াই বজ্রনিনাদে সর্ব্বধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিলেন, ভারতের চির গৌরব জ্যোতির উপর যে কাল কুজ্ঝটিকা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বেদান্তের জয় ঘোষণায় তীব্র বাত্যাঘাতে বিদুরিত হইল। ভারতের গৌরবজ্যোতি পুনরুদ্দীপিত হইল; তিনি বলিলেন,—"এই বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘের উদ্দেশ্য সকল ধর্ম্মের বিনাশ নহে, পুনঃ প্রতিষ্ঠা।"

কলিকাতার বিগত ধর্ম্মসভার উদ্দেশ্যও তাই। ঐতিহাসিকের পক্ষে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর ঠাকুর গৃহ। সেই ঠাকুর ঘরে বসিয়া সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ধ্যান পরায়ণ হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মের উপলব্ধি করিবার যত্ন করিতেছেন, ভগবৎসাক্ষাৎকারের চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের সুদুর প্রান্ত হইতে হিন্দুর রামাচারী, বল্লভাচারী, নিম্বার্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বৈষ্ণব, নানাবিধ শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য আদি সম্প্রদায়ের এবং খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় পার্শী ও য়িহুদী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের বিজ্ঞগণ উক্ত বিরাট ধর্ম্ম সভায় সমবেত হইয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে, এই সকল ধর্ম্ম সভার উদ্দেশ্য মনুষ্যকুলে একেশ্বরবাদ এবং এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমরা এ কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সকল ধর্ম্মই ত সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি একই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে—সেই এক ঈশ্বরকে চাহিতেছে, তবে সকলের জন্য এরূপ একটী এক ঘেয়ে ধর্ম্মের প্রয়োজন কি—তাহা আমরা কিছু বুঝি না। একটী উদ্যানে যদি একই প্রকার পুষ্পের বৃক্ষ থাকে তাহার শোভা সৌন্দর্য্য অধিক না একটী বিরাট উদ্যানে নানাবিধ গাছ বিবিধ প্রকার ফুল, ফল, লতা, গুল্ম, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, উপত্যকা,—তাহার শোভা বেশী? তাই বলিতেছি, সেই বহুত্বে একত্ব দেখা একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর কাজ, অন্যে কি বুঝিবে? যতক্ষণ প্রকৃতি ততক্ষণ বৈচিত্র্য আর বহুত্ব। আর যখনই একত্ব তখনই সৃষ্টিনাশ। সৃষ্টিনাশ কখনও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না*। তবে যিনি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই অনাদি একত্বের প্রত্যক্ষ

* ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ।

করেন, তাঁহারই জীবনোদ্দেশ্য সার্থক এবং তিনিই প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সক্ষম, আর তাঁহাকেই আমরা চিরকাল ঋষি কবি বা মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া আসিতেছি।

অতএব বৈচিত্র্য যখন অনিবার্য্য তখন ঈশ্বরোপলব্ধির উপায়ও বিভিন্ন চিরকাল থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

ভারতের ইতিহাস বলিতেছেন পৃথিবীর যে কোন দেশের যখনই ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে,—ধার্ম্মিকগণের উপর অত্যাচার হইতে দেখা গিয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই নিপীড়িত ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মক্ষেত্র এই ভারত ভূমিতেই আগমন পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে সেই অনাদি অনন্ত সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম আবহমান কাল হইতে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জন্যই এই অনাদি ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি। সকল ধর্ম্মের পশ্চাতে এই মহাকারণ স্বরূপ বৈদিক ধর্ম্ম একমাত্র ভারতেই বর্ত্তমান তাই আজও ভারত ধর্ম্ম চিন্তার স্বাধীন ক্ষেত্র। সেইজন্যই আমাদের এইখানে অপূর্ব্ব ও অসীম স্বাধীনতা। শ্রীভগবান এই স্বাধীনতা লাভের জন্যই ধর্ম্মস্বাধীনতা এবং স্বধর্ম্মপ্রিয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এই পবিত্র ভূমিতে আনয়ন করিয়া ফেলেন। সর্ব্বধর্ম্মের জননী ভারতমাতা উঁহাদিগকে নিজ বক্ষে লইয়া স্তন্য পান করাইয়া সজীব রাখিয়াছেন। তাই আমাদের শ্রুতি শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে যে, সকল ধর্ম্মই সত্য, কোন ধর্ম্ম মিথ্যা নহে। সকল পণ্ডিতেরা ঋগ বেদের যে মণ্ডলকে একবাক্যে সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া মনে করেন, সেই প্রথম মণ্ডলেই আছে,—"একম্ সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" * তিনি এক হইলেও তাঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। অতএব ধর্ম্ম বহুবিধ এই বিকাশ যতদিন,—এই চরাচর বিশ্বও ততদিন বিরাজমান থাকিবে।

কলিকাতায় এই বিরাট ধর্ম্ম সভায় কোন ধর্ম্মপিপাসু মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান ধর্ম্মসঙ্ঘের উদ্যোগের প্রায় ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা বুদ্ধদেব পাটলিপুত্র নগরে আধুনিক পাটনা সহরে তৎকালীন ঐ স্থানীয় রাজশক্তির দ্বারা এই ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রথম সূত্রপাত করেন। কিন্তু আমরা ইহার বহুশত বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতে পারি তৎকালে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ঋষিদের এরূপ সম্মিলনী, সভা ও সমিতির নিদর্শন অনেক হইয়া গিয়াছে; কারণ আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই বিদেহাধিপতি রাজর্ষিজনক

* ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত, ৪৬ ঋক্। লেখক।

একটা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে বহু বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজসভায় একত্র করেন; এবং এক সহস্র গাভী সংগ্রহকরিয়া প্রত্যেকের শৃঙ্গে দশটী করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা বাঁধিয়া সেই ঋষি সভায় বলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তিনি সুবর্ণ মুদ্রা সহ এই গোধন গ্রহণ করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কোনও তপস্বীকে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে না দেখিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্বীয় শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! এই গাভীগুলি তোমরা আমার আশ্রমে লইয়া যাও।" এই কথা শ্রবণ মাত্র ঋষিগণের মধ্যে একটা বড়ই অশান্তি উপস্থিত হইল—তাঁহাদের ভিতরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তাহার প্রমাণ দিতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ প্রমাণ পাইয়াই ঋষিগণ সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। কিন্তু অস্মদ্দেশে অধুনাতন এরূপ ঘটনাস্থলে শেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চরম না হইয়া কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। জনকের সভায় তৎকালে তাহার কোনও লক্ষণ নয়নগোচর হয় নাই। এই ঘটনা উপলক্ষে যে সমস্ত কথার আলোচনা হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ হয় এবং অদ্যাপি তাহা ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মচিন্তার শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত। এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান ঋষিদিগের সম্মিলনী সভা-সমিতির নিদর্শন অনেক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সময়ের তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় তাহা অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া, একেবারে নিমীলিত হইয়া যায়। এক্ষণে এই জগতের সেই তমসাচ্ছন্ন অবস্থা অন্তর্হিত হওয়ায় পুনরায় তাহার অঙ্কুর প্রকাশ পাইতেছে। এই সময়ে উপযুক্ত অঙ্কুর আর তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন যদি সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান ভারতে প্রতি বৎসর এইরূপ বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে ধর্ম্মসাধনা, ধর্ম্মবিজ্ঞান, রীতিনীতি তাহার সামঞ্জস্য, তাহার ইতিহাস এবং ধর্ম্মজীবনে তাহার সার্থকতা ও আবশ্যকতা হইয়া আলোচনা হয়,—তাহা হইলে ধর্ম্মক্ষেত্রে বিজ্ঞান কমল মুকুলিত হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা। *

বিগত চৈত্র মাসে ভারতধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন কালে সভাপতি দ্বারবঙ্গের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ

* মহারাজ বাহাদুরের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

এই সভায় সমবেত হইয়াছেন, সম্প্রদায় সমূহ কোন হিসাবে পৃথক্ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কিরূপ ব্যবধান আছে, সে সম্বন্ধে সকলে আলোচনা করিবেন। পূর্ব্বকালে এইরূপ ধর্ম্ম সভায় ব্রাহ্মণ মণ্ডলী অপর কোন সম্প্রদায়ের বা জাতির লোককে ধর্ম্মালোচনায় যোগদান করিতে দিতেন না সত্য, কিন্তু খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়, সে সময় হইতে এবিষয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

খৃষ্টের জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালে বিহারের অন্তর্গত রাজগিরিতে বৌদ্ধগণ প্রথমে এইরূপ একটি ধর্ম্ম সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। তাহার পর খৃষ্টের জন্মের ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে মজঃফরপুরের অন্তর্গত বৈশালী নামক স্থানে বৌদ্ধগণের চেষ্টায় দ্বিতীয় বার একটী সভা হয়। এইরূপে খৃষ্টের জন্মের ২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রনগরে তৃতীয় বার এবং রাজা কনিষ্কের রাজত্বকালে ৭৮ খৃষ্টাব্দে জলন্ধরে চতুর্থবার অধিবেশন হয়। তাহার পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে পাঁচ বৎসর অন্তর এইরূপ সভার অধিবেশন হইত। তাঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত সভাসমূহের মধ্যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরার সভাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের মধ্যে কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যই প্রকৃত প্রস্তাবে যথারীতি ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রবর্ত্তনই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহারা তৎকালীন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও এইরূপ নানা সম্প্রদায়ের জনগণ সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন। চিকাগো ও ভিনিস্ নগরে এবং ইউরোপেরও কোন কোন স্থানে এইরূপ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; আধুনিক ভারতেও কোন কোন সময়ে নানা সম্প্রদায়ের জনগণ সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন, এইরূপ সম্মিলনের মধ্যে কুম্ভমেলাই উল্লেখযোগ্য। জীবগণের মধ্যে মানবই ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু। পৃথিবীর যে কোন স্থানেই গমন করুন না কেন, দেখিতে পাইবেন যে সভ্যতার নিম্নতরবর্ত্তী জনগণও মানবাতিরিক্ত গুণবিশিষ্ট কোন এক সত্তার আরাধনা করিয়া থাকে। ধর্ম্মালোচনার জন্যই অদ্য আমরা সমবেত হইয়াছি। ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই এক্ষণে আমার স্মরণপথে উদিত হইতেছে।

পরস্পরকে ধারণ করাই ধর্ম্ম, একজন অপরকে আপনার সহিত এক সূত্রে বন্ধন করিবে, পরে সকলে ভগবানের সহিত আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিবে ইহাই ধর্ম্ম। আমরা এক্ষণে যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিব, ইহাই তাহার মূল বিষয়। আমার এই কথা যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে এই সভার অধিবেশনের পর আমরা মনে করিব যে, পাপ বা শয়তানের সর্ব্বপ্রকার শক্তির বিরুদ্ধে যে সেনাদল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, স্বয়ং ভগবান যে সেনাদলের প্রধান অধিনায়ক, আমরা সেই দলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র, আমাদের কার্য্য এক, উদ্দেশ্য এক। পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মহম্মদীয় প্রভৃতি এক একটী ধর্ম্ম, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পন্থার অনুসরণ করিয়া সেই পরমেশ্বরেরই আরাধনা করিতেছেন। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন মানব যে ভাবে আমাকে গ্রহণ করে, আমি সেইভাবে তাহাদিগের কার্য্য সাধন করিয়া থাকি। হে পার্থ! মানব আমারই পন্থার অনুসরণ করে।

জনৈক পারসিক কবি বলিয়াছেন হে ঈশ্বর! মুসলমান তোমার দাস, ব্রাহ্মণ তোমার পুণ্য নিকেতনের বন্দী, তুমি কাবাক ও মসজিদে বর্ত্তমান; তুমি অগ্নি-উপাসকদিগের উপাসনাগারে এবং হিন্দুর দেবমন্দিরেও অধিষ্ঠিত।

যদি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ ঘটে যদি তাঁহার সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, এই আশায় সকল ধর্ম্মের উপাসকেরাই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে মানব হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগের সকলের অন্তরেই বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সন্তানদিগকে বিভিন্ন পথে পরিচালন করেন। সকলে বিভিন্ন পন্থার পথিক হইলেও নিত্য ও একমাত্র ধর্ম্মের অনুসন্ধানেই তাহারা চলিয়াছে।

মানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব এবং ঈশ্বরের প্রতি পিতৃজ্ঞানই ধর্ম্ম। আমরা এই সত্য জ্ঞান অর্জ্জন করিবার এবং ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি! আমরা বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু যখন আমরা সেই একই উদ্দেশ্যে আপনাদিগকে পরিচালন করি এবং সেই একই আশ্রয় লাভ করিবার জন্য যত্নবান হই, তখন আমরা বিবাদী নহি, আমরা এক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ইহুদীদিগের ধর্ম্ম খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করেন।

দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজা বাহাদুর এই বিরাট ধর্ম্ম সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক উক্ত দিবসত্রয়কাল ধীর ও স্থিরভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন।

প্রথম দিবসে প্রথমেই য়িহুদি ধর্ম্মজ্ঞগণ তৎপরে অগ্নি উপাসক বিজ্ঞ-প্রবরগণ সর্ব্বশেষে লঙ্কাদ্বীপ হইতে সমাগত বৌদ্ধধর্ম্ম ও ধর্ম্মপাল প্রমুখ পণ্ডিত-প্রবরগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়দিন সর্ব্ব প্রথমেই ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পবিত্র ধর্ম্মালোচনা করেন স্থানাভাব বশতঃ এস্থলে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম প্রকাশ হইল না বটে কিন্তু ভবিষ্যতে সেই পবিত্র প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে সন্দেহ নাই। তৎপরে নানাপ্রকার মহম্মদীয় ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, দেব ধর্ম্ম আদি পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যাত হয়। শেষদিন অনুভবাদ্বৈত বেদান্ত, শৈবসিদ্ধান্ত, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বৈষ্ণব, সৌর, শৈব শাক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণের নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাপি যে সমস্ত মহাত্মগণ লোকের উদ্ধার জন্য যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন সকলে এক বাক্যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—এই জগদাধার নারায়ণে ভক্তি এবং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব সমূহের প্রতি দয়া, জীবের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের উপায় ও সকল ধর্ম্মের সার আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশ ভ্রমণকারী বৈষ্ণব বিনত পরিব্রাজক শ্রীমৎ বাবা প্রেমানন্দ ভারতী মহোদয় নানাপ্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্রেমই ভগভক্তি অনুশীলনের প্রধান সোপান, ইহা নিরবলম্বনে কখনই সাধিত হইতে পারে না। * অতএব অবলম্বনার্থ রূপ কল্পনা নিতান্ত প্রয়োজন। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়ে বঙ্গদেশে এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘ চেষ্টা, ইহা যে, ভারতবর্ষের একটী পরম সৌভাগ্যের বিষয় তাহা বিজ্ঞমণ্ডলীগণ এক বাক্যে অনুভব করিয়াছেন, অনেকে হৃদয়ের আনন্দবেগে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানযুগে অদ্য ভারতবর্ষে ইহা প্রথম। এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘ জন্য বঙ্গদেশ এবং বঙ্গদেশবাসিগণ ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় হইয়া ইতিহাসাদিতে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবেণ আজ আমরা বড়ই আনন্দ

* ঠাকুর শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয় তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভায় এতাবৎকাল আমাদিগকে এই প্রেম ভক্তির সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন আমরা সে দিন উক্ত ধর্ম্মসঙ্ঘে তাহার সামান্য আভাস মাত্র পাইয়াছিলাম। লেখক।

সহকারে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছি বঙ্গদেশের এবং বঙ্গবাসীর পরম সৌভাগ্য যে, তাহাদের স্থায় ব্যক্তির দ্বারাই অস্থ ভারতবর্ষে এই শুভ চেষ্টার পুনরভ্যুদয় হইয়া সমগ্র আর্য্যভূমির মুখোজ্জ্বল করিবার উদ্যম হইতেছে।

আগামী বর্ষের শীতকালে এই ধর্ম্ম সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন বোম্বাই অথবা মান্দ্রাজ মহানগরীতে হইবার প্রস্তাব হইল। সেই মহাসভার সদস্যাদি নির্ব্বাচনের নিমিত্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে প্রাদেশিক শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্থির হইয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী বিএ, কবিভূষণ।

কুসংসর্গ।

দিবাকর-কর সুমধুর অতি
জগৎ জুড়িয়া পড়ে,
বিটপী বল্লরী স্বভাবের গুণে
কালিমা-কলঙ্কী করে।
মৃদুল-সমীর পুলক-আবেশে
কুসুমে চুমিয়ে যায়,
আহা! পরে কত বিষময়-স্থান
বিষময় করে তায়।
জলধর-ঢালা পুত নিরমল
সলিল অবনী-পরে
আসিয়ে পশিয়ে পঙ্কিল-জীবন
পঙ্কিল-সরসী সরে।
কুসঙ্গের দোষে জীবন-প্রবাহ
অকূলে মিশিয়া যায়।
সঙ্গ-কল্যাণে রজত-প্রভাব
বিরস অয়সে পায়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ধর।

বীরবালা।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুর্জ্জয়ের পরিচয়।

দুর্জ্জয় সিংহের সহিত পাঠকগণ পরিচিত নহেন; সুতরাং এই পরিচ্ছেদে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

দুর্জ্জয় সিংহ প্রতাপগড়ের প্রধান সেনাধিনায়ক ছিলেন। সামান্য সৈনিক হইতে তিনি এই পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যখন দুর্জ্জয় সিংহ প্রতাপগড়ে প্রবেশ করিয়া প্রথম ভাগ্য-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন,—যখন তিনি আশ্রয়প্রার্থী কাঙ্গালরূপে রাজা মহীপৎ সিংহের নিকট নীত হন, তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। রাজা মহীপৎ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন,—দুর্জ্জয় পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক, সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সে তাহার পিতামাতাকে কখনও দেখে নাই, তাঁহাদের নাম, ধাম, বংশ-পরিচয়—তৎসম্বন্ধেও সে কিছুই জানে না; জ্ঞান হওয়া অবধি সে পথের ভিখারী। কেহই তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই; ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা মহীপৎ সিংহের দয়ার কথা শুনিয়া প্রতাপগড়ে আসিয়াছে, সে এখন রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে; কিন্তু সে রাজার আশ্রয়ে নিষ্কর্ম্মা হইয়া জড়ের মত—ভিখা-রীর মত পড়িয়া থাকিতে চায় না,—সে চায়—রাজসরকারে প্রবেশ করিয়া জীবন-সংগ্রামে তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে।

গুণগ্রাহী রাজা বালক দুর্জ্জয় সিংহের বীরোচিত প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইলেন। সৈন্যবিভাগে তিনি দুর্জ্জয় সিংহের জীবন সংগ্রামের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দুর্জ্জয় সিংহ প্রধান সেনাপতির নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগি-লেন, রাজভবনে তিনি অবস্থান করিবার আদেশ পাইলেন।

পাঁচ বৎসর পরে দুর্জ্জয় সিংহ সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি এক জন অশ্বারোহী সৈনিকের পদে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে দুর্জ্জয় সিংহের বীরত্ব-কাহিনী সকলের কর্ণগোচর হইল,—যুদ্ধক্ষেত্রে—শত্রু সমক্ষে দুর্জ্জয় সিংহের অসাধারণ সাহস দেখিয়া—রাজা মহীপৎ সিংহ মুগ্ধ হইলেন। ক্রমশঃ দুর্জ্জয় সিংহের পদোন্নতি হইতে লাগিল। বাইশ বৎসর বয়সে দুর্জ্জয় সিংহ প্রতাপগড়ের সমগ্র বাহিনীর সেনানায়ক হইলেন।

মহীপৎ সিংহ দুর্জ্জয়কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। দুর্জ্জয় সিংহ রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন; রাজ-অবরোধেও তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। ঘটনা-ক্রমে রাজকুমারী মৃণ্ময়ীর উপর দুর্জ্জয়ের পাপ-দৃষ্টি পড়িল। দুর্জ্জয় সিংহ বাল্যকাল হইতে রাজসংসারে প্রতিপালিত এবং রাজপরিবারে সংসৃষ্ট হই-লেও, রাজকুমারী মৃণ্ময়ী তাঁহার সহিত বড় একটা মিশিতেন না। দুর্জ্জয় সিংহ রাজকুমারীর সহিত গল্প করিতে, সুখ-দুঃখের কথা কহিতে, মেশামিশি করিতে সতত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু মৃণ্ময়ী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করি-তেন না। তিনি পিতার অন্যান্য কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণকে যে চক্ষে দেখিতেন, দুর্জ্জয়কেও সেই চক্ষে দেখিতেন। রাজকুমারী ভাবিতেন,—তাঁহার পিতার অপর যেমন সব ভৃত্য আছে, দুর্জ্জয়ও তেমনি। তবে রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া তাহার খাতির কিছু বেশী; তবু তো সে তাঁহার ভৃত্য! তাহার সহিত বন্ধুত্ব,—ছি!

কিন্তু দুর্জ্জয় সিংহ ভাবিতেন,—মৃণ্ময়ী মনে মনে তাঁহাকে ভাল বাসে, লজ্জাবশত তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহে না। ক্রমে দুর্জ্জয় সিংহের আশা বাড়িতে লাগিল, মৃণ্ময়ীকে তিনি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনে মনে বরণ করিয়া রাখিলেন, দিনান্তে অন্ততঃ একবার মৃণ্ময়ীকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না, মৃণ্ময়ীর জন্য তিনি আত্মহারা হইলেন। শয়নে—মৃণ্ময়ী-চিন্তা, স্বপনে—মৃণ্ময়ী-দর্শন, ভ্রমণে-ভোজনে—মৃণ্ময়ীর ভাবনা; ক্রমে ক্রমে দুর্জ্জয়ের হৃদয় মৃণ্ময়ীময় হইয়া উঠিল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জয় সিংহের আশা-লতা পল্লবিত হইয়া তাহার উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল, কিন্তু ফলবতী হইল না! দুর্জ্জয় সিংহের পাপ-স্পৃহা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—ক্রমে তাহা সংক্রামক হইয়া উঠিল। এখন আর দুর্জ্জয়সিংহ মৃণ্ময়ীর শুধু রূপ-চিন্তায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না,—দূর হইতে মৃণ্ময়ীকে দেখিয়াই তাঁহার প্রেম-তৃষা এখন আর প্রশমিত হয় না; তিনি এখন মৃণ্ময়ীকে নিজের-হৃদয়ের-অন্তরের সান্নিধ্যে আনিতে চান, মৃণ্ময়ীকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া তাঁহার পল্লবিত আশালতাকে ফলবতী করিতে চান;—শুধু অসার আকাশ-কুসুম-চয়নে এখন আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই।

এই সময় শুর্গিন খাঁ নামক একজন পাঠান-দস্যু প্রতাপগড়ের সীমান্তে বিষম উৎপাৎ করিতেছিল; এই বলবান দস্যুপতিকে কেহই বশীভূত

করিতে পারে নাই। কোন স্থানে শিক্ষা না পাওয়ায় গুর্গিন খাঁর স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; প্রবল প্রতাপে সে নর্ম্মদা অঞ্চলে দস্যুতা করিয়া বেড়াইতেছিল। তখন একটা জনরব উঠিয়াছিল যে, গুর্গিন খাঁ—পয়গম্বরের অবতার, তাহার উপর ঈশ্বরের অপার করুণা, তাহাকে ধরে কাহার সাধ্য!

মহীপৎসিংহ দস্যুবীর গুর্গিন খাঁর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেনাধিনায়ক দুর্জ্জয় সিংহের উপর গুর্গিন-দলনের ভার অর্পিত হইল। দুর্জ্জয় সিংহ মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া গুর্গিন খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। প্রতাপগড়ের সীমান্তে—দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে গুর্গিন খাঁ সদলে আশ্রয় লইয়াছিল। দুর্জ্জয় সিংহ সেই বন অবরোধ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রণ কৌশলে গুর্গিন খাঁর দলবল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; গুর্গিন খাঁ এক বেগগামী অশ্বারোহণে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া পলাইতেছিল, কিন্তু শত্রুনিক্ষিপ্ত এক অব্যর্থ গুলি তাহার ললাটে বিদ্ধ হইল, গুর্গিন খাঁ আহত হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল; দুর্জ্জয় সিংহ স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতায় আহত মূর্চ্ছিত শত্রুর শিরশ্ছেদ করিয়া মহীপৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

গুর্গিন খাঁ নিহত হইয়াছে শুনিয়া দক্ষিণাপথে হুলস্থুল পড়িয়া গেল,—ভীত ত্রস্ত প্রজারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুর্জ্জয়ের প্রতি মহীপৎসিংহের যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল, গুর্গিন খাঁর পতনে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। একদিন মহীপৎ সিংহ নির্জ্জনে দুর্জ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"দুর্জ্জয়! তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, আমি বুঝিতে পারিয়াছি—আমার করুণা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। দুর্জ্জয়! তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, আমাকে বল, আমি তাহা অম্লানবদনে পূর্ণ করিব।"

দুর্জ্জয় সিংহ ভাবিতেছিলেন,—জীবন-সংগ্রামে কর্ম্মসাগরে তিনি জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষিত হইয়াছে,—এবার প্রেম-সাগরে পড়িয়া তাঁহার ভাগ্য নির্ণয় করিতে হইবে। তিনি এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে ভাগ্যনির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু যখন মহীপৎ সিংহ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন আত্মহারা দুর্জ্জয় আনন্দে শিহরিয়া উঠিলেন,—এতক্ষণে তিনি ভাগ্য-পরীক্ষার সুন্দর সূত্র সম্মুখে দোদুল্যমান দেখিলেন। তিনি তখন স্মিতমুখে অসঙ্কোচে রাজা মহীপৎসিংহকে বলিলেন,—"মহারাজ! আমার একমাত্র প্রার্থনা,—আমি রাজকুমারী মৃন্ময়ীর

পাণিগ্রহণ-প্রত্যাশী; রাজকুমারীকে প্রসন্নমনে আমার হস্তে সম্প্রদান করেন,—এই আমার প্রার্থনা।"

দয়ালু দাতা ভিক্ষা-প্রার্থী আতুরকে ভিক্ষা দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সেই ভিখারী যদি তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করে, তাহা হইলে তিনি যেরূপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়েন,—অজ্ঞাত-কুলশীল দুর্জ্জয় সিংহের মুখে আজ এই প্রকার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া রাজা মহীপৎসিংহের অবস্থাও সেইরূপ হইল। কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, অবশেষে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন,—"এ প্রার্থনা কি শিষ্টাচার-সঙ্গত দুর্জ্জয়? তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, আমি তোমাকে পুত্রের মত দেখি, সেই সম্পর্কে মৃণ্ময়ী তোমার ভগিনী, তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইতেই পারে না। তুমি অপর কিছু প্রার্থনা কর।"

দুর্জ্জয় সিংহ সতেজে বলিলেন,—"আমি অপর কিছুর প্রার্থী নহি,—আমার যাহা প্রার্থনা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না হয় তাহা হইলে বুঝিব, প্রতাপগড়ের অধীশ্বর প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট মিথ্যাবাদী।"

রাজা মহীপৎসিংহের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইল; কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—দেখ দুর্জ্জয়, আমি গুণগ্রাহী—গুণের আদর করিতে আমি জানি; কিন্তু আমি কুলগ্রাসী নহি,—একজনের মনস্তুষ্টির জন্য আমি কুলনষ্ট করিতে পারি না। স্বীকার করি, তুমি গুণী,—আমার কার্য্যে তুমি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছ; তাহার বিনিময়ে যেরূপ সঙ্গত ও সম্ভব, আমি তোমাকে তাহা দিয়াই সন্তুষ্ট করিতে পারি। আমি তোমাকে অজস্র অর্থ, বিপুল সম্পত্তি, এমন কি আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত আমি তোমাকে অর্পণ করিতে পারি; কিন্তু আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না।"

দুর্জ্জয় সিংহ অপেক্ষাকৃত উগ্রস্বরে বলিলেন,—"আমি অর্থের প্রয়াসী নহি; সাম্রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই; ইচ্ছা হয়, যাহা চাহিয়াছি, তাহাই দিন; আমি অপর কিছু চাহি না।"

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কম্পিতস্বরে মহীপৎ সিংহ বলিলেন,—"তবে শোন, তোমার মত অজ্ঞাতকুলশীল অসহায় আশ্রয়হীন দাম্ভিক যুবকের সঙ্গে প্রতাপগড়ের রাজকুমারীর পরিণয় সম্পূর্ণ অসম্ভব; আমি তাহা কল্পনা করিতেও অক্ষম।"

গর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জয় সিংহ বলিলেন,—"তাহা হইলে নির্লজ্জের মত প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে এ কথা আপনার স্মরণ করা উচিত ছিল। আমি জানিতাম আপনি ধার্ম্মিক—সত্যবাদী, জানিতাম, আপনার সঙ্কল্প—বাক্য পর্ব্বতের মত অটল; কিন্তু আজ আমার সে বিশ্বাস, সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আজ জানিয়াছি—আপনি হীনমতি—মিথ্যাবাদী; জানিয়াছি, আপনি ভীরু—কাপুরুষ!"

প্রতাপগড়ের অধীশ্বর মহারাজ মহীপৎ সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ পর্য্যন্ত কেহই এরূপ কথা বলিতে পারে নাই। মহীপৎ সিংহ আত্মসম্বরণে অক্ষম হইলেন; ভ্রূকুটি করিয়া সরোষে দুর্জ্জয় সিংহকে বলিলেন,—"অকৃতজ্ঞ নরাধম! এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হইতে দূর হও;—আমার অধিকার ছাড়িয়া চলিয়া যাও; কাল প্রভাতে প্রতাপগড়ে যদি কেহ তোমার অস্তিত্ব দেখিতে পায়,—তাহা হইলে প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।"

দুর্জ্জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে সদর্পে উত্তর দিলেন,—"চলিলাম;—কিন্তু আর একদিন আসিব—ইহার প্রতিশোধ লইতে।"

প্রতাপগড় পরিত্যাগ করিয়া দুর্জ্জয় সিংহ দিল্লীনগরে গমন করিল দিল্লীর দরবারে দুর্জ্জয়ের বীরত্ব কাহিনী কাহারও অবিদিত ছিল না। দুর্জ্জয় সিংহ দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার অধীনতায় কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক তখন দক্ষিণাপথ আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন; সে সময় দক্ষিণাপথের একজন স্বাধীন রাজার খ্যাতনামা সেনাপতি তাঁহার সেনাদলে কার্য্য করিতে সম্মত দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। দুর্জ্জয় সিংহ সম্রাট কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত ও পঞ্চহাজারী মনসবদারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চতুর দুর্জ্জয় নির্ব্বোধ সম্রাটের মনোরঞ্জনের জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন; তাহার ফলে সম্রাট্ তোগলক অল্পদিনের মধ্যে দুর্জ্জয় সিংহের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। দুর্জ্জয় সিংহ এখন সম্রাটের অন্তরঙ্গ বন্ধু,—তিনি এখন সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত।

যখন দক্ষিণাপথের স্বাধীনতাকামী রাজগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন, তখন সম্রাট মহম্মদ দুর্জ্জয়সিংহের পরামর্শে দেবগিরি নগরে রাজধানী স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। যথাসময়ে সম্রাট সদলবলে দেবগিরি রাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাচীন দেবগিরিকে দৌলতাবাদ নামে অভিহিত করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ এ পর্য্যন্ত মৃণ্ময়ীকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মৃণ্ময়ী তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মৃণ্ময়ীর স্মৃতি ভুলেন নাই। দেবগিরিতে আসিয়া দুর্জ্জয়সিংহ স্থির করিলেন যে, একদিন গোপনে মৃণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং মহীপৎসিংহের চক্ষে ধূলি দিয়া, মৃণ্ময়ীকে লইয়া চলিয়া আসিবেন। সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি সংগোপনে পুষ্পোদ্যানে মৃণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত হইয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আওরঙ্গের প্রতিকৃতি।

সম্রাট মহম্মদ তোগলক সদলবলে দেবগিরির প্রাসাদে আসিয়াছেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেবগিরি রাজ্যে আনীত হইয়াছে। এই রাজধানী পরিবর্ত্তনে অনেক প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; দিল্লী হইতে পৈতৃক ঘর বাড়ী তুলিয়া অজ্ঞাত প্রদেশে আসিয়া আবার নূতনভাবে সংসার পাতা বড় সহজ ব্যাপার নহে; অধিকাংশ প্রজাই স্বেচ্ছায় দেবগিরি রাজ্যে আসিতে সম্মত ছিল না; কিন্তু তাহাদের সম্মতি-অসম্মতিতে কি আসিয়া যায়? ভীতত্রস্ত দরিদ্র প্রজার কাতর-প্রার্থনা শুনিবে কে? সম্রাটের সাধে 'বাদ সাধে' কাহার এমন সাধ্য? জন্মভূমি ছাড়িয়া, পৈতৃক বাস্তভিটার মায়া কাটাইয়া দেবগিরি নগরে যাইতে হইবে, সেইখানে নূতন আস্তানা তুলিয়া রাজধানী পত্তনে সহায়তা করিতে হইবে,—সম্রাটের এইরূপ আদেশ। ভক্ত পারিষদ ও সুদক্ষ কাজিগণের চেষ্টা যত্নে সম্রাটের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। যে সকল দুরন্ত প্রজা বাস্তভিটার মায়ায় পড়িয়া অম্লানবদনে সম্রাটের আদেশ মাথায় তুলিয়া লয় নাই,—তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, অনেকের মাথা গিয়াছে, অনেকে বাস্তভিটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সপরিবারে বলপূর্ব্বক দেবগিরি রাজ্যে নীত হইয়াছে। ক্ষুদ্র দেবগিরি রাজ্য আজ বিপুল জনতায় পরিপূর্ণ,—জনকোলাহলে চারিদিক মুখরিত। সম্রাটের আদেশে প্রাচীন দেবগিরি এখন দৌলতাবাদ নামে অভিহিত।

যে রাত্রে দুর্জ্জয় সিংহ প্রতাপগড়ের রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে

গিয়াছিলেন, সেই রাত্রে সম্রাট মহম্মদ তোগলক প্রাসাদের একটা সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া ওমরাহ ও পারিষদগণের সহিত দক্ষিণাপথ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

সম্রাট মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, দৌলাতাবাদের জল-বাতাস আপনাদের সহিতেছে তো ?"

একজন ওমরাহ উত্তর করিলেন,—"না সহিবার কোন কারণ তো দেখিতেছি না।"

আর একজন ওমরাহ বলিলেন,—"দৌলতাবাদের জলবাতাস যখন হিন্দুস্থানের একচ্ছত্রী সম্রাটের সহ্য হইয়াছে, তখন আমরা তো কোন্ ছার !—আমাদের না সহিবে কেন ?"

একজন পারিষদ সদম্ভে বলিয়া উঠিল,—"এ মুলুকে জাঁহাপনার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সবই শোধরাইয়া গিয়াছে ; আব হাওয়া তো দূরের কথা,—যে সকল কাফের ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটা গোলমাল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছিল, জাঁহাপনার আগমনে তাহারা পর্য্যন্ত সজুত হইয়া গিয়াছে।"

পারিষদের চাটুবাক্যে মহম্মদের মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রতিফলিত হইল ; ওমরাহগণের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"ভাল কথা, বিদ্রোহী কাফেরদের খবর কি ? আর যে তাহাদের বড় একটা সাড়াশব্দ পাইতেছি না।"

একজন ওমরাহ বলিলেন,—"জাঁহাপনা তখন সুদূর দিল্লীতে ছিলেন, তাই কাফেররা মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করিত, বিদ্রোহের ভয় দেখাইত ; এখন জাঁহাপনা তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন—বুকের উপর আসন গাড়িয়াছেন, আর কি তাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বিদ্রোহী হইবার সাহস রাখে ? এখন কাফেররা একেবারে ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়াছে।"

ম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার সহিত কেহ তো দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিল না ; এ অঞ্চল হইতে খাদায়পত্র অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; কোন রাজা—কোন জমিদার এ পর্য্যন্ত তো খাজনা পাঠাইল না ? তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব, তাহারা ভয় পাইয়াছে। ভয় পাইলে এখনও কি তাহারা দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া—খাজনাপত্র না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিত ?"

ও। দুদিন সবুর করিতে দিন ; জাঁহাপনা তো সবে সে দিন এ মুলুকে আসিয়াছেন। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, কাফেররা ভয় পাইয়াছে, তাহারা লড়াই করিবে না,—জাঁহাপনার পদানত হইবে।

ম। আর তিন দিন সবুর করিব; তিন দিনের মধ্যে যদি জাইগির-দার ও রাজারা আমার দ্বারস্থ হইয়া অধীনতা স্বীকার না করে—এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ রাজস্ব পড়িয়া আছে, তাহা দ্বিগুণ করিয়া না দেয়, তাহা হইলে আমি কাফেরদের উচিতমত শিক্ষা দিব। আমার পিতৃব্য বিদ্যমানে একবার আমি এ অঞ্চলে আসিয়া আগুণ জ্বালিয়া গিয়াছিলাম, এবারও তাহার পুনরভিনয় করিব, সমস্ত দক্ষিণাপথ ছারখার করিব, বিদ্রোহীদের গাছে গাছে লটকাইয়া দিব।

"জাঁহাপনা! কথাগুলি বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা কিন্তু তত-দূর সহজ নয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি দক্ষিণাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন; তখন দিল্লীশ্বরের প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি সম্পত্তির তুলনা ছিল না। জাঁহাপনার স্মরণ থাকিতে পারে, সেবার লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া দক্ষিণাপথ আক্রমণ করা হইয়াছিল। তখন এ অঞ্চলের রাজাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, রাজ্যেও তাদৃশ শৃঙ্খলা ছিল না; তথাচ তাহাদিগকে বশীভূত করিতে জাঁহাপনাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, দিল্লীশ্বরের সে প্রভাব প্রতিপত্তি নাই, পক্ষান্তরে দক্ষিণাপথের রাজ্য-গুলিতে এখন আর সে বিশৃঙ্খলা নাই; ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজাই এখন একতা-সূত্রে আবদ্ধ—দিল্লীশ্বরের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে সকলে সমুদ্যত। সুতরাং এ অবস্থায় দাক্ষিণাত্যবিজয় সহজসাধ্য নয়। আর জাঁহাপনা যে দ্বিগুণ রাজস্ব পাইবার আশা করিতেছেন, তাহা স্বপ্নের ন্যায় ভিত্তিহীন। রাজস্ব প্রদান দূরের কথা, এ অঞ্চলে কোন রাজা বা জাইগীরদার দিল্লীশ্বরের প্রভূত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে সম্মত নয়;—আমি এইরূপ শুনিয়াছি।"—সম্রাট মহম্মদের প্রধান অবলম্বন দিল্লীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি জাফরআলি খাঁ বাহাদুর এই কথাগুলি বলিলেন। জাফর খাঁ একজন উচ্চবংশীয় পাঠান; ইনি সম্রাটের আত্মীয় ইহাঁরই অসিবলে এবং অসাধারণ দক্ষতাগুণে মহম্মদ তোগলক বিধিবিরুদ্ধ শত শত গর্হিত কার্য্য করিয়াও দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাটের যথেচ্ছাচারে যখন দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশ সমূহের প্রজাগণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তখন এই জাফর খাঁ ও তাঁহার সহযোগী দুর্জ্জয় সিংহের অসাধারণ কূটকৌশলে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। জাফর খাঁ সম্রাটের সমগ্র বাহিনীর স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিংশতের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

জাফর খাঁর কথাগুলি শুনিয়া মহম্মদ বলিলেন,—"তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া দিল্লীশ্বরকে পলাইতে হইবে,—ইহাই তোমার বক্তব্য ?"

জাফ—আমার বক্তব্য নয়; আমি এমন কথা বলিতেছি না, আল্লার অনুগ্রহে কখনও বলিব না। আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিলাম।

ম।—স্বীকার করি, যাহা তুমি শুনিয়াছ, তাহাই বলিলে; কিন্তু তাহার প্রতীকারের কোন্ ব্যবস্থা স্থির করিয়াছ, তাহা শুনিতে পাই কি ?

জা। অবশ্য পাইবেন, কিন্তু স্থিরীকৃত কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমি এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারিব না। জাঁহাপনা তজ্জন্য আমার অপরাধ লইবেন না।

ম।—উত্তম; কিন্তু কাফের ধ্বংসের কি ব্যবস্থা করিয়াছ শুনি ?

জা।—আমি স্থির করিয়াছি,—যে নীতি অনুসারে পাঠান বিজেতারা হিন্দুস্থানে পাঠান আধিপত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আমিও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহোন্মুখ দাক্ষিণাত্য বিজয় করিব। ভেদনীতির অনুসরণ না করিয়া শুধু বাহুবলে দক্ষিণাপথ বিজয় এখন আর সম্ভবপর নয়। দুর্জ্জয় সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া আমি এইরূপ স্থির করিয়াছি।

ম।—আমার তাহাতে আপত্তি নাই; আমি চাই—দক্ষিণাপথের ধ্বংশ, তাহাই এখন আমার উদ্দেশ্য। ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক,—যেমন করিয়া হউক, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে বেইমান কাফেরের আস্পর্দ্ধা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

জা।—জাঁহাপনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে নফরের উদ্দেশ্যের কণামাত্র অনৈক্য নাই। তবে এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা সময়-সাপেক্ষ। আমার বিশ্বাস উপস্থিত ওমরাহগণ সকলেই আমার কথার সমর্থন করিবেন।

জাফর খাঁর কথা শেষ হইতে না হইতে ওমরাহ ও পারিষদগণ চারি দিক হইতে 'কেরামৎ! কেরামৎ!' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে দুর্জ্জয়সিংহ ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন।

মহম্মদ তোগলক সহাস্যে বলিলেন,—"এই যে দুর্জ্জয় সিংহ; এতক্ষণ তোমাদের দেশের কথাই হইতেছিল। তুমি তো এই অঞ্চলেরই লোক; শুনিয়াছি তোমাদের দেশের মেয়েরা নাকি বড়ই সুন্দরী ?"

একদিন পূর্ব্বে দুর্জ্জয়সিংহ যদি সম্রাটের মুখে এই কথা শুনিতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন না,—হয় তো তিনি দর্পের সহিত সম্রাটকে দু কথা শুনাইয়া দিতেন; কিন্তু আজ দুর্জ্জয় সিংহ প্রতিহিংসায় আত্মহারা,—প্রতিহিংসার তীব্রোজ্জ্বল অনলে আজ তিনি তাঁহার হৃদয়নিহিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংস্কার সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সুতরাং সম্রাট্ সম্ভাষণে দুর্জ্জয়সিংহ অম্লান বদনে বলিলেন,—"জাঁহাপনা কি এ পর্য্যন্ত তাহার নমুনা পান নাই?"

ম।—কোথায় পাইব? 'তোমার মেহেরবানী' না হইলে কেমন করিয়া পাই?

দু।—অধীন তুচ্ছ গোলাম মাত্র; জনাবের মেহেরবাণী হইলে এ নফর আপাততঃ এক আওরতের প্রতিকৃতি দেখাইতে পারে।

ম।—আপত্তি কি? সঙ্গে আছে না কি?

"আছে; জাঁহাপনাকে উপহার দিবার জন্যই এই প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।"—এই বলিয়া দুর্জ্জয় সিংহ অঙ্গবস্ত্র হইতে একখানি প্রতিকৃতি বাহির করিয়া সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিলেন।

অলৌকিক সুন্দরীর অপরূপ প্রতিকৃতি দেখিয়া সম্রাট মহম্মদ মুগ্ধ হইলেন; অনিমেষনয়নে তিনি সেই প্রতিকৃতি দেখিতে লাগিলেন। ওমরাহ ও পারিষদগণ সম্রাটের আশে পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রতিকৃতি দেখিতে লাগিলেন, সকলেই উচ্চকণ্ঠে তারিফ করিলেন; একজন পারিষদ মাথার টুপী তুলিয়া হাই তুলিয়া বলিয়া উঠিল,—"এ আওরৎ খোদাতাল্লার উপভোগ্য।"

দুর্জ্জয় সিংহ বলিলেন,—"দূর্ গর্দ্দভ; খোদাতাল্লা কি আওরতের প্রত্যাশী?—এ আওরৎ হিন্দুস্থানের বাদশাহের উপভোগ্য।"

পারিষদগণ উচ্চহাস্যে "কেরামৎ! কেরামৎ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

কথাটা সম্রাটের কানে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ আওরৎ বাদশাহের উপভোগ্যই বটে! এ তো দুনিয়ার চিজ নয়,—এ যে বেহেস্তের পরী!" পরক্ষণে সম্রাট্ দুর্জ্জয় সিংহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"দুর্জ্জয়সিংহ! তোমার সহিত আমার একটি গোপনীয় কথা আছে, আমার সঙ্গে আইস।"

সম্রাট উঠিলেন। দুর্জ্জয় সিংহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্জ্জয়ের দৌত্য।

দুর্জ্জয় সিংহ সম্রাটের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সেইটি সম্রাটের মন্ত্র-গৃহ। মহম্মদ আসন গ্রহণ করিলেন; তাঁহার অনুমতিক্রমে দুর্জ্জয়সিংহ পার্শ্ববর্ত্তী একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। মহম্মদ প্রতিকৃতিখানি দেখিতে দেখিতে দুর্জ্জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্জ্জয়সিংহ এখানি কোন সুন্দরীর প্রতিকৃতি?"

দু। রাজকুমারী মৃণ্ময়ীর।

ম। রাজকুমারী মৃণ্ময়ী? কে তিনি?—কোন্ রাজ্যের কুমারী?

দু। প্রতাপগড়ের রাজকুমারী।—মহারাজ মহীপৎ সিংহের কন্যা ইনি।

ম। প্রতাপগড়ের রাজা?—মহীপৎ সিংহ?—বুঝিয়াছি, পূর্ব্বে তুমি যাঁহার সেনাপতি ছিলে?

দু। হাঁ,—তিনি।

ম। এই সুন্দরীর সহিত তোমার বোধ হয় আসনাই আছে?

দু। কিছুমাত্র না।

ম। সত্য বলিতেছ? তোমার স্বর শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন কথা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ। শৈশব হইতে তুমি প্রতাপগড়ের রাজার অধীনে কার্য্য করিয়াছ, রাজভবনে তুমি প্রতিপালিত, এই সুন্দরীর সহিত আশৈশব হয় তো তুমি মেলামেশি করিয়াছ, সুতরাং ইহার প্রতি তোমার আনুরক্তিই সম্ভব। যাহা হউক তুমি নির্ভয়ে তোমার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বল।

দু। আমার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিব বলিয়াই আজ এই প্রতিকৃতি লইয়া জাঁহাপনার কাছে আসিয়াছি। জাঁহাপনা যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা সত্য। প্রতাপগড়ের রাজকুমারীর প্রতি আমার আনুরক্তি ছিল; আমার বিশ্বাস ছিল, রাজা মহীপৎসিংহ আমার উপর বিমুখ হইলেও তাঁহার কন্যা আমাকে ভাল বাসে;—আশা ছিল, রাজকুমারী মৃণ্ময়ী আমারই অঙ্কলক্ষ্মী হইবে; তাই আজ আমি সাহস করিয়া তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

ম। সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

দু। হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ফলে আমার আশা বিশ্বাস সমস্ত পণ্ড হইয়াছে।

ম। রাজকুমারী বুঝি তোমাকে আর ভালবাসিতে চায় না?

দু। ভালবাসা দূরের কথা, সে এখন আমার নামও মুখে আনিতে চায় না।—সে চায় বিধর্ম্মী পাঠানের পদলেহি কুলাঙ্গার দুর্জ্জয়সিংহের মুখে পদাঘাত করিতে।

ম। বটে; তাই বুঝি তুমি তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছ?

দু। বিবাহ করিব? না, জাঁহাপনা! এবার আপনি মিথ্যা অনুমান করিয়াছেন, আমি তাহাকে আর বিবাহ করিতে চাই না; আমি চাই, এবার তাহার উপর প্রতিহিংসা লইতে।

ম। একে রমণী, তাহাতে আবার সুন্দরী যুবতী, বিশেষ তোমার সঙ্গে তার আসনাইও ছিল;—এ অবস্থায় সাদি ছাড়া আর প্রতিহিংসার উপায় কৈ?

দু। জাঁহাপনা! তাহার প্রতি আমার যতটুকু ভালবাসা ছিল, ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া আমি তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছি। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—যে পাঠানের পদানত বলিয়া সে আমার মুখে পদাঘাত করিতে চায়, আমি তাহাকে সেই পাঠানের পদানতা বাঁদী করিব। জাঁহাপনা! এই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিবার জন্য আমি তাহার প্রতিকৃতি আপনাকে উপহার দিয়াছি।

অপূর্ব্ব পুলকে সম্রাট মহম্মদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কষ্টে হৃদয় ভাব গোপন করিয়া তিনি দুর্জ্জয়সিংহকে বলিলেন,—"রাগের বশে—অভিমানে আজ এই কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিন্তু কল্য প্রভাতে সেই সুন্দরীর স্মৃতি মনে পড়িলে, তোমার রাগ, অভিমান, প্রতিজ্ঞা—সমস্ত ভাসিয়া যাইবে।"

দুর্জ্জয়সিংহ সতেজে বলিলেন,—"জাঁহাপনা! আমি হিন্দু, হিন্দু কখনও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। ভাগ্যদোষে আজ আমি অধঃপতিত, স্বদেশ স্বজাতি—স্বধর্ম্মের সর্ব্বনাশে সমুদ্যত সত্য, কিন্তু তবু আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, শত সহস্র প্রলোভনেও আমি তাহাকে আর গ্রহণ করিতে পারিব না। জাঁহাপনা! এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যবস্থা করুন। এই অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারী আপনারই যোগ্য।"

মহম্মদ তোগলোক প্রতিকৃতিখানি দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"দুর্জ্জয়-সিংহ! এমন অনিন্দ্যসুন্দরী দুনিয়ায় থাকিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমার বিলাস-ভবনে সুন্দরীর অভাব নাই, কিন্তু এমনটি একটিও নাই; দুনিয়ায় বুঝি এ আওরতের তুলনা নাই! যে সুন্দরীর এই প্রতিকৃতি, তিনি রমণী-রত্ন।"

দু। চিন্তা কি জাহাপনা। এই রমণী-রত্নকে আপনার চরণের বাঁদী করিয়া দিব।

ম। এ রত্ন কি বাঁদীর যোগ্য দুর্জ্জয় সিংহ?—ইহা হৃদয়ে রাখিবার নিধি। দুর্জ্জয়সিংহ, তুমি যদি এই রত্ন আমাকে আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার কাছে ঋণী থাকিব; তোমাকে আমার কিছুই অদেয় থাকিবে না।

দু। জাঁহাপনা। পুরস্কারের প্রত্যাশায় এই প্রতিকৃতি আমি আপনাকে উপহার দিই নাই; এ কার্য্যের জন্য আমি আপনার নিকট পুরস্কার-প্রত্যাশী নহি।—প্রতিহিংসা গ্রহণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। জাঁহাপনার সমক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তাহাকে দেবগিরির বিলাস-ভবনে আনিয়া দিব।

মহম্মদ তোগলক সপুলকে দুর্জ্জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"দুর্জ্জয় সিংহ! ভাই! তুমি আমার অকৃত্রিম সুহৃদ; তুমি পুরুষ-রত্ন; তোমার গুণের তুলনা নাই।" ক্রমশঃ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

লর্ড রিপণের স্মৃতি।

গত ১০ই জুলাই ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মহামনা উদার-হৃদয় লর্ড রিপণের মৃত্যু হইয়াছে। লর্ড রিপণের নাম এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কেহ কখনও বিস্মৃত হইবে না। লোক চলিয়া যায়, সংসারে পড়িয়া থাকে তাহার স্মৃতি আর কীর্ত্তি। মহাপ্রাণ রিপণের শাসনকালে হিন্দুস্থানে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাই আজ তাঁহার স্মৃতি ভারতবাসীকে আকুল করিতেছে,—তাই তাঁহার মৃত্যুতে আজ সকলে সমভাবে বেদনা অনুভব করিতেছে। এ সময় লর্ড রিপণের জীবনচরিত আলোচনা—বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

লর্ড রিপণের পূর্ণ নাম—ফ্রেডরিক স্যামুয়েল রবিনসন, মার্কুইস অব্ রিপণ, কে, জি, পি, সি, জি, সি, এস, আই, জি, সি, আই, ই, ডি, এল, জে, পি, ডি, সি, এল, এফ, আর, এস। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডন নগরে লর্ড রিপণের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা আর্ল অব রিপণ, সার রবার্ট পীলের মন্ত্রণাসভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন আর্ল রিপণ বাকিংহাম শায়ারের একজন ধনাঢ্য জমিদারের দুহিতা, শারাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে লর্ড রিপণের জন্ম হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আর্ল অব রিপণ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লর্ড রিপণ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৭১ অব্দে ইনি মার্কুইস উপাধি লাভ করিয়া "জয়েণ্ট কমিটির" সভাপতি মনোনীত হন।

বাল্যকাল হইতেই লর্ড রিপণ আপামর জনসাধারণের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহার বয়স যখন ২৪ বৎসর, সেই সময় লণ্ডনে এক ভয়ঙ্কর ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটকারীরা তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্যই ধর্ম্মঘট করিয়াছে এরূপ বুঝিতে পারিয়া লর্ড রিপণ তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই ঘটনায় তাঁহার সম-অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কিন্তু রিপণ কিছুতেই সত্য ও ন্যায় হইতে বিচলিত হন নাই। এই সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ও কর্ত্তব্য ছিল। যখনই যে কার্য্যে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই সত্য ও ন্যায়মার্গ তখনই তাঁহার লক্ষ্যস্থল ছিল,—একদিনের জন্য তিনি তাহা হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই কারণেই—এই সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি ভারতবাসীগণের বিশেষ প্রীতি-পাত্র ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ানগণের ভয়ঙ্কর বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন।

ভারতের বড়লাটের পদে নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে লর্ড রিপণ ইংলণ্ডের অনেক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫২ অব্দে লর্ড রিপণ পার্লামেণ্টে প্রথম প্রবেশ করেন। পার্লামেণ্ট মহাসভায় তিনি একজন উদারনৈতিক সভ্য বলিয়া অভিহিত হন। ১৮৫৭ অব্দে তিনি লর্ড-অ্যাফিসের মেম্বর হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি সমর-বিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৬ অব্দে তিনি ইণ্ডিয়া হাউসে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি মহাসভার লর্ড প্রেসিডেণ্টের কার্য্য করেন। ১৮৮০ অব্দে তিনি গ্লাডষ্টোন কর্ত্তৃক ভারতের রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

লর্ড রিপণ যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন লর্ড লিটনের রোষানল

কাবুল দগ্ধ করিতেছিল, লর্ড রিপণ তাহা নির্ব্বাপিত করিলেন। মহীশূর রাজ্য বহুকাল তাহার ন্যায্য অধিকারীদিগের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল, রিপণ তাঁহাদিগকে মহীশূর-রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ন্যায়নিষ্ঠার উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্ত্তন করিয়া লর্ড রিপণ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সদনুষ্ঠানে সংবাদপত্রের শক্তি বর্দ্ধন ও রাজনীতিক-জীবনে নবীন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি শিক্ষা-কমিসন সংস্থাপন করেন। তিনি কার্পাসশুল্ক তুলিয়া দেন, দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য কৃষিবিভাগের পুনর্গঠন করেন।

আজকাল বঙ্গদেশে যে প্রজাস্বত্ব আইন প্রচলিত রহিয়াছে, লর্ড রিপণই এই আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বঙ্গের দরিদ্র নিঃস্ব প্রজাগণের অসুবিধা নিরাকরণের অভিপ্রায়ে তিনি উক্ত আইন প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লবণ-শুল্ক-হ্রাস করিয়া লর্ড রিপণ ভারতের মধ্যবিৎ ও দরিদ্র সমাজে বিশেষ প্রশংসিত হন,—এই শুল্ক হ্রাসে সমগ্র ভারতের প্রজার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সকলে সমস্বরে রিপণের জয়ধ্বনি করিয়াছিল। তখন বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে গীত হইত,—

"রিপণ, তোর গুণের কথা রইল গাঁথা
জন্মের মত হৃদ্‌মাঝারে।
কমালে নুনের মাশুল কীর্ত্তি অতুল,
প্রতুল হ'ল চাষীর ঘরে;
কেনে কেনে অন্ন উঠায় খাবায় খাবায়
নুন খেয়ে গুণ স্মরণ করে।"

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রিপণের গুণগান করিয়া "জয়মঙ্গল গীতে" লিখিয়াছিলেন,—

"আজিরে এ রবে কেবা ঘরে রবে,
আনন্দে বাজিছে ভেরী।
ঋষিতুল্য নর ভারত ভিতরে
এত দিন পরে হেরি।
চল সবে ভাই, দিয়া করতালি
নিকটে তাঁহারে ঘেরি।
'রিপণের জয়' 'রিপণের জয়'
আনন্দে বাজিছে ভেরী।"

ভারত-শাসন ব্যাপারে লর্ড রিপণ যেরূপ দক্ষতা ও সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারতের ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে তাহা সুবর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—ভারতীয় শাসনকর্তাই ভারত শাসনের উপযোগী। একজন ভারতীয় প্রজা কোন উৎকৃষ্ট ইংরেজ শাসন কর্তার শাসন অপেক্ষা একজন মধ্যম শ্রেণীর দেশীয় শাসনকর্তার শাসন অধিকতর ভালবাসে এবং তাহাকেই উৎকর্ষ বলিয়া স্বীকার করে।

লর্ড রিপণের ইচ্ছা ছিল যে, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা প্রভৃতি সাধারণ হিত-কর কার্য্যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অধিকার দিয়া তাঁহাদিগকে ক্রমে স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য তিনি মিউনিসিপালিটিসমূহে দেশীয় সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং জেলায় জেলায় জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সভ্যগণের উপর সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করেন।

ইল্‌বার্ট বিলের পাণ্ডুলিপি—লর্ড রিপণের শাসনকালের সর্ব্বশেষ স্মরণীয় ঘটনা। দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যাহাতে ইংরেজ আসামীগণেরও বিচার করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থার জন্য এই আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। এই ইল্‌বার্ট বিল লইয়া শ্বেতাঙ্গ সমাজে যে ভীষণ আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন সন্দেহ নাই। আংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এই বিলের জন্য লর্ড রিপণের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন; তাঁহার বিরুদ্ধে লোমহর্ষণ ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত পাকিয়া উঠিয়াছিল; সেই ষড়যন্ত্রে স্থির হইয়াছিল যে,—গভীর নিশায় ষড়যন্ত্রকারীরা লাটভবন আক্রমণপূর্ব্বক প্রহরীগণকে পরাজিত করিয়া লর্ড রিপণকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে!—যাহা হউক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণের এইপ্রকার জাতক্রোধের ফলে লর্ড রিপণকে অকালে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

লর্ড রিপণ চারি বৎসর কাল ভারতবর্ষে ছিলেন। বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক হন। তাহার পর লর্ড রিপণ "লর্ড প্রিভিসীল" হন, গত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে লর্ড রিপণ "রিভিউ অব রিভিউস্" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ষ্টেডকে বলিয়াছিলেন,—"আমার মতে বঙ্গভঙ্গ করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক সম্ভ্রান্ত স্থিতিশীল ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে সকল লোক ইতিপূর্ব্বে গবর্ণ-মেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, সেই সকল স্থিতীশীল এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

বঙ্গভঙ্গের জন্ত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গভঙ্গ কার্য্য দোষযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা যে একটি বিশাল রাজ্য, একজনের উপর ইহার শাসনভার ন্যস্ত করিলে সে ভার গুরুতর হয়, ইহা আমি মনে করি। বাঙ্গলাকে বিভক্ত করা আমার মত বটে, কিন্তু লর্ড কর্জ্জন যে ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, আমি কখনই উহাকে সে ভাবে বিভক্ত করিতাম না, এবং সমস্ত বঙ্গের লোক যদি আমার বঙ্গভঙ্গে অনুমোদন না করিতেন, তাহা হইলে আমি বাঙ্গলাদেশকে কখনই বিভক্ত করিতাম না।"

লর্ড রিপণ প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ইয়র্কসায়ারের উপর তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি ছিল। এই ইয়র্কসায়ারে তাঁহার বিপুল ভূসম্পত্তি আছে। তাহার পরিমাণ প্রায় সত্তর হাজার বিঘা। ষ্টাডলে রয়েল নামক স্থানে তাঁহার বিশাল প্রাসাদ ও তাহার সান্নিধ্যে ফন্টেনাভের ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ ইয়র্কসায়ারের একটি দর্শনযোগ্য স্থান। য়ুরোপের নানাস্থান হইতে দলে দলে দর্শক উহা দেখিবার জন্ত গমন করিতেন। তাঁহারা তথায় লর্ড রিপণের সৌজন্ত ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতেন।

১৮৫১ অব্দে প্রথম আর্ল অব গ্রের পৌত্রী হেনিরিয়েটা আনি থিয়োডোসিয়ার সহিত লর্ড রিপণের বিবাহ হইয়াছিল। লেডী রিপণ সর্ব্বাংশেই স্বামীর ছায়াস্বরূপিণী ছিলেন। গত ১৯০৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লর্ড রিপণের একটিমাত্র পুত্র, তাঁহার নাম আর্ল ডি গ্রে। ১৮৫২ অব্দের ২৯ শে জানুয়ারি তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর বয়স এখন ৫৭ বৎসর। ইনিও পার্লামেণ্টের একজন মেম্বর। ইনি এখানে মহারাণীর ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত আছেন। ইনিই এক্ষণে লর্ড রিপণের উপাধি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেপালের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাটমুণ্ড নগর নেপালের রাজধানী। সমুদ্র হইতে চারি হাজার ফিট উচ্চে এই রাজধানী অবস্থিত। রাজধানী কাষ্ঠমণ্ডপে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক বাস করে। রাজধানীর মধ্যস্থলে নেপালের মহারাজার প্রাসাদ। নেপালে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। অধিকাংশ মন্দির কাষ্ঠনির্ম্মিত, কারুকার্য্য, চিত্র ও গিল্‌টির দ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত। মন্দিরের চূড়াগুলি তাম্র বা পিত্তলের দ্বারা গিল্‌টী করা; প্রত্যেক তলার কার্ণিসে বহুসংখ্যক ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকে, বাতাসে সেগুলি টুং টাং করিয়া বাজে। গোম্বুজ ও স্তম্ভযুক্ত প্রস্তরময় মন্দিরও অনেক আছে।

রাজপ্রাসাদ হইতে ২০০ গজ দূরে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, সেই অট্টালিকাটি 'কট' নামে অভিহিত। ১৮৪৬ অব্দের ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য এই অট্টালিকা স্মরণীয়। এই অব্দে নেপালের সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া রাজমন্ত্রীকে হত্যা করে। মহারাণী চন্দ্রাবতী সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্তা হইয়া উঠেন। প্রধান সেনাধিনায়ক জঙ্গ বাহাদুরের উপর তিনি প্রতিশোধ লইবার ভার অর্পণ করেন।

জঙ্গ বাহাদুর রাজ্যের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ঐ অট্টালিকায় আমন্ত্রণ করেন। সেনাপতির আমন্ত্রণে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রাসাদে আগমন করিলেন। অতঃপর জঙ্গ বাহাদুর একদল সশস্ত্র সৈন্যসহ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে আমন্ত্রিত জনগণ অনলে পতিত পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হইলেন। ইহার পর জঙ্গ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। তিনিই নেপালের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

"ওঁ মণিপদ্মেহম" এই ছত্রটি নেপালের প্রধান ধর্ম্ম মন্ত্র। এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেই পুণ্যলাভ হয়—নেপালীদের এইরূপ বিশ্বাস।

শ্রীমণিলাল বন্দোপাধ্যায়।

হিংসা।

পরের উন্নতি দেখে কেন ওরে মন,
স্বার্থের কুহকে মজি হও জ্বালাতন।
অন্তরে পাপের অগ্নি করিলে পোষণ,
লাভ কি রে? দেহ তোর করিবে দহন।
সুখে থাক্ জীবগণ ভাবেন ঈশ্বর,
তুই কেন দুঃখী তাতে, হায় স্বার্থপর!
পশিতে ভাগ্য-মন্দিরে—কি আছে তোমার—
দয়া, ধর্ম্ম, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা আর—?
নাই ঐকান্তিকী চেষ্টা তাই ভূমণ্ডলে,
অবস্থার অবনতি ঘুচাতে নারিলে।
সে জন্য পরের সুখে দগ্ধ সর্ব্বক্ষণ,
ছি ছি, মন ভাল নয় একি আচরণ!
ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে এ প্রকার,
এ জীব-জগতে সব(ই) সমান তাঁহার।
বিভুর করুণা-কণা প্রত্যেক মানবে,
সমভাগে বিরাজিত,—এ বিশাল ভবে—
অপার মহিমা তাঁর—যেদিকে যখন,
নেহারি নয়ন মেলি করি বিলোকন।
কেনরে অবোধ মন বুঝেও বুঝনা,
অকারণে ভোগ কর নীরব যাতনা।
বিধির অলঙ্ঘ্য-বিধি চাহ দলিবারে,
একি ভাব? ক্ষান্ত হও, সংসার-সাগরে—
সামান্য-তৃণের ন্যায় আছ ভাসমান,
কেন বৃথা অহঙ্কার? হবে অবসান—
ধন, মান, কুল, শীল, রূপ, গর্ব্ব তোর,
রবেনা, হইবে এই সুখ-নিশা ভোর।

তাই বলি ওরে মন, ছাড় হিংসা দ্বেষ,
অন্তরে রেখনা কভু কুটিলতা-লেশ।
পরের সুখেতে সুখী হও চরাচরে,
ঈশ্বর তোমায় সুখ দিবেন অচিরে।

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

মাসিক সংবাদ।

মক্কা তীর্থের পাণ্ডারা ভারতের মুসলমানদিগের নিকট হইতে তীর্থ কার্য্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিত ঐ ব্যয়ের জন্য মক্কাতীর্থ করা ভারতীয় মুসলমানদিগের পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর হইয়াছিল সম্প্রতি হেজাজের বর্ত্তমান সচিব, ঐরূপ অবৈধ অর্থ সংগ্রহ রহিত করিয়াছেন।

বোম্বাই নগরের শ্রেষ্ঠ ধনী পার্শী মিঃ নৌরোজি মামেকজি ওয়াদিয়ার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক উইল করিয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার বিধবা পত্নী কেবল খোর পোষ পাইবেন, তদ্ভিন্ন উদ্বৃত্ত প্রায় দুই কোটি টাকা দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে যথা—উপনয়ন, বিবাহ, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি। পোষ্য পুত্র গ্রহণ প্রথা পার্শিজাতিতে নাই।

জয়পুরের মহারাজা পরলোকগত সংসার চন্দ্র সেনের পদে একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শিল্প বিজ্ঞান সমিতির সাহায্যে গত ২২শে জুলাই চারিজন বাঙ্গালী যুবক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান তিনি যাইবেন পারিসে অপর তিনজন ইংলণ্ডে থাকিয়া শিক্ষা করিবেন।